ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

"MISSION WITH MOUNTBATTEN"

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড

আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী

কলিকাতা-৯

ভূমিকা

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বোধ হয় ভারতে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাই বৃহত্তম পরিবর্তনের ঘটনা বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। আমার দিনলিপিরূপে লিখিত এই গ্রন্থে আমি বেশির ভাগই ইতিহাসের মূল উপাদান পরিবেষণ করেছি, সত্যি সত্যি একটা ইতিহাস রচনার প্রয়াস করিনি। ভারত সম্বন্ধে বিচারকের রায়ের মতো আর একটা অভিমত ঘোষণা না ক'রে বরং বেশির ভাগই সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্য পরিবেষণ করেছি। ঘটনা, এবং ঘটনার সঙ্গে যে-সকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা, উভয়ই এখনো অতিদূরে অতীতের বিষয় হয়ে পড়েনি। মনের দিক দিয়ে সেই ঘটনা এবং সেই সব ব্যক্তিত্বের স্মৃতি এখনো আমার এত নিকটে যে, উভয়কেই বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে একটা চূড়ান্ত অভিমতে উপস্থিত হওয়াও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ওয়েস্টমিনিস্টার
জুলাই, ১৯৫১

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

প রি চ য়

রীয়ার অ্যাডমিরাল দি ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন অব বর্মা : ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আর্ল উপাধিতে ভূষিত। ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয়, এবং শেষ ভাইসরয়। ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। কার্যকাল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন পর্যন্ত।

কাউণ্টেস মাউণ্টব্যাটেন অব বর্মা : ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর-জেনারেলের স্ত্রী।

লর্ড ব্র্যাবোর্ণ : মাউণ্টব্যাটেনের জামাতা।

লেডি ব্র্যাবোর্ণ : মাউণ্টব্যাটেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

মহাত্মা গান্ধী : "জাতির পিতা"।

সি আর : চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারী।

ভি পি : ভি পি মেনন। পূর্বে ভাইসরয়ের 'রিফর্মস্ কমিশনার'। পরে দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারি।

লকহার্ট : লেঃ জেনারেল স্যার রব লকহার্ট। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর (১৯৪৭ সালের জুন থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত)। ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম প্রধান সেনাপতি (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত)।

স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন : নিজামের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা।

নেহরু : পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে 'পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ্-সম্পর্কে'র ভারপ্রাপ্ত মেম্বার। ভারত ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ : ভারতীয় গণ-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট।

ভের্নন : লেঃ কর্নেল আর্স্কিন ক্রাম।

আচার্য কৃপালনী : নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি।

রোণি : ক্যাপ্টেন ব্রকম্যান।

জিন্না : মহম্মদ আলি জিন্না (কায়েদে আজম)। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট।

লেডি প্যামেলা মাউণ্টব্যাটেন : মাউণ্টব্যাটেনের কনিষ্ঠা কন্যা।

কে এম মুন্সী : হায়দরাবাদে নিযুক্ত ভারতের এজেণ্ট-জেনারেল (ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল)।

লিয়াকৎ আলি খাঁ : নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি। অন্তর্বর্তী ভারতীয় গভর্নমেণ্টের ফাইন্যান্স বা অর্থ-বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মেম্বার। পাকিস্থান ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী।

অকিনলেক : ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক। ১৫ই আগস্ট (১৯৪৭) পর্যন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতি। তার পর (১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত) ভারতীয় বাহিনীর খণ্ডনব্যবস্থা পরিচালনার কার্যে নিযুক্ত সুপ্রীম কম্যাণ্ডার।

সূচীপত্র

শেষ ভাইসরয়ের ভারতযাত্রা

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল : আজ সকালবেলা মাউণ্টব্যাটেনের চেস্টার স্ট্রীটের বাড়িতে প্রাতরাশে যোগদানের জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে মাউণ্টব্যাটেন যখন কাজ করছিলেন, তখন তাঁর দৈনন্দিন যুদ্ধকর্ম-বিবরণী লিখবার কাজের ভার ছিল আমার উপর। যুদ্ধ নেই, সেই কার্যপদও এখন আর আমার নেই, তবুও মাউণ্টব্যাটেন আমাকে তাঁর লিখিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ডেসপ্যাচগুলি একবার দেখবার জন্য বলেছেন। প্রাতরাশ সমাপনের পর কিছুক্ষণ এই সব ডেসপ্যাচ দেখার কাজেই কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু এ কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হবার নয়। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনেরও একবার বাইরে বের হবার প্রয়োজন ছিল। তিনি যাবেন শিল্পী অসোয়াল্ড বার্লের স্টুডিওতে। মাউণ্টব্যাটেনের একটি পোট্রেট আঁকতে শুরু করেছেন অসোয়াল্ড। অগত্যা মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গেই বের হলাম।

গাড়িতে উঠেই মাউণ্টব্যাটেন সব জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন যে, তিনি এখন আমাকে এমন একটি সংবাদ শোনাবেন, যে সংবাদ তাঁর পরিবাবের বাইরে কেউ এখনো জানেন না। সংবাদটা যেন আমার মুখ থেকে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কানে না যায়, গোপনতা রক্ষার এই নির্দেশও তিনি আমাকে শুনিয়ে রাখলেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, গতকাল সন্ধ্যাবেলা এটলি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওয়েভেল ভারত থেকে চলে আসছেন এবং তাঁর স্থানে এইবার মাউণ্টব্যাটেনকেই ভাইসরয় হয়ে ভারতে যেতে হবে, এই প্রস্তাব করেছেন এটলি।

বিস্মিত হলাম, কারণ এ ধরনের সংবাদ শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না এবং শুনবো বলে কল্পনাও করতে পারিনি, যদিও মাউণ্টব্যাটেনকে নানারকম বিস্ময়কর ব্যাপারের মধ্যেই দেখতে আমি অভ্যস্ত। আমি আজ পর্যন্ত জানতাম যে, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মাউণ্টব্যাটেন ফার্স্ট ক্রুজার স্কোয়াড্রনের রীয়ার-অ্যাডমির‍্যাল পদে নিযুক্ত হবেন এবং মাউণ্টব্যাটেনও তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই এখন শুনতে পেলাম, এটলির সঙ্গে তাঁর কি আলোচনা হয়েছে। এটলি জিজ্ঞাসা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেনের মন কি সত্য সত্যই সমুদ্রে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে রয়েছে? মাউণ্টব্যাটেন উত্তর দিয়েছেন—হ্যাঁ।

এরপর এটলি আলোচনার প্রসঙ্গ অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। ভারতীয় সঙ্কটের কথা উত্থাপন করলেন এটলি। তিনি বললেন, ওয়েভেল এ পর্যন্ত যা করতে পেরেছেন, তা'কে বলা যায়, সামরিক দখল ছেড়ে দিয়ে চলে আসার মতো ভারত থেকে ব্রিটিশের শুধু সরে আসবার একটা পরিকল্পনা। নতুন কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য এর চেয়ে বেশি কাজের কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা ক'রে উঠতে পারেননি ওয়েভেল। ভারতে বর্তমানে যে পন্থায় রাজনীতিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা হচ্ছে, তার ফলও ভাল হচ্ছে না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, উভয়েরই উপর এর প্রতিক্রিয়া বেশ খারাপভাবেই দেখা দিয়েছে। এসব ব্যাপারে গভর্নমেণ্টও

অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। এটলি বললেন, যদি আমরা এ বিষয়ে এখনই খুব সজাগ ও সতর্ক না হই, তবে পরিণাম যতটা খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা যায়, বাস্তবে তার চেয়ে বেশি খারাপ হতে পারে। ভারতকে শুধু যে গৃহযুদ্ধের মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে আসা হবে তা নয়, বস্তুত ভারতকে একনায়কতা প্রতিষ্ঠায় সমুদ্যত কতকগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের গ্রাসের মধ্যে সঁপে দিয়ে আসা হবে। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রের এই অচল অবস্থা দূর করার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। মন্ত্রি-মিশনের প্রধান প্রধান সদস্যদের সকলেরই মনে এখন এই ধারণা হয়েছে যে, সমস্যা সমাধান করতে হলে নতুন পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। এমন লোক চাই, যিনি এই সমস্যা সমাধানে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের যোগ্যতা রাখেন। মন্ত্রি-মিশনের প্রধান সদস্যেরা এরকম এক যোগ্য ব্যক্তি সংগ্রহের কথাও চিন্তা করেছেন। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনই হলেন এ কাজের পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি। এ কাজের উপযুক্ত গুণ এবং ব্যক্তিত্ব মাউণ্টব্যাটেনের আছে।

মাউণ্টব্যাটেন বলেছেন যে, তিনি একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন। মাউণ্টব্যাটেন যতদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে কাজ করছিলেন, ততদিন ভারতে ওয়েভেলের কাজ ও নীতির মধ্যে এমন কিছু তিনি দেখতে পাননি, যার বিরুদ্ধে তাঁর কোন আপত্তি ছিল। ওয়েভেলের নীতি তিনি সমর্থনই করেছেন। ওয়েভেলের সঙ্গে যতবার তাঁর আলোচনা হয়েছে, এমনকি বিগত জুন মাসে দিল্লীতে ওয়েভেলের সঙ্গে তাঁর যে শেষ আলোচনা হয়েছে, তাতেও তিনি বুঝেছেন যে, ওয়েভেলের অনুসৃত নীতিতে কোন ভুল নেই। ওয়েভেল যা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেনের উপর দায়িত্ব থাকলে তিনিও ঠিক তাই করতেন।

এটলি স্বীকার করলেন, ওয়েভেল এতদিন ধরে যে সাধারণ নীতি অনুসরণ ক'রে কাজ করেছেন, মূলত সেই নীতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আসল কথা হলো, নীতি প্রয়োগ করার অর্থাৎ নীতিকে কার্যে পরিণত করার সমস্যা। এবং বাস্তব সত্য এই যে, অজস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে নীতি ব্যর্থ হয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে সে নীতি আদৌ প্রযুক্ত হতে পারেনি।

এটলি বললেন, এখন এই নতুন অবস্থার কারণে সমস্যাটা প্রধানত একটা ব্যক্তিত্বঘটিত সমস্যাই হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতর হয়ে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উপায় নির্ণয় করাই এখন হলো সবচেয়ে বড় কাজের কথা।

মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বললেন, এটলির কাছ থেকে এই সব কথা শুনেও তিনি খুব জোর আপত্তি ক'রে বলেছেন যে, সমুদ্রে নৌ-সৈন্যের অধিনায়কতার পদে থেকেই তিনি রাষ্ট্রের সেবায় বেশি কাজ করতে পারবেন বলে মনে করেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন—ভারতে ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হবার মতো যোগ্য লোক কি আর কেউ নেই? অকিনলেক তো ভারতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন; সুতরাং অকিনলেককে ঐ পদে নিয়োগ করা কি যায় না?

এটলিকে শেষ পর্যন্ত কোন কথা দিয়ে আসতে পারেননি মাউণ্টব্যাটেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও তিনি করেননি। মাউণ্টব্যাটেন প্রথমত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে ধারণা ক'রে নিতে চাইছেন। ভারতে কি নীতি অনুসরণ করতে চান গভর্নমেণ্ট? তা ছাড়া, ইংলণ্ড-নৃপতির সঙ্গেও মাউণ্টব্যাটেনকে

একবার আলোচনা করতে হবে। ভাইসরয়ের পদ গ্রহণের অর্থ ইংলণ্ড-নৃপতিরই প্রতিভূ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ। ভারতের শাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভাইসরয় হলেন ইংলণ্ড-নৃপতির মনোনীত কর্মচারী, এবং দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভাইসরয় হলেন প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ড-নৃপতিরই ব্যক্তিগত প্রতিনিধি তথা প্রতিভূ। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন ইংলণ্ড-নৃপতির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এটলিকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না।

আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। আমি বললাম, গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যের পরিচয় এবং কর্তব্যের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে না জেনে নিয়ে এমন নিদারুণ দায়িত্ব গ্রহণ করা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত হবে না।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন,—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আমাকে একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হবে : কতদিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে? এ বিষয়ে যদি একটা চূড়ান্ত সময়সীমা নির্দিষ্ট না ক'রে দেওয়া হয়, তবে ভারতীয় জনমতের ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে প্রথম থেকেই আমার চেষ্টা পণ্ড হতে থাকবে এবং আমি এই ধরনের অবস্থার মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে পারি না।

মাউণ্টব্যাটেনের কথা শুনে মনে হলো, তিনি ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন। তিনি এ বিষয়ে সচেতন আছেন যে, এ কাজের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ফলাফলের সব বদনামের বোঝা তাঁরই ঘাড়ে পড়বার একটা আশঙ্কাও অবশ্য রয়েছে, কিন্তু খুব বেশি আছে বলে তিনি মনে করেন না।

লণ্ডন, বুধবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল : এখন একপ্রকারের সুনিশ্চিতই হয়ে গিয়েছে যে, মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদ গ্রহণ করবেন। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরে একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দেবার নীতিও গভর্নমেণ্ট স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোন্ তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্ত গভর্নমেণ্ট ক'রে উঠতে পারছেন না। গভর্নমেণ্ট বলেছেন, ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের মনেও এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ যত এগিয়ে দেওয়া হবে, মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষেও ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার প্রয়াস তত দ্রুত সাফল্য লাভ করবে। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন দাবী করেছেন, ১৯৪৮ সালের 'দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে' অর্থ যেন জুন মাসের মধ্যে বুঝায়, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নয়।

বড়দিনের প্রথম সপ্তাহ দেখা দেবার আগে এটলির সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের আলোচনাও এই পর্যন্ত এসে থেমে ছিল। চূড়ান্ত আলোচনার পর্ব বাকি থেকে যায়। মাউণ্টব্যাটেনও সপরিবারে অবসর যাপনের জন্য ডাভোসে চলে যান। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই লণ্ডন থেকে জরুরী আহ্বান চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ বিমানও উপস্থিত হলো তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে যাবার জন্য।

সংবাদপত্র মহল এই ঘটনার সংবাদ জানতে পারলেন, কিন্তু ঘটনার মর্মার্থ বুঝে উঠতে পারলেন না। 'ডেলি মেলের' সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল আমাকে বললেন যে, মাউণ্টব্যাটেনকে প্যালেস্টাইনে পাঠাবার জন্যই ব্যবস্থা হচ্ছে বলে তিনি অনুমান করছেন।

গভর্নমেণ্টের নতুন ঘোষণার খসড়ায় উল্লিখিত সর্তগুলি বেশ ভাল ক'রেই

বিবেচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং দেখে সন্তুষ্ট হলেন। দেখলেন, ভবিষ্যতে তাঁর নৌবিভাগীয় সার্ভিসের সুযোগও একটি উল্লেখের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ভাইসরয়ের পদ গ্রহণে চূড়ান্ত সম্মতি জানিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন এই আশঙ্কা করছিলেন এবং সে সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, ভাইসরয়ের পদে তাঁর এই নিয়োগে অনেকের মনে ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণা হতে পারে, ভারতীয় সমস্যার কোন সঙ্গত সমাধান করতে না পেরে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের উপর তাঁদের নিজেদেরই ইচ্ছামতো একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আরও ধারণা হতে পারে, ভারতে ভাইসরয় নিয়োগের প্রথাটিও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে চাইছেন। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিই যদি কতগুলি নীতি ও সর্ত নিজেরাই উল্লেখ ক'রে সেই নীতি ও সর্ত অনুযায়ী ভাইসরয়ের কর্তব্য পালনে মাউণ্টব্যাটেনকে খোলাখুলিভাবে আমন্ত্রণ করেন, তবে মাউণ্টব্যাটেনের ভাইসরয়পদ গ্রহণের ব্যাপার সম্পর্কে ঐসব ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিতে পারবে না। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ হতে নতুন ভাইসরয়ের জন্য আমন্ত্রণ উত্থাপিত হলে তবেই মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদ গ্রহণ করবেন, এই সর্ত করতে চেয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু এটলি মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রস্তাবের সকল দিক ব্যাখ্যা ক'রে এই অভিমত দিলেন যে, এ প্রস্তাব বাস্তবে সম্ভবপর হতে পারে না। তবে এই সঙ্গে আর একটি নীতি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার ক'রে নিলেন এটলি। নির্দিষ্ট একটি তারিখের মধ্যেই ভারতে ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটিয়ে দিতে হবে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি একমত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হোক বা না হোক। তা ছাড়া, যদি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই একমত হয়ে ভারতের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে এবং সে শাসনতন্ত্র মেনে নিতে রাজি হয়ে যায়, তবে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হবে।

লণ্ডন, সোমবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সাল : আর একটি দাবী করেছেন মাউণ্টব্যাটেন এবং গভর্নমেণ্ট মাউণ্টব্যাটেনের এই দাবীও মেনে নিয়েছেন। দিল্লীতে লর্ড ওয়েভেল এখন যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, তাঁরা যথেষ্ট সুদক্ষ হলেও মাত্র সেই স্টাফের সাহায্যে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর কাজ ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে করছেন না। মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতে গিয়ে এমন এক কাজের ভার নিতে হবে, সামরিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে তার চেয়ে বৃহৎ কোন কাজের দায়িত্ব এর আগে কোন ভাইসরয়কেই গ্রহণ করতে হয়নি। তা ছাড়া, সাধারণতঃ একজন ভাইসরয়ের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকালের মাত্র এক চতুর্থাংশকালের মধ্যেই নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনকে সকল কর্তব্য সমাপ্ত ক'রে ফেলবার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনের জন্য অতিরিক্ত স্টাফ চাই। গভর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

দিল্লীর ভাইসরয় ভবনে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত স্টাফ হিসাবে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের নামও জানতে পারা গেল। কয়েকটি নতুন পদ সৃষ্টি করছেন মাউণ্টব্যাটেন, ইতিপূর্বে দিল্লীর ভাইসরয় ভবনে এই ধরনের পদাধিকারী কোন কর্মচারী ছিল না। ভাইসরয়ের চীফ অব স্টাফ বা প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন লর্ড ইস্মে। প্রধান সেক্রেটারি হবেন স্যার এরিক মিয়েভিল।

ভের্নন আর্স্কিন ক্রাম'কে কনফারেন্স সেক্রেটারি বা সম্মেলন সচিবের পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ব্রকম্যান এবং নিকল্‌স্‌ উভয়েই ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ মাউণ্টব্যাটেনের অধীনে কাজ করেছিলেন। ব্রকম্যান ছিলেন নৌ-সচিব এবং নিকল্‌স্‌ ছিলেন নৌ-সৈন্যের পদস্থ কর্মচারী। এঁরা দু'জনে যথাক্রমে ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের পার্সোনাল ও ডেপুটি পার্সোনাল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হলেন।

আমি ছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের জনৈক উইং-কম্যাণ্ডার। মাউণ্ট-ব্যাটেনেরই পরিচালনাধীনে চার বৎসর কাজ করেছি। এখন আমার কাজ নেই। অল্পদিন হলো সামরিক কর্মজীবন থেকে ছাড়া পেয়েছি, কারণ যুদ্ধোত্তর সৈন্যবিদায় করার পালা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছা, আমি তাঁর 'প্রেস অ্যাটাশে' বা সংবাদ-কর্মচারীর পদ গ্রহণ করি। সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন এবং প্রচারের জন্যও এই রকম একটি কর্তব্যের পদ ভাইসরয়ের স্টাফের মধ্যে রাখবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই অনুভব করছিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সাল : আমি রাজি হয়েছি। মাউণ্টব্যাটেনের চেস্টার স্ট্রীটের বাড়িতে আর একবার এসে তাঁকে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে এসেছি। নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের সংবাদ-কর্মচারীর পদে আমিই কাজ করব।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে একই গাড়িতে বসে ফেব্রুয়ারীর এই রুক্ষ অপরাহ্নে বরফ-ছড়ানো পথের উপর দিয়ে বাকিংহামশায়ারের দিকে যাচ্ছিলাম। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—চার্চিল অসন্তুষ্ট হয়েছেন। চার্চিল এই অভিযোগ ক'রে বেড়াচ্ছেন যে, সোস্যালিস্ট দল নিজেদের ব্যর্থতার অপরাধ ঢাকবার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সুনামের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করছেন।

চেস্টার স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম, কমন্স সভায় এটলি নতুন ভাইসরয়ের নাম ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন। সপ্রশংস ধ্বনির দ্বারা এই ঘোষণা কমন্স সভায় অভিনন্দিত হয়েছে।

আরও শুনলাম, কমন্স সভায় চার্চিলের প্রতিবাদে একটা চাঞ্চল্যও সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের ভাইসরয় পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগের সিদ্ধান্ত যেভাবে সমালোচনা করেছেন চার্চিল, তাতে এটুকুই শুধু প্রমাণিত হয় যে, তিনি গভর্নমেণ্টের এই নীতির ভেতর থেকে তাঁর নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সুযোগ টেনে বের করবার জন্য তৈরী হয়েছেন।

ভারতের নতুন ভাইসরয়ের নিয়োগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাগত যেসব নির্দেশও ঘোষণা করেছেন এটলি, সেসব নির্দেশ বস্তুত নতুন ভাইসরয়কে স্বচ্ছন্দে কাজ করবার এক উদার অবকাশ দিয়েছে। যদি ভারতে ভারতীয় জনসাধারণের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে গঠিত গণপরিষদ একমত হয়ে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে কোন শাসনতন্ত্র রচনা ক'রে উঠতে না পারেন, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে আবার চিন্তা ক'রে নির্ণয় করতে হবে, নির্দিষ্ট তারিখে কার উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে? "ব্রিটিশ ভারতের কোন একটি কেন্দ্রীয় সরকারকে কিংবা বিভিন্ন কয়েকটি অঞ্চলে বর্তমানের প্রচলিত প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অথবা ভারতীয় জনসাধারণের সর্বোত্তম কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত পন্থায় ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা করবেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট।"

কমন্স সভার এই অধিবেশনে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী এটলি স্পষ্ট ক'রেই বললেন যে, অধিরাজক ক্ষমতা কোন নতুন গভর্নমেণ্টের উপরে অর্পণ করা হবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ঘোষণা শুনে চমকে উঠলেন রক্ষণশীল 'কনজারভেটিভ' দল।

লণ্ডন, বুধবার, ৫ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : যেমন পার্লামেণ্টের অধিবেশনের বিতর্কে, তেমনি অন্যান্য সূত্রেও ব্রিটিশ জনমতের পরিচয় জানবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আয়োজন এবং ব্যবস্থাকে কে কি চক্ষে দেখছেন?

কমন্স সভার বিতর্কে ক্রীপস্ যদিও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্ব চুকিয়ে দেবার জন্য একটা সময়সীমা বেঁধে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ১৯৪৮ সালের পরে ব্রিটিশের ভারতে অবস্থান সমর্থন করার মতো আর কোন যুক্তি নেই। সামরিক এবং শাসনিক, উভয় কারণেই ১৯৪৮ সালের পরেও ব্রিটিশের পক্ষে ভারতে থাকা আর উচিত হবে না। লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে ক্রীপস্ একটি কথাও বললেন না। ওয়েভেল সম্বন্ধে তাঁর এই নীরবতা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। কারণ ওয়েভেল সম্বন্ধে একটা উল্লেখ পর্যন্ত করতে ভুলে যাওয়ার এই ব্যাপার সেই সন্দেহই আরও বেশি দৃঢ় ক'রে তুলবে যে, বিদায়ী ভাইসরয় ওয়েভেল এবং এটলি-গভর্নমেণ্টের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ঘটেছে।

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ৬ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : কমন্স সভার বিতর্ক আজ চার্চিলের তপ্ত কথার ঝলক লেগে অস্থির হয়ে উঠল। এ রকমই হবে বলে আশা করেছিলাম। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই পরিকল্পনাকে তিনি পূর্বানুসৃত নীতির ভয়ঙ্কর অন্যথাচরণ বলে উল্লেখ করলেন। শেষে লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন চার্চিল। তিনি বললেন—'আমি বলতে চাই, ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে বস্তুত পদচ্যুত করেছেন গভর্নমেণ্ট। ওয়েভেলের পক্ষ সমর্থনের কোন দায় আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, আসলে ভুল করেছেন গভর্নমেণ্ট; এবং ওয়েভেলকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই ভ্রান্ত গভর্নমেণ্টেরই প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছে।'

নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন সম্পর্কেও উল্লেখ ক'রে চার্চিল বললেন—'এই সমস্ত ব্যাপারের স্বরূপ দেখে আমি বলতে বাধ্য যে, গভর্নমেণ্ট এখন মহাযুদ্ধের যত কৃতী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতিকে নিজেদের অকৃতিত্ব ঢাকবার কাজে লাগাবার পন্থা গ্রহণ করেছেন।'

ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন চার্চিল—'ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন গভর্নমেণ্ট। শুধু দুই ভাগ নয়, এলোমেলোভাবে ভারতকে টুকরো টুকরো করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়সীমা ঘোষণা করায় কোন সুফল দেখা দেবে না। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাণ্ডজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে সাহায্য না ক'রে নির্দিষ্ট সময়সীমার এই ঘোষণা বরং তাদের দিক থেকে নানা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ দাবী উপস্থিত করার প্ররোচনা হয়ে উঠবে। ভারতের এই সব 'পার্টি' বলে থাকে যে, তারা হলো ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি। এ দাবী একেবারে ভুয়া ও ভিত্তিহীন। ভারতের এই সব পার্টির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ কতগুলি খড়ের তৈরী মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সব পার্টির অস্তিত্বের লেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

চার্চিলের সমালোচনার উত্তর দিলেন এটলি। ওয়েভেল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করলেন। ভারতীয় নেতাদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে এটলি বললেন—'দীর্ঘকাল হতে ভারতের শাসন পরিচালনায় আমরা যেসব 'রিফর্ম' বা সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে এসেছি, তার মধ্যে একটা বড় ভুল ছিল। আমরা ভারতীয় সমাজকে দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা না দিয়ে বস্তুত দায়িত্বহীন হবার শিক্ষাই দিয়ে এসেছি। প্রত্যেক ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা এযাবৎ গভর্নমেণ্ট-বিরোধী হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়েছেন এবং অভিজ্ঞতার থেকেই বলা যায়, তাঁদের পক্ষে সর্বদা এইভাবে বিরোধী হয়ে থাকার ফল ভাল হতে পারে না।'

ভারতের মাইনরিটি সমাজগুলির প্রতি ব্রিটিশের দায়িত্বের প্রসঙ্গেও কতগুলি মন্তব্য করলেন এটলি। এটলি বললেন—বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের অস্পৃশ্য সমাজরা একটি মাইনরিটি এবং তাদের প্রতি ব্রিটিশের একটা দায়িত্ব আছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, বর্তমান ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেই 'ট্রাস্ট' তথা নৈতিক দায়িত্ব এখন অস্বীকার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটলি তীব্র মন্তব্য করলেন—'এই ট্রাস্ট তথা দায়িত্ব তো অনেককাল হতেই রয়েছে। এতদিনের মধ্যেও সে দায়িত্ব পালন করা হয়নি কেন? যদি এ রকম কোন দায়িত্ব আছে বলেই ধরা হয়, তবে বলতে হবে যে, সে দায়িত্ব আরও আগেই পালন করা উচিত ছিল। এখন ঠিক যে-সময়ে আমরা ভারতে আমাদের শাসনেরই অবসান করার জন্য উদ্যোগী হয়েছি, সে সময়ে ট্রাস্টের প্রতি অবহেলা বা মাইনরিটির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করার কোন অর্থ হয় না।'

বক্তব্যের উপসংহারে এটলি বললেন—'নতুন ভাইসরয়ের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমি, তাঁর মিশন সফল হউক। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোন বিশ্বাসভঙ্গের পরিকল্পনা নিয়ে নয়, ভারতে এক সদুদ্দেশ্য সাধনেরই মিশন সফল ক'রে তুলবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।'

এটলি যদিও এই আবেদন করেছিলেন যে, পার্লামেণ্টের সকল দলের পক্ষ থেকেই সম্মিলিতভাবে এক শুভেচ্ছার বাণী ভারতের জনসাধারণ এবং ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হোক, তবুও এই আবেদন গভর্নমেণ্টের ঘোষণা ও নীতিকে দলীয় অভিমতের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হলো না। প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দাবী করা হলো। গভর্নমেণ্টের নীতি এবং আমাদের মিশনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে তিন শত সাঁইত্রিশ এবং বিরুদ্ধে এক শত পঁচাশি ভোট প্রদত্ত হলো। ভোটের দাবী এবং মিঃ চার্চিলের কতগুলি মন্তব্যে বিশেষ অপ্রসন্নতা ব্যক্ত হ'তে দেখে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে অভিমতের ব্যবধান যত বড় বলে মনে হতে পারে, আসলে সে ব্যবধান যে তার তুলনায় অনেক কম, সেটা এই ঐতিহাসিক বিতর্ক শোনার পর কেউ অনুভব না ক'রে পারবেন না।

লণ্ডন, সোমবার, ১০ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : ভারত মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একেবারে নতুন কোন দেশ নয়। ভারত সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। প্রথম তিনি ভারতে গিয়েছিলেন ১৯২১ সালে, প্রিন্স অব ওয়েলসের পার্শ্বচর অফিসার হয়ে। তারপর ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মিত্রশক্তির সম্মিলিত কম্যাণ্ডের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে তিনি দিল্লীতেই তাঁর প্রধান দপ্তর রেখেছিলেন। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের অধ্যক্ষ হিসাবে মালয়ে তিনি প্রধান দপ্তর স্থাপন করলেন। এখানেই ভারতের জওহরলাল

নেহরুর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের প্রথম সাক্ষাৎ। মালয়ের অন্যতম সংখ্যাপ্রধান সমাজ ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাব অনুসারে নেহরু সেসময় মালয়ে একবার এসেছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি এখনো বেশ স্পষ্টই আমার মনে আছে। খুবই প্রীতিপূর্ণ হয়েছিল এই সাক্ষাৎকার। স্পষ্টই বুঝতে পারা গিয়েছিল, উভয়েরই মনে উভয়ের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ভাব তখনই বেশ নিবিড় হয়েই দেখা দিয়েছিল।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে আর একটা ব্যবস্থাগত বিষয়েও কিছুটা পরিবর্তন করিয়ে নিলেন। 'গভর্নর-জেনারেলের কার্যবিধির নির্দেশিকা'য় উল্লিখিত নির্দেশগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন। বর্তমানে যে নির্দেশিকা প্রচলিত রয়েছে, সে নির্দেশিকা ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন বিধানের লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্বই এই নির্দেশিকায় গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্বরূপে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশিকা এখন গভর্নমেণ্টের গৃহীত নতুন ভারত-নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং এর কিছু কিছু পরিবর্তন না ক'রে নিলে চলে না। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক নির্দেশিকা রচিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এতটা দাবী করতে চান না এবং কোন প্রয়োজনও আছে বলে মনে করেন না। গভর্নমেণ্টও মনে করছেন যে, বর্তমান অবস্থায় এবং ভারত সম্পর্কে নতুন আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নির্দেশিকা নতুন গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের কাজের পক্ষে কোন ব্যক্তিগত অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। সুতরাং একেবারে নতুন একটা নির্দেশিকা রচনা ছেড়ে দিয়ে, মাউণ্টব্যাটেনের কাজের সুবিধার জন্য নীতি-নিয়ামক কতগুলি নতুন কর্মসূত্রের উল্লেখ ক'রে একটি পত্র মাউণ্টব্যাটেনকে যদি গভর্নমেণ্ট দেন, তবেই ব্যবস্থার দিক দিয়ে আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। এই দাবীই করলেন মাউণ্টব্যাটেন। গভর্নমেণ্টও সম্মত হলেন। পত্রে সুস্পষ্ট কতগুলি কর্মসূত্রের উল্লেখ ক'রে মাউণ্ট-ব্যাটেনকে প্রদান করা হলো।

(১) ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতে একটি এককেন্দ্রিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা। যদি সম্ভব হয়, তবে এই নতুন গভর্নমেণ্টকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নতুন এককেন্দ্রিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করার পন্থা হলো, মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গণপরিষদ। ভারতের সকল রাজনৈতিক দলকে এই পরিকল্পনায় সম্মত করাবার জন্য মাউণ্ট-ব্যাটেনও তাঁর সাধ্যমতো সকল চেষ্টা করবেন। 'যদি সম্ভব হয়, তবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে'—এই কথা কয়টি মাউণ্টব্যাটেনেরই বিশেষ অনুরোধ অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা একমাত্র ব্রিটিশ-ভারতের সম্পর্কে প্রযোজ্য। এবং এই পরিকল্পনা কার্যত প্রযোজ্য হতে পারে, যদি ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ঐ পরিকল্পনা সমর্থন ও গ্রহণ করতে রাজি হন। যখন এই নীতিই ঘোষণা করা হয়েছে, তখন ঐ দুই প্রধান রাজনৈতিক দলকে মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করার কোন কথা আর উঠতে পারে না। যদি আগামী ১লা অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে, এককেন্দ্রিক

গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে দুই রাজনৈতিক দলের মতৈক্য সৃষ্টির কোন ভরসা আর নেই, তবে তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে জানাবেন, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(৩) দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা তথা শাসকবর্গকে মাউণ্টব্যাটেন এই কথা বোঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যে, প্রত্যেক দেশীয় নৃপতির পক্ষে এখন নিজ নিজ রাজ্যে কোন-না-কোন প্রকারের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দ্রুত প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতের নতুন গভর্নমেণ্টের সংগে দেশীয় রাজারা যে-ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবেন, সে সম্বন্ধে একটা সংগত ও ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা বর্তমান ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সংগেই আলোচনা ক'রে উদ্ভাবন করতে হবে—এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই মাউণ্টব্যাটেন চেষ্টা ক'রে যাবেন।

(৪) ব্রিটিশ-ভারতে প্রশাসনিক ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেন যে নীতি অনুসারে কাজ করবেন, তাকে এক্ কথায় বলা যায়—ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার সাহায্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

(৫) ভারতের দেশরক্ষা, অর্থাৎ সামরিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতে হবে। ভারতীয় বাহিনীর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সচেতন করবেন মাউণ্টব্যাটেন। তাছাড়া, ভারত মহাসাগরের রক্ষা-ব্যবস্থায় বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও ভারত ও ব্রিটিশের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ভারতীয় নেতাদের মনে অনুকূল ধারণা সৃষ্টির জন্য মাউণ্টব্যাটেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া আর কোন ভাইসরয়কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কর্ম-নিয়ামক এরকম উদার অথচ দুরূহ নির্দেশ এর আগে কখনো গ্রহণ করতে হয়নি।

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ১১ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই গভর্নমেণ্ট পক্ষের প্রধানদের সংগে অনেকবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং অনেক আলোচনাও করেছেন। ইংলণ্ড-নৃপতির সংগেও সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়ে গিয়েছে। যেমন এটলি, ক্রীপস, আলেকজাণ্ডার ও পেথিক লরেন্সের সংগে দেখা করেছেন, তেমনি বিরোধী পক্ষের প্রধানদের সংগেও সাক্ষাৎ করতে তিনি ভোলেননি।

আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে মাউণ্টব্যাটেনের সংগে লর্ড স্যামুয়েলের সাক্ষাৎ হলো। সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আমিই করেছিলাম। আলোচনার বেশির ভাগ সময় মাউণ্ট-ব্যাটেনই কথা বললেন এবং স্যামুয়েল বেশির ভাগ সময় চুপ ক'রে শুনলেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, বিরোধী পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ করবার কোন যুক্তি নেই যে, আমি একমাত্র এটলির ইচ্ছা অনুসারেই ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হয়েছি। ইংলণ্ড-নৃপতি আমার এই নিয়োগ আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন। এমনকি, ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ ক'রে ইংলণ্ড-নৃপতি আমাকে জানিয়েছেন যে, বস্তুত একটা জাতীয় কর্তব্য হিসাবেই আমার পক্ষে এই পদ গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং উচিত হয়েছে। সুতরাং আমাকে শুধু 'প্রধান মন্ত্রী' নিয়োগ করেছেন, বিরোধীদের পক্ষে একথা বলা নিতান্তই অন্যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়াতেই বা কি অন্যায় হয়েছে? স্বয়ং ওয়েভেলও এই মত পোষণ করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ঠিকই হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, অবস্থার অবনতি একেবারে চরম হবার আগেই পরিবর্তনের উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে ফেলাই ভালো। বিহার ও বাংলা অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষ হজম ক'রে এখন কিছুটা শান্ত হয়েছে। এই দুই প্রদেশে অশান্তির সম্ভাবনা কতকটা নিরুদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে একটা সঙ্কট অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। পাঞ্জাবের 'কোয়ালিশন' প্রধান মন্ত্রী মুসলিম লীগের হাতে নিহত হবার ভয়ে গত পাঁচ মাস ধরে প্রতি রাত্রিতে গৃহ বদল ক'রে লুকিয়ে থাকছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও হাঙ্গামা হবে বলে মাউণ্টব্যাটেন আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

লর্ড স্যামুয়েলের কাছে জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন—আপনি কি বলেন?

স্যামুয়েল বললেন যে, ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ-নৃপতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতেই তিনি ইচ্ছা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ-নৃপতির নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। এর জন্য যদি ভারতে ভাইসরয় নিয়োগের প্রথাটি প্রচলিত রাখতে হয়, তবে তাই করা উচিত।

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : ভারতে রওনা হবার আগে আমিও আমার পালনীয় কর্তব্যের কিছু কিছু করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। এদিকের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের অভিমত সংগ্রহ করেছি। স্যাভয়ে স্যার জর্জ ও লেডি শুস্টারের সঙ্গে বসে একদিন ভোজন করাও হয়েছে। লর্ড হ্যালিফাক্স যখন ভারতে ভাইসরয় ছিলেন, তখন শুস্টার ছিলেন ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদে ফাইন্যান্স মেম্বার তথা অর্থ-সদস্য।

শুস্টার বললেন, ভারতে রাজনৈতিক অবস্থার এই রকম শোচনীয়তার প্রধান কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন যোগ্য নেতা নেই। প্রথম শ্রেণীর নেতা মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় না। শুস্টার বললেন, ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকে জিন্না তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনই ব্যর্থ হন যে, বৈঠকের পর কিছুকাল আর ভারতেই ফিরে গেলেন না জিন্না। স্কটল্যাণ্ডের এক নিভৃতে তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে বস্তুত এক প্রকারের অবসর-জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। সে সময় শুস্টারের সঙ্গে জিন্না ভ্রাতা-ভগ্নীর কয়েকবার দেখাও হয়েছিল।

'পাঞ্জাব হলো একটি ট্র্যাজেডি'—শুস্টার আক্ষেপ করলেন। সেখানে বিগত পাঁচ বছর ধরে যে রিফর্ম-ব্যবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল, সে সবই এতদিনে মুসলিম লীগের উন্মত্ততার বেদিতে বলি দেওয়া হলো।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-সচিবের নিযুক্ত কর্মচারীদের (সেক্রেটারি অব্ স্টেট সার্ভিসেস্) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন চিন্তা করছেন। ভারতীয় সিভিল ও ভারতীয় মিলিটারী সার্ভিসে শুধু ব্রিটিশ কর্মচারীরাই নয়, ভারতীয় কর্মচারীও নিযুক্ত রয়েছে। ভারতে নতুন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদের অবস্থা ও মর্যাদা কিরকম হবে?

এই সার্ভিসের কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট এর আগেই কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রথম হলো, ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের কারণে এই শ্রেণীর সার্ভিসের অবসান হ'লে প্রত্যেক কর্মচারীকেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ থোক টাকা দিতে হবে। দ্বিতীয়, নতুন গভর্নমেণ্টে এই কর্মচারীরা কাজ করতে রাজি হোক

বা না হোক, ভারত-সচিবের সঙ্গে তাঁদের আর কোন চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সুতরাং নতুন গভর্নমেণ্টের কাজে নিযুক্ত থাকলে এবং না থাকলেও প্রত্যেকেই ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা পাবেন। তৃতীয়, নতুন গভর্নমেণ্টের অধীনে কাজ করতে কাউকে বাধ্য করা হবে না। ভারত গভর্নমেণ্ট যদি কম হারে বেতন দানের ব্যবস্থা করেন, তবে আপত্তি করতে হবে। এবং এইসব প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না।

এখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনা করছেন। তিনিও কিছুকাল আগে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ক্ষতিপূরণ দেবার এইসব কল্পনাকেই তিনি সম্পূর্ণ অপছন্দ করেন। প্যাটেল জানিয়েছিলেন যে, নতুন ভারত গভর্নমেণ্ট পূর্বতন গভর্নমেণ্টের কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য নন। পূর্বতন গভর্নমেণ্ট হলো ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ও ভারত-সচিবের পরিচালনাধীন গভর্নমেণ্ট। যতদিন এই সম্পর্ক ছিল, ততদিন পার্লামেণ্টের অথবা ভারত-সচিবের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের একটা নিয়মতন্ত্রসম্মত বাধ্যতা ভারতের ছিল। কিন্তু সেই সম্পর্ক অপসারিত ক'রে ভারতে যখন স্বতন্ত্র ও নতুন গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হচ্ছে, তখন সেই অপসারিত সম্পর্কেরই দোহাই দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করা উচিত হয় না। যুদ্ধ-সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীদের যে-হারে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দেওয়া হয়, যদি আই-সি-এস এবং আই-এম-এস'-এর কর্মচারীদের জন্য সেই হারেই টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবার দাবী করা হয়, তবে সেই দাবী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের রাজকোষ থেকে পূরণ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

এই সব ঘটনা পূর্বেই হয়ে গিয়েছে। আণ্ডার-সেক্রেটারি হেণ্ডার্সনও গত জানুয়ারীতেই দিল্লীতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু প্যাটেল তাঁর প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হননি।

ক্ষতিপূরণ অস্বীকারের কোন ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করবেন না মাউণ্টব্যাটেন। শুধু ভারতীয় কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যতিক্রম করা চলতে পারে, এই পরিবর্তন ছাড়া ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরিবর্তনে তিনি রাজি হতে পারবেন না বলেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিলেন। যদি ভারত গভর্নমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি না হন, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষতিপূরণ করবেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই যদি ক্ষতিপূরণের ব্যয়ভার বহনে বাধ্য হন, তবে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের স্টার্লিং জমা শোধ দেবার পদ্ধতি নির্ণয়ের ব্যাপারে এই ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা ক'রে দেখা হবে। গত সপ্তাহে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের এবিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনেরই অভিমত সমর্থন করেছেন গভর্নমেণ্ট।

লণ্ডন, সোমবার, ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : সন্ধ্যাবেলা ইণ্ডিয়া হাউসে হাই-কমিশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন্ এক অভ্যর্থনাসভার আয়োজন করলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের এই অভ্যর্থনাসভাতেই মাউণ্টব্যাটেন আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারলেন যে, ভারতে গিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগ রক্ষার বিষয়ে কি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। ভারতে গিয়ে বড় বড় সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলে যে-সব অসুবিধা দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে মাউণ্টব্যাটেনকে আমি একটি রিপোর্ট দিয়েছিলাম, এই অভ্যর্থনাসভায় তারই সত্যতা প্রমাণিত হতে দেখলাম। আমাদের কোন ধারণাই ছিল না যে, আজকের এই সন্ধ্যার অভ্যর্থনাসভাতেই

আমাদের উপর সাংবাদিকদের কৌতূহলের আক্রমণ এমন অবাধভাবে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদ-চিত্র গ্রহণের উপযোগী ক'রে সভাকে প্রখর আলোকে প্লাবিত ক'রে রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রায় এক ডজন লণ্ডন-সংবাদদাতা মাউণ্টব্যাটেনকে আটক ক'রে ধরলেন, এবং অতি-পরিশ্রমী মৌমাছির ঝাঁকের মতো নানা প্রশ্নের গুঞ্জন তুলে সমস্তক্ষণ মাউণ্টব্যাটেনকে ঘিরে রাখলেন। নিমন্ত্রণকর্তা ও গৃহস্বামী স্যার স্যামুয়েল এই আক্রমণ থেকে মাউণ্টব্যাটেনকে উদ্ধারের জন্য একটুও চেষ্টা করলেন না। একজন অত্যুৎসাহী রিপোর্টার মাউণ্টব্যাটেনকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কি কখনো কার্ল মার্ক্স পড়েছেন? তার পরেই রিপোর্টার মহাশয় মাউণ্টব্যাটেনকে এই আশ্বাসবাণী শোনালেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের ভাইসরয়ের পদে নিয়োগ তিনি সমর্থন করেন, কারণ মাউণ্টব্যাটেনের মতো একজন অ্যাডমিরালই ভারত থেকে ব্রিটিশদের সমুদ্রপথে ব্রিটেনে অপসারণ করার জন্য সব চেয়ে ভালরকম একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। এবিষয়ে রিপোর্টার মহাশয়ের মনে কোন সন্দেহই নেই।

অভ্যর্থনাসভা থেকে ফেরবার সময় মনে হলো, এই অভিজ্ঞতা থেকে মাউণ্টব্যাটেন একটা শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন শুধু এই মন্তব্য করলেন—'দেখতে হয় ও শিখতে হয়'।

করাচী, শুক্রবার, ২১শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : দশ ঘণ্টা সময় আকাশপথেই কাটিয়ে দিয়ে আমরা করাচী এসে পৌঁছলাম। যুদ্ধের সময় করাচীর পথে যান-বাহনের ভিড়ের যে চেহারা দেখেছিলাম, সে চেহারা এখন আর নেই। যানবাহনের চলাচল সে সময়ের তুলনায় আজ নিতান্তই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হলাম ঠিক এখানেই অতীতের শোনা একটি সুরধ্বনিকে আজ আবার শুনতে পেয়ে। বিমান থেকে অবতরণ ক'রেই শুনতে পেলাম বিং ক্রসবি'র রেকর্ড বাজছে—'মুনলাইট বিকামস্ ইউ'। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের দপ্তরে যোগদানের জন্য যাবার সময় যেদিন বিমানপথে ভারতের মাটিতে প্রথম এসে নেমেছিলাম, সেদিনও এই সঙ্গীতের সুরধ্বনিই প্রথম কানে এসে পৌঁছেছিল।

প্রথম সপ্তাহ

ভাইসরয় ভবন, নয়াদিল্লী, শনিবার, ২২শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : মধ্যাহ্ন সাড়ে বারটার সময় আমরা অর্থাৎ ভাইসরয়ের স্টাফ পালম বিমানবন্দরে এসে নামলাম। ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের বিমান আর কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছবার কথা। বিমান-বন্দরে প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক উপস্থিত ছিলেন। পালম বিমানবন্দর থেকে সোজা ভাইসরয় ভবনে এসে শুনতে পেলাম যে, ওয়েভেল-দম্পতির সঙ্গে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিকাল বেলা ভাইসরয় ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু ক'রে দরবার হলের সোপান-শ্রেণী পর্যন্ত সব জায়গা জুড়ে বিশেষ ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় খোলা ল্যাণ্ডো গাড়ির আরোহী হয়ে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতি বিমানবন্দর থেকে ভাইসরয় ভবনে এসে পৌঁছলেন। লাল কার্পেটে ঢাকা সোপানশ্রেণী পার হয়ে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতি উপরে উঠতেই দেখতে পেলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনার জন্য ওয়েভেল-দম্পতি দাঁড়িয়ে আছেন। লেডি মাউণ্টব্যাটেন দেহ নত ক'রে অভিবাদনের ভঙ্গী প্রদর্শন করলেন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায়ী ভাইসরয়কে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন।

ভের্নন আর্স্কিন ক্রাম আজই আমাকে এই তথ্যটি জানিয়ে দিলেন যে, বর্তমানে ভারতে অবস্থিত ইওরোপীয় সমাজের মনে মাউণ্টব্যাটেনবিরোধী ভাব যথেষ্ট প্রবল হয়ে রয়েছে। প্রধানত চারটি কারণে এখানকার ইওরোপীয়েরা মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ পছন্দ করতে পারছেন না। যথা—(১) মাউণ্টব্যাটেন ভারত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। (২) মাউণ্টব্যাটেন যে স্টাফ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা ভারত সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। ভাল লোককে সরিয়ে দেবার জন্য এইসব নতুন লোক নেওয়া হয়েছে। (৩) মাউণ্টব্যাটেন অপরের ইচ্ছার একটা যন্ত্র মাত্র। (৪) ওয়েভেলের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েভেলকে অপসারণের কোনই সঙ্গত যুক্তি ছিল না।

এই অভিযোগের উত্তরও অবশ্য দিতে পারা যায়। ভারত সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন কিছু জানেন কিনা, সেটা মাউণ্টব্যাটেনের কাজের দ্বারাই প্রমাণিত হবে। মাউণ্ট-ব্যাটেনের উপর অন্তত এটুকু বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তিনি এখানে থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার সাহায্যেই কাজ ক'রে প্রমাণিত করতে পারবেন যে, ভারত সম্বন্ধে তাঁর ঠিক ধারণা আছে কি না। ভারত সম্বন্ধে স্টাফের অনভিজ্ঞতার অভিযোগও ঠিক নয়, অন্তত মিয়েভিল ও ইস্‌মের সম্বন্ধে তো এই অভিযোগ খাটে না। তা ছাড়া, আমরা যারা নতুন এসেছি, তারা কাউকে সরিয়ে দিয়ে আসিনি। আমরা হলাম অতিরিক্ত স্টাফ। মাউণ্টব্যাটেন সম্পূর্ণরূপে অপরের ইচ্ছার যন্ত্র মাত্র হয়ে কাজ করতে এসেছেন কিনা, তা'ও তাঁর কাজের রীতিতেই মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। ওয়েভেলের প্রতি যদি কোন অসম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে দায়ী হলেন স্বয়ং এটলি। এটলি আজ পর্যন্ত ওয়েভেল সম্পর্কে একটা সৌজন্যসূচক উক্তিও করতে পারেননি।

ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশেরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণাই করে থাকুন না কেন,

আমরা এটা জানি যে, সমস্যা সমাধানের কোন পন্থা না পেয়ে এবং একেবারে হতাশ হবার পর মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। গভর্নমেণ্ট শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরের সংকল্প ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে সে সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের মনে কোন পরিকল্পনা নেই, কারণ আজ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা করা সম্ভবপরই হয়নি। তাছাড়া, যে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমরা এসেছি, সে ভারতে এসেই পেয়েছি ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সে দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া স্থান হতে স্থানান্তরে দেখা দিয়ে অশান্তির এক ক্ষান্তিহীন ঘটনামালা রচনা ক'রে চলেছে। পাঞ্জাব প্রদেশ, যে প্রদেশে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান নামক তিন সম্প্রদায়ের ভেদবাদের সংঘর্ষ চলেছে, সেই প্রদেশে এখন গভর্নর-জেনারেলের 'জরুরী ঘোষণা' অনুযায়ী শাসনকার্য চালিত হচ্ছে। ভাইসরয় ওয়েভেল আজ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা ক'রে উঠতে পেরেছেন, সেটা বস্তুত ভারত থেকে ব্রিটিশের সামরিক অধিকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ ক'রে নিয়ে যাবার জন্য একটা সংকল্পের ঘোষণা মাত্র। কংগ্রেস স্বাধীন সার্বভৌম রিপাব্লিক তথা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী ঘোষণা ক'রে বসে আছেন। অপরদিকে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই দাবী প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। দেশীয় রাজন্যেরা জানেন, তাঁদের উপর থেকে ব্রিটিশের অধিরাজক ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলি আইনত এক একটি সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত হবে। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের শাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরবর্তী উত্তরাধিকারী নতুন ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যেরা কিভাবে ও কোন্ পন্থায় সম্পর্ক স্থাপন করবেন, সে-সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়নি। এই হলো অবস্থা এবং ভারতে এসে এই অবস্থার মধ্যেই কাজ করবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায় : দেশের লোক দাঙ্গায় ব্যাপৃত, রাজন্যেরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত, সমস্ত সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ-ব্যবস্থা হীনবল হয়ে যাচ্ছে এবং ব্রিটিশেরা যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা শুধু কতগুলি সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে প্রত্যাসন্ন পরিণাম সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করছেন।

সময়ের একটুও অপচয় করলেন না মাউণ্টব্যাটেন। এসেই গান্ধী ও জিন্নার কাছে দুটি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিলেন। সোজা সরল ভাষায় লেখা দুটি আমন্ত্রণ-লিপি। আমন্ত্রণপত্রে মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, শীঘ্রই এসে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভবপর হবে।

গান্ধীকে আমন্ত্রণ করার সময় মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য ভেবে দেখেছেন যে, গান্ধীর পক্ষে তাড়াতাড়ি এসে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর না'ও হতে পারে। বিহারের সেই সব অঞ্চলে গান্ধী এখন তাঁর 'অনুতাপ-পরিক্রমায়' নিযুক্ত রয়েছেন, যে-সব অঞ্চলে সব চেয়ে খারাপ রকমের সাম্প্রদায়িক অশান্তির ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। আগামী সোমবার দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তরে নিখিল এশিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। কোন ঠিক নেই, গান্ধী এই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না। দেখা যাচ্ছে, বিদায়ী ভাইসরয় ওয়েভেল ভারত থেকে চলে যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীকে ও জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেছেন। সব কাজের আগে তিনি এই কাজটি করলেন। এর থেকেই মাউণ্টব্যাটেন মানুষটির এবং তাঁর কাজেরও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

আজ সকালেই যখন আগামী কালের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তিনি আজকেরই সকালবেলার উপভোগ্য একটি সাংবাদিক কীর্তির নিদর্শন আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। 'ডন' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় রোনি ব্রকম্যান ও এলিজাবেথ ওয়ার্ডের (লেডি মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি) ফটো ছাপা হয়েছে। ফটোর পরিচয়ে লেখা হয়েছে—'লর্ড ও লেডি লুইয়ের আগমন'।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে একটা নূতনত্ব করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি সম্বন্ধে ছোট একটি ভাষণ দান করলেন। গত কালই এই ভাষণের খসড়া আমাকে একবার দেখবার জন্য তিনি দিয়েছিলেন। খসড়ায় এমন কয়েকটি কথা ছিল, যার জন্য আমি দুশ্চিন্তিত না হয়ে পারিনি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণে মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে,—'ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় যদি পেতে হয়, তবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে মতবিরোধের একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেই হবে।' আমি আপত্তি করেছিলাম যে, এই কথাগুলি থাকলে ভাষণের প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। লোকে ভুল বুঝবে। এই কথাগুলির মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষিত সময়সীমার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাবারই একটা চেষ্টার ভাব ভারতীয়েরা লক্ষ্য করবেন।

আমার আপত্তি শোনবার পর গতকালই বেলা একটার সময় মাউণ্টব্যাটেন তাঁর জনৈক এ-ডি-সি'কে পাঠিয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভাষণের খসড়া থেকে ঐ অস্পষ্টার্থক কথাগুলি তিনি বাদ দিয়েছেন।

শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠান মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। ভাষণ দিতে মাউণ্টব্যাটেন নিলেন মাত্র চার মিনিট সময়। সিংহাসনের দু'পাশে নতুন ভাবতের নেতারা বসেছিলেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যাঁদের উপর অতি দুরূহ এক দায়িত্ব পালনের ভার এসে পড়বে। আমি দেখলাম, নেহরু এবং লিয়াকৎ দু'জনেই খুব মনোযোগ দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণ শুনছেন। কোন সন্দেহ নেই, মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণ তাঁদের মনের উপর সম্পূর্ণ একটা নতুন বিস্ময়ের মতোই দেখা দিয়েছে। সংবাদপত্রের অভিমতও ভালই হয়েছে দেখা গেল। টাইম্‌সের এরিক ব্রিটার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মাউণ্টব্যাটেনের এই ঘোষণাকে মাউণ্টব্যাটেনের নিজের চিন্তার সৃষ্টি বলে মনে করতে পারি কি? আমি উত্তর দিলাম—মনে করলে ভুল করা হবে না।

শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানে দু'জনের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ল। ভোপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজা। আমি যতদূর জানি, এই অনুপস্থিতির কারণও এখন পর্যন্ত কিছু জানতে পারা যায়নি। অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগেই জর্জ অ্যাবেল এসে খোঁজ নিয়েছিলেন, ভোপাল এসে তাঁর আসনে বসেছেন কিনা। আসেননি দেখতে পেয়ে তখুনি শূন্য চেয়ার সরিয়ে ফেলা হলো। ভোপাল এবং বিকানীর, ভারতে এই দুজনেই হলেন মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত বন্ধু। এ বন্ধুত্ব অনেক দিনের। তা ছাড়া সরকারী রাজপুরুষদের আহূত এবং বিশেষ ক'রে ভাইসরয়ের সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে আহূত আনুষ্ঠানিক সম্মেলনে উপস্থিত

থাকার রীতি দেশীয় রাজন্যেরা সাধারণতঃ খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে থাকেন। তবুও আজ দেখা গেল যে, বিকানীর ও ভোপাল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন না। বোঝা যায়, দেশীয় রাজন্যদের নিজেদের মধ্যেই ব্যক্তিগত মতভেদের প্রাবল্য তাঁদের শ্রেণীগত সংহতি ও ঐক্যের কত বড় অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর সঙ্গে তিন ঘণ্টাকাল এবং লিয়াকতের সঙ্গে দু'ঘণ্টাকাল আলাপ করেছেন। লিয়াকতের রচিত বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এই বাজেটের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এখন বেশ একটা দ্বন্দ্ব চলছে। ওয়েভেল আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর শাসন পরিষদের প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে সবার আগে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এই বাজেটগত মতভেদের ব্যাপার নিয়েই একটা সমস্যায় ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বেন। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের অর্থমন্ত্রী লিয়াকতের রচিত বাজেট কংগ্রেসকেও একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। সকল রকম বড় বড় আয়ের উপর বেশ ভারি ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছেন লিয়াকৎ। যেসব বড় বড় আয়ওয়ালা ব্যবসায়ী কংগ্রেসের সমর্থক, তাঁদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে পারেন না কংগ্রেস। অথচ এই বিত্তবান ব্যবসায়িক শ্রেণীর করভার হ্রাস করবার আগ্রহ যদি কংগ্রেস প্রকাশ করেন, তবে কংগ্রেসেরই বহুঘোষিত প্রগতিশীল অর্থনীতিক সমতাবাদের কথাগুলি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। যাই হোক, এটাও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, একটা আপোষ অবশ্যই হতে পারবে। কারণ, যেমন কংগ্রেস তেমনই মুসলিম লীগও বিত্তবানদের উপর ট্যাক্স চাপাবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারেন না।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৫শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই কতগুলি সাক্ষাৎকারের উপভোগ্য বিবরণ শুনলাম। নেহরু ও লিয়াকতের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের সাক্ষাতের বিবরণ। আর, বিকানীর ও ভোপালের সঙ্গে মাউণ্ট-ব্যাটেনের সাক্ষাতের বিবরণ। এরই মধ্যে বিকানীর ও ভোপাল এসে মাউণ্টব্যাটেনকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কেন তাঁরা শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এইসব সাক্ষাৎকারের অনুষ্ঠানগুলিরও সময়ের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, মাউণ্টব্যাটেনকে সবশুদ্ধ ছয় ঘণ্টা কাল অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থাটাকে এখন একটা 'সিদ্ধ ডিমের' অবস্থার মতোই মনে করছেন।

ভোপাল মাউণ্টব্যাটেনের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, বিকানীর ও আরও কতিপয় রাজন্য বস্তুত দলত্যাগীর মতো অসঙ্গত কাজ করছেন। বিকানীর ও অন্যান্য কতিপয় রাজন্য গণপরিষদে যোগদান ক'রে কংগ্রেসেরই ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন। এই কারণে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন ভোপাল। গণপরিষদে যোগদান ক'রে এইসব রাজন্যেরা রাজন্যগোষ্ঠীর দাবীর জোর স্বল্প ও লঘু ক'রে ফেলছেন। অধিকার আদায়ের ব্যাপারে রাজন্যেরা যতখানি জোর দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারতেন, সে জোর আর থাকছে না। ভোপাল বললেন, এ পর্যন্ত দেশীয় রাজন্যেরা সব রকম সাম্প্রদায়িক হানাহানির বাইরে নিজেদের রাখতে পেরেছেন এবং নিজেদের নীতি অনুসারে চলতেও পারছিলেন। ভোপালের মতে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার। যদি এরকম কোন সময়সীমা সত্যই নির্দিষ্ট করা হয়, তবে রক্তপাত ও অরাজকতা অবশ্যই দেখা দেবে। মাউণ্টব্যাটেনকে এই প্রশ্নও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে করলেন ভোপাল, সময়-

শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ভারত আগমন। পালম বিমানক্ষেত্রে তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন নেহরু ও লিয়াকৎ

সীমা বেঁধে দেবার এই নীতিটি পরিহার করবার কি কোন পথ নেই? মাউণ্টব্যাটেন বললেন, অবশ্যই আছে। একটি মাত্র পথ আছে। যদি ভারতের সমস্ত বৃহৎ রাজনৈতিক দল ও পক্ষের তরফ থেকে এই অনুরোধ করা হয় যে, ব্রিটিশেরা ভারতেই থাকুক, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন নেই। মাউণ্টব্যাটেনই ভোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু এমন অনুরোধ কি বাস্তবে সম্ভব যে, সকল দল সম্মিলিতভাবে ভারতে ব্রিটিশের অবস্থানই কামনা করবে?

ভোপাল প্রত্যুত্তরে যা বললেন, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এমন অনুরোধ যে নিতান্তই অবাস্তব ও অসম্ভবপর ব্যাপার, তা'ও জোর ক'রে বলা যায় না। নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে এলেই ঐ রকম অনুরোধের প্রয়োজন হয়তো অনেকেই অনুভব করবেন।

বিকানীরকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু ভোপাল যতটা আশা প্রকাশ করেছেন, বিকানীর ততটা আশা পোষণ করেন না। তথাকথিত দলত্যাগী রাজন্যদের পক্ষ নিয়েই কথা বললেন বিকানীর। বিকানীর অবশ্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন যে, রাজন্যদের মধ্যে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে, সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ভোপালের বিরুদ্ধেই সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ ক'রে বিকানীর বললেন যে, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের প্রতি ভোপাল যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তার ফলেই রাজন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিকানীরের বক্তব্য হলো, গণপরিষদে তথাকথিত 'দলত্যাগী' রাজন্যেরা যোগদান ক'রে তাঁরা নতুন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে শক্তিশালী হয়ে উঠতেই সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া, দেশীয় রাজন্যদের যোগদানের ফলেই বরং নতুন গভর্নমেণ্ট বিশুদ্ধ কংগ্রেসতন্ত্রের গভর্নমেণ্টে পরিণত হতে পারবে না।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর প্রথম সাক্ষাৎও দু'জনের পক্ষেই দু'জনের মনের পরিচয় জানবার দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। মন্ত্রি-মিশনের প্রচেষ্টা থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা এবং ঘটনার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নেহরু মন খুলেই তাঁর নিজের মত ও ব্যাখ্যা বর্ণনা ক'রে শোনালেন। রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নেহরু যেসব তথ্য উপস্থিত করলেন এবং যে ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, তার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ধারণারও প্রধানত কোন অমিল নেই। লণ্ডনে থাকতেই মাউণ্টব্যাটেন যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, নেহরুর বক্তব্যের সঙ্গে সেসব অধিকাংশই মিলে গেল। নেহরুর মতে, ওয়েভেলের এই একটি মস্ত ভুল হয়েছে যে, তিনি নিজেই যেচে মুসলিম লীগকে গণপরিষদে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেছিলেন। ওয়েভেলের উচিত ছিল আরও কিছুকাল চুপ ক'রে থাকা। মুসলিম লীগ নিজের থেকেই গণপরিষদে যোগ দেবার ইচ্ছা যদি জানাতেন এবং যখন জানাতেন, একমাত্র তবেই এবং তখন লীগকে প্রত্যুত্তরে আমন্ত্রণ করা ওয়েভেলের পক্ষে শোভন হতো। নেহরু বললেন যে, ওয়েভেলের আমন্ত্রণের পূর্বেই জিন্না বেশ নরম হয়ে এসেছিলেন। মুসলিম লীগের একটি গোপন বৈঠকের আলোচনায় জিন্না গণপরিষদে যোগদানের ইচ্ছা ঘোষণা ক'রে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব দাবী প্রত্যাহার করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

—জিন্নার সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি? মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর কাছে জিন্না সম্বন্ধে নেহরুর ব্যক্তিগত ধারণার কথা জানতে চাইলেন। নেহরু বললেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত এক পুস্তকে এ বিষয়ে লিখেছেন। একথা বলার পরেও

নেহরু জিন্না সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আরও কিছু পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। নেহরু বললেন—জিন্নার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে হলে একটি বড় তথ্য স্মরণে রাখতে হয়। জিন্না তাঁর শেষ বয়সে পৌঁছবার পর তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছেন। সাফল্য তাঁর জীবনে অনেক দেরিতে এসেছে, ষাট বৎসর বয়স পার হবার পর। তার আগে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কোন একটা ব্যক্তিত্ব বলেও গণ্য হননি। আইনজীবী হিসাবে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু খুব বেশি কিছু কৃতিত্বের খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। জিন্না যে সাফল্য ও কৃতিত্ব আজ লাভ করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর একটি বিশেষ মনোবৃত্তিগত যোগ্যতা। সর্বক্ষণ এবং সর্ববিষয়ে একটা নেতি মনোভাব অবলম্বন ও অনুসরণ করার যোগ্যতা। ১৯৩৫ সাল থেকে জিন্না এই নেতি মনোভাবকেই একমাত্র সাধনার বিষয় ক'রে নিয়ে চলেছেন। জিন্না জানেন যে, যুক্তিসহ বিচার ও সমালোচনার কাছে পাকিস্থানের দাবী টিকতে পারে না। সুতরাং তিনি ঠিক ক'রে নিয়েছেন যে, পাকিস্থানের দাবীকে কোন প্রকার যুক্তি দিয়ে বিচার করা হবে না, বিচার করতে দেওয়াও হবে না।

—কোন্ সমস্যাকে আপনি এখন ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করেন? মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রশ্নের উত্তরে নেহরু বললেন—অর্থনৈতিক সমস্যা।

মাউণ্টব্যাটেন—অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট যে চেষ্টা করছেন, সেটা কি সন্তোষজনক হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

নেহরু বললেন—না। কিন্তু যেটুকু হতে পারতো, সেটুকুও নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন লীগ। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ভিতর থেকে বিনষ্ট করার জন্যই লীগ সব সময় ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।

নেহরু বললেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে পাঞ্জাবে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সব সুযোগের ভিত্তিও যে বিনষ্ট হয়ে যায়!

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। নেহরুর ধারণা, সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দাবী করা ব্রিটিশের পক্ষে একটা পাগলামি করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেখানে কোন কর্মচারীকেই পদচ্যুত ও অপসারিত করার কথা নেই, প্রত্যেকেই যখন নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন, তখন ক্ষতিপূরণের কথা উঠতে পারে কি ক'রে? নেহরু বললেন, যেসব সুবিধার সর্তে আই-সি-এস কর্মচারীরা কাজ করছেন, নতুন ভারত গভর্নমেণ্ট সেই সব সুবিধার সুযোগ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে নতুন ক'রে চুক্তি করতে রাজি আছেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তো তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারেন না। আমার ধারণা, আপনিও চান না যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যেসব সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আই-সি-এস কর্মচারীদের নিযুক্ত করেছেন, সেই প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার আজ অস্বীকার করবেন।

নেহরু বললেন—শুধু ব্রিটিশ কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির কথা যদি ধরা হয়, তবে সে-বিষয়ে যা-কিছু করা দরকার সে-সব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরই পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমি স্বীকার করি। ক্ষতিপূরণ করতে হলেও এত বেশি পরিমাণ টাকা দেবার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ যদি প্রচুর হয়, তবে আই-সি-এস কর্মচারীদের কাজে নিযুক্ত থাকতে

উৎসাহিত না ক'রে কাজ ছেড়ে দিতেই উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া, ভারতীয় কর্মচারীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে? ভারতীয় আই-সি-এস কর্মচারীরা তো ভারতে থেকে তাঁদের নিজের দেশের লোকের সার্ভিসেই কাজ করবেন। সুতরাং এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবটাকে বস্তুত একটা পাগলামির প্রস্তাব বলেই মনে হয়।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য নেহরুর যুক্তিতে বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর বক্তব্যের কিছুই প্রত্যাহার করতে রাজি না হয়ে বরং নেহরুরই সহযোগিতা দাবী করলেন। নেহরু যেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, এই দাবী করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, নেহরু ব্রিটিশের মনোভাবকে ভুল বুঝেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, আই-সি-এস-এর ব্রিটিশ কর্মচারীদের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ যত বেশি উদার ও অকৃপণ হবে, ব্রিটিশ কর্মচারীরাও তত বেশি ভারতীয় সার্ভিসে নিযুক্ত থাকতে উৎসাহিত হবেন।

নেহরু তাঁর মনের কথা অত্যন্ত সুবিচারশীলতার সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছেন, নেহরুর সঙ্গে আলোচনার পর মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণাই হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনকে একটি কথায় রীতিমত আশ্চর্য ক'রে দিয়েছিলেন নেহরু। নেহরুর কথা থেকে মনে হয়েছিল যে, তিনি এমন এক ধরনের ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন, যে-সম্পর্ক কমনওয়েলথ্ সম্পর্কের চেয়েও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর। নেহরুর মতে, 'কমনওয়েলথ্ স্টেটাস' মেনে নেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, ভারতের মনই এইরকম সম্পর্কের প্রস্তাবে সায় দেবে না। মানসিক প্রকৃতি, রুচি ও আবেগের বাস্তব কতগুলি প্রশ্ন আছে, যার জন্য ভারতবাসীরা কমনওয়েলথ স্টেটাস মেনে নিতে পারে না।

আলোচনার শেষে নেহরু যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'মিঃ নেহরু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি ভারতে এসেছি, আপনি আমাকে সেইরকম একজন শেষ ভাইসরয় বলে মনে করবেন না। আমি চাই, আপনি বরং আমাকে প্রথম ভাইসরয় বলেই মনে করবেন, যিনি নতুন ভারত প্রতিষ্ঠার একটা পথ দেখিয়ে দেবার জন্য এসেছেন।'

নেহরু দাঁড়ালেন ও মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। দেখে মনে হলো, মাউণ্টব্যাটেনের কথার আবেদন তাঁর মনের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করেছে। হেসে হেসে নেহরু বললেন,—'লোকে বলে যে, আপনার প্রীতি ও আন্তরিকতা নাকি বড়ই বিপজ্জনক। আমি এখন লোকের ঐ কথার অর্থটা বেশ বুঝতে পারছি।'

লিয়াকতের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের আলোচনার সময় লিয়াকৎই মাউণ্টব্যাটেনকে একটি অর্থপূর্ণ প্রশ্ন করলেন। শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটা কার রচনা? ঐ ভাষণে যে-সব কথা বলা হয়েছে, সে-সব কথা কার মাথা থেকে এসেছে? মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি এখুনি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারেন। ঐ ভাষণ সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজের রচনা, অন্য কারও অনুরোধে ঐসব কথা তাঁর ভাষণে স্থান পেয়েছে, এটা সত্য নয়। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এমনকি আমার স্টাফের অনেকে ঐ ভাষণে কতগুলি বক্তব্যের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিলেন।

লিয়াকৎ বললেন—'শুনে সুখী হলাম। যাঁরা ভিতরের অনেক বিষয়ের খবর রাখেন, এরকম তিনটি তথ্যজ্ঞ মহল আমাকে জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস যা বলবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছে, আপনি ঐ ভাষণে সেই সব কথাই বলেছেন।'

এই ছোট ঘটনাই প্রমাণ ক'রে দিল যে, দুই সম্প্রদায়ের মন পরস্পরের প্রতি

কতখানি সন্দিগ্ধ হয়ে রয়েছে। উভয়েরই উভয়ের বিরুদ্ধে যা কিছু বলবার আছে, সবই এরই মধ্যে বলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন পক্ষই একটু দেরি করেননি।

পাঞ্জাব-গভর্নর জেংকিন্সের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম এসেছে। পাঞ্জাব সম্বন্ধে নেহরু যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন, তার বাস্তবতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ একটা সমালোচনার মতোই যেন এই টেলিগ্রাম। স্টাফের আলোচনা-সভায় মিয়েভিল এই টেলিগ্রামের তাৎপর্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জ্ঞানী কর্তার সিং নামক জনৈক প্রভাবশালী শিখ-নেতার একটি বিবৃতির বক্তব্য জেংকিন্স জানিয়েছেন। জ্ঞানী কর্তার সিং বলেছেন যে, শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমন একটি চুক্তি যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পাদিত না হয়, তবে শিখেরা অবশ্যই পাঞ্জাব প্রদেশকে খণ্ডনের জন্য দাবী করবেন। তার আগে পাঞ্জাবে যদি লীগ-মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টা হয়, তবে শিখেরা তাঁদের সব শক্তি দিয়ে সে চেষ্টাকে প্রতিহত করবেন। জ্ঞানী কর্তার সিং-এর এই বিবৃতি তথা বক্তৃতার রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বক্তৃতাটি যে আকস্মিক একটা অভিমতের উচ্ছ্বাস নয়, বরং শিখদের প্রামাণ্য অভিমত বলেই গণ্য হবার যোগ্য, তার প্রমাণও আছে। পাঞ্জাব প্রদেশের খণ্ডনের প্রস্তাবে রাজি হবার জন্য শিখেরা ইতি-মধ্যেই কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে এসে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ আগেই কংগ্রেসও শিখদের প্রস্তাবিত এই পাঞ্জাব-খণ্ডনের দাবী আলোচনা প্রসঙ্গে সমর্থন করেছিলেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৬শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী জন মাথাই এবং রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি স্যার কনরাড করফিল্ড গতকাল মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মাথাই অভিযোগ করলেন যে, লিয়াকতের রচিত বাজেট তিনি যথাসাধ্য সমর্থন করেছেন, তবুও ডন তাঁকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে।

করফিল্ড যে পদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, সেই পদের রীতি অনুযায়ী তিনিই হলেন দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডরাজের প্রতিভূ ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা। বিকানীরের মহারাজার আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে কতগুলি কথা বললেন করফিল্ড। গণপরিষদে যোগদান ক'রে বিকানীর দেশীয় রাজন্যদের অধিকার-আদায়ের ক্ষমতাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, এই হলো করফিল্ডের অভিযোগ। বোঝা গেল, করফিল্ড এ বিষয়ে মতের দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই ভোপালের পক্ষে রয়েছেন। করফিল্ড চাইছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যদেরও যেন তৃতীয় একটা পক্ষ বা শক্তি বলে গণ্য করা হয়।

প্যাটেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কি অভিজ্ঞতা লাভ করবেন মাউণ্টব্যাটেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা আশঙ্কার ভাব ছিল। কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ডের ভিতরে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মানুষ বলেই প্যাটেল পরিচিত। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন আলোচনার অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্দার প্যাটেলের চোখের ভাব থেকে একটা কথা বুঝে ফেলতে পারলেন। সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে প্যাটেলের মনের ভাব ও ধারণার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেও কোন দ্বিধার চিহ্ন ছিল না। সোজাসুজি এবং সুস্পষ্টভাবেই মুসলিম লীগের স্পর্শ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে, এই হলো প্যাটেলের ধারণা। পাঞ্জাবে যে-সব ব্যাপার হয়েছে, তা'তে লীগ বেশ বড় গলা ক'রে নিজেদের কৃতিত্বের বড়াই করতে আরম্ভ করেছে। প্যাটেল বললেন—ওরা পাগলই হয়ে গিয়েছে।

এই পর্যন্ত আলোচনা শান্তভাবেই চলছিল। উঠল আই-সি-এস-দের ক্ষতিপূরণের কথা। প্যাটেল তাঁর হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতেই বললেন যে, ভারত যদি আই-সি-এস কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ করার প্রস্তাবে রাজি হয়, তবে সেই ভারতের সরকারী দায়িত্বের কোন পদ তিনিও আর দ্বিতীয়বারের মতো স্পর্শ করবেন না।

সন্ধ্যাবেলা মরিস জিঙ্কিনের সঙ্গে এক টেবিলে ভোজনে বসলাম। জিঙ্কিন হলেন এক তরুণ আই-সি-এস। বেশ বুদ্ধি রাখেন। ১৯৪৩ সালেই দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল। বর্তমানে তিনি ভারতের ফাইন্যান্স বিভাগে সহকারী সেক্রেটারিরূপে কাজ করছেন। লক্ষপতির দল ও কংগ্রেসের চার-আনা সদস্যদলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেবার জন্য লিয়াকৎ যে বাজেট রচনা করেছেন, সে বাজেট রচনার ব্যাপারে মরিসের যথেষ্ট হাত ছিল। মরিস নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন কে এম পানিক্করকে, যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পানিক্করের চিবুকে ইম্পিরিয়াল দাড়ির ছোট একটি গুচ্ছ লেগে রয়েছে। তিনি হলেন একাধারে ঐতিহাসিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাংবাদিক। বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় সমন্বিত পানিক্করের আবার সেই সুন্দর সংলাপের গুণও আছে, যে গুণ আজকাল খুবই বিরল হয়ে এসেছে।

পানিক্করকে আমি সোজা জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি যদি মাউণ্টব্যাটেনের জায়গায় থাকতেন, তবে কি করতেন?'

পানিক্কর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'মাউণ্টব্যাটেন হলেন একজন সুদক্ষ নৌ-যুদ্ধবিশারদ প্রতিভা। সুতরাং, তাঁর পক্ষে এটা সহজেই উপলব্ধি করা উচিত যে, ব্রিটিশ স্বার্থ সবচেয়ে ভাল ক'রে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে, ভারতের সমুদ্রোপকূলভাগ নিয়ে ত্রিশ কোটি মানুষ ও তাদের ধর্মমত এবং ভৌগোলিক একত্বের ভিত্তির উপরেই একটি সুদৃঢ়, সংহত ও কেন্দ্রীয় শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্র স্থাপন করা কর্তব্য। হিন্দুস্থান হলো হাতির মতো, এবং পাকিস্থান হলো সেই হাতির দুটি কান। কান দুটো না থাকলেও হাতি বেঁচে থাকতে পারবে।'

পানিক্কর অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে, জিন্না যে দাবী করেছেন সেই দাবীর যৌক্তিকতাও জিন্না দেখাতে পারবেন। চার ঘর-ওয়ালা এক বাড়ির মধ্যে জিন্না শুধু একটি ঘর দাবী করেছেন। জিন্না শুধু চাইছেন যে, এই ঘরটি যেন সত্যি সত্যি তাঁর নিজের ঘর হয়। হিন্দুর সংখ্যাগুরুত্বে চালিত কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে মুসলিম মাইনরিটিদের ছেড়ে দিতে রাজি নন জিন্না। এইরকম হিন্দুপ্রধান কেন্দ্রীয় শাসনের সদিচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারা যায়, এ বিশ্বাস জিন্নার মনে নেই।

পানিক্করের বক্তব্য বস্তুত এই দাঁড়াল যে, আমরা ব্রিটিশেরা যেন ভারতের উপর বৃহত্তর কোন ঐক্য চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করি। ঐতিহাসিক কারণে যতখানি ভারতের প্রয়োজন হয়েছে, তার চেয়ে বড় কোন ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা অনাবশ্যক। পানিক্করের মতে, পাঞ্জাব প্রদেশে ত্রিদলীয় শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নেহরু যে প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে কংগ্রেসের সেই চিন্তারই আভাস প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, যেটা শেষ পর্যন্ত ভারতকে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে খণ্ডিত করবার সিদ্ধান্তে পরিণত হবে। শিখদের সম্বন্ধে জিন্নাও যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তিনিও উপলব্ধি ক'রে থাকবেন যে, পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখা বস্তুত আর সম্ভবপর নয়।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও পানিক্কর মন্তব্য করলেন। তাঁর মতে হায়দরাবাদের পক্ষে ভারত ইউনিয়নের বাইরে থাকা কখনই সম্ভবপর হতে পারবে না। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্থানের সঙ্গেই যুক্ত হবার জন্য যে উৎসাহিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পানিক্কর বললেন, দেশীয় রাজন্যেরা যে-সব উদ্দেশ্য নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করেছেন, তার মধ্যে আসল উদ্দেশ্যটা হলো, কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী অংশকে শক্তিশালী করা, যাতে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর সোস্যালিস্ট গ্রুপ কংগ্রেসের ভিতরে শক্তিশালী না হয়ে উঠতে পারে। পানিক্কর বলেন, বাংলা প্রদেশে সোস্যালিস্টরা যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলেছে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নামে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের সামাজিক গঠন সম্বন্ধেও পানিক্করের ধারণার কথা প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলাম। পানিক্কর বললেন, কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাক্রমে ভেঙ্গে কয়েক ভাগ হয়ে যাবে। মুসলিম লীগ সম্বন্ধে পানিক্কর বললেন যে, লীগের গঠন আরও বেশি সুসংহত, কারণ লীগের অনুগামীদের মধ্যে বিত্তগত পার্থক্যের রূপ তেমন বড় কিছু নয়। একদিকে অত্যন্ত বিত্তশালী শিল্পপতির দল, আর একদিকে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীর লোক, লীগের সমর্থকদের মধ্যে এরকম দুটি বৃহৎ বিত্তগত শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। মুসলিম লীগের মধ্যে অল্পসংখ্যক ধনী অবশ্য আছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই হলেন ভূসম্পত্তির মালিক। মুসলিম গরীবদের শোষণের যে প্রক্রিয়া চলছে, সেটা হলো প্রধানত হিন্দু পুঁজিপতির দ্বারা চালিত মুসলিম শ্রমিকের শোষণ-ক্রিয়া। আমি জানি, মাউণ্টব্যাটেনও এই ধারণা পোষণ করেন।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৮শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : লালকেল্লায় নিখিল এশিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। সম্মেলনের সদস্যবৃন্দ, আইনসভার সদস্যবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দকে মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয় ভবনের উদ্যানে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। কংগ্রেস-নেতারা জীবনে এই প্রথম ভাইসরয় ভবনের ভিতরে প্রবেশ করলেন। নতুন মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির দিক দিয়ে এই সম্মেলন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেটা সহজেই অনুভব করা যায়। প্রথমত এটা প্রমাণিত হলো যে, এশিয়ার ব্যাপারে ভারতকে সক্রিয় ভূমিকায় দাঁড় করাবার জন্য নেহরুর মনে যে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন সে আকাঙ্ক্ষা সমর্থনই করছেন। তা ছাড়া, ভারতের সহজ প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব অর্জন করতে হলে ভারতীয় সাধারণের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যে সামাজিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন, এই ভোজসভা সেই প্রয়োজনও সিদ্ধ করার সুযোগ এনে দিল। সাতশত নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে মেলা-মেশার এই প্রাঙ্গণে আমিও ঘুরে ফিরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। বিরূপ বা বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পেলাম না। বুঝলাম, অনেকেরই মনে একটা চাপা সতর্কতার ভাব রয়েছে। এই সান্ধ্য ভোজের আসরে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির ব্যবহারের এইটুকু ফল হবে বলেই আশা করছি যে, ঐ চাপা মনোভাব অনেকখানিই দূর হয়ে যাবে।

এরপর ১৭নং ইয়র্ক রোডে নেহরুর ভবনে গিয়ে লেডি মাউণ্টব্যাটেন, প্যামেলা ও ভাইসরয় ভবনের অধিবাসীদের একটি দল মুখোশ-পরা ছাউ নৃত্য দেখে এলেন। সেরাইকেল্লা নামক ক্ষুদ্র একটি দেশীয় রাজ্য এই 'ছাউ' নৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গান্ধী ও জিন্না

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ সাল : সকাল দশটায় স্টাফের বৈঠক হবার কথা ছিল। ঠিক সময় মতোই বৈঠকে উপস্থিত হলাম। আজই বিকালে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ হবে। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপার সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতে পারে, সেই সম্বন্ধেই বৈঠকে আলোচনা হলো। বিকাল তিনটার সময় মহাত্মা আসবেন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সংবাদপত্রের কৌতূহল যে কত তীব্র সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাইসরয়ের পাঠকক্ষের নিকটে মোগল উদ্যানে এই উপমহাদেশের প্রত্যেক বিখ্যাত ফটোশিল্পী তাঁর ক্যামেরা-যন্ত্র নিয়ে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই উপস্থিত হবেন। এঁদেরই সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে মহাত্মার আগমনের অপেক্ষা করতে হবে। আমার আসন্ন কর্তব্যের গুরুত্ব কল্পনা করতে পারছি।

মহাত্মা এলেন। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পর মাউণ্ট-ব্যাটেন-দম্পতি মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতীক্ষমান ক্যামেরাশ্রেণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধী বেশ খুশিভাবেই মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপে নানারকম ঠাট্টার আমোদ জাগিয়ে ক্যামেরাশ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার পরীক্ষা সহ্য করলেন। ফটোশিল্পীদের অনুরোধে গান্ধীকে বিব্রত হতে হচ্ছিল। প্রত্যেকেই সবচেয়ে ভাল ভঙ্গীর ফটো নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একজনের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে যে-ভাবে দাঁড়াতে হয়, তা'তে আর একজনের অসুবিধা হয়ে পড়ে। এইরকম একটা অবস্থা। এর মধ্যে শুধু চুপ ক'রে অপেক্ষায় ছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান ম্যাক্স ডেসফস। বিশেষ ভঙ্গীর ফটো নেবার জন্য অন্যান্য সব ক্যামেরার প্রমত্ততা মিটে যাবার পর ম্যাক্স ডেসফস তাঁর ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন, যেন কোন একটা অভাবিত দৃশ্য ধরবার জন্য। ম্যাক্স ডেসফসের চোখ যথার্থ শিল্পীর চোখ। গান্ধী ভাইসরয়ের পাঠকক্ষের দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দিয়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গেই লেডি মাউণ্টব্যাটেনের কাঁধের উপর একটি হাত তুলে দিলেন। একমাত্র ম্যাক্স ডেসফসের ক্যামেরা সেই মুহূর্তে তুলে নিল সেই ছবি। গান্ধী প্রতিদিন প্রার্থনাসভায় যাবার সময় যে-ভাবে তাঁর নাতনিদের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে থাকেন, ঠিক সেইভাবেই লেডি মাউণ্টব্যাটেনের কাঁধে তিনি হাত রেখেছিলেন। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গান্ধী সাধারণ কোন কাজের সময়েও শরীরের যে-কোন ভঙ্গী ও ভাব প্রদর্শন করুন না কেন, লোকের চক্ষে সেই ভঙ্গী ও ভাব বৃহত্তর একটা তাৎপর্যের প্রতীক বলেই বোধ হয়ে থাকে। সুতরাং এই অপরাহ্নে গান্ধীর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতির রূপ নিয়েই দেখা দিল বলা যায়।

গান্ধী ও মাউণ্টব্যাটেনের আলাপে সওয়া দুই ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল। মাউণ্টব্যাটেন আমাকে ডেকে নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সাক্ষাৎ ও আলোচনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের কাছে কি বলতে হবে, সেই বিষয়েই কথা হলো। গান্ধী বললেন যে, এ বিষয়টা বিবেচনার ভার তিনি ভাইসরয়ের হাতেই ছেড়ে দিতে চান।

গান্ধী চলে যাবার পর মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বললেন যে, আজকের আলোচনায় বর্তমানের কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়নি। গান্ধী তাঁর অতীত জীবনের নানাকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তরুণ বয়সে যখন ইংলণ্ডে ছিলেন গান্ধী, সে-সময়ের ঘটনা, দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থানকালে তাঁর কর্মজীবনের ঘটনা এবং প্রাক্তন ভাইসরয়দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি থেকে নানা বিবরণ গান্ধী শুনিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি এইভাবে গান্ধীর সঙ্গে সরল ও স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতার ভিতর দিয়েই পরিচয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক। তাড়াতাড়ি ক'রে গান্ধীকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে এনে ফেলতে চান না।

মাউণ্টব্যাটেন তো এই সব কথা বললেন, কিন্তু আমিই কল্পনা করতে পারছিলাম যে, সংবাদপত্রকে এ কথা বিশ্বাস করানো কি দুরূহ ব্যাপার।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের একটা ভিড় বাইরের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল। তাঁদের সম্মুখে গিয়া আমার রচিত বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনালাম—"মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে মিঃ গান্ধীর আজ পঁচাত্তর মিনিটকাল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ হয়েছে।" বিজ্ঞপ্তির এই অংশটুকু শুনেই জনৈক সংবাদদাতা তখনি বাধা দিয়ে বললেন যে, মহাত্মা তো এখানে দু' ঘণ্টা সময় ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে নানা-রকম মন্তব্যের গুঞ্জন জেগে উঠল। বিবৃতির বাকি অংশ আমি পড়ে শোনালাম—"এর পরে শুধু হিজ এক্সেলেন্সি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মিঃ গান্ধীর আরও এক ঘণ্টাকাল সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।"

এইবার সংবাদদাতা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করলেন যে, বোধ হয় আমি আমার বিবৃতিতে সত্য কথাই বলেছি।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, পয়লা এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ এবং আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। মোট দু' ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়েছিল, এর মধ্যে মাত্র পনর মিনিটকাল আসল কাজের কথায় কেটেছে। গান্ধী তাঁর জীবনের নানা ঘটনার অনেক কথা শোনালেন। তারপরেই বর্তমানের সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্ময়কর এক প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটিকে সংক্ষেপে বলা যায়, বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে হবে এবং তারপর বিশুদ্ধ একটি মুসলিম শাসন পরিষদ গঠন করার জন্য জিন্নাকে আহ্বান করতে হবে। অর্থাৎ জিন্না-গঠিত এই শাসন-পরিষদে প্রত্যেক সদস্যই হবেন মুসলমান।

মাউণ্টব্যাটেন মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন—'আপনার এই প্রস্তাব শুনে জিন্নার মনে কি ধারণা দেখা দেবে?'

গান্ধী বললেন—'জিন্না বলবেন যে, আবার সেই চতুর গান্ধী নতুন চাল চেলেছে।'

মাউণ্টব্যাটেন মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন—'জিন্না যদি এই ধারণা করেন, তবে তাঁর পক্ষে ঠিক ধারণা করাই হবে নাকি?'

গান্ধী প্রত্যুত্তর দিলেন—'না, এরকম ধারণা করলে জিন্নার পক্ষে ভুল করাই হবে। আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই এই প্রস্তাব করছি।'

মাউণ্টব্যাটেনকে গান্ধী একথাও জানিয়ে দিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনকে একটু দৃঢ় হতে হবে এবং বাস্তবোচিত পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। 'ডিভাইড এণ্ড রুল'—
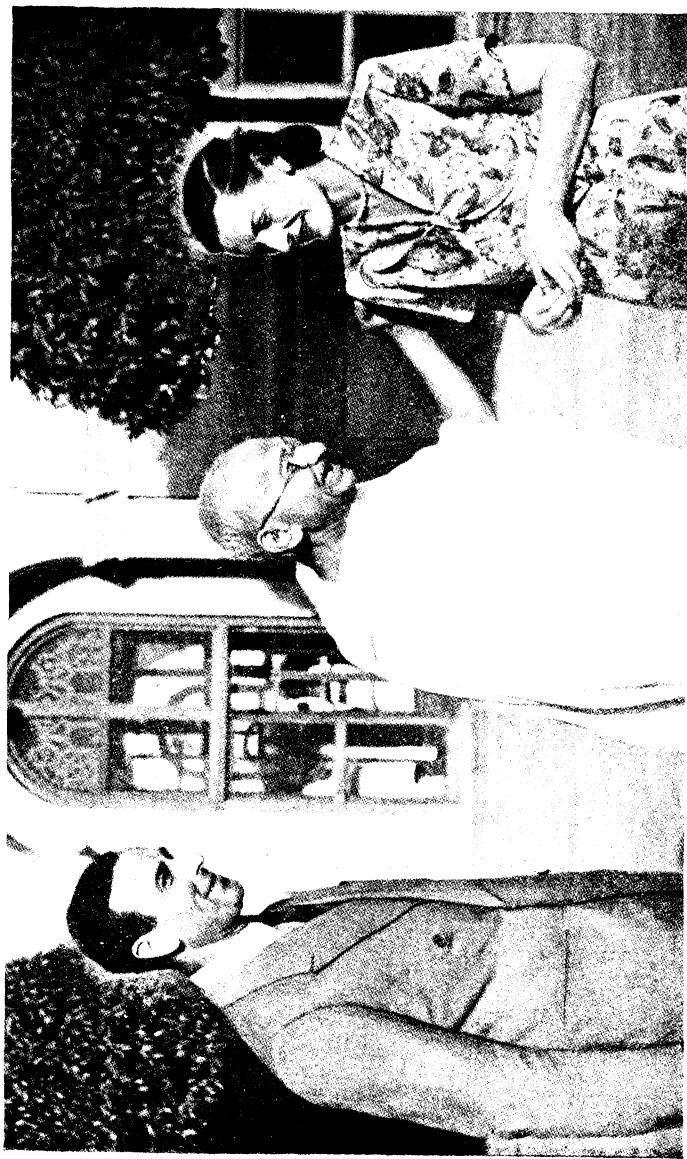
গান্ধী ও মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির প্রথম সাক্ষাৎকার

দিল্লীতে '১৫ই আগস্টের' অনুষ্ঠানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

অর্থাৎ. প্রথমে ভেদ সৃষ্টি কর, তার পর শাসন কর, এই নীতি ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতের উপর এতাবৎ প্রয়োগ ক'রে এসেছেন। গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন যে, আপনাকে এবার আপনারই পূর্বগামীদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ব্রিটিশের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এখন সমস্ত সমস্যাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের সম্মুখে মাত্র দুটি পথ ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনকেই পূর্ববৎ অবাধে চলতে দেওয়া, নয় ভারতীয়দের নিজেদেরই এক রক্ত-স্নানের ভিতর দিয়ে নতুন পথ ক'রে নেওয়া। এই দুই পথের একটি পথ বেছে নেবার প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে রক্ত-স্নানের পথটি অবশ্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে, এবং তার জন্য তৈরী হতে হবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কতিপয় ব্যক্তি যুদ্ধ-অপরাধের কারণে কারাগারে রয়েছে, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কোন অপরাধের জন্য নয়, বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুরতার কতগুলি ক্রিয়াকলাপের জন্য। এই সব বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য গভর্নমেণ্টের উপর প্রবল জনমতের চাপ পড়ছে। বাংলা দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যক্তিবর্গকে লোকে মুক্তিযোদ্ধা বীরের দল বলেই শ্রদ্ধা করছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, এই ফৌজের পরিচালক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি অতীতে একবার গান্ধীর অভিমতের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে ফেলতেও দ্বিধা করেননি। ভারতের উপর জাপানীদের আক্রমণের যে পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনার সহযোগিতা করার জন্য তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানী-দের সহকারী বাহিনী হিসাবে উপস্থিত করেছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসবার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপার নিয়ে ভারতে একটা প্রবল ভাবচাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। আজাদ হিন্দের কাহিনীর মধ্যে জনসাধারণ জাতীয় গৌরবের আনন্দই অনুভব করছিল। দুঃখের বিষয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী সম্পর্কে জনমত আন্দোলিত হয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সে সমস্যা বিজ্ঞতার সঙ্গে সমাধানের কোন প্রচেষ্টা পূর্বে হয়নি। ওয়েভেল এই বিষয়টি আইনসভায় আলোচনার জন্যও উত্থাপিত হতে দেননি। তিনি ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতার নির্দেশ জারি ক'রে এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে সমস্যা আরও বেশি জটিল হয়েই এসেছে এবং সমাধানের দায় এখন আর একটা ঝঞ্ঝাটের মতো আমাদেরই পোহাতে হচ্ছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন দেখা দিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, সে সমস্যার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের সম্মিলিতভাবেই একটি পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও মুসলিম লীগ ১৯৪২ সালের কংগ্রেসী আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং মিত্রশক্তির যুদ্ধোদ্যোগের বিরুদ্ধে লীগ কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করেনি, কিন্তু যেমুহূর্তে দেখা গেল যে, আজাদ হিন্দের বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি বস্তুত একটি জাতীয় দাবী চরিতার্থ করার প্রশ্ন, সেই মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মতভেদ লুপ্ত হয়ে গেল।

নেহরু এই সমস্যাটার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে

উঠেছেন, কিন্তু আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের অভিমত কি হতে পারে, সেটা কল্পনা ক'রে তিনি চিন্তিত হচ্ছেন। লিয়াকৎ আবার যুক্তি দেখিয়ে এমন সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, যেগুলি সহ্য করতে গিয়ে অকিনলেকের ধৈর্যশক্তির অবশিষ্টটুকুও ফুরিয়ে যেতে বসেছে। গভর্নমেণ্ট এবং প্রধান সেনাপতির মধ্যে বিরোধের ব্যাপার এখন প্রবল হয়েই দেখা দিতে চলেছে। তবুও বোঝা যায় যে, বাইরের এই সব উষ্মা ও উত্তেজনার প্রকাশ সত্ত্বেও অকিনলেকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব সকলেরই মনের মধ্যে এখনো রয়েছে। অকিনলেক পদত্যাগ করবেন বলেছেন। অকিনলেকের এই সঙ্কল্পের কথা শুনে গভর্নমেণ্টের অনেকে আবার উদ্বিগ্ন না হয়েও পারছেন না। এই ভাবেই সঙ্কট এখন চরমে পৌঁছেছে।

নেহরু, লিয়াকৎ, বলদেব সিং ও অকিনলেককে এক বৈঠকে আহ্বান ক'রে আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিন ঘণ্টা ধরে প্রবল আলোচনার পর সমাধানের একটা ফরমুলা স্থির করা হলো। অনুরোধ ক'রে অকিনলেককেই রাজি করানো হলো যে, তিনিই এই ফরমুলার ব্যবস্থাগত প্রস্তাবগুলি রচনা করবেন। এই ফরমুলা গৃহীত হলো যে, প্রত্যেক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা ক'রে বন্দীর মুক্তিব দাবীর যৌক্তিকতা নির্ণয়ের ব্যাপারে ফেডারাল আদালতের পরামর্শ আহ্বান করা হবে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২রা এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : স্টাফের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন আজ ঐ আজাদ হিন্দ ফরমুলারই নানা দিক আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত একটা অসুবিধার মধ্যে এসে সব সমস্যা ঠেকেছে। ফেডারাল আদালতের কর্তব্য ও অধিকারের পরিধির মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থার প্রশ্রয় হতে পারে না, যেটা বস্তুত প্রধান সেনাপতির কাছে পরামর্শ বা রিপোর্ট প্রদানের ব্যাপার। এ কাজ ফেডারাল আদালতের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশ অনুসারে আমি আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত হলাম। গভর্নর-জেনারেলের উপবেশনের জন্য নির্দিষ্ট আসরের মধ্যে একটি আসনে আমি স্থান নিলাম। শুনলাম আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত বিতর্ক। জনৈক মুসলিম সদস্য আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি দাবী ক'রে তাঁর বক্তৃতায় আগুন ও রক্ত ছড়াতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ তাঁর বক্তৃতা থেমে গেল। মনে হলো কংগ্রেসী হুইপ ঐ সদস্যকে তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই কিছু সুপরামর্শ দিয়ে উত্তাপ ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন।

এর পর প্রত্যুত্তর দিলেন নেহরু। নেহরুর বক্তৃতায় সমস্যা সমাধানের জন্য একটা বলিষ্ঠ আগ্রহের ভাবই ফুটে উঠল। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেহরু, সেই প্রতিশ্রুতিই তিনি পালন করলেন। অকিনলেককেই সমর্থন করলেন নেহরু।

নেহরু জানতেন, আইনসভার প্রায় সকল সদস্যই অকিনলেকের প্রস্তাবের বিরোধী। সুতরাং এ হেন সমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে অকিনলেককে সমর্থন ক'রে নেহরু অত্যন্ত সাহসের পরিচয়ই প্রদান করলেন। তিনি বললেন, আজাদ হিন্দ সম্পর্কে বিচার করতে হলে নানাদিক ভেবে দেখবার আছে। সৈন্যবাহিনীর প্রতি সৈনিকের ব্যক্তিগত আনুগত্যের দিক। তার উপর আবার আছে, দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য ব্যক্তিমনের স্বাভাবিক আগ্রহের দিক। এই দুই আনুগত্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন যখন কোন ব্যক্তির সম্মুখে দেখা দেয়, তখন সে ব্যক্তিকে স্বভাবত একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই পড়তে হয়।

নেহরু বললেন, এই অবস্থা যখন দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে সৎ ও ভাল লোকের মনের দুঃখই সবচেয়ে বেশি দুঃসহ হয়ে ওঠে, বাজে লোকের মনে কোন দুঃখবোধের বালাই থাকে না। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশপ্রেমিক ছিলেন না। যেমন জনসমাজের সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যেও কিছু ভাল লোক, কিছু খারাপ লোক এবং কিছু ভাল-মন্দ মেশানো মাঝারি চরিত্রের লোকও ছিল।

আইনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হলো। অত্যন্ত বিপজ্জনক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটা ঘটনার এই শান্ত পরিসমাপ্তিতে দুটি জিনিসের বাস্তব সত্যতা প্রমাণিত হলো। মতবিরোধের মীমাংসার কোন আলোচনার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার এই প্রথম সাফল্য লাভ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ঘটনাটি নেহরুর চিন্তা ও আচরণের সুদৃঢ়তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : আইনসভায় ইওরোপীয় দলের নেতা মিঃ গ্রিফিথস্ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছেন। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবে ভারতের ইওরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় আসনসংখ্যার যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে গ্রিফিথস্ তীব্র অসন্তোষের ভাব জ্ঞাপন করলেন। গ্রিফিথস্ চাইছেন, আইনসভায় ইওরোপীয়দের জন্য আটটি আসনের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু এটা নিতান্তই অবাস্তব দাবী। প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একটি ক'রে প্রতিনিধিত্বের আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং মাত্র সত্তর হাজার ইওরোপীয়ের জন্য আটটি আসন কোন্ যুক্তিতে দাবী করা যায়? গান্ধী ইওরোপীয় সম্প্রদায়ের এই দাবীর বিরুদ্ধে বেশ কড়া ক'রেই বলেছেন। গ্রিফিথসের মতে, যদি প্রথম থেকেই তিনটি আসন দাবী করা হতো, তাহলে সে দাবী মেনে নিতে বোধ হয় কারও আপত্তি হতো না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথাই এখন সংবাদপত্রের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। আজকের স্টাফের বৈঠকে ইস্‌মে কথাপ্রসঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাকে 'দো-আঁসলা অবস্থা' বলে উল্লেখ করলেন। যে প্রদেশের অধিবাসীদের শতকরা ৯৭জন হলো মুসলমান, সেই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের শাসন চলবে, এই অবস্থাটাই ইস্‌মে ঐ ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের সম্পর্কে আলোচনা হলো। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের সুদীর্ঘ না হলেও মাঝারি রকমের সুবিস্তৃত একটা সমুদ্রোপকূল-ভাগও আছে। সেখানে ইউরেনিয়ামের খনিও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ব্রিটিশের অধিনায়ক ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হবার পর দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে, এই প্রশ্নের মধ্যে একটা নতুন গুরুত্বও এখন প্রবেশ করেছে। ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুরের গুরুত্বকে সামরিক প্রয়োজনের দিক দিয়েও বিবেচনা করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ভারত থেকে সমস্ত ইওরোপীয় নরনারীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, সে সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই যে-সব ইওরোপীয় ভারত থেকে চলে যেতে চান, তাঁদের নামের একটি রেজিস্টার তৈরী করার সিদ্ধান্ত করা হলো। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, ইওরোপীয়দের অপসারণের জন্য যে পরিকল্পনাই করা হোক না কেন, এমন কোন

ব্যস্ততার ও উদ্বেগের সঙ্গে সেটা করা উচিত হবে না, যার ফলে আতঙ্কিতভাবে অতি দ্রুত ভারত ত্যাগের একটা হিড়িক ইওরোপীয়দের মধ্যে দেখা দিতে পারে।

মরিস জিংকিন্সের সঙ্গে ডিনার খেলাম। মরিস বললেন, নেহরু হলেন গান্ধীর পশ্চিমাস্য, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধে গান্ধী তাঁর নীতি নির্ণয়ের সব ভার নেহরুর উপরেই ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। মরিস আর একটা বিষয় ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন। তিনি বললেন যে, পাকিস্থান রাষ্ট্র কখনো আর্থিক আত্মনির্ভরতা লাভ করতে পারে না, এইরকম একটা ধারণা অনেকেই ক'রে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। আর্থিক শক্তি ও সঙ্গতির অভাবে পাকিস্থান রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে না, এরকম কল্পনার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আত্মনির্ভর হবার মতো আর্থিক সঙ্গতি পাকিস্থানেরও থাকবে। আমি মরিসকে এবিষয়ে একটা মেমোরেণ্ডাম লিখে দেবার জন্য বললাম, কারণ মাউণ্টব্যাটেনের বর্তমানের চিন্তা ও বিবেচনার দিক দিয়ে এবিষয়ে তথ্যপূর্ণ কোন নিবন্ধ অবশ্যই বিশেষ কাজে লাগবে।

মরিসের কাছ থেকে তাঁর আর একটা ধারণার কথা শুনলাম। নেহরু এবং কংগ্রেসের পক্ষে অকিনলেককে সমর্থন করার একটা কারণ এই হতে পারে যে, অকিনলেক এখন পদত্যাগ করলে ফিল্ড মার্শাল স্লিম ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হবেন। কারণে হোক্ বা অকারণেই হোক্, কংগ্রেসের ধারণা এই যে, অকিনলেকের তুলনায় স্লিম মুসলমানদের প্রতি বেশি সমর্থন ও অনুরাগের ভাব পোষণ করেন। এই কারণে মুসলিম লীগ ও লিয়াকৎ অকিনলেককে ঐভাবে উত্যক্ত করছেন, যাতে অকিনলেক বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন আর চলে যান।

নেহরুর সম্বন্ধে একটা গল্পও বললেন মরিস। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের দিনে প্রতিনিধিদের পান-ভোজনে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। আসরের মধ্যে ঘুরে ফিরে নেহরু প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন এবং কখনো বা করমর্দন করছিলেন। মদ্য পানে বিবশ একজন প্রতিনিধির কাছে এসে নেহরু বললেন—এ কি? আপনি দেখছি একটি আস্ত আম গাছ! এত জলও আপনার দরকার হয়?

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : গান্ধীর মনের আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে আজকের স্টাফের বৈঠকে আলোচনা হলো। সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, গান্ধী তাঁর সেই পুরনো দাবীই অত্যন্ত অকপটভাবে উপস্থিত করেছেন। গান্ধীর ব্যক্তিগত অভিমতের দিকটা বিবেচনা করবার প্রয়োজনীয়তা মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞতারই প্রমাণ দিয়েছেন। এর মধ্যে সতর্কতার আসল বিষয় এই যে, মাউণ্টব্যাটেন যেন গান্ধীর সঙ্গে এমন কোন ধরনের আলোচনার মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে না যান, যেখানে গান্ধীর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদের ব্যাপার আছে। গান্ধী যে-সব পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন, মাউণ্টব্যাটেন শুধু তাই শুনে রাখবেন।

মাউণ্টব্যাটেন এখন প্রধানত সেই ধরনের সমাধানের একটি সূত্র সন্ধানের চেষ্টায় তাঁর চিন্তা নিয়োজিত করেছেন, যার সাহায্যে ভারতের সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে রাজি করাবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা ও আগ্রহ যথোচিত পরিমাণে প্রথমেই দলগুলির মনে সঞ্চারিত করা সম্ভবপর হবে। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে বরং সে প্রস্তাবকে যথেষ্ট সজীব ক'রে তোলবার জন্যই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সকল চেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। তবে এটা তিনি ধারণা

ক'রে নিয়েছেন যে, মুসলিম লীগের উপর থেকে জিন্নার প্রভাব ও ক্ষমতা কখনই শিথিল হবে না এবং জিন্নাও তাঁর সংকল্পের কোন নড়চড় করবেন না। সুতরাং, পরিকল্পনার মধ্যে দেশখণ্ডনের ব্যবস্থার সুযোগও রাখতে হবে। একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে ভাগ ক'রে যদি দুটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করতে হয়, তবে এটাও ঠিক যে কয়েকটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকেও ভাগ করতে হবে। যে সব প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, সেই সব প্রদেশকেও ভাগ করার যৌক্তিকতা মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার করেন।

পরিকল্পনা যে রূপেই গ্রহণ করুক না কেন, মাউণ্টব্যাটেন এখানে এসে প্রথম থেকেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে গিয়েছেন যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়। লণ্ডনে থাকতে সমস্যাকে যতটা দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গিয়েছিল, এখানে এসেই বোঝা গিয়েছে যে, তার চেয়েও বেশি দ্রুততার সঙ্গে একটা মীমাংসায় পেঁছতেই হবে। তাই '১৯৪৮ সালের জুন মাস'কে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বলে যে ঘোষণা করা হয়েছে, সে ঘোষণাকে এখন আর অবস্থার উপযোগী বলে মনে করতে পারছেন না মাউণ্টব্যাটেন। এই সময়সীমা বস্তুত একটা বেশি বিলম্বিত ব্যবস্থারই সময়সীমা। আরও অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা নিষ্পন্ন ক'রে ফেলা প্রয়োজন। মাউণ্টব্যাটেন অনুভব করছেন, বেশি দেরি হলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় এমন এক ভাঙ্গন দেখা দেবে, যখন সমাধানের চেষ্টাই অসাধ্য হয়ে উঠবে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ-সমাজ, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এই তিন সক্রিয় পক্ষ নিজের নিজের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করবার মতো শক্তি অবশ্যই রাখেন। কিন্তু যদি কোন মীমাংসার সূত্রে এঁদের সম্মত না করানো যায়, তবে ভারতে চীনের অবস্থা দেখা দিতে দেরি হবে না। আর একটা কথা। সমস্যার ও মতভেদের রাজনৈতিক সমাধান খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলার অর্থও এই দাঁড়ায় যে, প্রশাসনিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য পরবর্তী একটা সময়সীমাও নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজন হবে। এ কাজও অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সুতরাং রাজনৈতিকভাবে মীমাংসার সূত্র লাভের পরেও, কিছুকালের মতো আবার সকল পক্ষকে সেই সব ব্যবস্থার একটা পরিকল্পনায় সম্মত করাতে হবে, যেসব ব্যবস্থা নানাপ্রকারের প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজন।

সকাল বেলার বৈঠক সমাপ্ত হলো তখন, যখন জিন্না মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এলেন। গান্ধী-মাউণ্টব্যাটেন সাক্ষাৎকারের সময় ফটোগ্রাফারদের যেরকম ভিড় দেখেছিলাম, সেরকম কোন ভিড় দেখলাম না। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফারদের সম্পর্কে জিন্নার আচরণে একটা কেতাদুরস্তী ভাব ও ভঙ্গী দেখা গেল। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলোচনা সমাপ্ত হবার পরেই আমি মাউণ্টব্যাটেনের কাছে উপস্থিত হলাম। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, সেটা মাউণ্টব্যাটেনকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। বিজ্ঞপ্তির সামান্য একটু পরিবর্তন ক'রে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

আগে কথা ছিল, আজ রাত্রে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্না ও জিন্নার ভগ্নী ডিনারে যোগদান করবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে, ব্যবস্থা হলো, আগামীকাল সন্ধ্যার সময় ভাইসরয় ভবনে জিন্না ও জিন্না-ভগ্নী ডিনারে আসবেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, জিন্নার সঙ্গে আজই আর একটা সাক্ষাৎ ও আলোচনা সহ্য করতে তিনি অসমর্থ। আজকের সকালের আলোচনার পর জিন্না

চলে যাবার সময় মাউণ্টব্যাটেনকে বলে গিয়েছেন যে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবেন। জিন্নার সঙ্গে আলাপের পর মাউণ্ট-ব্যাটেনের মনে প্রথম কি ধারণা দেখা দিয়েছে, সেটা মাউণ্টব্যাটেনের একটা কথা থেকেই বুঝতে পারা গেল। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'মাই গড! ভদ্রলোক একেবারে হিমের মতো উত্তাপহীন। জিন্নার এই হিমাক্ত ভাব দূর করতেই আমার আলোচনার বেশির ভাগ সময় কেটেছে।'

আজকের লাঞ্চের পর কৃষ্ণ মেনন ও ইস্‌মের মধ্যে গান্ধী-প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হলো। মাউণ্টব্যাটেনই দু'জনকে এই আলোচনা করতে বলেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনও সকালের বৈঠকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতের বর্তমান শাসন-দায়িত্বের ভার গ্রহণের জন্য জিন্নাকে আমন্ত্রণ করার জন্য গান্ধী মনে মনে প্রস্তুত হয়েছেন। গান্ধী এই কথাও বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেসকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাবেন। সুতরাং, কংগ্রেসকে সম্মত করাবার কাজে গান্ধী উদ্যত হবার আগেই নেহরুকে একটি কথা জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। নেহরুকে জানিয়ে দিতে হবে যে, গান্ধীর ঐ প্রস্তাব মেনে নেবার কোন প্রতিশ্রুতি মাউণ্টব্যাটেন দেননি। গান্ধীর প্রস্তাবে ভাল ক'রে বিশ্লেষণ ও বিচার ক'রে দেখবার অনেক কিছু আছে, এ প্রস্তাবে হঠাৎ কোন সম্মতি দান করা সম্ভবপর নয়।

গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী ও গান্ধীর ঐ প্রস্তাবকে মাউণ্টব্যাটেন বৈজ্ঞানিক মিঃ পাইকের একটা পরিকল্পনার অনুরূপ একটা কল্পনাকাণ্ড বলে মনে করেন। মিত্রশক্তির সংযুক্ত 'সামরিক অপারেশন' বিভাগে মিঃ পাইক কাজ করতেন। তিনি তুষারনির্মিত এক বিমানক্ষেত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পিত এই বিমানক্ষেত্রের নাম দিয়েছিলেন—'হাবাকুক'। তুষার দিয়ে তৈরী এই 'হাবাকুক' বিমানক্ষেত্র আকাশে স্বয়ংচালিত হয়ে ভেসে বেড়াতে পারবে। মিঃ পাইকের 'হাবাকুক' অবশ্য বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার দিক দিয়ে নিতান্ত অসাধ্য কোন পরিকল্পনা নয়; কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে সুদূর-পরাহত এবং প্রায়-অসাধ্য একটা কষ্ট-কল্পনারই দৃষ্টান্ত।

সন্ধ্যাবেলা মাউণ্টব্যাটেনের ডিনারে মাত্র আমি একাই উপস্থিত ছিলাম। জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই শুনলাম।

জিন্না এসেই কোন রকম আলাপী ভাষায় প্রসঙ্গের উত্থাপন না ক'রে প্রথমেই বললেন—'আমি মাত্র একটি সর্তে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি আছি......।'

মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বললেন,—'জিন্নার কথা শেষ হবার আগেই আমি তাঁকে বাধা দিলাম।'

জিন্নাকে উদ্দেশ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'আমি কোন রকমেরই সর্ত আলোচনা করতে রাজি নই মিঃ জিন্না। এমন কি বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি নই, যতক্ষণ না আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাব এবং আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার সুযোগ পাব।'

মাউণ্টব্যাটেনের প্রত্যুত্তরে জিন্না একেবারে ঘাবড়েই গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে নিঃশব্দে এবং ক্ষোভ-গম্ভীর মূর্তি নিয়ে যেন আলগোছে বসে রইলেন।

আলোচনার শেষ দিকে তাঁর ভঙ্গী একটু নরম হয়ে এল। কেমন ক'রে মুসলিম লীগ মুসলমানদের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং স্বয়ং জিন্না লীগের এই প্রতিপত্তির ইতিহাসে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেই কাহিনী জিন্নার মুখ থেকেই শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। জিন্নাও মাউণ্টব্যাটেনের এই অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : গত রাত্রে জিন্না ও জিন্না-ভগ্নী মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে ডিনারে যোগদান করেছিলেন। কিভাবে কত মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে, তারই কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণনা করলেন জিন্না। মুসলমানদের হত্যা করার এই সব ব্যাপারে যে-সব বিভীষিকাবৎ হিংস্রতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাও বিস্তারিতভাবে জিন্না বর্ণনা করলেন।

জিন্না বললেন—'আপনাদের দিক থেকে অতি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অস্ত্রচিকিৎসক সার্জন যেভাবে অপারেশন ক'রে থাকেন, সেই ভাবেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'অপারেশনের আগে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়।'

জিন্নার সঙ্গে আলাপ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাতে মাউণ্টব্যাটেন নিজের সম্বন্ধেই অধিকতর বিশ্বাসের শক্তি লাভ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন—'জিন্না আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে পারেন, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম তাতে কিছু হবে না।'

গান্ধীর সম্পর্কেও মাউণ্টব্যাটেনকে কতগুলি কথা বলেছেন জিন্না।—গান্ধীর নেতৃত্ব মস্ত বড় একটা ধোঁকার ব্যাপার। গান্ধী কর্তৃত্বের অধিকার পেয়েছেন, অথচ দায়িত্ব পালনের কোন বাধ্যতা তাঁর উপর নেই।

জিন্নার এই ব্যাখ্যা জিন্না নিজেই আবার ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার জন্য অতীত ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলে নানা কথা বললেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যতবার এবং যে-সব সমস্যা ও আলোচনা হয়েছে, সেই সব ঘটনার বৃত্তান্ত থেকে শুরু ক'রে ক্রীপস্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা এবং ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের ঘটনা পর্যন্ত তিনি প্রসঙ্গে টেনে আনলেন। ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনকে গান্ধীর 'হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি' বলে মন্তব্য করলেন জিন্না।

জিন্না বললেন—'কংগ্রেস শুধু নিজের জন্যই সব কিছু পেতে চায়। পাকিস্থান লাভের সম্ভাবনা ও সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার জন্য কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ পর্যন্ত মেনে নিতে রাজি হবেন।'

জিন্নার উপর বর্তমান ভারতের শাসনদায়িত্ব এবং মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার অর্পণ করার যে প্রস্তাব গান্ধী করেছেন, সে প্রস্তাবকে মাউণ্টব্যাটেন শুধু বিবেচনা ক'রে দেখবার যোগ্য একটা প্রস্তাব বলে মনে করেন। এর বেশি কিছু গুরুত্ব আরোপ করার মত কোন চিন্তা তাঁর মনে এখনো স্থান লাভ করেনি। গান্ধীর শেষ চিঠি আজকের স্টাফের বৈঠকে পড়ে শোনালেন ইস্‌মে। এই চিঠির বক্তব্যের মধ্যে 'গান্ধী-মাউণ্টব্যাটেনের চুক্তি'র বীজ রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য এটা উপলব্ধি করছেন যে, গভর্নমেণ্ট গঠনের দায়িত্বের মধ্যে জিন্নাকে আনতেই হবে, কিন্তু কিভাবে সেটা হতে পারে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা ক'রে উঠতে পারছেন না মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্নার প্রথম সাক্ষাতের সময়, আলোচনার ঠিক আগে যখন ফটোগ্রাফারেরা ফটো তুলবার জন্য ক্যামেরা তুলে দাঁড়ালেন তখন জিন্না লেডি মাউণ্টব্যাটেনের কাছে নিজেকে রসিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে গিয়ে বললেন,—'দুই কণ্টকের মাঝখানে একটি গোলাপের মতো আপনি এখন দাঁড়িয়ে থাকুন।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফটো যখন তোলা হলো, তখন দেখা গেল যে জিন্নাই গ্রুপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : আজকের স্টাফের বৈঠকে লিয়াকতের একটি চিঠির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা চলল। লিয়াকৎ অভিযোগ করেছেন যে, ভারতীয় বাহিনীতে মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা হিন্দু সৈনিকের তুলনায় অনেক কম। লিয়াকৎ চাইছেন, অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনীকে উপযুক্তসংখ্যক মুসলিম সৈনিক নিয়ে পুনর্গঠিত করা হোক্, যাতে যথাকালে হিন্দুস্থানের ও পাকিস্থানের জন্য ঐ বাহিনীকে দু'টি বাহিনীতে ভালভাবে ভাগ ক'রে ফেলা সম্ভবপর হতে পারে। ইস্‌মে বললেন, লিয়াকতের এই চিঠির বক্তব্য বিবেচনা ক'রে কোন ব্যবস্থা করা উচিত হবে না। করলে, সেটা রাজনৈতিক প্রশ্নটাকেই বিশেষ একটা পরিণামের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টায় পরিণত হবে। যতদিন না ভাইসরয় মহামান্য ইংলণ্ড-নৃপতির গভর্নমেণ্টের কাছে কোন সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা উপস্থিত করছেন, ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবই আমাদের কর্মপন্থার প্রধান নিয়ামক হয়ে থাকবে। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবে ভারতের জন্য একটি অখণ্ড সৈন্য-বাহিনী রাখবার নীতিই স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং লিয়াকতের চিঠি বিবেচনা ক'রে কোন নতুন ব্যবস্থার উদ্যোগ করলে ঐ নীতিরই অন্যথা করা হয়। মাউণ্টব্যাটেনও এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের পূর্বেই ভারতীয় বাহিনীকে খণ্ডিত করা চলতে পারে না।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিরোধের জন্য ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একটা শান্তি-চুক্তির মতো প্রস্তাব গ্রহণের ও ঘোষণার যে প্রয়োজন হয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, সে সম্বন্ধে গতকাল জিন্নাকে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে জিন্নার অভিমত জানবার চেষ্টা করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। একেবারে সোজাসুজি ও স্পষ্ট ভাষায় জিন্নাকে প্রশ্ন করেছেন—সাম্প্রদায়িক অশান্তি বন্ধ হোক্, এটা আপনি সত্যিই চান কি না? আর একটা প্রশ্ন, জিন্না যদি এইরকম শান্তির আবেদন ঘোষণা করেন, তবে তাতে মুসলিম লীগকে কোন রকমের রাজনৈতিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে কি না? আলোচনার পর জিন্না শেষ পর্যন্ত শান্তির আবেদন ঘোষণা করার প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছেন।

স্টাফের বৈঠক সমাপ্ত হবার পর আমি আজ জিন্নার ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আওরঙ্গজেব রোডের ধারে অবস্থিত জিন্নার এই বাসভবনটি দেখতে মসজিদেরই মতন। ঘরের ভিতর একটা তাকের উপর এক কাঠের গায়ে রুপোর পাত বসিয়ে তৈরী-করা ভারতের একটা মানচিত্র রয়েছে। মানচিত্রের পাকিস্থান অংশটি হলো সবুজ রঙের। প্রথম দিনের সাক্ষাতে জিন্নার যে আচরণ দেখেছিলাম, তার তুলনায় আজকের আচরণে তিনি অনেক বেশি সৌজন্য দেখালেন। জিন্না বললেন, নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন নামে যে সঙ্ঘটি রয়েছে, সেটি হলো একটি বিশুদ্ধ হিন্দু সঙ্ঘ। মুসলমানের সংবাদপত্র বলতে 'ডন' নামে

মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে জিন্নার প্রথম সাক্ষাতের দিনে। 'দেখা গেল যে জিন্নাই গ্রুপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন'

মাত্র একটি সংবাদপত্রই আছে বলে জিন্না মনে করেন। জিন্নাই হলেন ডন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী।

জিন্না বললেন—'কিন্তু এটা জেনে রাখবেন যে, আমি কোন দিনই এই পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না। সম্পাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও ইচ্ছা অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত ক'রে থাকেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই নির্বিকারভাবে আর একটা কথা বললেন জিন্না—'সম্পাদক অবশ্য বরাবর আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন।'

আলোচনার শেষদিকে জিন্না নোয়াখালির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, নোয়াখালিতে মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হিন্দু-হত্যার যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণ। প্রথমে রটনা করা হয়েছিল যে, কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। জিন্না বললেন—শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, এক শত জনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশিসংখ্যক নিহত এবং এক শত জন আহত হয়েছে।

আজ বিকালে নেহরুর ভবনে এসে চা খেয়েছি। ইন্দিরা ও কৃষ্ণ মেনন মুসলিম লীগের উদ্ভব এবং লীগের নেতাদেরও নেতৃত্বের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন যে, জন্মের দিক দিয়ে স্বয়ং জিন্না একজন হিন্দুই ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, কংগ্রেস যেদিন থেকে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলেন, সেই দিন থেকেই লীগের একটা মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কারও কারও চোখে পড়ল। তার আগে লীগকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হতো না। ব্রিটিশের উৎসাহে ও সমর্থনে লীগ পুষ্ট হয়েছে। আমাকে গোয়ালিয়রে গিয়ে দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সম্মেলনের অধিবেশন দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন কৃষ্ণ। তিনি বললেন, প্রজা-সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি নেহরু এই অধিবেশনে কাশ্মীরের মুসলমান কংগ্রেসের নেতা শেখ আবদুল্লার উপর নিখিল ভারত প্রজা-সম্মেলনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। শেখ আবদুল্লা এখন কাশ্মীরের কারাগারে রয়েছেন।

বুঝতে পারছি, শুধু রাজনৈতিক উত্তাপই নয়, প্রাকৃতিক উত্তাপও কত দ্রুত বেড়ে চলেছে। গতকাল ব্যারোমিটারে দেখেছিলাম, তাপের মাত্রা ১০০ ডিগ্রীতে এসে পৌঁছেছে। নেহরুও যথার্থ একটি মন্তব্য করেছিলেন—"উত্তাপের কথা যতই বেশি চিন্তা করা যায়, ততই বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেও হয়।"

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে বিশেষ একটি কারণে জিন্না পূর্বে আপত্তি তুলেছিলেন, সে-বিষয় মাউণ্টব্যাটেন আজকের স্টাফের বৈঠকে বললেন। ইচ্ছা করলেও কয়েকটি প্রদেশ গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না, বড় জোর এক গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে যোগদান করতে পারবে, এটাই ছিল জিন্নার আপত্তির বিষয়।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এখন কংগ্রেসও স্বীকার ক'রে নিতে রাজি হয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে গ্রুপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার অধিকার প্রদেশগুলিকে দেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে সমগ্র ভারতকে নিয়ে যে একটি ইউনিয়ন রচনার পরিকল্পনা স্থান লাভ করেছে, সেই ইউনিয়ন পরিকল্পনাকেই সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার উপর কংগ্রেস জোর দিয়েছেন। ভাইসরয়ের ডেপুটি প্রাইভেট সেক্রেটারি আইয়ান স্কট বললেন যে, বিভিন্ন গ্রুপগুলিকে এক ইউনিয়নের অধীনে যুক্ত ক'রে রাখাই মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত আসল তত্ত্ব। মাউণ্টব্যাটেন আজ যে-সব কথা বললেন, তাতে তাঁর চিন্তার প্রকৃতিও অনেকটা স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারা গেল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্পর্কে যে নীতি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হবে, তাতে এটাই স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হবে যে, ভারতীয় জনসাধারণ যেভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর চাইবেন সেইভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এটা স্পষ্টভাবে ভারতীয় জনসাধারণের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। সুতরাং দেশ খণ্ডনের পন্থায় অথবা অন্য কোন পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কি হবে না, সেটা ভেবে স্থির করবার সুযোগ ভারতীয় জনসাধারণকে এখন দিতে হবে।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার যে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে, সেই সাক্ষাতের সময় জিন্না নাটকীয় ভঙ্গীতে একটি সঙ্কল্প মাউণ্টব্যাটেনের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। পাকিস্থানকে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করবার সঙ্কল্প মাউণ্টব্যাটেনের কাছে ঘোষণা করেছিলেন জিন্না। জিন্নার এই প্রস্তাব শুনেও কোনরকম আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ করেননি মাউণ্টব্যাটেন। জিন্নার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারা গেল যে, মাউণ্টব্যাটেনের এই আচরণে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনার বিবরণ মাউণ্টব্যাটেনই আজ আমাদের বললেন।

আজকের বৈঠকে আমরা মন খুলেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুটি পদ্ধতির কথা বিশদভাবেই আলোচনা করলাম। 'ইউনিয়ন পরিকল্পনা' অথবা 'বল্কান পরিকল্পনা'? মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি এই ধাঁধার মতো সমস্যার একেবারে মূলে গিয়ে সমাধানের জন্য একটা প্রচেষ্টার উপায় সন্ধান করবেন। তিনি প্রথমে চেষ্টা করবেন যাতে কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপেই মেনে নিতে রাজি হন। কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে রাজি হলে মাউণ্টব্যাটেন তারপর জিন্নাকে দুটি পথের একটি পথ বেছে নেবার জন্য আবেদন করবেন। হয় মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ইউনিয়ন স্বীকার ক'রে নেওয়া, নয় কিছু অংশ কেটে-বাদ-দেওয়া অর্থাৎ হ্রস্বীকৃত পাকিস্থান গ্রহণ করা। জর্জ অ্যাবেল এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, কংগ্রেস তাঁর নীতি পরিবর্তন করবেন বলে মনে হয় না। উত্তর ভারতের গ্রুপগুলির উপর কংগ্রেস এরই মধ্যে এমন চাপ দিয়ে ফেলেছেন যে, তার ফলে মুসলিম লীগ পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

গান্ধী এক পত্র লিখে মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন যে, তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন সে প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নিতে পারেননি। গান্ধী আরও জানিয়েছেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যতে যে-সব আলোচনা হবে, তার মধ্যে তিনি নিজে আর থাকবেন না। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির উপরেই আলোচনার সব দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন।

মাউণ্টব্যাটেন আমাদের বললেন যে, তিনি গান্ধীকে এখনো আলোচনার ব্যাপারে রাখবার চেষ্টা করবেন। কংগ্রেস যা'তে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, তার জন্য কংগ্রেসকে বুঝিয়ে প্রভাবিত করার জন্য গান্ধীর প্রয়োজন আছে। মাউণ্টব্যাটেন এটা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য মনের গভীরে একটা প্রবল আগ্রহ এখনো কংগ্রেসের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় এই মর্মে এক প্রবন্ধ বের হয়ে গিয়েছে যে, গান্ধী, জিন্না ও কৃপালনীর স্বাক্ষরিত এক 'শান্তি-আবেদন' শীঘ্রই প্রচারিত হবে। এই 'শান্তি-আবেদন' প্রকাশের জন্যই ব্যবস্থা করার চেষ্টাতে মাউণ্টব্যাটেন কয়েকদিন ধরে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস চাপ দিয়েছেন যে, শান্তি-আবেদনে কংগ্রেস-

সভাপতি কৃপালনীও স্বাক্ষর দান করবেন এবং জিন্না কৃপালনীর স্বাক্ষর-দানের প্রস্তাবে আপত্তি করছেন। এখনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি, অথচ সংবাদটা এরই মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল। ইস্মে ও মিয়েভিল বললেন যে, হিন্দুস্থান টাইমসের এই প্রবন্ধের এই ফল হবে যে, জিন্না আর শান্তি-আবেদনে স্বাক্ষর করতে রাজিই হবেন না। কেমন ক'রে শান্তি-আবেদন রচনার কথা সংবাদপত্র জানতে পেরেছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে আজই একটি পত্র দেবেন বলে ঠিক করলেন।

শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনের ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির জয় হলো। শান্তি-আবেদনে শুধু গান্ধী এবং জিন্না স্বাক্ষর-দান করেছেন। কৃপালনীকে স্বাক্ষর-দান করবার জন্য আহ্বান করা হয়নি, সুতরাং জিন্নার ইচ্ছার মর্যাদাও রক্ষিত হয়েছে। গান্ধী বস্তুত এই দলিলে দু'জায়গায় তাঁর নাম স্বাক্ষরিত করেছেন। একটি স্বাক্ষর ইংরাজীতে এবং একটি স্বাক্ষর উর্দুতে।

আগামীকাল হবে গভর্নর সম্মেলন। তার আগেই বিভিন্ন রেসিডেণ্টদের নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের একটা আলোচনা-পর্বও অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যে পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছেন, সেই খসড়া গভর্নরদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হবে। গভর্নরদের অভিমত সুস্পষ্টভাবে জেনে ও বুঝে নিয়ে তবে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দান করবেন।

যে কয়টি প্রধান কর্মনীতির উপর ভিত্তি ক'রে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছেন, সেগুলিকে সংক্ষেপে বলা যায় :

(১) যদি দেশখণ্ডন করতেই হয়, তবে দেশখণ্ডনের দাবীর দায়িত্ব এবং দেশ-খণ্ডনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পালনের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে ভারতীয় জন-সাধারণেরই দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে।

(২) সাধারণত, প্রদেশগুলিকে তাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের অধিকার দেওয়া হবে।

(৩) ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাংলা ও পাঞ্জাবকে তাদের অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় অনুসারে আপাতত হিন্দুপ্রধান এবং মুসলমানপ্রধান দুই অঞ্চলে একটা আনুমানিক সীমারেখার দ্বারা ভাগ ক'রে নিতে হবে।

(৪) বাংলা প্রদেশ খণ্ডিত হলে আসামের মুসলিমপ্রধান শ্রীহট্ট জেলাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুসলিম-প্রদেশাঞ্চলে যোগদান করবার অথবা না করবার অধিকার এবং সুযোগ দিতে হবে।

(৫) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন ক'রে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী স্যার মির্জা ইসমাইলও এসেছেন। মির্জা ইসমাইল বললেন যে, নিজাম সম্ভবত শীঘ্রই জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নিজের ব্যক্তিগত অবস্থার কথাও বললেন মির্জা ইসমাইল। তাঁর উপর নিজামের আস্থা অতি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে এবং তিনি মনে করছেন যে, নিজামের প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে বেশি দিন আর তাঁকে থাকতে হবে না।

গভর্নরবর্গের বিবেচনায়

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : আজ গভর্নর সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়েছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে ফেলবেন, এই ঘোষণা সত্য সত্যই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত নাও হতে পারে বলে ধারণা করার মতো যদি কোন সংশয়ী টমাস এই সম্মেলনে থেকেও থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে এখন সে ধারণা পরিবর্তন ক'রে ফেলাই কর্তব্য। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই আবেদন জানালেন।

বিভিন্ন প্রদেশের এগারজন গভর্নর এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোস অসুস্থ হওয়ায় তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাঁর সেক্রেটারি জে, বি, টাইসন।

স্যার জন কলভিল ও স্যার আর্চিবল্ড নাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দুই গভর্নর ভারত থেকে ইওরোপীয়দের অপসারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যক্ত করলেন। পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেংকিন্স পাঞ্জাবের আশঙ্কাপূর্ণ অবস্থার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিহারের গভর্নর স্যার হিউ ডাও বললেন যে, চার কোটি অধিবাসীর প্রদেশ বিহারে মাত্র পঞ্চাশ জন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী রয়েছেন। সুতরাং, তাঁর প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলার কতটুকু অস্তিত্ব আছে, সে সম্বন্ধে না বুঝবার মতো কোন অস্পষ্টতা আর নেই। আসামের গভর্নর স্যার এণ্ড্রু ক্লো ইওরোপীয় চা-কর'দের সম্বন্ধে বললেন। তিনি বললেন, চা-কর'দের যে-সব যুবতী স্ত্রী বর্তমানে আসামেই স্বামীর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। অতীতে কখনো এত বেশি সংখ্যায় ইওরোপীয় যুবতী মহিলা আসামে ছিলেন না। টাইসন বললেন, বাংলা প্রদেশে বিশ হাজার ইওরোপীয়ান রয়েছেন। কলকাতার বাইরে অন্যান্য জেলায় যে-সব ইওরোপীয় রয়েছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেই তিনি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। টাইসন অনুভব করছেন যে, বাংলা প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই কম্যুনিস্টদের আন্দোলন বেশি প্রবল এবং এটাও দেখা যাচ্ছে যে, কম্যুনিস্টদের আন্দোলন সুস্পষ্টভাবেই ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধাভিমুখী হয়ে উঠেছে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : ভারত সরকারের সংবাদ-দপ্তরের সেক্রেটারি জি এস বজম্যানের সঙ্গে আজ ইম্পিরিয়াল হোটেলের লনে বসে আমরা ভোজ খেলাম। গান্ধী-জিন্না আবেদন প্রচারের ব্যাপার সম্পর্কে আমি এর আগেই বজম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নয়াদিল্লীর প্রথম গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যাটি বেশ স্নিগ্ধ ও মনোরম। লনের উপর প্রখর বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে রয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা বাস্কেট চেয়ারে বসে পানপাত্রে লম্বা লম্বা চুমুক দিচ্ছেন। দূরে ধাবমান টাঙ্গার টুং-টুং ঘণ্টাধ্বনি শ্রুতিমধুর হয়ে বাজছে। মাঝে মাঝে এই লনেরই ঘাসের উপরে হঠাৎ এক আগন্তুক শেয়ালের ছায়া দেখা দিয়ে, তার পরেই দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বজম্যান বললেন যে, বল্লভভাই প্যাটেলের দপ্তরে এতদিন ধরে কাজ ক'রে তিনি

ঐ মানুষটির সম্বন্ধেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, প্যাটেলই হলেন ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিমান। যদি প্যাটেলকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে সে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন ফলই হবে না।

ডেলি টেলিগ্রাফের কলিন রীড উপস্থিত ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপার সম্বন্ধে কলিনকে এক রকমের বিশেষজ্ঞই বলা যায়। মিশরে থেকে তিনি মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়নও করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কলিন বললেন যে, তিনি নিজে আরবী ভাষাতে লিখিত মূল কোরাণ পাঠ করেছেন। কোরাণ সম্বন্ধে জিন্নার জ্ঞান, শিক্ষা ও ধারণা অনেকবার যাচাই ক'রেও দেখেছেন কলিন। কলিন বললেন—জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, পবিত্র কোরাণে বর্ণিত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্নার তুলনায় আমার জ্ঞান অনেক বেশি।

—মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের মুসলিম লীগের কতটা ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা আছে বলে আপনি মনে করেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে কলিন বললেন যে, সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে যে মিশন এসেছিলেন, তাঁরা জিন্না এবং মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি বা আগ্রহের ভাব বিশেষ কিছু প্রদর্শন করেননি।

আমি বললাম—কিন্তু পৃথিবীর লোক এই ধারণা করে যে, ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ঐক্যের ভাব এবং বোধ আছে।

কলিন বেশ জোর দিয়েই বললেন, ধর্মগত ঐক্যের উপর সম্মিলিত ইসলাম নামে সত্য সত্যই কোন ভাবৈক্যের ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে, এমন ঘটনা আজ পর্যন্ত কখনো বাস্তবে ঘটতে দেখা যায়নি।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন আজ বললেন যে, বস্তুত ভারতের সমগ্র জনসাধারণের প্রায় অর্ধাংশের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁরা সকলেই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। মুসলিম লীগ, তপশীলী ফেডারেশন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবৃন্দ, এ'রা সকলেই কমনওয়েলথে থাকবার পক্ষপাতী। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কমনওয়েলথে থাকবার ইচ্ছা এবং অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রে এ'রা যেন ব্রিটেনের প্রতি মস্ত বড় একটা অনুগ্রহ করছেন, এই রকমই একটা ভাব এ'দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

মাউণ্টব্যাটেন আজ আবার সেই পুরনো অভিমতের কথাই তুলে বললেন যে, মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবকেই কিছুটা পরিবর্তন ক'রে একটা নতুন নাম ও রূপ দিয়ে পুনর্জীবিত করা যেতে পারে। মন্ত্রি-মিশনের মূল প্রস্তাবে পরিবর্তনের ব্যবস্থা-গুলি যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল, তারই মধ্যে একটি ভুল হয়েছিল বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন। ভুলটা হলো মনস্তত্ত্বগত। কতগুলি মানসিক অবস্থার বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে ঐ প্রস্তাবে সতর্কতার অভাব ছিল। যদি দুটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি গৃহীত হয়, তবে দুই রাষ্ট্রের সার্বভৌমতার ভিতর দিয়েই একটা ইউনিয়ন সৃষ্টিও সম্ভবপর। হ্রস্বীকৃত অর্থাৎ একটা কাটা-ছাঁটা পাকিস্থানের সঙ্গে যদি একটা সত্যিকারের স্বাধীন কেন্দ্র দান করা হয়, তবে মুসলিম লীগ মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবিত 'খ' এবং 'গ' গ্রুপ নামক দুটি বৃহত্তর পাকিস্থান-অঞ্চলের পরিবর্তে এই হ্রস্বীকৃত পাকিস্থানই গ্রহণ করতে রাজি হবেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের পুরো তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। জর্জ অ্যাবেল আমাকে বললেন যে, আজকের আলোচনায় জিন্নার কথাবার্তায় একটা নির্বিরোধের ভাবই ছিল। মাঝে মাঝে জিন্না ইচ্ছা ক'রেই রূঢ় ভাব অবশ্য দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু মোটামুটি তিনি পরের যুক্তি ও দাবীকে বুঝে দেখবার মতো সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

পাঞ্জাব ও বাংলা যে খণ্ডিত হবে, এটা জিন্না এখন অমোঘ বলেই ধরে নিয়েছেন। এই দুই খণ্ডিত প্রদেশের সীমানা কি হবে, সে সম্বন্ধেও তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে কোন প্রশ্ন করেননি, মাউণ্টব্যাটেনও তাঁকে কিছু বলেননি। জিন্না এখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্য উত্থাপন ক'রে 'যুক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য আবেদন' করেছেন। সীমান্ত প্রদেশে লীগ যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' চালিয়ে যাচ্ছেন, সে সংগ্রাম প্রত্যাহারের জন্য মাউণ্টব্যাটেন তাঁকে কোন অনুরোধ না করায় তিনি বেশ স্বস্তিও বোধ করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেনকে জিন্না বলেছেন—"ইওর এক্সেলেন্সি, আপনাকে আমি আমার মনের কথা অকপটভাবেই বলতে পারি। হিন্দুদের সঙ্গে কোন কাজ করা একেবারেই অসাধ্য। হিন্দুরা অদ্ভুত, ওরা সব সময় এক টাকার বদলে সতর আনা দাবী করে।"

জর্জ অ্যাবেল আমাকে বললেন—"আমিও মনে করি যে, জিন্নার এই মন্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। মুসলমানদের বক্তব্যের তুলনায় হিন্দুদের বক্তব্য অবশ্য অনেক বেশি সঙ্গত, কিন্তু হিন্দুরা তাদের দাবীর মাত্রা বেশি বাড়িয়ে দিয়ে সব সময় নিজেদেরই বক্তব্যের জোর ক্ষুণ্ণ ক'রে থাকেন।"

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনার খসড়া নিয়েই আজ আবার আমাদের স্টাফের আলোচনা হলো।

দেশ খণ্ডনের ব্যবস্থা পরিহার করতে হলে যাতে একরাষ্ট্রীয়তার ভিত্তি লাভের মতো কোন ব্যবস্থা করার পথ উন্মুক্ত থাকে, তার জন্য মাউণ্টব্যাটেন তাঁর খসড়া-পরিকল্পনার ঘোষণায় একটা নতুন অনুচ্ছেদ জুড়ে দিয়ে ঐক্যের পথ খোলা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যবস্থারই মতো বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং সংযোগব্যবস্থা নামক তিনটি শাসনিক বিষয়ের পরিচালন-ক্ষমতা একই কেন্দ্রের উপর অর্পণ ক'রে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ একটি ধরনের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে যদি দুই পক্ষ সম্মত হন, তবে সেই প্রস্তাব মাউণ্টব্যাটেন অবশ্যই বিবেচনা করবেন। এই মর্মে একটি অনুচ্ছেদ এই খসড়া-পরিকল্পনায় যুক্ত ক'রে দিতে চাইছেন মাউণ্টব্যাটেন। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যবস্থার যে বিষয়টি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেটি এই যে, কেন্দ্রে হিন্দুরা ইচ্ছা করলেই সংখ্যাগুরুত্বের জোরে চিরকাল কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভিমত ভোটের জোরে হারিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এবং সংরক্ষিত ঐ তিনটি ক্ষমতা-বিষয়ের সাহায্যে মুসলমানদের দাবী দমন করতেও হিন্দুরা পারবে। এই সম্ভাবনা পরিহার করতে হলে কেন্দ্রে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যায় সমান সমান করতে হয়। যদি হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বে একটি কেন্দ্র গঠন ক'রে সমগ্র ভারতে একরাষ্ট্রীয়তার একটা বিশেষ রূপ ও গঠন সৃষ্টি সম্ভবপর হয়, তবে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম প্রদেশকেও সম্ভবত অখণ্ডিত রাখা যাবে।

অ্যাবেল বললেন যে, কেন্দ্রে দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের এই ধরনের সংখ্যাগত সমতার দ্বারাই ক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান নামে দুই ভিন্ন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগত শক্তি এবং যোগ্যতার সমতার উপরেই প্রকৃত সমতা নির্ভর করে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি অ্যাবেলের এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন। বক্তব্য আর একটু স্পষ্ট ক'রে এবং ব্যাখ্যা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন—"আমার উদ্দেশ্য হলো, যাতে ভোটাধিক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার রীতির পরিবর্তে কেন্দ্রে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অথবা দুটি ভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিবর্গ পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি অনুসরণ করেন, এই রকমই একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।"

কলকাতা শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা ও আশঙ্কা প্রকাশের ব্যাপার চলছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মুসলমানেরা কলকাতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা দাবী করবেন, এবং কলকাতার পরিণামের প্রশ্ন দুই পক্ষের মত-বিরোধের মধ্যে আর একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কলকাতা, এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য কলকাতার জনমত যাচাই করবার কোন ব্যবস্থা করা হলে, ভুল উত্তর লাভের যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা শহরের জন্যও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করা নিতান্তই অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন মাউণ্টব্যাটেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : লাহোর থেকে ফিরে এসে জর্জ অ্যাবেল জানিয়েছেন যে, সেখানকার অবস্থা খুবই সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবে একটা গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে বলেই গভর্নর জেংকিন্স মনে করছেন। জর্জ অ্যাবেল জেংকিন্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই ব্রিটিশের পক্ষে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় আছে কি? জেংকিন্সও স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশের পক্ষে ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই চলে যাওয়া ছাড়া অবশ্য অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, এভাবে চলে যাওয়া এই দেশকে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যেই ফেলে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে।

কলকাতা থেকে আর এক ধরনের সংবাদ এসেছে। বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পরিকল্পনায় যে ব্যবস্থার প্রস্তাব উল্লিখিত হয়েছে, সে প্রস্তাবে গভর্নর বারোসকে সম্মত করাতে পারেন জন ক্রাইস্টি, ভাইসরয়ের জয়েণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি। বারোস চাইছেন, কলকাতাকে 'ফ্রি সিটি' তথা অবাধ শহর বলে ঘোষণা করার নীতি যেন গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পরেই কলকাতাকে 'অবাধ শহরে' পরিণত করা হবে, এই প্রস্তাবকে একটা ম্যাণ্ডেটরী তথা অবশ্যপালনীয় নির্দেশরূপেই ঘোষণা করার জন্য বলেছেন বারোস। কিন্তু বারোসের প্রস্তাব শুনতেই অদ্ভুত লাগছে। যে সময়ে আমরা ভারতে থাকব না এবং ভারতের উপর আমাদের কোন ক্ষমতাও থাকবে না, সেই সময়ে ভারতে কোন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্বন্ধে আমাদের উদ্যোগী হতে বলা একটা অদ্ভুত অনুরোধ বলেই মনে করছি।

সীমান্তে ও সিমলায়

পেশোয়ার, সোমবার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : প্রত্যুষেই নয়াদিল্লী ছেড়ে বিমানপথে পেশোয়ার রওনা হলাম। মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে তাঁদের কন্যা প্যামেলাও চলেছেন। পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চ নাঙ্গা পর্বতের সুমহিম ও সমুন্নত মূর্তি চোখে পড়ল। মধ্যাহ্নের একটু পরেই পেশোয়ারে এসে নামলাম।

পেশোয়ারের গভর্নমেণ্ট হাউসে এসেই এমন একটা ঘটনার কথা শুনতে পেলাম, যে-ঘটনাকে একটা সঙ্কটের ব্যাপারই বলা যেতে পারে; এবং যার ফলে অবস্থাও আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো দুশ্চিন্তিত-ভাবে বললেন যে, এক মাইল দূরে মুসলিম লীগের বিরাট এক জনতার জমায়েত হয়েছে। ভাইসরয়ের কাছে তারা তাদের অভিযোগ জানাতে চায়। আইনের নিষেধ আছে যে, মিছিল ক'রে কোন জনতা পথে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। কিন্তু এই জনতা আজ সেই আইন ভঙ্গ করতেও প্রস্তুত আছে, তারা মিছিল ক'রে গভর্নমেণ্ট হাউসে আসবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ক্যারো বললেন, এইসব বিক্ষোভকারীর সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি। প্রদেশের নানা দূরের ও দূরান্তরের অঞ্চল থেকে তারা এসেছে। ক্যারো পরামর্শ দিলেন, এই অবস্থায় ঐ জনতাকে এখানে আসবার সুযোগ যদি না দিতে হয়, তবে ভাইসরয়ের পক্ষেই এখনি নিজের থেকে সেখানে গিয়ে জনতার সম্মুখীন হওয়া দরকার। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়েই মাউণ্টব্যাটেন তখনি বিক্ষোভকারী জনতার দিকে চললেন। বালা হিসার কেল্লার কাছে রেলওয়ের বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আমরা এই জনতার চেহারা দেখলাম। অসংখ্য সবুজ পতাকা উড়ছে, পতাকায় পাকিস্থানের সাদা চাঁদ আঁকা রয়েছে, এবং অনবরত 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনিও বেজে উঠছে।

মাউণ্টব্যাটেনকে দেখতে পেয়েই জনতার ধ্বনিও বদলে গেল। শোনা গেল—'মাউণ্টব্যাটেন জিন্দাবাদ'। জনতার গম্ভীর মুখগুলির উপর হাসিও দেখা দিল। খাকি বুশ-সার্টপরিহিত মাউণ্টব্যাটেন এবং লেডি মাউণ্টব্যাটেন জনতার উদ্দেশ্যে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় হাত দোলালেন।

মাউণ্টব্যাটেনকে স্বচক্ষে দেখার পরেই ভিড় নিজের থেকেই ভেঙ্গে গেল। গভর্নর ও সরকারী অফিসারেরা বললেন যে, এই জনতাকে নিবৃত্ত করা বা ভেঙ্গে দেওয়া পুলিশ ও মিলিটারির সাধ্য ছিল না। গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে আসার পর মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে একে একে বিভিন্ন ব্যক্তি নেতা ও প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের পালা আরম্ভ হলো। মুসলিম লীগের যেসব নেতা কারারুদ্ধ হয়ে রয়েছেন, বিশেষ বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে তাঁদেরও মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এই প্রদেশে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে গভর্নর ক্যারো এবং কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে একটা কঠিন মতবিরোধের ভাব।

ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'পাঞ্জাব ও বাংলা

সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্য একটা উপায় বের করবার চেষ্টা আমি এরই মধ্যে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা আমার বিশেষ কঠিন বলেই বোধ হচ্ছে। মুসলিম লীগকে আমি অবশ্যই বলব যে, কোনরকম হিংসাকর ক্রিয়াকলাপের কাছে আমি নতি স্বীকার করব না। আমি আপনাকে ঘরোয়াভাবে বলতে পারি যে, সীমান্ত প্রদেশে নতুন ক'রে সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু মুসলমানদের আমি সুস্পষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলতে পারব না যে, সাধারণ নির্বাচন হবেই। জিন্না এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি সীমান্ত প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়, তবেই সব হিংসাকর অশান্তি ও হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার সদুদ্দেশ্য ও সততার প্রতি আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে। জিন্নাও এটা মেনে নিয়েছেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্যই তাঁর অনুগামীদের এখন নির্দেশ দিচ্ছেন।'

স্থানীয় মুসলিম লীগের উপর মুসলিম লীগের হাইকম্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। খান সাহেব বললেন, স্থানীয় মুসলিম লীগই দাঙ্গা বাধিয়েছে এবং এখন নিজের ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করছে। মুসলিম লীগের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের অন্যতম বলে যিনি পরিচিত, সেই আবদুর রব নিস্তারও গত নির্বাচনে পাকিস্থানের দাবীর দোহাই দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের 'কুইট ইণ্ডিয়া' বাণী স্থানীয় জনসাধারণের মনের উপর বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু এখন সেই বাণীর সে-প্রভাব আর নেই। যারা আগে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল, তাদেরও অনেকের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, তাহলে কি হিন্দুদের অধীনতাই এখন স্বীকার ক'রে নিতে হবে?

খান সাহেব যখন পাঠানিস্থানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তখনই আলোচনা কিছুটা খাপছাড়া এবং বিস্ফোরকের মতন হয়ে উঠল। গান্ধীও কিছুদিন থেকে এই পাঠানিস্থান প্রস্তাব সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করছেন। পাঠানিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে তার কি সুফল হতে পারে, সে সম্বন্ধে গান্ধী সম্প্রতি আরও বেশি জোর দিয়ে অনেক কথা বলেছেন। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যদি পাঠানিস্থান পরিকল্পনাকে বড় ক'রে তোলা হয়, তবে তার ফলে নতুন একটা সীমান্ত-জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হবে এবং সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রে পাকিস্থানের সঙ্গে এই প্রদেশের ঐক্যবদ্ধ হবার সম্ভাবনাও খণ্ডিত হবে।

খান সাহেব সতর্ক ক'রে দিলেন—'যদি আপনারা পাঠান জাতিকে বিনষ্ট করেন, তবে নানারকম ভয়ংকর ঘটনাও দেখা দেবে।'

মাউণ্টব্যাটেন প্রশ্ন করলেন—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হলো না কেন?

খান সাহেব—যদি কংগ্রেস কোয়ালিশন চায়, তবে আমি সেই কোয়ালিশনে কখনই থাকব না।

মাউণ্টব্যাটেন—আমি শুধু একটা তথ্য জানতে চাইছি।

খান সাহেব—আমাদের পাঠানেরা অত্যন্ত গরীব। এখানকার মুসলিম লীগ হলো যত সব বিত্তবান খান সমাজের প্রতিনিধি।

ক্যারো বললেন—কংগ্রেসের পিছনেও বড় বড় ধনী ব্যক্তি রয়েছেন।

প্রদেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থার কথা জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। ক্যারো বললেন—একমাত্র হাজারা ছাড়া আর সব জায়গাতেই মুসলমান জনসাধারণই হিন্দু ও শিখদের রক্ষা করছে। মুসলমানদের মনে ও হৃদয়ে কোন বিকার দেখা দেয়নি।

খান সাহেব—সরকারী কর্মচারীরাই আইনভঙ্গের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেছেন।

ক্যারো প্রতিবাদ ক'রে বললেন—সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সব সময়েই এই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, আজ পর্যন্ত এমন একটিও ঘটনা ঘটেনি, যার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা যায় যে, কর্মচারীরা কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেননি।

শাসনতান্ত্রিক রীতি ও নিয়মের মর্যাদা রক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। প্রধান মন্ত্রীর অভিযোগ এই যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে গভর্নর অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন এবং চাপ দিচ্ছেন। গভর্নরের অভিযোগ এই যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমি এখানে কাজ করবার জন্য এসেছি, কারও কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আসিনি। জনসাধারণ যেভাবে পেতে চাইবেন, সেই-ভাবে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। আমার ধারণা, সবচেয়ে ভাল হতো, যদি এখানে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু সময় বড় কম।

প্রদেশগুলির হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন সাধারণভাবে সকল প্রদেশ এবং বিশেষ ক'রে সীমান্ত প্রদেশের কথা আলোচনা করলেন। বিভিন্ন প্রদেশের হাতে যদি ক্ষমতা অর্পণ করতে হয়, তবে প্রদেশগুলির পক্ষ হতে ক্ষমতা গ্রহণের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি ও প্রস্তুতির জন্য যা করতে হবে, তারই তাৎপর্যের দিকটা আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সাধারণ নির্বাচন করা, নয়, যথোপযুক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা, যার ফলে বর্তমান গভর্নমেণ্টই প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হতে পারবেন। সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে একটি ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাকে বেছে নিতে হবে।

স্থানীয় হিন্দুদের একজন প্রতিনিধি দেখা করতে এলেন। মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন—আমি একটা তথ্য জানবার জন্যই প্রশ্ন করছি। আপনারা কি বর্তমান গভর্নমেণ্টকে পছন্দ করেন?

হিন্দু প্রতিনিধিরা বললেন—আমরা যে-কোন গভর্নমেণ্টকেই স্বীকার করতে রাজি আছি, যদি সেই গভর্নমেণ্টের অধীনে আমরা শান্তিতে বাস করবার সুযোগ পাই।

হিন্দু প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরাও আলোচনা ক'রে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান মন্ত্রিসভার পরিণাম সম্বন্ধে তাঁদের কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা নেই। ভাইসরয়ের কাছে তাঁরা যে অভিযোগ করতে এসেছেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় অথবা লীগ-বিরোধী সমালোচনার তুলনায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার কথাটাই হলো তাঁদের প্রধান বক্তব্য। নিরীহ হিন্দু ও শিখদের প্রাণরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই তাঁরা ব্যবস্থা দাবী করতে এসেছেন।

পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি, মঙ্গলবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : খৈবার গিরিবর্ত্ম দেখবার জন্য এবং জামরুদে এক উপজাতীয় জির্গায় উপস্থিত থাকবার জন্য আধ ডজন মোটরকারের আরোহী হয়ে আজ সকালে আমরা যাত্রা করলাম। লাণ্ডিকোটালে এসেই জির্গার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আফ্রিদি, শিনওয়ারি, মালিকদিন ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর মালিকেরা এই জির্গায় উপস্থিত হয়েছেন। জির্গার প্রধান মুখপাত্র খাঁ আবদুল লতিফ খাঁ পুশতু ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, ক্যারো সে বক্তৃতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে শোনালেন।

লতিফ খাঁর বক্তব্য হলো, ব্রিটিশরা যদি চলেই যান, তবে খৈবার অঞ্চলের অধিকার যেন আবার উপজাতীয়দের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যান। লতিফ খাঁ বললেন যে, যদিও তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন, তবুও তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থন মুসলমান বেরাদারদের পিছনেই থাকবে। বক্তৃতায় লতিফ খাঁ নেহরুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহু উগ্র মন্তব্য করলেন।

জির্গাকে উদ্দেশ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'আপনারা বোধহয় জানেন যে, আমি হলাম একজন নৌ-সৈনিক। উত্তর সাগরে যে যুদ্ধ-জাহাজের সৈনিক হয়ে কাজ করবার গৌরব জীবনে আমি পেয়েছি, সেই যুদ্ধ-জাহাজের নাম ছিল 'আফ্রিদি', আপনাদেরই যুদ্ধ-নিপুণ গোষ্ঠীর নামে সে জাহাজের নাম রাখা হয়েছিল। দূর-দর্শিতা ও বিজ্ঞতার জন্য আপনাদের জির্গার সুনাম আছে। গত ষোল বছর ধরে আপনারা চুক্তির সর্তের প্রতি নিষ্ঠা রেখে চলেছেন। বর্তমানের সঙ্কটপূর্ণ সময়েও, যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে চলেছে, তখন আপনাদের সেই সুনামও যেন আপনারা ক্ষুণ্ণ না করেন।'

বিমানযোগে রাওয়ালপিণ্ডি এসে পেঁাছলাম। পেঁাছনো মাত্র পাঞ্জাব-গভর্নর জেংকিন্স দাঙ্গা-বিধ্বস্ত একটি অঞ্চল দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। জায়গাটার নাম কাহুতা, ছোট একটা শহর, যেন যুদ্ধবিমানের নিক্ষিপ্ত আগুনে-বোমায় বিধ্বস্ত একটা স্থান। মুসলমানদের আক্রমণে শিখদের জীবন এবং জীবিকা উভয়েরই বিনাশ সাধিত হয়েছে। স্থানীয় মুসলমানদের দেখে মনে হলো যে, তারা এই অবস্থাটাকে বেশ সুখের অবস্থা বলে মনে করছে। স্থানীয় শিখ ব্যবসায়ীদের জীবিকার ভিত্তির সঙ্গেই যে স্থানীয় মুসলমানদেরও অর্থনৈতিক উন্নতির একটি ভিত্তি যুক্ত হয়ে রয়েছে, এটা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা স্থানীয় মুসলমানদের আছে বলে মনে হলো না।

স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য শুনলেন মাউণ্টব্যাটেন। দেওয়ান পিনকি দাস সভরওয়াল নামে এক ব্যক্তি পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী এক লিখিত ভাষণে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে গভর্নর জেংকিন্সের বিরুদ্ধেও কতগুলি গুরুতর অভিযোগের কথা উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করলেন। সামনে বসে জেংকিন্সও এই ভাষণ শুনছিলেন ও অপ্রসন্ন হয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন। নানারকমের অদ্ভুত সব তথ্য উল্লেখ করলেন পিনকি দাস। বললেন, তিন হাজার এক শত নিরানব্বই জন অমুসলমানকে জোর ক'রে ধর্মান্তরিত অর্থাৎ মুসলমান করা হয়েছে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী ফিরে এসেছেন। লেডি মাউণ্টব্যাটেন আরও অন্যান্য দাঙ্গা-অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে তারপর ফিরবেন।

রয়টারের ডুন ক্যাম্বেল মাঝরাত্রিতে আমাকে টেলিফোন ক'রে জানালেন যে, জিন্না

ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের দুটি বিবৃতি বের হয়েছে। দুই বিবৃতিরই ভাষা বেশ কড়া। আরও বেশি রাজ্য দাবীর অভিযান জিন্না এইবার আরম্ভই ক'রে দিয়েছেন। জিন্না বলেছেন, 'হ্রস্বীকৃত বিকৃতাঙ্গ ও কীটদষ্ট' একটা পাকিস্থান তিনি গ্রহণ করবেন না। তিনি মুসলমানদের জন্য একটি 'জাতীয় বাসভূমি' দাবী করেছেন। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম—এই কয়টি 'প্রদেশ' সম্পূর্ণভাবে নিয়ে গঠিত যে পাকিস্থান, সেই পাকিস্থানই জিন্নার চাই।

ডাঃ প্রসাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে সর্বপ্রথম যখন পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠার দাবী প্রস্তাবিত হয়, তখন লীগের প্রস্তাবে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ভারতের শুধু মুসলমান-প্রধান 'অঞ্চল'গুলি নিয়ে পাকিস্থান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে।

ডাঃ প্রসাদ কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন। তিনি বর্তমানে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের 'খাদ্য ও কৃষি' মেম্বারের পদে নিযুক্ত রয়েছেন। কয়েকদিন আগে আমি ডাঃ প্রসাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে চা-পান করেছিলাম। ডাঃ প্রসাদের মনের প্রশান্ত ভাব, চিন্তার গভীরতা এবং প্রকৃতির বলিষ্ঠতা আমার বেশ ভাল লেগেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তাঁকে বরং একজন মডারেট ও আপোষপন্থীই বলা যায়। তিনি দেশের সাধারণ মানুষেরই প্রতিনিধি। তাঁর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা কোনরকম বাগ্মিতার উপর নির্ভর করে না। তিনি দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাশীল সেবা ও কর্তব্যের সাধনার দ্বারাই এই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১লা মে, ১৯৪৭ সাল : স্টাফের বৈঠকে আজও আবার কমনওয়েলথ প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। ভারতকে কমনওয়েলথের ভিতরে রাখবার প্রশ্ন। লণ্ডন থেকে আমাদের এরই মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ব্রিটিশ-ভারতকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দেবার পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময় যেন এটা স্মরণে রাখা হয় যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি বর্তমানে ব্রিটিশ-ভারতের অংশ নয়। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা বস্তুত সম্ভবপর নয়।

ব্রিটিশ-ভারতের কমনওয়েলথভুক্তির প্রসঙ্গে অবশ্য মাউণ্টব্যাটেন এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ব্রিটিশ-ভারতের কোন অংশকে কমনওয়েলথে এবং কোন অংশকে কমনওয়েলথের বাইরে থাকতে দেবার পরিকল্পনা তিনি পছন্দ করেন না। কারণ, তার ফলে ব্রিটিশ-ভারতের অংশ নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রকে অপর ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমর্থন করার একটা ঝুঁকি স্বভাবত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপর আরোপিত হবার আশঙ্কা আছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ব্রিটিশ-ভারতের সকল অংশকেই কমনওয়েলথে রাখবার নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে, এবিষয়ে সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত বা অভিমত অবশ্য এখন ঘোষণা করা উচিত হবে না।

ইস্‌মের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, যদি ভারতের মাত্র একটি কোন অংশ কমনওয়েলথে থাকবার প্রস্তাব করে, তবে সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা বস্তুত ব্রিটিশের পক্ষে অসম্ভব। পাকিস্থানের প্রতি কোন মনোভাব অবলম্বনের সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু ক'রে পাকিস্থান পর্যন্ত অবস্থিত সমগ্র মুসলিম ব্লকের সঙ্গে

ব্রিটিশের সম্পর্কের প্রশ্নটাও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। ভারতের একটি অংশ যদি কমনওয়েলথে থাকে, তবে সেই অংশের পিছনে ব্রিটিশের সমর্থন ও সাহায্যের নীতিও থাকবে এবং এই অবস্থাটাই বরং ভারতের দুই অংশের মধ্যে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ নিবারণের একটা উপায় হয়ে উঠতে পারবে। আইয়ান স্কট ইস্‌মের অভিমত সমর্থন করলেন।

আপত্তি করলেন জর্জ অ্যাবেল। তিনি বললেন, শুধু পাকিস্থানকে এককভাবেই কমনওয়েলথে স্থান দেবার অর্থ বস্তুত ব্রিটিশের পক্ষে তাঁদের নৈতিক দায়িত্বকে অতি নিকৃষ্টভাবে পালন করার প্রচেষ্টা।

আমি জর্জ অ্যাবেলেরই অভিমত সমর্থন করলাম। আমি বললাম, ভারতের মাত্র একটি অংশের সঙ্গে যদি গ্রেট ব্রিটেন তাঁদের সমর্থনের ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেন, তবে তার ফলে সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশই বস্তুত বিশ্বের নানা জাতির স্বার্থ অভিসন্ধি ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত হবে।

গত কাল বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোস দিল্লীতে এসেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন খুশিই হয়েছেন। বাংলার গভর্নরগিরির দায়িত্ব নিয়ে পূর্বে যাঁরা কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউসে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বারোসের একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। বারোস পূর্বে রেলওয়ের সার্ভিসে ছিলেন, এবং এখনো তিনি রেলের লোক হিসাবে তাঁর পূর্বতন সার্ভিসের কথা তুলে বেশ গৌরব অনুভব ক'রে থাকেন। তিনি একটা কথা বলে একবার কলকাতারই সকলকে চমকে দিয়েছিলেন—"আমার সঙ্গে বাংলার অন্যান্য প্রাক্তন গভর্নরদের এই পার্থক্য যে, ঐ সব গভর্নর 'হাণ্টিং ও শুটিং' কার্যে অভ্যস্ত ছিলেন এবং আমি হলাম 'শাণ্টিং ও হুটিং' কার্যে অভ্যস্ত।"

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২রা মে, ১৯৪৭ সাল : বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে দিয়েছি, মাউণ্টব্যাটেন শীঘ্রই কয়েকদিনের জন্য সিমলাতে গিয়ে থাকবেন। মাউণ্টব্যাটেন এই কথাও প্রচার ক'রে দিতে বললেন যে, ভারতের সকল পক্ষের প্রতিনিধিদের নেতাদের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের প্রাথমিক আলোচনার পর্ব সমাপ্তও হয়ে গিয়েছে এবং আগামী ৬ই মে তারিখে সাপ্তাহিক কেবিনেট-বৈঠক শেষ হবার পর তিনি সিমলাতে যাবেন, এবং পরবর্তী কেবিনেট-বৈঠকে উপস্থিত থাকবার জন্য যথাসময়েই দিল্লী ফিরে আসবেন।

আমি আজই রাত্রিতে দিল্লী মেলে সিমলা রওনা হয়ে গেলাম।

সিমলা, সোমবার, ৫ই মে, ১৯৪৭ সাল : দিল্লীর ঘটনার খবর এখানে থেকেই পেয়ে যাচ্ছি। মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পরিকল্পনা সঙ্গে নিয়ে ইস্‌মে ও অ্যাবেল গত ২রা মে তারিখেই লণ্ডন রওনা হয়ে গিয়েছেন।

দিল্লীতে ভাইসরয়ের ভবনে ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগে গান্ধী ও জিন্নার সাক্ষাৎ হয়েছে। বিগত তিন বৎসরে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে কোনদিন পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়নি। পরস্পরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন বিনিময়ের পর গান্ধী ও জিন্না দুই চেয়ারে বসলেন। চেয়ার দুটি কাছাকাছি ছিল না। দু'জনেই পরস্পরের নিকট হতে দূরে বসে থাকায় এবং অত্যন্ত অস্পষ্ট ও চাপা স্বরে কথা বলতে থাকায়, তাঁদের আলাপের ব্যাপারটাকে একটা মূক-আলাপের মতই দেখতে লাগছিল। যাই হোক্‌, গান্ধী-জিন্নার এই মুখোমুখি সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর একটি সঙ্কল্প সিদ্ধ ক'রে নিলেন। ব্যবস্থা হলো যে, পরের দিন জিন্নারই ভবনে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে বিস্তারিতভাবে একটা আলোচনা হবে।

সিমলা, মঙ্গলবার, ৬ই মে, ১৯৪৭ সাল : আওরঙ্গজেব রোডে জিন্নার ভবনে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে তিনঘণ্টাকাল আলোচনা হয়েছে। উভয়েরই সম্মতিতে জিন্না এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে আলোচনার ফলাফল সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। বিবৃতিটি এই :

"দু'টি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। একটি বিষয় হলো, ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করার প্রশ্ন। মিঃ গান্ধী ভারতখণ্ডনের নীতি স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে, দেশখণ্ডন অপরিহার্য নয়। অপরপক্ষে আমার মতে, পাকিস্থান শুধু অপরিহার্যই নয়, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পন্থা হলো পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা।

"দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমরা আলোচনা করেছি সেটা হলো শান্তি রক্ষার জন্য প্রচারিত আমাদেরই দু'জনের স্বাক্ষরিত আবেদন। আমরা উভয়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমরা দু'জনেই আমাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে সাধ্যমত সকল চেষ্টাই করতে থাকব, যাতে আমাদের আবেদন কার্যত সফল হয়।"

সিমলা, বুধবার, ৭ই মে, ১৯৪৭ সাল : ভি পি মেননকে সঙ্গে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন সিমলাতে এসেছেন। ১৯৪৫ সালে সিমলাতে অনুষ্ঠিত এবং ১৯৪৬ সালে মন্ত্রি-মিশনের আগমনের পর অনুষ্ঠিত সকল আলোচনার ব্যাপারের সঙ্গে ভি পি মেননও যুক্ত ছিলেন। মাঝখানে যদিও ভি পি মেননের গুরুত্ব ও সমাদর একটু কম হয়ে গিয়েছিল, তবুও এটা ঠিক যে, মেনন এখনও বল্লভভাই প্যাটেলের অন্যতম বিশ্বস্ত সহকারী হয়েই রয়েছেন।

একবার শুধু স্টাফের বৈঠকে, এবং আর একবার মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে স্টাফের বৈঠকে আজ আলোচনা হলো। দুই বৈঠকেই একটা বিকল্প পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হলো। যদি জিন্না মাউণ্টব্যাটেনের রচিত খসড়া পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে কি করতে হবে? ভি পি বললেন যে, জিন্না এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করবেন বলে তিনি একরকম ধরেই নিয়েছেন।

মাউণ্টব্যাটেনও বললেন, জিন্নার পক্ষ থেকে পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা আছে কি না, সেটাও তিনি সর্বদা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। জিন্নার সঙ্গে এবং লিয়াকতের সঙ্গে প্রত্যেক আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন সর্বদা লক্ষ্য রেখেছিলেন যে, তাঁদের কথার মধ্যে প্রত্যাখ্যানের কোন ইঙ্গিত বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সেরকম কোন ইঙ্গিত বা লক্ষণ দেখা যায়নি। মাউণ্টব্যাটেন ইচ্ছা ক'রেই অনেকবার নানা কথার ভিতর দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং তাতে এটাই বুঝা গিয়েছে যে, জিন্না এই পরিকল্পনা মেনে নিতেই ইচ্ছা করেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন যে, যদি জিন্না এই পরিকল্পনায় সম্মত না হন, তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর অসম্মতির মূলে দু'টি সম্ভাব্য কারণের কোন একটি আছেই। একটি হলো, জিন্না এখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখতেই ইচ্ছা করেন। ব্রিটিশেরা এখন ভারতে থেকে গেলে তিনি দরাদরি করার ব্যাপারটাকে আরও বিলম্বিত করতে পারবেন, এবং ফলে ব্রিটিশের পক্ষে ভারত বর্জন করা আরও দুরূহ হয়ে উঠবে। জিন্নার আশা এই যে, তাহ'লে ব্রিটিশের কাছ থেকে তাঁর দাবীর পক্ষে আরও সুবিধাকর কোন ব্যবস্থার একটা নির্দেশক ঘোষণা বা 'অ্যাওয়ার্ড' তিনি আদায় করতে পারবেন। দ্বিতীয়টি হলো, জিন্না যদি বুঝে থাকেন যে, পাকিস্থান রাষ্ট্র স্থাপন করা বা স্থাপিত রাখা কার্যত সম্ভবপর নয়।

কিন্তু জিন্নার চিন্তায় সত্য সত্যই এই ধরনের কোন বিবেচনা বা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবুও তিনি ভি পি'র প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে বললেন যে, জিন্নার দ্বারা বর্তমান খসড়া-পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে বিকল্প একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে।

বিকল্প পরিকল্পনা হিসাবে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, ভারতের বর্তমান গঠনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধনের মধ্যে না গিয়ে বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত কর্তৃত্বগুলির হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করা। এর জন্য ভারতীয় নেতাদের সম্মতিলাভের বা তাঁদের একমত করাবারও কোন প্রয়োজন হবে না। প্রাদেশিক ক্ষমতাবিষয়গুলি বর্তমান প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির অধিকারে এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবিষয়গুলি বর্তমান কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকারে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে, এই মাত্র। কিন্তু এই ব্যবস্থার অর্থ, মুসলমানদের হিন্দুমেজরিটিরই অধীন ক'রে রাখা।

একটি টেলিগ্রামের খসড়াও রচনা করা হলো। সমস্যার, কারণের ও অন্যান্য সম্ভাব্য ঘটনার পরিচয় জানিয়ে এই টেলিগ্রাম লণ্ডনে প্রেরণ করা হবে এবং লণ্ডন কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তাঁরা এইরকম কোন বিকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন করেন কি না।

সিমলা, শনিবার, ১০ই মে, ১৯৪৭ সাল : গতকাল নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন সিমলাতে এসে পৌঁছেছেন। আজ আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে দিলাম যে, আগামী শনিবার, ১৭ই মে তারিখে সকাল সাড়ে দশটার সময় সাক্ষাতের জন্য ভাইসরয় পাঁচজন ভারতীয় নেতাকে এবং বিকালে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করেছেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হলো—'ভারতীয়দের হাতেই ভারতের শাসনক্ষমতা অর্পণের জন্য হিজ্ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্ট যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, সেই পরিকল্পনা নেতাদের কাছে উপস্থিত করা হবে।'

সিমলা, রবিবার, ১১ই মে, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পরিকল্পনা লণ্ডন থেকে সংশোধিত ও অনুমোদিত হয়ে মাউণ্টব্যাটেনের হাতে ফিরে এসেছে। লণ্ডনের দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত এই পরিকল্পনাটিই গত রাত্রে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে একবার পড়ে দেখবার জন্য দিয়েছিলেন। পড়া শেষ ক'রেই নেহরু তীব্র আপত্তি জানিয়ে এই পরিকল্পনাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, মাউণ্টব্যাটেনের রচিত পরিকল্পনার মূল খসড়া ও লণ্ডনের সংশোধিত ও অনুমোদিত এই পরিকল্পনার মধ্যে নীতির দিক দিয়ে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে।

যেমন মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবে, তেমনি মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পরিকল্পনায় স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে একটা 'নতুন' রাষ্ট্র বলে গণ্য না ক'রে রাজনীতিক অর্থে পূর্বের ভারত রাষ্ট্র বলে গণ্য করার নীতি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে নেহরু অবশ্য খুশি হয়েছেন। কিন্তু লণ্ডনের হাতে পড়ে পরিকল্পনার খসড়ায় যে-সব পরিবর্তন হয়েছে, তাতে ভারতকে বস্তুত বল্কানীকরণের মতলবের মতোই একটা মতলবের প্রমাণ নেহরু দেখতে পেয়েছেন। ভারত এবং বর্তমান গণপরিষদই হলো ব্রিটিশ-ভারতের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজ্য ও কর্তৃত্ব, এবং পাকিস্থান ও মুসলিম লীগ হলো ভারত থেকে কতগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ এবং বিচ্ছিন্ন অংশের কর্তৃত্ব, এই নীতি পুরোপুরি স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান নেহরু।

নেহরুর সংশয় মাত্রার একটু বেশি হয়ে পড়েছে বলেই মনে করছি। বৈদেশিকের দ্বারা গঠিত সিভিল-সার্ভিসের আসল আড্ডা লণ্ডনের সম্পর্কে নেহরুর মনে যে-সব পুরনো সন্দেহ ছিল, খসড়া-পরিকল্পনায় এইসব পরিবর্তনের প্রমাণ পেয়ে নেহরুর মনে সেই সন্দেহই আবার নতুন ক'রে জেগে উঠেছে।

আমি আমার প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির কথাই ভাবছিলাম। নেতৃসম্মেলনের দিন ও সময় ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। এখন দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে কি বলব? মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করলাম।

মাউণ্টব্যাটেনকে দেখে মনে হলো, তিনি যেন একটা অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ে অস্বস্তি অনুভব করছেন, কিন্তু তবুও তাঁর অসাধারণ স্থৈর্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হলো না। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, এই হোঁচট তাঁকে আরও বড় বিপদ থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে বলেই তিনি মনে করছেন। তিনি বললেন—"বেশি অগ্রসর হবার আগেভাগেই এই হোঁচট খেয়ে ভালই হয়েছে; তা না হলে ডিকি মাউণ্টব্যাটেনকে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সরে পড়বার জন্যই তৈরী হতে হতো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে আমাদের আস্ত মুর্খের মতো মুখ নিয়ে দাঁড়াতে হতো, কারণ আমরাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এই ধারণা করবার সুযোগ ক'রে দিয়েছি যে, নেহরু ঐ পরিকল্পনা অবশ্যই মেনে নেবেন।"

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করার পর নতুন বিজ্ঞপ্তি রচনা করলাম। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো—"লণ্ডনে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আসন্ন। সেই কারণে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ১৭ই মে তারিখে ভাইসরয়ের যে বৈঠক হবার কথা ছিল, সেই বৈঠক আগামী ২রা জুন তারিখের আগে হবে না।"

সিমলা, সোমবার, ১২ই মে, ১৯৪৭ সাল: মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি এটা বিশ্বাস করেন যে, তাঁর সততা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। কোন পরিকল্পনায় লণ্ডনের হাত দেখতে পেলেই একটা আতঙ্কের ও সন্দেহের ভাব এখানে দেখা দেয়। সুতরাং এইবার নতুন ক'রে যদি কোন খসড়া রচনা করতে হয় তবে সেটা তাঁকে এখানেই শুধু তাঁর স্টাফের সহযোগিতায় রচনা ক'রে ফেলতে হবে।

বাংলাপ্রদেশ হোক, বা অন্য যে-কোন প্রদেশই হোক, কোন প্রদেশের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হবার কোন অধিকার স্বীকৃত হবে না। পরিকল্পনার মধ্যে এই ব্যবস্থার কথা সুস্পষ্টভাবে যুক্ত ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। যদি প্রধান দুই পক্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই প্রদেশের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন হবার অধিকার প্রদানের নীতি দাবী করেন, তবে ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে কোন অসুবিধা ঘটবারও সম্ভাবনা নেই। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, নেহরু নিজে যে পরিকল্পনা পছন্দ করেন সেটা কতকটা আমাদেরই পরিকল্পনার অনুরূপ। নেহরুর ইচ্ছা, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে অবিলম্বে বর্তমান অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ ক'রে দেওয়া হোক।

প্রস্তাবে পরিবর্তন

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৭ সাল : লণ্ডন থেকে আহ্বান এসেছে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মাউণ্টব্যাটেনকে একবার লণ্ডন আসতে হবে। যথোচিত সৌজন্যের সঙ্গেই আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা কড়া নির্দেশের ভাবও ছিল।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই আহ্বানে বিরক্ত হয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। তাঁকে লণ্ডনে ডেকে পাঠাবার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে আপত্তিও করলেন। তাঁর মতে এই সময়ে তাঁকে লণ্ডনে যেতে বলার কোন অর্থ হয় না, কোন প্রয়োজন নেই এবং লণ্ডনে গিয়ে তাঁর কিছু করবারও নেই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এর পর প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন, মাউণ্টব্যাটেন যদি নিতান্তই না আসেন, তবে ভারত সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে একজন অথবা কয়েকজনকে পরামর্শের জন্য লণ্ডনে আসা চাই। এ প্রস্তাব মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আরও খারাপ বোধ হলো। তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। অগত্যা এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন যেতে রাজি হলেন।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৪৭ সাল : ভারতীয় নেতাদের আহ্বান করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা যাঁরা প্রধান এবং বিশিষ্ট, এমন কয়েকজন নেতার সঙ্গে একটি বৈঠকে আলোচনা করবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এক কথায় বলতে পারা যায়, এই বৈঠকের আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং ফলাফলের উপর ভারতের রাজনৈতিক অদৃষ্ট নির্ভর করছে।

যে ক'জন নেতাকে এই ঐতিহাসিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবার জন্য আহ্বান করবেন বলে ঠিক করেছেন মাউণ্টব্যাটেন, তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনীরও থাকা চাই, এই দাবী জানিয়েছেন নেহরু ও প্যাটেল। বৈঠকে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যে অভিমত প্রকাশ করবেন, সেই অভিমত বস্তুত গভর্নমেণ্টের কয়েকজন মন্ত্রীরই অভিমত। কিন্তু কংগ্রেস নামে বিরাট জন-প্রতিষ্ঠানের অভিমত বিশুদ্ধভাবে জানতে হলে এ বৈঠকে কৃপালনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। নেহরু ও প্যাটেল এই যুক্তি দেখিয়েই আমন্ত্রিত নেতাদের নামের তালিকার মধ্যে কৃপালনীর নাম যুক্ত করবার দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের আর একটি যুক্তি হলো, বর্তমানে মুসলিম লীগে জিন্নার যে স্থান, কংগ্রেসে কৃপালনীরও সেই স্থান। উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ সঙ্ঘের সভাপতি। সুতরাং মুসলিম লীগের সভাপতি যদি বৈঠকে আমন্ত্রিত হন, তবে কংগ্রেসের সভাপতিকেও অবশ্যই আমন্ত্রণ করতে হবে।

মাউণ্টব্যাটেন নেহরু-প্যাটেলের এই দাবী তথা প্রস্তাবের উত্তরে যা বলবেন, সেটাও তাঁর ভেবে দেখা হয়ে গেছে। কৃপালনীর বর্তমান রাজনৈতিক মর্যাদার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করছেন, তবুও বৈঠকে কৃপালনীকে উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ জানাতে তিনি পারছেন না। কিন্তু তিনি কৃপালনীকে স্বতন্ত্রভাবে আহ্বান ক'রে আলোচনা করতে রাজি আছেন। হয় বৈঠকের অব্যবহিত পূর্বে, কিংবা বৈঠক সমাপ্তির অব্যবহিত পরে, কৃপালনীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

এ একটা জটিল সমস্যা, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এটা একটা সমস্যাই নয়। উপর থেকে দেখতে খুবই তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হলো সেই ধরনের সমস্যারই একটি নমুনা, যে সমস্যা নানাপ্রকার বিরক্তিকর জটিলতা সৃষ্টি ক'রে অতি সহজেই একটা বড় সঙ্কটের মতো হয়ে উঠতে পারে। কৃপালনীকে যদি আমন্ত্রণ না করা হয়, তবে কংগ্রেস ক্ষুব্ধ হবেন। কংগ্রেস মনে করবেন, এই ধরনের ব্যাপার মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে জিন্নার দাবীর কাছে আর একবার নতি স্বীকার করা। এদিকে কৃপালনীকে যদি আমন্ত্রণ করা হয়, তবে জিন্না আবার যথার্থই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

নতুন ধরনের একটা সম্মতি-পত্রের খসড়া তৈরী করে ফেলেছেন ভি পি মেনন। সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় ও বক্তব্যের তালিকা, সংখ্যায় সব শুদ্ধ আটটি। দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় নেতারা সাহস ক'রে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। এটা বস্তুত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার একটা চেষ্টা। পার্টি যদি ইচ্ছা না করেন, তবে নেতারা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, এই যুক্তির আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাঁরা দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলতে চাইছেন না। নেতাদের এই মনোভাব ও আচরণ সমস্যা সমাধানের পথে যে বাধা সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, মাউণ্টব্যাটেন সেই বাধাকেই এড়িয়ে অন্যভাবে অগ্রসর হবার জন্য এবং বেশ সাহস ক'রেই নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে সম্মত করাবার জন্য একটা নতুন চেষ্টার সূত্র গ্রহণ করলেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আটটি ব্যবস্থার প্রস্তাব উল্লেখ ক'রে নেতাদের স্বাক্ষর লাভের উদ্দেশ্যে নতুন এক সম্মতি-পত্র প্রস্তুত করেছেন মাউণ্টব্যাটেন।

প্রস্তাবের বক্তব্য হলো—অবিলম্বে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' চাই। চূড়ান্ত দাবী হিসাবে নয়, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি ক'রে এবং সে আইনের কিছুটা রদ-বদল ক'রে ভারতে এক বা একাধিক 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদাযুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। যদি একটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ ক'রে দিতে হবে।

প্রস্তাবের আর একটি বক্তব্য হলো—যদি দুইটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দুই ডোমিনিয়নেরই এক গভর্নর-জেনারেল থাকবেন। আর একটি প্রস্তাবে সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করবার নিয়ম ও নীতি উল্লিখিত হয়েছে। যে অঞ্চলের জন-সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে যে সৈন্যদল গঠন করা হয়েছে, সেই অঞ্চলে সেই সৈন্যদলই থাকবে। সৈন্যদলকে আঞ্চলিকভাবেই ভাগ ক'রে দুই বিভিন্ন গভর্নমেণ্টের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবার নীতি গৃহীত হয়েছে। যে সৈন্যদল দুই গভর্নমেণ্টেরই অঞ্চলের লোক নিয়ে গঠিত, সেই মিশ্র সৈন্যদলগুলিকে ভাগ করার ও বণ্টন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি জিন্না ও লিয়াকৎকে দিয়ে এই সম্মতি-পত্রে স্বাক্ষর দান করাতে পারলেন না। সম্পূর্ণভাবে না হোক, আংশিকভাবেও সম্মতি-পত্রে উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ের একটি বর্ণও অনুমোদন ক'রে স্বাক্ষর দান করতে রাজি হলেন না জিন্না ও লিয়াকৎ। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, প্রস্তাবগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ নীতিটি জিন্না ও লিয়াকৎ সমর্থন করেন, কিন্তু এই সমর্থন তাঁরা লিখিতভাবে জানাতে ইচ্ছা করেন না।

ভি পি মেনন বললেন, প্যাটেল এবং নেহরুর প্রধান বক্তব্য হলো, প্রস্তাব যথেষ্ট স্পষ্টতার সঙ্গে সমর্থন ক'রে জিন্নাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, আঞ্চলিক দাবী সম্বন্ধে তিনি তাঁর শেষ কথা বলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর যা বক্তব্য তা এখানেই সমাপ্ত হবে। এর পর নতুন ক'রে আবার আরও কোন অঞ্চলের উপর দাবীর কথা বলতে পারবেন না জিন্না। আঞ্চলিক ভাগ সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে হবে, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা বলে নয়। মাউণ্টব্যাটেনের বিশ্বাস, তিনি কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন, যদি জিন্না একথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেন যে, ব্যক্তিগতভাবে এই প্রস্তাব জিন্না সমর্থন করছেন এবং প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁর নেতৃপদের প্রভাবে ও অধিকারে যা কিছু করা সম্ভবপর তা করবেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি একটি বিষয়ে জিন্নাকে খুব সাবধানে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। নেতারা যদি কোন প্রস্তাবেই একমত না হতে পারেন, তবে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর ভিত্তিতে ভারতের বর্তমান অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের কাছেই শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হবে, এই কথার মধ্যে হুঁশিয়ার ক'রে দেবার যে একটা ইঙ্গিত ছিল, জিন্না সেটা লক্ষ্য করেছেন। এই ইঙ্গিতে জিন্নার মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, মাউণ্টব্যাটেনও সেটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছেন। এই কথা শুনে জিন্না বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হয়েছেন বলে মনে হলো না। উপরে উপরে তিনি একটা প্রশান্ত ভাবই দেখালেন। শুধু এই কথাই বললেন যে, যদি ব্যাপার এরকমই দাঁড়ায় তবে তিনি কোন অবস্থাতেই সেটা বন্ধ করতে পারেন না।

কিন্তু এর পর ঘটনা কোন্ দিকে যাবে, সেটা অনুমান করতে পারছি। এই ব্যাপার এখানেই থামবে না। বরং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রেই জিন্না এবং মাউণ্ট-ব্যাটেনকে নিজ নিজ কূটনীতির ক্ষেত্রে সম্ভবত অবিলম্বে প্রস্তুত হতে হবে মন স্থির ক'রে সুস্পষ্টভাবে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলবার জন্য।

মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছেন, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা শুনে জিন্নার মনের ভিতরের ভাব কি হয়েছে। জিন্নার মনের এই ভাব সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের ভাব নয়, বরং দুশ্চিন্তিত হবার মতোই বিষয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও বুঝা যায় যে, জিন্না যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটা একটা সূক্ষ্ম এবং চতুর বুদ্ধিরও ব্যাপার।

বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা অনেকখানিই হলো। এই চেষ্টায় এগিয়ে যেয়ে আবার পিছিয়ে আসতেও হলো। এর মধ্যে শুধু এই একটি বাস্তব সত্যের প্রমাণ পাওয়া গেল যে, জিন্নার মন অতি কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরী, সহজে বিচলিত হবার বস্তু নয়।

আর একটি বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। কংগ্রেসের দাবীর যূপকাষ্ঠে ব্রিটিশেরা জিন্নাকে বলি দিয়েছেন, কোন ঘটনা থেকে এই রকম কোন প্রমাণ দেখাতে পারলে জিন্না রাজনীতির ক্ষেত্রে কি করতে পারেন, সেটা জিন্না ভাল ক'রেই জানেন। মাউণ্টব্যাটেন বুঝেছেন, জিন্না তাঁর এই শক্তি সম্বন্ধে বেশ সচেতন আছেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই মে, ১৯৪৭ সাল : আজ সকাল সাড়ে আটটার সময় লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন। যাত্রাকালে মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য পালম বিমানক্ষেত্রে বেশ ভিড় হয়েছিল। এর মধ্যে কলভিলও ছিলেন। গভর্নরদের মধ্যে কলভিলই সিনিয়র। মাউণ্টব্যাটেনের অনুপস্থিতির সময় তাঁকেই ভাইসরয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই নিয়ে কলভিলকে চারবার

অস্থায়িভাবে ভাইসরয়ের পদে কাজ করতে হলো। ভি পি মেনন এবং ভের্নকেও সঙ্গে নিয়ে চললেন মাউণ্টব্যাটেন।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২২শে মে, ১৯৪৭ সাল : জিন্না ঠিক সময় বুঝে একটি বোমা ছেড়েছেন। আগের থেকে বেশ ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে নিয়ে এবং প্রস্তুত হয়ে তিনি এই কাজটি করেছেন। আটশত মাইল দীর্ঘ এক করিডর চাই, এই দাবী ক'রে বসেছেন জিন্না। এই হলো জিন্নার বোমা। পূর্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থানকে যুক্ত ক'রে ভারতের উপর দিয়ে আটশত মাইল দীর্ঘ যোজকের মতো এক ভূখণ্ড চাই জিন্নার।

করিডর দাবীর এই ঘোষণাটি জিন্না যেভাবে প্রচারিত করেছেন, তার মধ্যে স্ট্যালিনসুলভ প্রচারকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচারের কায়দায় জিন্না স্ট্যালিনেরই অনুকরণ করেছেন। রয়টারের ডুন ক্যাম্বেলের কাছেই জিন্না সর্বপ্রথম তাঁর এই করিডর তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ডুন ক্যাম্বেল কয়েকদিন পূর্বে জিন্নার কাছে এক প্রশ্নতালিকা রেখে এসেছিলেন। সেই প্রশ্নতালিকার উত্তর দিতে গিয়ে জিন্না যে এমন একটি অভিনব এবং জবর সংবাদ জানিয়ে দেবেন, এটা ডুন ক্যাম্বেলেরও ধারণায় ছিল না। সংবাদ হিসাবে চমকে দেবার মতো এক সংবাদ অভাবিতভাবেই পেয়ে গেলেন ডুন ক্যাম্বেল।

আমি লণ্ডনে টেলিগ্রাম ক'রে আর্স্কিন ক্রামকে (ভের্নকে) জানিয়ে দিলাম—"করিডর দাবীর কথা জিন্নার একটা মুখের কথা মাত্র নয়। ডুন ক্যাম্বেলের প্রশ্নের উত্তরে জিন্না লিখিতভাবেই এই দাবীর কথা জানিয়েছেন।"

রয়টার কর্তৃক এই কাহিনী প্রচারিত হওয়া মাত্র জিন্নার সেক্রেটারি বৈদেশিক সাংবাদিকদের কাছে টেলিফোন ক'রে জিন্নার করিডর দাবীর সংবাদটির উপর বিশেষ নজর দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। বৈদেশিক সাংবাদিকেরাই আমাকে বলেছেন যে, জিন্না নিজের থেকেই তাঁদের কয়েকজনকে সাক্ষাৎ করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন এই বিবৃতিটি দেবার উদ্দেশ্যে। বৈদেশিক সাংবাদিকদের ধারণা, যে কোন একটা অজুহাতে এই বিবৃতি দেবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন জিন্না। এই অবস্থায় জিন্নার সুবিধা ক'রে দিলেন রয়টার। রয়টার যেচে একটা প্রশ্নতালিকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াতেই জিন্না সুবিধা পেয়ে গেলেন। রয়টারের অনুরোধকেই কায়দা ক'রে তাঁর বিবৃতি দেবার একটা সুযোগ হিসাবে তিনি ব্যবহার করলেন।

অবশ্য প্রচারযন্ত্র হিসাবে রয়টারকেই বেছে নেওয়া জিন্নার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তাঁর উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবে রয়টারই উপযুক্ত প্রচারযন্ত্র। যে সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মাউণ্টব্যাটেনকে লণ্ডনে ডেকে নিয়ে পরামর্শ করছেন এবং আলোচনা একটা গুরুতর পর্যায়ে এসে পেঁাছেছে, ঠিক সেই সময় লণ্ডনের উপর সবচেয়ে বেশি চাপ দিতে হলে জিন্নার করিডর তত্ত্ব যেভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত, রয়টারের সাহায্যে তাই হতে পারে। জিন্না জানেন যে, রয়টারের সাহায্যে করিডর কাহিনী প্রচারিত হলে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে সে কাহিনী যতদূর সম্ভব বেশি স্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করবে এবং আলোচিতও হবে।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির লণ্ডন সংবাদদাতারা তাঁদের অজস্র রকমের জল্পনার বিবরণ পাঠিয়ে চলেছেন। জল্পনাগুলির মধ্যে অপরের ইচ্ছায় উৎসাহিত একটা উদ্দেশ্যপ্রবণ প্রচারের সুর আছে। লণ্ডন সংবাদদাতারা ভারতীয় সংবাদপত্রে জানাচ্ছেন—মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আলোচনায় বাধা পড়েছে।

কিন্তু এ জল্পনা নিতান্ত ভিত্তিহীন। আলোচনা বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই চলছে। বরং এ সময় মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং লণ্ডনে উপস্থিত থাকায় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এবং সরকারী মহলের মনের হতাশার ভাব অনেকখানি কেটে গিয়েছে। তাঁদের চেষ্টার পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাগুলিও যেভাবে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে তার মধ্যেও একটা সুসংহতি ফিরে এসেছে। গভর্নমেণ্টের বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গেও মাউণ্টব্যাটেন সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাতের খুবই প্রয়োজন ছিল। বিরোধী দলের সমর্থন না পেলে ক্ষমতা হস্তান্তরের এত বড় ব্যাপার বিলম্বিত হতে পারে, এই আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে স্বাধীনতা বিলটি যদি যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে গৃহীত না হয়, তাহ'লে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং ভারতে উপস্থিত থেকে সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সুতরাং লণ্ডন কর্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত তথ্য জানতে চান, তবে মাউণ্টব্যাটেনের কাছেই জানতে পারবেন। লণ্ডন কর্তৃপক্ষের মনে বাস্তবসঙ্গত কারণেই যেসব দ্বিধা ও সংশয় দেখা দিয়েছে, সেসব দূরীভূত করার প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁদের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার উপরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সমগ্র পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, এ সময় এবং এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনে উপস্থিত থাকায় কতখানি কাজের মত কাজ হতে পারবে।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-পলিসি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব এযাবৎ মিঃ এটলিই সম্পূর্ণভাবে নিজের দায়িত্বে নিয়ে কাজ ক'রে আসছেন। ভারত সম্বন্ধে করণীয় যে কোন ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, এটলি তারও দায়িত্ব নিচ্ছেন। এটলি এইবার তাঁর সহকর্মীদেরও মনে একটি বিষয়ে দায়িত্ববোধ বেশ সাফল্যের সঙ্গে জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এটলির সহ-কর্মীরাও বুঝেছেন যে, কালক্ষেপ না ক'রে এইবার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা সম্পন্ন ক'রে ফেলতে হবে। বিশেষভাবে লর্ড চ্যান্সেলার এবং ইণ্ডিয়া অফিসের উপরেই কাজের চাপ পড়বে সবচেয়ে বেশি ক'রে।

মাউণ্টব্যাটেনের মতে, বর্তমান অবস্থায় 'সময়'ই হলো একটা সমস্যার বিষয়। যথাসময়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে এক একটি ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে সমস্ত পরিকল্পনাই একটা ব্যর্থতায় পরিণত হবে। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই সময়-সমস্যার তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে লর্ড চ্যান্সেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই স্বাধীনতা বিলটিকে পার্লামেণ্টে উত্থাপন করার জন্য তিনি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন।

লর্ড চ্যান্সেলার যে সময়ের মধ্যে বিলের রচনার কাজ শেষ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসেই সেটা এক অভিনব ঘটনার সংবাদ। এত বৃহৎ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল এত অল্প সময়ের মধ্যে রচনা ক'রে পার্লামেণ্টে উপস্থিত করার ব্যাপার অতীতে কখনো হয়নি। এত বড় পরিবর্তন ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিল রচনার দৃষ্টান্তও পৃথিবীর কোন দেশের পার্লামেণ্টারী গভর্নমেণ্টের ইতিহাসে নেই, এর তুলনা এবং নজিরও পাওয়া যায় না। দেশরক্ষার সামরিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে অবশ্য নানারকম দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ইস্‌মে আমাকে আশাজনক এবং উৎসাহিত হবার মতোই সংবাদ পাঠিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন এবং ভি পি মেনন, দু'জনে মিলে 'ডোমিনিয়ন

স্টেটাস'-এর সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা সকলেই আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন ও অনুমোদন করেছেন। ব্যাখ্যাত বিষয়গুলির কয়েকটি অংশ আর একটু স্পষ্ট করা এবং সংশোধন করা মাত্র এখন বাকি আছে।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৪৭ সাল : জিন্নার 'করিডর' দাবীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে যদিও একটু দেরি হয়েছে, কিন্তু দেখা দিয়েছে বেশ ভাল রকমেই। আগুনের গায়ে বাতাস লাগলে যেমন হয়, করিডর প্রসঙ্গ তেমনি ক্রমেই বেশি উত্তপ্ত হয়ে বাদ-প্রতিবাদের ঝড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বিরোধের ভাব ও উত্তেজনা ক্রমেই কত প্রবল হয়ে উঠছে, করিডর-প্রসঙ্গ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের এই হানাহানিতে তারই সমস্ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সুস্পষ্ট একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না ক'রে ফেলতে পারলে এই উত্তেজনা প্রশমিত করা যাবে না। মাউণ্টব্যাটেন এখন রয়েছেন লণ্ডনে, এদিকে নষ্ট হতে চলেছে এমন একটি জিনিস, যা তিনি অনেক পরিশ্রমে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। গত দু' মাস ধরে অক্লান্তভাবে চেষ্টা ক'রে দুই পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণ শুভেচ্ছার ভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁরই এই অল্প-দিনের অনুপস্থিতির মধ্যেই অতি দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আমি ভের্নকে জানিয়েছি : "প্রসাদ এবং দেও (কংগ্রেস সেক্রেটারি) দু'জনেই বেশ জোর দিয়ে এবং খোলাখুলি-ভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন দু'টি বিবৃতিতে। প্রসাদ বলেছেন—জিন্না যা দাবী করেছেন, সেটা এক মুহূর্তের জন্যও বিবেচনা ক'রে দেখবার মতো বস্তু নয়। দেও মনে করেন—ব্রিটিশেরা এখনো জিন্নাকে সাহায্য করতে পারেন, এই বিশ্বাসের মোহে মুগ্ধ হয়ে আছেন জিন্না। তাই ক্রমেই তাঁর দাবীর বহর বাড়িয়ে তুলছেন। যাই হোক, উত্ত্যক্ত ও বিড়ম্বিত ক'রে কাজ হাসিল করার এই সব কূট-কৌশল ও হুমকিতে দেশের লোক ভয় পাবে না। করিডর দাবী কখনই পূরণ করা যেতে পারে না।"

গত শনিবার আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসকে এক 'সাক্ষাৎ' দান করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রগত ভূখণ্ডের অতিরিক্ত কোন ভূখণ্ড দাবী করবার এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জনসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে এই প্রথম তিনি প্রকাশ করলেন। নেহরু বলেছেন—"মিঃ জিন্না সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণভাবে একটা বাস্তবতাবোধহীন বিবৃতি মাত্র। এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, জিন্না কোন রকমেরই একটা মীমাংসার মধ্যে আসতে চান না। করিডর দাবী একটা উদ্ভট ও অপ্রাকৃত দাবী। আমরা যে দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছি, সেটা হলো ভারতের সকল অংশ নিয়ে সম্মিলিতভাবে এক 'ভারত ইউনিয়ন' গঠনের দাবী এবং সেই সঙ্গে এই নীতিতেও আমরা স্বীকৃত হয়েছি যে, যদি বিশেষ কোন অংশ 'ভারত ইউনিয়নের' বাইরে থাকতে চায় তবে সেই অংশকে বাইরে থাকবার অধিকার দেওয়া হবে। কোন অংশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে ভারত ইউনিয়নের ভিতরে ধরে রাখার চেষ্টা হবে না। যদি এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রে এবং অতিরিক্ত ভূখণ্ড পাওয়ার জন্যে দাবীর মাত্রা না বাড়িয়ে, জিন্না আমাদের সঙ্গে একটা সঙ্গত মীমাংসায় না আসতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভারত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার ও সেই গঠনতন্ত্র কার্যে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে যেতে থাকব।"

নেহরুর অন্যান্য উক্তি থেকেও বুঝতে পারছি যে, তাঁর মনোভাব ক্রমেই দৃঢ় ও কঠিন হয়ে উঠছে। মিয়েভিলকে নেহরু একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি অগত্যা ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই বিকল্প প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর দাবী উত্থাপন করবার জন্য

তৈরী হয়েছেন। দুই পক্ষের মধ্যে কোন মীমাংসা না হলে একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করার প্রস্তাব। মীমাংসার জন্য সম্মতি-সূত্রের যে খসড়া রচনা এবং ঘোষণা করেছেন মাউণ্টব্যাটেন, জিন্না সেই ঘোষণার প্রধান প্রধান বিষয়, বক্তব্য ও প্রস্তাবের সবগুলিই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিকল্প ব্যবস্থাটি দাবী করতে তিনি বাধ্য। নেহরু চাইছেন, একটা সাময়িক চুক্তির দ্বারা বর্তমান (কেন্দ্রীয়) অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকেই ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্ট হিসাবে গণ্য ক'রে নিতে হবে। জিন্না কখনই কোন ব্যবস্থায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না। নেহরু এই অভিযোগও করেছেন যে, জিন্নার রীতি হলো ক্রমেই দাবীর বহর বাড়িয়ে তোলা। যে দাবী আদায় করা গেল, সেটা গ্রহণ ক'রে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নতুন ক'রে এবং আরও বেশি ক'রে দাবী করা—এই হলো জিন্নার পন্থা। নেহরু বলেছেন, শুধু এক পক্ষ থেকেই প্রতিশ্রুতি দেবার ব্যাপার আর চলতে পারে না।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৭শে মে, ১৯৪৭ সাল : বাংলার গভর্নর বারোস এক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কলকাতার অবস্থা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। এই কারণে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছেন বারোস। রিপোর্ট পাঠাবার দু'-এক দিন আগে তিনি আরও ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছেন, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কলকাতার উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বে যে ধারণা তিনি করেছিলেন, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি সাংঘাতিক এবং ভয়াবহ বলেই বুঝতে পারছেন। কলকাতার এই উত্তেজনার ভাব প্রশমিত করার জন্য বারোস বেতারে একটি ভাষণ দিতে ইচ্ছা করছেন। তারই জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের সম্মতি চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন বারোস। সংবাদটি হলো নেহরুর একটি উক্তি। নেহরু বলেছেন যে, আগামী ২রা জুন থেকে সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোন নিষ্পত্তি হবে বলে তিনি তেমন কোন আশা পোষণ করছেন না।

নেহরু সত্যিই এরকম কোন উক্তি করেছেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আমি সঠিক তথ্য জানবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি, সংবাদটা নিতান্তই ভিত্তিহীন। এ সংবাদ বিশ্বাস করার মতো কোন প্রমাণই পাইনি। এতেই বোঝা যায় যে, চারদিকের অবস্থা কতখানি এলোমেলো হয়ে উঠেছে। এরিক ব্রিটার আমাকে বলেছেন যে, এরই মধ্যে কলকাতা শহরের মুসলমান ও হিন্দু মারামারি করার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছে। শহরের বিভিন্ন বাড়ি এবং রাস্তাগুলি এক একটি ঘাঁটিতে পরিণত ক'রে দুই সম্প্রদায়ই সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নয়াদিল্লী, ৩১শে মে, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী ফিরে এসেছেন এবং আসা মাত্রই তিনি আলোচনার জন্য তাঁর স্টাফের সকলকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ হলো সপ্তাহের শেষ দিন এবং শেষ দিনটিই সমাপ্ত হতে মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা বাকি আছে, তার পরেই সেই নেতৃবৈঠক, যে বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপর ভারতের অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

মাউণ্টব্যাটেন আজ দু'বার স্টাফের বৈঠক আহ্বান করেছেন। দুই বৈঠকেই অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। প্রথম বৈঠকে কর্নভিল উপস্থিত ছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের মানসিক এবং কায়িক পরিশ্রম করবার শক্তি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সুদূর লণ্ডন থেকে আকাশ-পথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর সবেমাত্র দিল্লী এসে পৌঁছেছেন,

তবুও দেখে মনে হয় না যে, তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হয়েছেন। লণ্ডনে কয়েকদিন ধরে অতি দুরূহ এবং রাজনৈতিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ নানা বিষয়ের আলোচনায় বস্তুত তাঁকে বিরামহীনভাবেই ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে, তবু তাঁর কিছুমাত্র মানসিক ক্লান্তি নেই। বরং দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর কাজের উৎসাহ যেন আরও স্ফূর্তি লাভ করেছে। স্টাফকে একের পর এক নানারকম কাজের নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগলেন মাউণ্টব্যাটেন।

সম্প্রতি গান্ধী তাঁর প্রাত্যহিক প্রার্থনাসভার ভাষণে যেসব কথা বলেছেন, মাউণ্টব্যাটেন সেই সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তিনি বুঝেছেন, গান্ধীজীর এই মন্তব্য-গুলি শোনবার পর তাঁর পক্ষে শুধু চুপ ক'রে থাকা উচিত হবে না। কিছু একটা করতে হবে।

প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধী সম্প্রতি যা বলেছেন, তাতে বোঝা গিয়েছে যে, গান্ধী ভারত-খণ্ডন অনুমোদন করতে পারছেন না। ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে গান্ধী যেভাবে তাঁর বক্তব্য ঘোষণা করছেন, তার মধ্যে এইরকম একটা অভিমতের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয় যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মিশনের প্রস্তাবকেই ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়াই এখন সমাধানের একমাত্র পন্থা। কলভিল এবং মেনন দু'জনেই অবশ্য বলেছেন যে, তাঁদের বিশ্বাস, গান্ধীজী ভারত-খণ্ডনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে এমন কিছু করবেন না, যার ফলে খণ্ডনের পরিকল্পনাই সমূহভাবে বিনষ্ট হতে বাধ্য হবে।

জিন্নার সঙ্গে আচরণে কি মনোভাব নিয়ে চলতে হবে, সে সম্বন্ধেও মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ধারণা এখন স্পষ্ট ক'রে নিয়েছেন। জিন্নার 'করিডর' দাবীতে মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে কি রকম বিড়ম্বিত ও বিব্রত বোধ করছেন, সেই কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন যে, আর রাগ ক'রে নয়, বরং দুঃখের সঙ্গেই জিন্নাকে 'স্বীকার' ক'রে নিয়ে তাঁকে প্রত্যেক কাজে ও আলোচনায় এবার অগ্রসর হতে হবে।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য লণ্ডন থেকেই একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যেটা তিনি জিন্নার বিরোধিতার বিরুদ্ধে সময় বুঝে এবং প্রয়োজন বুঝে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারবেন। অস্ত্রটি হলো জিন্নার কাছে লেখা চার্চিলের একখানি চিঠি। চিঠিতে জিন্নার উদ্দেশে চার্চিলের একটি অত্যন্ত অর্থগূঢ় অনুরোধ-বাণী উল্লিখিত আছে। চার্চিল জিন্নাকে জানিয়েছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব সমর্থন ও গ্রহণ করা জিন্নার পক্ষে এখন বস্তুত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের মতোই ব্যাপার।

২রা জুনের নেতৃসম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন। সম্মুখে উপবিষ্ট বলদেব সিং, কৃপালনী, প্যাটেল, নেহরু, জিন্না, লিয়াকৎ ও নিস্তার। পিছনে মিয়েভিল

সর্বসমর্থন

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১লা জুন, ১৯৪৭ সাল : আজ আমি আমার মা'য়ের কাছে একটি চিঠিতে এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখেছি :

"আসন্ন এক বিরাট ঘটনার জন্য আমরা এখানে প্রতীক্ষায় রয়েছি। আর দু'দিন পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ঘোষণা করবেন মাউণ্টব্যাটেন। এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। দেশখণ্ডনের প্রস্তাবই যে ঘোষিত এবং গৃহীত হবে, সেটা একরকমের অবধারিত বলেই মনে করতে পারি। এ প্রস্তাবের ফলে সাম্প্রদায়িক অশান্তিও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিতে পারে। কিন্তু বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বেশি কাম্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতের এই রোষ ও উত্তেজনা এখন সম্পূর্ণভাবেই তার ঘরোয়া ব্যাপার, ভ্রাতৃঘাতী হিংসার প্রকোপে ভারত আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। এখন ব্রিটিশের প্রতি ভারতের দুই পক্ষেরই কোন আক্রোশ নেই। হিন্দু ও মুসলমান, দুই সম্প্রদায়ের কাছে ব্রিটিশ আজ যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, অতীতে কোন কালেই ততটা জনপ্রিয়তা ব্রিটিশেরা লাভ করেনি।

"ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণার একটি ফল এই হয়েছে যে, কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের মনোভাবে মস্ত একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দেশখণ্ডন অপরিহার্য, এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, এবং এই সত্য স্বীকার ক'রে নিতে তাঁরা সম্মতও হয়েছেন। সম্মত হচ্ছেন না গান্ধী। দেশখণ্ডন অপরিহার্য বলে তিনি স্বীকার করতে রাজি নন, এবং এমন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতি প্রবল এক অভিযানও তিনি অন্তরাল হতে চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই অভিযান কতদূর পর্যন্ত তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, সেটা বলা দুঃসাধ্য, কারণ সেটা বুঝে ওঠাও দুষ্কর।

"নেহরু ও প্যাটেল, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের দুই কংগ্রেসী প্রধান, দেশখণ্ডনের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন। তাঁরা মনে করেন, পাকিস্থান স্থাপিত হলে জিন্নার মুখ আর দেখতে হবে না। নিকটে থাকার সুযোগ আছে বলেই জিন্না শুধু উপদ্রব এবং গ্লানি সৃষ্টি ক'রে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছেন। সুতরাং, জিন্নাকে দূরে সরে যেতে দিলে এই উপদ্রবের সম্ভাবনাকেই দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে। 'মাথা কেটে দিলে মাথাব্যথার পীড়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে'—এইরকম উক্তিও নেহরু করেছেন বলে শুনেছি। কিন্তু নেহরু ও প্যাটেলের এই ধরনের অভিমত শুনে মনে হয় যে, তাঁরা একটু বেশি আশা ক'রে ফেলেছেন। কারণ, জিন্না হলেন সেই ধরনের মানুষ, খেতে পেলে যাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, বরং ক্ষুধা আরও বেড়ে যায়। আট শত মাইল করিডর দাবী ক'রে জিন্না দেখিয়ে দিয়েছেন যে, একটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পাওয়ার জন্য জিন্না কিভাবে তাঁর দাবী বাড়িয়ে তুলবার কৌশলে অভ্যস্ত। যাই হোক্, দু'পক্ষই যদিও প্রস্তাবের সমর্থন জানাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, কিন্তু সমর্থনের রীতিটা আদৌ সুষ্ঠু নয়। সমর্থনের মধ্যেও দু'পক্ষের রূঢ়তা অত্যন্ত অশোভন ভাবে ফুটে উঠছে। দেশখণ্ডন একটা শোচনীয় এবং দুঃখকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে বেশি শোচনীয় এবং সাংঘাতিক

পরিণাম দেখা দেবে, যদি দশ কোটি মুসলমানের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে একটা ঐক্য চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।"

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২রা জুন, ১৯৪৭ সাল : সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি এসে গিয়েছে। অতিবৃহৎ এবং পরিণামবহুল একটি ঘটনার লগ্নকাল।

নেতাদের নিয়ে বৃহৎ আকারের এক একটি মার্কিনী মোটরকার নর্থ কোর্টে এসে একে একে প্রবেশ করছে। আমি বসে আছি ভাইসরয়ের পাঠকক্ষে। নতুন ক'রে রং লাগিয়ে কক্ষের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাঢ় রং তুলে দিয়ে ফিকে সবুজ বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠকক্ষটি আকারে ছোট। বেশ একটা অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশ আছে কক্ষটির মধ্যে। কাউন্সিল চেম্বার কিংবা তার পাশেরই অভ্যর্থনাকক্ষগুলির তুলনায় এই ক্ষুদ্র পাঠকক্ষটির পরিবেশের মধ্যে কেতাদুরস্ত লৌকিকতার ভাব খুবই কম। কক্ষে ঢুকবার আগে প্রবেশপথে যে হলঘর পড়ে, তারই দেয়ালে টাঙানো ক্লাইভের রঙীন প্রতিকৃতি ভারতে ব্রিটিশরাজের এই অনাড়ম্বর অন্তিমের দিকে যেন নীরবে তাকিয়ে রয়েছে।

সবার শেষে এলেন জিন্না এবং আসতে কয়েক মিনিট দেরিও করেছেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন প্রথমেই খোশগল্প ও সাধারণ ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে নেতাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আলাপ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, উপস্থিত নেতাদের মনের চারদিক ঘিরে যে ভাবনার পরিবেশ রয়েছে, তার মধ্যে বিদ্যুতের জ্বালা লুকিয়ে আছে। যাই হোক্, এইরকম পরিবেশের মধ্যেই নেতৃ-বৈঠক আরম্ভ হলো। কৃপালনীও এসেছেন। কৃপালনীকে আহ্বান করার সমস্যা মিটে গিয়েছে। নিস্তারকেও এই বৈঠকে আমন্ত্রণ ক'রে জিন্নার মরজি রক্ষা করা হয়েছে। নিস্তারকে আমন্ত্রণ করায় কৃপালনীকে আমন্ত্রণ করার বিরুদ্ধে জিন্না তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন।

নেতৃ-বৈঠকের আলোচনা মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। ভের্নেনের কাছে শুনলাম, বৈঠকে অধিকাংশ সময় মাউণ্টব্যাটেনই কথা বলেছেন। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করলেন। সমগ্র ঘটনার গতি-প্রকৃতি ও পরিণামের সকল দিক তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝালেন। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্যের আরম্ভেই নেতাদের প্রতি এই আবেদন জানালেন যে, যে বৃহৎ পরিবর্তন নেতারাই আহ্বান করছেন সেই পরিবর্তনের সম্মুখীন হবার মতো যোগ্যতা নিয়েই নেতাদের দাঁড়াতে হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, জীবনে তাঁকে এমন বহু বৈঠকে উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগদান করতে হয়েছে, যে বৈঠকের সিদ্ধান্তে মহাযুদ্ধের পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ এখন তিনি যে বৈঠকে বসে আলোচনা করছেন, সেই বৈঠকের ঐতিহাসিক গুরুত্বের তুলনা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন, এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত পৃথিবীর ভবিষ্যতের ইতিহাসকেও যেভাবে প্রভাবিত করবে, অতীতের কোন রাজনৈতিক বৈঠকের সিদ্ধান্তে কখনো তা হয়নি।

নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, বলদেব সিং, জিন্না, লিয়াকৎ ও নিস্তার—নেতৃবৈঠকে ভারতের সপ্তপ্রধান উপস্থিত হয়েছেন। নেতাদের কাছে মাউণ্টব্যাটেন আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন একটা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে সব কাজ সেরে দিতে চাইছেন, একথা সত্য নয়। যাঁরই সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের

প্রত্যেকেই মাউণ্টব্যাটেনকে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল ব্যবস্থা এবং উদ্যোগ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পন্ন ক'রে ফেলা উচিত। প্রত্যেকেই বর্তমানের এই নিশ্চয়তাহীন অবস্থার দ্রুত অবসান দেখতে চান। সুতরাং যত শীঘ্র ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে ফেলা যায়, সকলের পক্ষে ততই কল্যাণের বিষয়।

মাউণ্টব্যাটেন প্রথমে মন্ত্রিসভা মিশনের পুরাতন প্রস্তাবকেই নেতাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। ঐ প্রস্তাবে নেতাদের সম্মত করাবার জন্য আর একবার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু পূর্বপ্রত্যাখ্যাত ও নিষ্প্রাণ সেই প্রস্তাবকে সজীব ক'রে তোলবার এই চেষ্টাই শেষ চেষ্টায় পরিণত হলো। জিন্নাও শেষবারের মতো সেই প্রস্তাবকে সুস্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন। মন্ত্রিসভা মিশনের প্রস্তাব এখানেই সমাধি লাভ করল।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ভারত-খণ্ডন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব। দেশখণ্ডনের পদ্ধতি সম্পর্কেই দু'পক্ষের মতভেদ যে ধাঁধার মতো একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে, মাউণ্টব্যাটেন সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস ভারত-খণ্ডনের নীতিতে সম্মত হতে পারেননি। কিন্তু কংগ্রেস প্রদেশ-খণ্ডনের প্রস্তাবে আপত্তি করেননি। কংগ্রেসের বক্তব্য হলো, কোন প্রদেশের হিন্দুপ্রধান বা মুসলমানপ্রধান অংশবিশেষকে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে কোন ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করার নীতি কংগ্রেস সমর্থন করেন না। কোন অংশের অধিকাংশ অধিবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করবার ব্যবস্থা পরিহার করার জন্যই কংগ্রেস প্রদেশ-খণ্ডনে রাজি হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কিন্তু জিন্না প্রদেশ-খণ্ডনে আপত্তি করেছেন। জিন্নার দাবী হলো ভারত-খণ্ডন।

ব্রিটেনের গভর্নমেণ্টবিরোধী রাজনৈতিক দলও দেশখণ্ডনের প্রস্তাবের পক্ষে যে সমর্থন জানিয়েছেন, মাউণ্টব্যাটেন সে বিষয়ও উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাঁর এই প্রস্তাব সম্পর্কে ('দেশ-খণ্ডন ও ক্ষমতা হস্তান্তর') ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তাঁরা এই প্রস্তাবকে তাঁদের দলীয় দ্বন্দ্বের একটা বিষয় হয়ে উঠতে দেননি। প্রসঙ্গক্রমে মাউণ্টব্যাটেন শিখসমাজের কথাও বললেন। দেশখণ্ডনের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থায় শিখদের যে অবস্থায় পড়তে হবে, সেটা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে, সেকথাও তিনি বললেন।

কোন কোন মহল থেকে এই দাবী করা হয়েছে যে, কলকাতা সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, কলকাতাকে 'অবাধ বন্দরে' (যে বন্দরে পণ্যসামগ্রী আমদানী করলে কোন শুল্ক দিতে হয় না) পরিণত করা উচিত কি না, এবিষয়ে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার এই প্রস্তাব সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিলেন—এ প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য নয়। কলকাতাকে 'অবাধ বন্দরে' পরিণত করার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে দেওয়া হলো।

এইবার মাউণ্টব্যাটেন উত্থাপন করলেন তাঁর প্রস্তাবের নতুন একটি অনুচ্ছেদ (২০ অনুচ্ছেদ)। 'অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর'—এই শিরোনামা দিয়ে যে সব ব্যবস্থা ও নীতির কথা এই নতুন অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে তার তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। এই প্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর বিষয়টিও আলোচনা করলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারত 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদা লাভ করবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করবার এই ব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের একটা ভিত্তি ভারতে রাখতে ইচ্ছা করছেন। 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দেবার পিছনে ব্রিটিশের এইরকম কোন উদ্দেশ্য নেই। যে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছেন, সেই দায়িত্বের ভার সাফল্যের সঙ্গে উপযুক্ত হস্তে অর্পণ করার জন্যই যথাযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সুতরাং একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি ব্রিটিশ সাহায্যের প্রয়োজন এখনো আছে বলে বোধ হয়ে থাকে, তবে সে সাহায্য দানের একটা সম্পর্ক-সূত্র অকালে ছিন্ন ক'রে দেওয়া উচিত হবে না।

এর আগে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় জিন্না এমন একটি মন্তব্য কয়েকবার করেছিলেন, যা শুনে মাউণ্টব্যাটেনকে বিস্ময়ে চমকে উঠতে হয়েছিল। জিন্না বলেছিলেন, কোন প্রস্তাবে 'সম্মত হওয়া' এবং প্রস্তাবকে 'সমর্থন করা' একই ব্যাপার নয়। জিন্না বলেছিলেন, কোন প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছেন অর্থ এই নয় যে, তিনি ঐ প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। আজকের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নারই ঐ তর্কতত্ত্বটিকে সুবিধামতো কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্রস্তাবের এক একটি কপি উপস্থিত নেতাদের হাতে দেবার পর মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, নেতারা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন, এতটা তিনি আশা করেন না। এতটা আশা করার অর্থ বস্তুত এই দাঁড়ায় যে, নেতাদের তিনি নিজের নিজের বিবেকের বিরোধী হতে বলছেন। মাউণ্টব্যাটেন শুধু এইটুকুই চাইছেন যে, নেতারা শান্তচিত্তে এই প্রস্তাব মাত্র সমর্থন করবেন।

নেহরু জানতে চাইলেন, সম্মত হওয়া এবং সমর্থন করার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? দুটি শব্দের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাগত পার্থক্যের আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করলেন নেহরু।

মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। কোন প্রস্তাবে কেউ সম্মত হলে এই বুঝায় যে, প্রস্তাবে যথার্থ এবং সঙ্গত নীতি অনুসারে বিবিধ ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—কিন্তু যে প্রস্তাব তিনি আজ উত্থাপন করছেন, সে প্রস্তাবে এমন অনেক ব্যবস্থার কথা আছে যা দু'পক্ষেরই নীতিতে বাধে। কোন কোন ব্যবস্থা মুসলিম লীগের নীতির বিরোধী হয়েছে। কোন কোন ব্যবস্থা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী হয়েছে। এই অবস্থায় এবং এমন প্রস্তাবে দুই পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে 'সম্মত হতে' তিনি বলতে পারেন না। তাই মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন যে, দুই পক্ষই এ প্রস্তাবকে শুধু সমর্থন করবেন। প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ এই যে, এই প্রস্তাবকে দেশের ভালোর জন্যই একটা সঙ্গত ও আন্তরিক মীমাংসার প্রচেষ্টা বলে নেতারা বিশ্বাস করছেন।

এরপর নেহরু জানালেন, যদিও কংগ্রেস এই প্রস্তাবে কখনই সম্পূর্ণভাবে সম্মত হতে পারেন না, তবুও প্রস্তাবের ভাল-মন্দ তুলনা ক'রে কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন।

নিস্তার এই দ্বিমুখী তর্কতত্ত্বকে একেবারে সমান ক'রে দিয়ে বললেন, প্রস্তাবকে সমর্থন করার অর্থ বস্তুত এই দাঁড়ায় যে, প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করার জন্যও সম্মত হওয়া গিয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেনও খুশি হয়ে এই ব্যাখ্যায় সম্মত হলেন এবং সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলেন যে, প্রধান যুদ্ধে তাঁর জয়লাভও হয়ে গিয়েছে।

জিন্না এইবার এক নতুন তত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন যে, এই প্রস্তাব সমর্থন করার দায়িত্ব তিনি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না।

যিনি কায়েদে আজম আখ্যা গ্রহণ করেছেন, যাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তই বস্তুত দলের সিদ্ধান্ত, সেই সর্বশক্তিমান নেতা এই প্রস্তাব সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যক্তিগত-ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না! কেন পারছেন না, সেই তত্ত্বই তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন।

জিন্না বললেন, তিনি প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তবুও, তাঁর এই ব্যক্তিগত ধারণার জোরেই তিনি প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন না।

জিন্না বললেন, এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে সমর্থন করার আসল ক্ষমতার ও দায়িত্বের মালিক যাঁরা, সেই মুসলিম জনসাধারণের কাছেই গিয়ে তাঁর এবং তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির আগে জেনে আসা চাই, প্রস্তাব সমর্থন করা যায় কি না।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এমন এক একটা সময় এবং প্রয়োজন আসে, যখন প্রধান নেতাকে অনুগামীদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেও ব্যক্তিগত দায়িত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলতে হয়। পরে দল এবং অনুগামীদের বুঝিয়ে সম্মত করানো যাবে, এই বিশ্বাস নিয়েই প্রধান নেতা ব্যক্তিগত দায়িত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই রীতিও যথার্থই গণতন্ত্রসম্মত নীতি।

এযাবৎ এবং এতবার ক'রে যিনি শুধু 'না' বলে বলেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, সেই জিন্না শেষ পর্যন্ত এমন একটি উক্তি করলেন, যেটা প্রায় 'হাঁ' বলার কাছাকাছি একটা মনোভাবের প্রকাশ। জিন্না বললেন, তিনি তাঁর প্রকৃত 'প্রভুদের' কাছে অর্থাৎ মুসলিম জনসাধারণের কাছে তাঁর বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হবেন, মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবকে বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। মুসলিম জন-সাধারণ যাতে প্রস্তাব সমর্থন করে, তারই জন্য তাদের বুঝিয়ে রাজি করাবার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই তিনি মুসলিম জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হবেন। জিন্না বললেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিশ্রুতি মাত্র দিতে পারেন যে, তাঁর দল যাতে এ-প্রস্তাব সমর্থন করে, তার জন্য তিনি তাঁর যতদূর সাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি তাঁর নিজের বিবেচনা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী পন্থায় তাঁর সম্প্রদায়কে এ প্রস্তাবের পক্ষে আনবার চেষ্টা করবেন।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন দাবী করলেন—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ সমাজ, প্রস্তাব সম্পর্কে এই তিন দলের প্রত্যেকের মনোভাব লিখিতভাবে আজ মধ্যরাত্রের আগেই তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে। কৃপালনী এবং বলদেব সিং জানালেন যে, তাঁরা সন্ধ্যার আগেই তাঁদের মনোভাব ও অভিমত উল্লেখ ক'রে মাউণ্টব্যাটেনকে চিঠি পাঠিয়ে দেবেন।

জিন্না বললেন, তিনি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত লিখিতভাবে জানাতে পারবেন না। তবে কথা দিলেন যে, তিনি স্বয়ং এসে মাউণ্টব্যাটেনকে মৌখিকভাবে

তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য জানিয়ে যাবেন। জিন্নার এই প্রতিশ্রুতিতেই সন্তুষ্ট হলেন মাউণ্টব্যাটেন।

এক অতি দুরূহ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। এ সাফল্যের রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যখন তাঁর আর একটি অনুরোধ রক্ষা করতে নেতারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। মাউণ্টব্যাটেন জানালেন যে, আগামী কাল সন্ধ্যার সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র থেকে তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে এই প্রস্তাবের কথা ও প্রস্তাবে নেতাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করবেন। মাউণ্টব্যাটেন অনুরোধ করলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেহরু, জিন্না এবং বলদেব সিংকেও বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে তাঁদের সমর্থনের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘোষণা করতে হবে। মাউণ্টব্যাটেন একথাও জানিয়ে দিলেন যে, কাল সকাল বেলাতেই তিনি তাঁর বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি নেতাদের দেখতে দেবেন।

প্যাটেল এতক্ষণ ধরে প্রায় চুপ ক'রেই বসেছিলেন। আলোচনার সময় খুব কম কথাই তিনি বলেছেন। বেতার-ঘোষণার এই ব্যবস্থার কথা শোনার পর তিনি বাঁকা-হাসির সঙ্গে বললেন—সাধারণ নিয়ম হলো, বেতার-বক্তৃতার সব পাণ্ডুলিপি প্রচারের আগে সংবাদ-প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে উপস্থিত করতে হবে। [প্যাটেলই হলেন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।]

জিন্না হাসিহীন মুখেই উত্তর দিলেন, তাঁর মনের কথা তিনি স্পষ্ট ক'রেই এবং অবাধভাবে বেতার-বক্তৃতায় বলবেন।

আলোচনায় নেতৃত্ব করবার যে প্রতিভা এবং বক্তব্য ব্যাখ্যা করার যে কৃতিত্বের প্রমাণ আজকের এই বৈঠকে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন, তার তুলনা বিরল। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে তিন বছর ধরে প্রায় প্রতিদিনের আহূত আলোচনার বৈঠকে সভাপতিত্ব ক'রে মাউণ্টব্যাটেন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে যে কোন দুরূহ আলোচনা পরিচালনা করার এক বিস্ময়কর দক্ষতা মাউণ্টব্যাটেনের প্রায় স্বভাবগত হয়ে গিয়েছে। ভের্নন আমাকে বলেছেন, তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে এতটা সতর্ক হয়ে আলোচনা করতে কখনো দেখেননি। আলোচনাকে কোনক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে কোন অবান্তর প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত হতে তিনি দেননি। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিবেচ্য এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র আলোচনাকে ধরে রেখেছিলেন। যে মানসিক পরিবেশের মধ্যে বৈঠক আরম্ভ হয়েছিল, সেটা ভিতরে ভিতরে বিরোধের উত্তাপে বেশ তপ্ত হয়েই ছিল। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের আরম্ভিক বক্তৃতাতেই এই বিষন্ন পরিবেশ বদলে গেল। এই প্রস্তাব ও প্রস্তাব রচনার সকল উদ্যোগের পিছনে যে আন্তরিক শুভেচ্ছার ভাব এবং যুক্তিগত নিষ্ঠা রক্ষার যে নম্র মনোভাব আছে, সেটা অচিরেই নেতারা অনুভব করতে পেরেছিলেন। সাফল্য লাভ করতেই হবে, মাউণ্টব্যাটেনের এই সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরই জয় হয়েছে। জিন্নার মতো মানুষেরও শুকনো রীতিগত নানা প্রশ্নের বাধা এবং কঠিন অনমনীয়তা মাউণ্টব্যাটেনের এই সদিচ্ছাশক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারেনি।

আর একটি কাজের কথা আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। বৈঠক সমাপ্ত হবার পর, জিন্না চলে যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে সেই কথা জানালেন। বৈঠক শেষ হয়েছে, নেতারা চলে যাচ্ছেন, কিন্তু জিন্নাকে আরও কিছুক্ষণ থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে বললেন—আমি আজ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। গান্ধী

কখনো কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আসেন না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবেই আমাকে দেখা করতে হবে। এই ব্যাপার দেখে মুসলিম লীগ সম্ভবত বিরুদ্ধ সমালোচনা করবেন। কিন্তু আপনি যদি এখন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে এবং স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা ক'রে যান, তবে গান্ধীর সঙ্গে আমার স্বতন্ত্র সাক্ষাতের বিরুদ্ধে লীগের পক্ষ থেকে সমালোচনা করবার কোন যুক্তি থাকবে না।

মাউণ্টব্যাটেন জানালেন, আর একটি বিষয়েও সুবিধা হবে। লীগকে কোন কাজে ও প্রস্তাবে সম্মত করাবার ব্যাপারে জিন্না তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব আরও বেশি ক'রে প্রয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে যে মনোভাব জিন্না শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করবেন, সেটাও সুস্পষ্টভাবে বিচার ক'রে দেখা জিন্নার পক্ষে সহজ হবে।

সব কথা শুনলেন জিন্না, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। সুতরাং মধ্যরাত্রে এইখানে ফিরে এসে যে বার্তা জানিয়ে যাবেন জিন্না, তারই উপর ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বেলা সাড়ে বারটার সময় মহাত্মা এলেন। আজকের সকালের নেতৃ-বৈঠকে মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু বৈঠকের আলোচনায় তিনি অন্যভাবে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত কংগ্রেস-নেতাদের মনের মধ্যে ছিলেন গান্ধী। দেশখণ্ডনের এই প্রস্তাব শুনে শেষ পর্যন্ত মহাত্মা কি মনোভাব গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস-নেতাদের মনে নানা ধারণার দ্বন্দ্ব চলছিল। কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর সম্ভাব্য অভিমত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা করতে না পারায় কংগ্রেস-নেতারা আলোচনায় তেমন ক'রে উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারছিলেন না এবং কোন অভিমত প্রকাশ করতে মনে মনে একটা কুণ্ঠাও অনুভব করছিলেন। গান্ধী তাঁর অন্তরের বাণী থেকে কর্তব্যের প্রেরণা লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর অন্তরের বাণী কি হবে, সেটাও অনুমান করা অসাধ্য। কংগ্রেস-নেতারা গান্ধীর আচরণের এই বাস্তব সত্যটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। শুধু কংগ্রেস-নেতারা নয়, সর্বত্রই এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গান্ধী তাঁর দুর্বোধ্য বিবেকের ইঙ্গিতে দেশখণ্ডনের এই উদ্যোগ শেষবারের মতো একেবারে চূর্ণ ক'রে দেবার জন্য তাঁর চেষ্টাকে চরমে নিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হবেন না। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন মনের ভিতর যথেষ্ট শঙ্কা নিয়েই গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

গান্ধীজী কতকগুলি পুরনো ও ব্যবহৃত খামের টুকরো সম্মুখে রেখে বসেছিলেন। প্রথমেই একটি খামের টুকরোর উপর লিখে গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন—আজ তাঁর মৌন দিবস।

একথা জানা মাত্র মাউণ্টব্যাটেনের শঙ্কাকুণ্ঠিত মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, গান্ধীর বক্তব্যের সম্মুখীন আজ আর হতে হবে না। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর এই আকস্মিক সৌভাগ্য দেখে কতখানি বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাও কল্পনা করা যায়।

নীরব সাক্ষাৎ সমাপ্ত হলো। কাগজের টুকরোগুলি মাউণ্টব্যাটেন কুড়িয়ে জমা করলেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন, তিনি আজ পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন-বস্তু সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে এই কাগজের টুকরোগুলিই ঐতিহাসিক মহত্ত্বে তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশি মূল্যবান। কাগজের টুকরোগুলিতে মহাত্মা লিখে দিয়ে গিয়েছেন : "আজ আমি কথা বলতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আমি এই সোমবারের মৌনব্রত গ্রহণের আগে ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, কি ধরনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এই ব্রত ভঙ্গ করতে আমি দ্বিধা করব না।

যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হয়, এবং যদি কোন রোগীর সেবাকার্যের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে আমি ব্রত ভঙ্গ ক'রে কথা বলব, এই সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু আমি বুঝেছি, আজ আমি আমার মৌনব্রত ভঙ্গ করি, এটা আপনি চান না। জিজ্ঞাসা করছি, আমি আমার বক্তৃতাগুলিতে আপনার বিরুদ্ধে কি একটিও কথা বলেছি? যদি আপনি বুঝে থাকেন যে, আপনার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিনি, তবে আপনার আশঙ্কা নিরর্থক। দু'-একটি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই আপনার কাছে কিছু বলতে হবে। তবে আজ নয়। যদি আবার আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়, তবে এবং সেই সময়ে বলব।"

নীরব আলোচনা! দেখতে অদ্ভুত লাগে! কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যেই একটি জিনিস দেখলাম। একজন শক্তিমান মানুষ তাঁর প্রবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও কিভাবে নিজেকে মুছে ফেলতে পারেন। শক্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস বর্জন করার ও নিজেকে সংযত করার কি মহৎ দৃষ্টান্ত!

সকাল বেলার নেতৃ-বৈঠক শেষ হবার পর এবং নেতারা চলে যাবার পর, সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি যখন বৈঠকের কক্ষে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন আমিও সেখানে একটি নিদর্শন-বস্তু কুড়িয়ে পেলাম। একটি ছোট গোলাকার টেবিলের উপর এই বস্তুটি পড়েছিল।

বস্তুটি আর কিছুই নয়, একটি কাগজের উপর জিন্নার হাতের আঁকা একটি হিজিবিজি। আলোচনার সময় অন্যমনস্কভাবে কাগজের টুকরোর উপর জিন্না কলম দিয়ে এই হিজিবিজি এঁকেছিলেন। আমি মনোবিজ্ঞানী নই, তবুও বলতে পারি, জিন্না তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় জয়লাভের মুহূর্তে যে হিজিবিজি ছবিটি এঁকে ফেলেছেন, তার ভিতর জিন্নারই অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবিটি দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে জিন্নার শক্তির দর্প এবং আত্মশ্লাঘার একটি প্রতীক-ছবি ফুটে উঠেছে।

বিকাল চারটের সময় আমাদের স্টাফের বৈঠক হলো। 'দেশখণ্ডনে প্রশাসন-ব্যবস্থার পরিণাম'—এই শিরোনামা দিয়ে রচিত নিবন্ধটি স্টাফের বৈঠকে আগাগোড়া পাঠ করা হলো। ত্রিশটি ফুলস্কেপ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই নিবন্ধটির অধিকাংশই জন ক্রাইস্টির রচনা, যথেষ্ট মনীষার সঙ্গে পরিবেশিত বিবিধ তথ্যনির্দেশ ও প্রস্তাবের একটি দলিল। ভবিষ্যতের মানুষ কখনো এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমরা ভারতের প্রশাসন-ব্যবস্থার ক্ষতি ক'রে দিয়ে তবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। এই নিবন্ধই ভারতের প্রশাসন-ব্যবস্থার সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রাখবার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। দেশ খণ্ডিত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হতে চলেছে। ডোমিনিয়ন মর্যাদাযুক্ত দুটি নতুন রাষ্ট্র। তবুও, এই বৃহৎ পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রশাসন-ব্যবস্থার যেন কোন হানি না হয় এবং সে ব্যবস্থা যাতে পূর্ববৎ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তারই উপায় এই পরিকল্পনায় বর্ণিত হয়েছে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৩রা জুন, ১৯৪৭ সাল : ভোর হবার অল্পক্ষণ পরেই স্টাফের বৈঠকে আমরা উপস্থিত হলাম। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কাল রাত্রে জিন্না এসেছিলেন। মধ্যরাত্রিতে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার যে নাটকীয় সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে, তারই কাহিনী মাউণ্টব্যাটেনের মুখে শুনলাম।

জিন্না মধ্যরাত্রিতে এসে জানালেন যে, প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন অভিমত তিনি
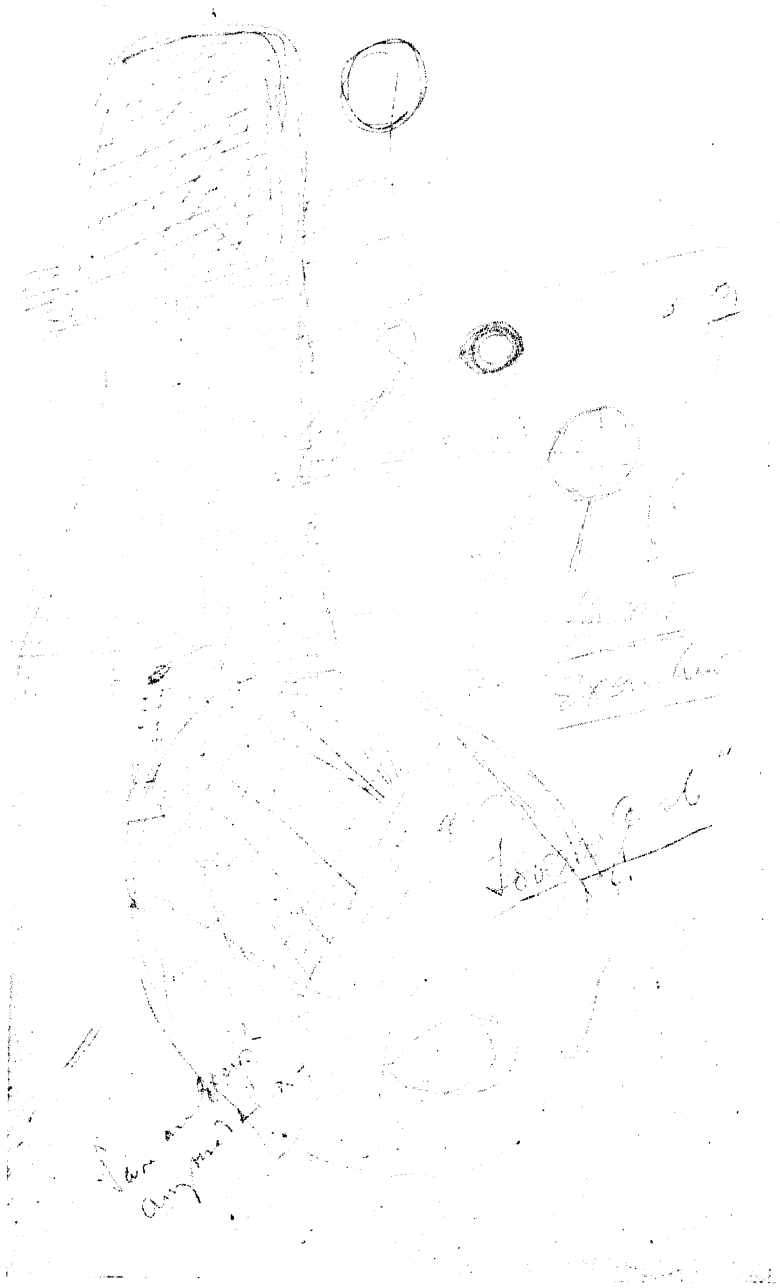
জিন্নার নিজের হাতে আঁকা সেই ঐতিহাসিক হিজিবিজি

লিখিতভাবে জানাতে পারবেন না। লিখে জানাবার অনুরোধ তিনি সোজাসুজি এবং সুস্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন। জিন্না শুধু মৌখিকভাবে তাঁর বক্তব্য বলতে রাজি হলেন। এই অবস্থায় ইস্‌মেকে সেখানে উপস্থিত হতে হলো। জিন্না মাউণ্ট-ব্যাটেনকে যেসব কথা বললেন, তার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে ইস্‌মে রইলেন।

গতকাল সকাল বেলার নেতৃ-বৈঠকে জিন্না যেসব কথা বলেছিলেন, সেই কথারই পুনরুক্তি ক'রে এবং ধুয়া টেনে জিন্না তাঁর বক্তব্য বলে চললেন। মুসলিম লীগের কাউন্সিল তাঁদের আগামী বৈঠকে এই প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করবেন, জিন্না এই রকম কোন কথা দিতে সম্মত হলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের বহু অনুরোধ ও যুক্তির চাপেও কোন ফল হলো না। জিন্না শুধু এইটুকু করতে রাজি হলেন যে, তিনি লীগ কাউন্সিলকে বুঝিয়ে প্রস্তাব সমর্থনে রাজি করাবার জন্য তাঁর যতদূর সাধ্য চেষ্টা করবেন এবং তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি যাতে তাঁর পক্ষে থাকেন, সেই চেষ্টাও করবেন। জিন্না বললেন, লীগ কাউন্সিলকে রাজি করাবার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র অনুসারে তাঁর পক্ষে যতটা চেষ্টা করা সম্ভবপর, তিনি ততটা চেষ্টাই করবেন।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জিন্নার এই বিশেষ ধরনের কূটপদ্ধতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের মন ভয়ানকভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে রয়েছে। কংগ্রেস জানে, জিন্না সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরনের কূটপদ্ধতিটি প্রয়োগ ক'রে চলছেন। কোন প্রস্তাব সম্পর্কে যখনই দুই পক্ষের একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই দেখা গিয়েছে যে, জিন্না শুধু কালক্ষেপ করছেন, যতদিন না কংগ্রেস একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলেন। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকাই হলো জিন্নার রীতি। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর জিন্না চিন্তা করতে থাকেন, মুসলিম লীগ কাউন্সিলকে দিয়ে কোন্ এবং কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করালে তাঁর সুবিধা হবে এবং কয়েকদিন পরে লীগ কাউন্সিল জিন্নারই উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে থাকেন। কংগ্রেস লক্ষ্য করেছেন, জিন্না বরাবর এই ধরনের কূটপন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে একটু বুঝেসুঝে চলবার জন্যেই আর একটি কথা জানিয়ে দিলেন। নেহরু, কৃপালনী ও প্যাটেল তাঁদের একটি অবিচল সংকল্পের কথা একেবারে পরিষ্কার ক'রেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, কংগ্রেস যে সময়ে প্রস্তাব সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, ঠিক সেই সময়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগকেও প্রস্তাব সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে, পরে করব বললে চলবে না। তাছাড়া কংগ্রেস আরও দাবী করেছেন যে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবেই এই প্রস্তাবকে লীগ সমর্থন করবেন। এর যদি অন্যথা করেন লীগ, তবে কংগ্রেস সমগ্র প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করবেন।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন যত কথা এবং যা-ই বলুন না কেন, জিন্নার মনে তার কোন আবেদন হতে দেখা গেল না। বিচলিত হলেন না জিন্না। বরং তিনি আবার সেই পুরনো যুক্তির আড়ালে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করলেন। জিন্না বললেন, মুসলিম লীগের পূর্ণ সম্মতি না নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্মতি গ্রহণ করার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার তাঁর নেই। আরও জানিয়ে দিলেন জিন্না, মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক তাড়াতাড়ি আহ্বান করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না, কিছুদিন দেরি হবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'এই যদি আপনার মনোভাব হয়, তবে আগামী সকাল

বেলার নেতৃ-বৈঠকে কংগ্রেসের এবং শিখ সমাজের নেতারাও প্রস্তাবকে চূড়ান্তভাবে সমর্থন ক'রে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে রাজি হবেন না। সমর্থনের প্রস্তাব তাঁরাও প্রত্যাখ্যান করবেন। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, সারা দেশে অরাজক অবস্থা ও অশান্তি দেখা দেবে এবং সম্ভবত চিরকালের মতো আপনার পাকিস্থানকে আপনি হারাবেন।'

জিন্না তাঁর ঘাড়টাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রত্যুত্তরে শুধু বললেন—যা অবশ্যই হবে তা অবশ্যই হবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—"শুনুন মিঃ জিন্না, একটা নিষ্পত্তি করবার জন্য এই যে এত চেষ্টা, পরিশ্রম ও কাজ এতদিন ধরে হলো, সেসব আপনার জন্য ব্যর্থ হয়ে যেতে দেব না। ব্যর্থ করবার সুযোগও আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যখন মুসলিম লীগের হয়ে কোন কথাই দিতে রাজি হচ্ছেন না, তখন আমি নিজেই মুসলিম লীগের পক্ষ নিয়ে কথা বলব। আমি এইবার ঘোষণা করব যে, আপনার কাছ থেকে আমি যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এই কথা বলার ফলাফলের সব ঝুঁকি ও দায়িত্ব আমি নিজের উপরেই নিলাম। যদি লীগ কাউন্সিল আপনার ব্যক্তিগত সম্মতির কথা সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তবে আপনি সমস্ত দোষ আমার উপর চাপিয়ে আমাকেই এ ব্যাপারের জন্য দায়ী করতে পারবেন।"

এর পর মাউণ্টব্যাটেন বললেন—"কিন্তু আমার একটি সর্তে আপনাকে এখুনি রাজি হতে হবে মিঃ জিন্না। কাল নেতৃ-বৈঠকে আমি সকলের সমক্ষে এই কথা ঘোষণা করব যে, 'মিঃ জিন্না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি সেই প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়েছি এবং প্রতিশ্রুতি আমার ইচ্ছা ও কাজের পক্ষে সন্তোষজনক হয়েছে।' আপনি আমার এই উক্তির কোনরকম প্রতিবাদ করতে পারবেন না। আমি এই উক্তি ক'রেই আপনার দিকে একবার তাকাব এবং আপনি সমর্থন জানাবার ভঙ্গীতে শুধু একবার ঘাড় নাড়বেন।"

এই প্রস্তাবেও মুখ খুলে কথা বলে কোন স্বীকৃতি জানালেন না জিন্না। মাউণ্টব্যাটেনের সর্তের কথা শুনে নীরবে একবার শুধু ঘাড় নাড়লেন।

মাউণ্টব্যাটেন এইবার তাঁর শেষ প্রশ্নটির উত্তর জিন্নার কাছে জানতে চাইলেন : "মিঃ জিন্না কি মনে করেন, এইবার এটলিকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আগামীকালই যেন এটলি সরকারীভাবে প্রস্তাব ঘোষণা করেন?"

জিন্না উত্তরে বললেন—হ্যাঁ।

জিন্নার এই শেষ কথার মধ্যেই যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া গেল, তার থেকেই মাউণ্টব্যাটেন এবং ইস্‌মে দু'জনেই বুঝতে পারলেন যে, জিন্নার কাছ থেকে যতখানি সমর্থন আদায় করা সম্ভবপর তা এতক্ষণে জিন্নার মন নিংড়ে বের করা গিয়েছে। আর এক সপ্তাহ পরে জিন্না মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান করবেন। তার আগে জিন্নার কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি যতখানি পাওয়া সম্ভবপর তাই পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

জিন্না চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই কৃপালনীর চিঠি এসে পৌঁছলো। কৃপালনীর চিঠির মর্মার্থ হলো, প্রস্তাবে উল্লিখিত কতগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ে কংগ্রেসের অবশ্যই আপত্তি করবার মতো কিছু কিছু আছে এবং সে বিষয়ে কংগ্রেসের শেষ বক্তব্য বলাও বাকি রইল। কিন্তু এ সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকলেই প্রস্তাবটিকে সাধারণভাবে অথচ সুস্পষ্টভাবেই সমর্থন করছেন।

আজ সকালেই ভাইসরয় ভবনে আবার নেতৃ-বৈঠক হলো। আলোচনার সূত্রপাত করলেন মাউণ্টব্যাটেন। গত রাত্রে জিন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, জিন্নার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া এবং যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে চলেছেন, সবই উল্লেখ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। গত রাত্রের অঙ্গীকার অনুযায়ী জিন্নাও যথাসঙ্গত ভঙ্গীতে নীরবে ঘাড় নেড়ে মাউণ্টব্যাটেনের কথা সমর্থন করলেন।

তিন দলই (কংগ্রেস, শিখ ও মুসলিম লীগ) প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ যেসব অংশের বিরুদ্ধে জোর আপত্তি করেছেন, সে বিষয়েও উল্লেখ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'আপনারা যে আপনাদের আপত্তির বিষয়গুলি খোলাখুলি এবং পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত ক'রে দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা যেখানে এসে পেঁাছেছে এবং অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তার পরিচয়ও মাউণ্টব্যাটেন যথেষ্ট পরিমাণেই পেয়ে গিয়েছেন। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা তাঁর আছে বলেই মাউণ্টব্যাটেন এই আপত্তির বিষয়গুলিকে এ বৈঠকে আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে চাইলেন না। তিনি জানেন, কোন পক্ষই অপর পক্ষের আপত্তির বিষয়গুলিকে আমল দিতে রাজি হবেন না এবং কোন পক্ষই অপর পক্ষের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারবেন না। প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থাগত নির্দেশগুলির সম্পর্কে তিন দলের বিভিন্ন রকমের আপত্তি ও মতভেদ এ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। এর জন্য ভিন্নভাবে কোন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন হবে, যেখানে আপত্তির বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও বিবেচনা হতে পারবে। এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাবার জন্য অনুরোধ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেতারা সম্মতি জানালেন।

এইভাবেই নেতারা বস্তুত স্বেচ্ছায় এবং সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই এমন একটি ব্যবস্থায় রাজি হয়ে গেলেন, যার ফলে এই বৈঠকে বাদ-প্রতিবাদ সৃষ্টি করাবার মতো আর কোন যথার্থ আলোচ্য বিষয় রইল না।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমার ধারণা, বিভিন্ন দলের নেতাদের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবে যতখানি সম্মতি পাওয়া সম্ভবপর, সেটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমার এই প্রস্তাবের (ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা) পক্ষে এইবার আমি পেয়ে গিয়েছি।

জিন্না, কৃপালনী এবং বলদেব সিং তিনজনেই উত্তরে জানালেন যে, ভাইসরয় ঠিক ধারণাই করেছেন। নেতারাও এই অভিমত পোষণ করেন এবং ভাইসরয়ের অনুমানও নির্ভুল হয়েছে।

এরপর মাউণ্টব্যাটেন জানালেন—প্রস্তাব এইবার সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

নেতাদের মধ্যে কেউই মাউণ্টব্যাটেনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করলেন না।

এই পর্যন্ত যা দেখা গেল, তাতে মনে হতে পারে যে, এরপর থেকে সব কাজ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এবং অবাধে এগিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এ ধারণা যে কতখানি ভুল, তা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

মাউণ্টব্যাটেন এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, এবার থেকে অতীতকে অতীতের বিস্মৃতির মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে ভবিষ্যতের জন্যই শুভেচ্ছার ভাব নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। অতীতের ঘটনা স্মরণে রেখে তিক্ততার জের টেনে চলা আর উচিত হবে না। ভবিষ্যৎকেই সুন্দর ক'রে গড়ে তোলার পথ মুক্ত করতে হবে। সেই

কারণেই এবার থেকে দেশের উপ-নেতাদের পক্ষে কথায় ও মনোভাবে সংযম রক্ষা ক'রে চলা বাঞ্ছনীয়।

মাউণ্টব্যাটেনের আবেদন শোনামাত্র লিয়াকৎ একটি উক্তি করলেন। বোঝা গেল, এই কথাটি বলবার জন্যই লিয়াকৎ প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং এ প্রলোভন আর সংবরণ করতে পারলেন না। লিয়াকৎ হঠাৎ বলে উঠলেন—কথায় ও মনোভাবে সংযম অবলম্বন করা উপ-নেতাদের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে অতি-নেতাদের পক্ষে, যথা মিঃ গান্ধী।

মিঃ লিয়াকতের মতে, গান্ধী তাঁর প্রাত্যহিক প্রার্থনাসভার ভাষণে আজকাল অসংযত উক্তি করছেন।

বৈঠকের পরিবেশ এতক্ষণ শান্ত ছিল। কিন্তু লিয়াকতের উক্তি হঠাৎ সেই পুরাতন তিক্ততাকেই খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলল। দু'পক্ষের উষ্মার দ্বন্দ্বে তিক্ত হয়ে উঠল পরিবেশ।

জিন্না এবং লিয়াকৎ দু'জনেই তাঁদের কথায় এই ইঙ্গিত করলেন যে, গান্ধী জনসাধারণকে উত্তেজিত ক'রে তুলছেন। গান্ধী জনসাধারণকে শেখাচ্ছেন যে, এই বৈঠকে যেসব নেতা যোগদান করেছেন, তাঁদের উপর যেন কেউ নির্ভর না করে। জনসাধারণ যেন এবার থেকে অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান করে।

কৃপালনী প্রত্যুত্তরে স্মরণ করিয়ে দিলেন—গান্ধী যাই বলুন, তাঁর সকল কাজ ও চেষ্টা অহিংসার নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই চালিত হয়।

প্যাটেল বললেন—এটা বলতে পারি যে, এখানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, গান্ধী নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য রক্ষা ক'রে চলবেন।

মাউণ্টব্যাটেন এই বিপজ্জনক আলোচনাকে এখানেই থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে দু'পক্ষেরই মনের কথা বেশ ভালভাবেই ব্যক্ত করা হয়ে গিয়েছে। আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, একথা মেনে নিতে হবে যে, নেতা হিসাবে গান্ধীজীকে সাধারণ নেতাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর বিশেষ একটি স্থান আছে, গান্ধীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার এই বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না।

লীগ-নেতাদের উদ্দেশ ক'রে এই কথা বলে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমি বিশ্বাস করি, কংগ্রেস-নেতারাও অপর পক্ষের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন ক'রে দেখবেন।

মাউণ্টব্যাটেন হঠাৎ একটি বস্তু হাতে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথার উপর তুলে ধরলেন, তারপরেই ধপ্ ক'রে টেবিলের উপর ফেললেন। একটি দলিল—'দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম'।

চম্‌কে উঠলেন নেতারা। তাঁরা সম্ভবত এই দুরূহ বাস্তবটিকে এত তাড়াতাড়ি দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফুলস্কেপ আকারের ত্রিশটি পৃষ্ঠায় ঠাসা টাইপ করা দলিল। আজকের বৈঠকেই দলিলটি নেতাদের সম্মুখে পেশ করবেন বলে মাউণ্টব্যাটেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। বহুবিস্তৃত তথ্যকে কত অল্প পরিসরের মধ্যে বিবৃত করা যায়, তারই এক অসাধারণ কৃতিত্বের উদাহরণ এই দলিলটি, মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে পরিচালিত স্টাফের প্রতিভার সৃষ্টি।

'দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম'কে চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়ে নেতারা এতক্ষণে যেন এক রূঢ় বাস্তবের মূর্তি দেখতে পেলেন। নেতারা শুধু একটা রাজনৈতিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্ত কি বৃহৎ দায়িত্ব ডেকে আনছে, সে সম্বন্ধে নেতাদের সচেতন হবার মুহূর্তটিও এসে গিয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন যে, এই দলিলটি দেখে নেতারা প্রথমেই যেভাবে আঁৎকে উঠেছিলেন, তা দেখে একটু আমোদ উপভোগ করাই যেত, যদি বাস্তব অবস্থাটা অন্যরকমের হতো। প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্বন্ধে নেতাদের মনে শোচনীয়রকমের একটা ঔদাসীন্য ছিল। এদিকটার কথা তাঁদের একবার মনেও পড়েনি। এরকম একটা শোচনীয় ঔদাসীন্যের সমস্যা না থাকলে, নেতাদের মুখের ভাব দেখে একটু আমোদ অনুভব করাই সম্ভবপর হতো।

আরম্ভ হলো আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, এ আলোচনায় কোন ফল হবে না। কোন নেতা হয়তো অসাবধানে হঠাৎ একটা অবান্তর কথা বলে বসলেন এবং সেই সামান্য কথাটা নিয়েই বাদানুবাদ তুমুল হয়ে উঠল। কথায় কথায় এবং তর্কে তর্কে ক্ষুদ্র একটা উ'ইঢিবিকে পর্বতপ্রমাণ ক'রে তোলা হতে লাগল।

মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন—এই দলিল এখানে নিতান্ত প্রাথমিকভাবেই আলোচিত হতে পারে। এর পর এই দলিল বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে।

লিয়াকৎ এবং জিন্না উভয়েই নানা যুক্তি তুলে আপত্তি করলেন—এ দলিল মন্ত্রি-সভার কাছে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা যেতে পারে না। এখানকার প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্যা বিচার ও বিবেচনা ক'রে কোন সিদ্ধান্ত করবার এবং নির্দেশ দান করবার কর্তৃত্বাধিকার মন্ত্রিসভার নেই।

জিন্না এবং লিয়াকৎ কোন্ দেশের মন্ত্রিসভার কথা বলছেন, সেটা বুঝতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। মাউণ্টব্যাটেন ভারতীয় মন্ত্রিসভারই (অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট) কথা বলেছিলেন। কিন্তু জিন্না ও লিয়াকৎ ধারণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কথা বলা হয়েছে। জিন্নাকে যখন তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হলো, তখন তিনি অভিযোগের সুরে বললেন যে, তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে। জিন্না বললেন—"বলুন যে, ভাইসরয়ের শাসন পরিষদের কাছে বিবেচনার জন্য এই দলিল পেশ করা হবে। কোদালকে কোদালই বলা উচিত।"

জিন্না বললেন, নিয়মতন্ত্রসম্মত শব্দ ব্যবহার না করলে তিনি কোন উক্তির অর্থ বুঝে উঠতে পারেন না। কোন বিষয় চিন্তার সময় তিনি শব্দের নিয়মতন্ত্রসম্মত অর্থটিই অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর বক্তব্য নিরূপণ ক'রে থাকেন।

'দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম' শিরোনামা দিয়ে রচিত এই দলিলে একটি 'বিভাগ কমিটি' গঠনের নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। যাবতীয় বিষয় ভাগ ক'রে দুই রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণ করবার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। সকল দলের প্রতিনিধি নিয়েই এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

লিয়াকৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বিভাগ কমিটিতে সকল প্রস্তাব, প্রশ্ন ও মতভেদের বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত কি ভোটাধিক্যের দ্বারাই নিরূপিত হবে?

মাউণ্টব্যাটেন উত্তর দিলেন—না। শুধু ভোটের জোরেই কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা হবে না। প্রত্যেক ব্যবস্থা যেন সঙ্গত ব্যবস্থা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক প্রস্তাব আলোচিত হবে।

মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, এতদিনে যখন দেশখণ্ডন সম্বন্ধে মতভেদের চূড়ান্ত

মীমাংসা হয়ে যেতে পেরেছে, তখন অন্যান্য সকল আলোচনায় এবার থেকে একটা নতুন উৎসাহ ও আগ্রহের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হোক্।

লিয়াকৎ তীক্ষ্ণস্বরেই প্রত্যুত্তর দিলেন—এর মধ্যে নতুন উৎসাহ ও আগ্রহের কোন প্রশ্ন আসে না। সৈন্যবাহিনী ভাগ করার দুরূহ প্রশ্নটি নিয়ে দু'পক্ষের যথেষ্ট মতভেদ আছে।

মতভেদের কথা এইভাবে বড় ক'রে তোলা সত্ত্বেও আলোচনা তীব্রতর হয়ে উঠল না। বরং আলোচনার প্রকৃতি হঠাৎ এবং অভাবিতভাবেই মৃদুতর ও শান্ততর হয়ে এল। সকল পক্ষই সম্মত হলেন যে, সৈন্যবাহিনী ভাগ করা হবে সৈনিকদের নাগরিক পরিচয় অনুসারে। যে সৈন্যদলের দেশ যে রাষ্ট্রে পড়বে, সেই সৈন্যদল সেই রাষ্ট্রেরই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে। নাগরিক পরিচয় অনুসারে সৈন্যদল ভাগ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সৈনিকের বাসভূমির ভৌগোলিক পরিচয়ও বিবেচনা করার নীতি স্বীকার করতে হবে। নেতারা স্বীকার করলেন—তাই হবে।

জিন্না বেশ জোর দিয়েই বললেন—পাকিস্থানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন পার্থক্য না করাই তাঁর ইচ্ছা। পাকিস্থানে যারা বাস করবে, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে তারা সকলেই পাকিস্থানে পূর্ণ নাগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত অধিবাসীর মর্যাদা লাভ করবে।

এইবার শুরু হলো দেশীয় রাজ্যগুলির পালা। বিকেল চারটের সময় কাউন্সিল ভবনে 'দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটি'র সদস্যেরা সম্মিলিত হলেন। আজ রাত্রেই প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে, এবং নেতারাও প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের সম্মতি ঘোষণা ক'রে বক্তৃতা করবেন। মাউণ্টব্যাটেন ও নেতারা যে সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন, তারই ইতিবৃত্ত দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটির সদস্যদের জানাতে হবে, প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষিত হবার পূর্বেই। সম্মেলনের কাজ আরম্ভের আগে একটি সার্কাসের ফিল্ম-ছবি প্রদর্শিত হলো। কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একটা সহজ ও সরল বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আরম্ভ করার ইচ্ছা করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং সেই দিক থেকে এই ছবির সার্কাসের হাল্‌কা আমোদ কিছুটা সাহায্যই করল।

দীর্ঘ বৃত্তায়ত আকারের এক টেবিলের চারদিকে বসেছেন ভারতীয় রাজন্য সমাজের শিরোমণিগণ, হিজ্-হাইনেসবৃন্দ। ভোপাল, পাতিয়ালা, দুঙ্গাপুর, নবনগর ও বিলাসপুর। তা ছাড়া, বিখ্যাত দেওয়ানবৃন্দও রয়েছেন—হায়দরাবাদের স্যার মির্জা ইসমাইল, বরোদার স্যার বি এল মিত্র, মহীশূরের স্যার রামস্বামী মুদালিয়র, কাশ্মীরের কাক, গোয়ালিয়রের শ্রীনিবাসন্, ত্রিবাঙ্কুরের স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, জয়পুরের স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী এবং বিকানীরের পানিক্কর। আরও দু'জন রয়েছেন, নরেন্দ্রমণ্ডলের প্রতিনিধি হিসাবে স্যার সুলতান আহমদ এবং সর্দার ডি কে সেন।

এটা বিশেষভাবেই চোখে পড়ে, ব্রিটিশ ভারতের জনসমাজে যাঁরা প্রতিভায় ও মনীষায় শ্রেষ্ঠ, তাঁদের ভিতর থেকেই বাছাই-করা এতগুলি গুণী ব্যক্তি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়ে রয়েছেন। এ'দের মধ্যে অনেকেই প্রথম-শ্রেণীর আইনবিদ্। আইন সম্বন্ধে গভীর ব্যুৎপত্তি থাকায় এ'রা সহজেই নিয়মতন্ত্রের নানা কূটপ্রশ্নের বিচারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। অধিরাজক

ক্ষমতার অবসানের বিষয় নিয়ে যে বাদ-প্রতিবাদ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে এ'দেরও কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আইনবিশারদ এই সব বিশিষ্ট দেওয়ানদের অনেকেরই পরামর্শ বর্তমানে দেশীয় রাজন্যদের বিশেষ কাজে লাগছে। এ'রা দেশীয় রাজন্যদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকলেও, বস্তুত দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে এ'দের সম্পর্কে একটা অভিনবত্ব তথা বৈশিষ্ট্য আছে। এ'দের কাজ কতকটা ব্যারিস্টারের কাজের মতোই; যেন কোন মামলায় নিজ নিজ রাজন্যের পক্ষ সমর্থনের জন্য মস্ত বড় 'ব্রিফ' নিয়েছেন।

দেশীয় রাজন্যদের এই আলোচনা কমিটি যাতে সহজেই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝতে পারেন, তার জন্য মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই প্রস্তাবের ইতিবৃত্ত এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করলেন। এর পরেই মাউণ্টব্যাটেনের উপর কঠিন জেরা আরম্ভ হলো। কমিটির সদস্যেরা প্রশ্ন করলেন, এই প্রস্তাব দেশীয় রাজ্যের উপর কিভাবে প্রযোজ্য হবে এবং হতে পারে কি?

রাজন্যেরা এবং তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দ সকলেই বিশেষভাবে একটি বিষয় জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন, অধিরাজক ক্ষমতার পরিণামের বিষয়। তাঁরা জানতে চাইছেন, ব্রিটিশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই দেশীয় রাজ্যগুলির উপর থেকে ব্রিটিশের অধিরাজক ক্ষমতার অবসান করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে কি না? এই প্রশ্নের ভিতর দেশীয় রাজন্যদের মনোভাব ও ধারণারই একটি পরিচয় ফুটে উঠেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ধারণা করছেন, ব্রিটিশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই যদি তাঁদের উপর থেকে ব্রিটিশের অধিরাজক ক্ষমতা অপসারিত হয়, তবে তাঁরা ভবিষ্যতের দুই ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে নিজেদের দাবী এবং অভিমত খাটিয়ে দর কষাকষি করবার সুবিধা বেশি ক'রে পাবেন।

মাউণ্টব্যাটেন এই বৈঠকে উপস্থিত রাজন্যদের মনে বাস্তবতাবোধ সঞ্চারের জন্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে দু'টি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তার অর্থ এই যে, দু'টি নতুন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হবে। যদি সমগ্র উপমহাদেশে একটি মাত্র গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হতো, তবে বলা চলতো যে, এত বড় ভূখণ্ডের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হ্রাস ক'রে বিভিন্ন অংশের হাতে ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইরকম কোন দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হচ্ছে না। উচ্চ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হতে চলেছে। এই অবস্থায়, এই দুই গভর্নমেণ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বেচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেশের বিভিন্ন অংশের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। মাউণ্টব্যাটেন বরং মনে করেন যে, দু'টি নতুন রাষ্ট্র ডোমিনিয়ন মর্যাদা গ্রহণ করায় দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে আত্মরক্ষা করারই সুবিধা হলো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সকল চুক্তির মর্যাদা রক্ষা ক'রে, প্রত্যেক চুক্তিবন্ধ নীতি ও ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সৌহার্দ্যের ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে দেশীয় রাজন্যেরা এতদিন চলেছেন। কিন্তু সে পটভূমিকা পরিবর্তিত হতে চলেছে। তবু দেশীয় রাজন্যদের পক্ষে দুশ্চিন্তিত হবার কিছু নেই। দু'টি নতুন ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রে দেশীয় রাজন্যদের অস্তিত্ব রক্ষা করার এবং যথোচিত স্বার্থরক্ষা করারই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—"আমি আপনাদের এই পরামর্শই দেব যে, কোন সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করার আগে আপনারা ভবিষ্যতের দশ বছর পরের অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা করবেন। আপনারা চিন্তা প্রসারিত ক'রে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারত এবং সমগ্র পৃথিবীরই অবস্থা কোন্ রূপ গ্রহণ করবে।"

ভাইসরয়ের রোল্স্-এ চড়ে আমিও মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ভবনে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম রেডিও ভবনের প্রত্যেক জানালা থেকে কর্মচারীদের কৌতূহলী মুখগুলি উঁকি দিয়ে রয়েছে। ভবনের ব্যালকনিতেও কর্মচারীর দল ভিড় ক'রে ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভবনের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেও ছোট একটা ভিড় জমেছিল।

ফে একটা মজার ঘটনার কথা পরে আমাদের কাছে বলেছিলেন। রেডিও ভবনের ব্যালকনির উপর দাঁড়িয়েই ফে এই ঘটনা লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমরা যখন রেডিও ভবনে প্রবেশ করছিলাম, তখন গৈরিক রঙের টুপি-পরা একদল সাধু উচ্চৈঃস্বরে 'ধ্বনি' করছিলেন। কিন্তু এই বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনের পুলিশের গাড়িতে সাধুর দলকে যেন ছোঁ মেরে তুলে ফেলল পুলিশ। ভারতের পথের জনতা সাধারণত শান্ত এবং আচরণেও ভদ্র। বিক্ষুব্ধ সাধুর দলকে পুলিশ এমন পরিচ্ছন্নভাবে চট্‌পট্ তুলে নিয়ে সরে গেল যে, তাই দেখে জনতা হো হো করে হেসে উঠল। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে এই সাধুরা এসেছেন এবং যমুনার কিনারায় তাঁবু ফেলে একটি আড্ডা স্থাপন করেছেন। এঁরা দেশখণ্ডনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এসেছেন। এঁদের অভিযোগ হলো, দেশখণ্ডন ক'রে হিন্দুজীবনের আদর্শ এবং আচারের সর্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করা হচ্ছে।

আলাপ ও আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন সাধারণত বেশ দ্রুততার সঙ্গে এবং অনর্গলভাবে তাঁর বক্তব্য বলে থাকেন। কিন্তু রেডিওতে তিনি আজ যে ভাষণ দিলেন, তার মধ্যে বক্তার সেই অভ্যস্ত দ্রুতকথনভঙ্গীর কোন পরিচয় পেলাম না। প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য বেতারে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা ক'রে নেবার পর, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবের ঘোষণা আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে, প্রত্যেকটি কথার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। সমগ্র বক্তব্যের মাত্রা এবং বক্তব্যের প্রত্যেকটি কথার অর্থগত সামঞ্জস্য বজায় রেখে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ঘোষণা সমাপ্ত করলেন। ঘোষণার মধ্যে কোথাও যেন অতিশয়োক্তি না ঘটে, সে সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন। বরং অল্পোক্তি হোক্, কিন্তু কোন অত্যুক্তি যেন না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য রচনা করেছিলেন। বক্তব্য ঘোষণায় এই রীতি গ্রহণ করাই মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত হয়েছে। প্রস্তাবের ঘোষণা আর এক দিক দিয়ে বস্তুত মাউণ্টব্যাটেনেরই ব্যক্তিগত জয় ও সাফল্যের ঘোষণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাউণ্টব্যাটেন যে বাণী আজ বেতারে প্রচার করলেন, তার মধ্যে বিরাট কৃতিত্ব বা কৃতার্থতার কোন ভাব ফুটে ওঠেনি। মাউণ্টব্যাটেন বরং তাঁর বাণীতে এ ধরনের সুর বিশেষভাবেই চেপে দিয়েছেন। সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে বিচার করার ভাবটিই তিনি তাঁর ভাষণে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুনলাম নেহরুর ভাষণ। এ ভাষণ শ্রোতার মনকে নাড়া দেয়। বক্তার চিত্তের ভাব এবং তার প্রকাশভঙ্গী, উভয়েরই মধ্যে এমন একটা আবেদন আছে, যার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না, শ্রোতার মনের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। নেহরুর বক্তৃতায়

রূঢ় শলাঘার ভাব বিন্দুমাত্রও ছিল না। তেমনি সাফাই গাইবার, নিজেকে দোষমুক্ত করবার, অথবা আত্মসমর্পণ করবারও কোন চেষ্টার ভাব ছিল না। নেহরুর বক্তৃতায় তাঁর মনের গভীরের সেই অনুভূতিরই সুর ফুটে উঠেছিল, প্রত্যেক বৃহৎ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিফলতাও মিশে থাকায় যে অনুভূতি প্রত্যেক মানুষের মনে একটা বিষাদের ভাব নিয়ে জেগে ওঠে। জীবনের প্রত্যেক বিজয়হর্ষের মধ্যে একটা না একটা ব্যর্থতারও আক্ষেপ না থেকে পারে না।

নেহরু-চরিত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি বোধ হয় এই যে, যদিও তিনি এক রাজনৈতিক দলের নায়ক, পরিচালক ও যোদ্ধা হিসাবে অত্যুচ্চ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তবুও নিতান্ত দলগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের দ্বারা তাঁর সত্তা অভিভূত নয়। তিনি সাধারণ দলীয়তার পরিধি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ঘটনাকে সত্যসচেতন বুদ্ধি এবং বিমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে পারেন।

শিল্পীর মন এবং তত্ত্বনিষ্ঠ বিদ্বানের সন্ধিৎসা, উভয়ই নেহরুর প্রতিভার মধ্যে সমন্বিত হয়ে রয়েছে। যে কোন বিষয় বিচারের সময় নেহরুর চিন্তার ভিতর থেকে এই শিল্পীর মন ও বিদ্বানের তত্ত্বনিষ্ঠাই সবচেয়ে আগে এবং সহজেই প্রকট হয়ে পড়ে। আজও সমগ্র ঘটনা যখন সুবৃহৎ এক নতুন পরিণাম স্ফূর্ত করার সন্ধিক্ষণে এসে পেঁৗছেছে, তখন নেহরু একথা সহজেই বলতে পারলেন—"আমরা ক্ষুদ্র মানুষ। কিন্তু ক্ষুদ্র হয়েও আমরা এক বৃহৎ আদর্শের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছি। আদর্শের বৃহত্ত্ব আমাদের ক্ষুদ্রত্বকে দূর করতে সাহায্য করেছে। আদর্শ মহৎ বলেই সে মহত্ত্বের কিছুটা আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকে স্পর্শ করেছে।"

এর পর আরম্ভ করলেন জিন্না। মুসলিম লীগের বিশেষ ধরনের বাগ্‌ভঙ্গী ও বিতর্ক পদ্ধতিতে যাঁরা বেশ দক্ষ তাঁদের মতে জিন্নার এই বক্তৃতাটি হলো একটি আদর্শ বক্তৃতা। এঁদেরই মধ্যে বিশিষ্ট এক ব্যক্তি, জিন্নার বক্তৃতা সমাপ্ত হবার পরেই আমাকে তাঁর অভিমত জানালেন—"জিন্নার এই ভাষাই হলো সেই ভাষা, যার অর্থ বাজারের লোক সহজেই বুঝে থাকে। বোঝা যাচ্ছে, জিন্না এইবার সংগ্রামের অবসানে শান্তি চাইছেন।"

কিন্তু লীগসুলভ তর্কতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন এই ভদ্রলোক যা বললেন, সেরকম কোন বস্তু আমি জিন্নার বক্তৃতার মধ্যে পেলাম না। এরকম কোন তত্ত্বের ঐন্দ্রজালিক মহিমা জিন্নার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে বলে মনে হলো না। বরং আমার মনে হলো, যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিন্না আজ কথা বলছেন, তার তুলনায় তাঁর চিন্তা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। ঘটনার বৃহত্ত্ব ও গুরুত্বের সঙ্গে সমান স্তরে তিনি দাঁড়াতে পারছেন না, তাঁর চিন্তা অনেক নীচের স্তরে নেমে রয়েছে। অথচ যে ঘটনা চোখের সম্মুখে আসন্ন হয়ে উঠেছে, সে ঘটনার পিছনে তাঁরও যথেষ্ট চেষ্টার ইতিহাস রয়েছে।

জিন্না প্রথমেই একটা অভিযোগের কথা প্রচ্ছন্নভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ ক'রে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর মতন একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে বেতারে বক্তৃতা দানের সুযোগ পূর্বে কখনো দেননি, এই হলো জিন্নার অভিযোগ। জিন্না বললেন—"যাই হোক, আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আমার অভিমত ও বক্তব্য শুধু সংবাদপত্রে ছাপা কতগুলি নির্জীব হরপ থেকেই নয়, আমার বেতার-প্রচারিত কণ্ঠস্বর থেকেই আপনারা শুনতে পাবেন।"

আমি কিন্তু জিন্নার বক্তৃতার মধ্যে কোন সজীবতার সাড়া অথবা উৎসাহিত

হবার মতো কিছু পেলাম না। মাত্র মাউণ্টব্যাটেনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর আগ্রহের কিছুটা সজীবতার পরিচয় দিলেন। জিন্না জানালেন—"আমি একথা অবশ্যই বলব যে, ভাইসরয়কে বহু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে, এবং তিনি সাহসের সঙ্গেই লড়েছেন। ভাইসরয়ের আচরণে আমার মনে এই ধারণাই হয়েছে যে, তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষার এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য উচ্চতম বোধ ও নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করেছেন। এখন তাঁর কাজকে একটু কম কঠিন ক'রে তোলাই আমাদের কাজ। যতদূর সাধ্য আমরা তাঁকে সাহায্য করব, যাতে তিনি ভারতের জনসাধারণের কাছে শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বৃহৎ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।"

খুব দক্ষতার সঙ্গে জিন্না একটা বিষয় এড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর চূড়ান্ত ইচ্ছা ও অভিমতের কোন পরিচয় ঘোষণা করলেন না। প্রস্তাব যেন তিনি সমর্থনই করছেন, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা তিনি অবশ্য করেছেন। কিন্তু এই সমর্থনের ব্যাপারটাকেও তিনি একটা ধাঁধার মতো অবস্থায় রেখে দিলেন। "ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাব আমরা একটা আপোষ হিসাবে সমর্থন করব, অথবা একটা নিষ্পত্তি হিসাবে সমর্থন করব, সেটা বিবেচনা ক'রে দেখা এখন আমাদেরই কর্তব্য। এবিষয়ে আমি আগে থেকেই কোন মত দিয়ে রাখতে চাই না।"

নেহরু তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন 'জয় হিন্দ্' বাণী ধ্বনিত ক'রে। জিন্না শেষ করলেন 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' উচ্চারণ ক'রে। এই কথাটা জিন্না এমন কাটা-কাটা ভঙ্গীতে ও ভাঙা গলায় উচ্চারণ করলেন যে, শ্রোতারা শুনে চমকে উঠলেন। শুনে মনে হলো, 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' কথাটার সব গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন একটা অবজ্ঞার ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন জিন্না। শুনে মনে হলো না যে, জিন্না ঠিক 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' কথাটা উচ্চারণ করেছেন। শ্রোতারা শুনলেন, জিন্না বলছেন—'পাকিস্থান্স্ ইন দি ব্যাগ'।*

সব শেষে বললেন বলদেব সিং। দেশখণ্ডনের ফলে শিখসমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে, সে আশঙ্কার কথা মন থেকে মুছে ফেলা কোন শিখের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বলদেব সিং ভালভাবেই জানেন, দেশখণ্ডনের ফলে তাঁর স্বসমাজের জনসাধারণের মনে কি তীব্র তিক্ততা অচিরেই দেখা দেবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলদেব সিং-এর বক্তৃতার মধ্যে কোন উষ্মা ও তিক্ততার ভাব ফুটে উঠল না। তিনি তাঁর বক্তব্য বেশ স্বচ্ছন্দভাবে এবং সাহসের সঙ্গেই বলে গেলেন। তিনি বিশেষভাবে ভারতের সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ ক'রে এক বৃহৎ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং শান্তিরক্ষার জন্য ভারতীয় বাহিনীকে বর্তমানে যে কাজ করতে হচ্ছে, সে কাজ ভারতীয় সৈনিকের পক্ষে সুখের কাজ নয়। তবুও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এই অপ্রিয় কর্তব্যকেই দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় সৈনিক পালন করবেন। ভারতীয় সৈন্য তাঁদের সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্যের উচ্চাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই আবেদন জানালেন বলদেব।

ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রস্তাবে নেতারা আজ তাঁদের সমর্থন ঘোষণার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে প্রস্তাব সম্বন্ধে জিন্না তাঁর বক্তৃতায় যে অর্থপূর্ণ

* 'Pakistan's in the Bag'.

একটি উক্তি করেছেন, বলদেব সিং ঠিক তার বিপরীত উক্তি করলেন। এই প্রস্তাবকে জিন্না বলেছেন—একটা 'আপোষ'। বলদেব বললেন—'আমি বলব, এই প্রস্তাব হলো একটি 'নিষ্পত্তি'।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৪ঠা জুন, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে এসেম্বলী ভবনে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সম্মুখীন হলেন মাউণ্টব্যাটেন। এর আগে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের অনেক বৃহৎ সমাবেশ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু আজকের মতো এত বড় সমাবেশ এর আগে খুব কমই দেখেছি। ভারত ও পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদপত্রের প্রায় তিনশত জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দানে এবং নিজ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মাউণ্টব্যাটেন যে অত্যুচ্চ কৃতিত্বের প্রমাণ দিলেন, তার উদাহরণও এর আগে খুব কমই দেখেছি। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য বিষয়ের কোন নোট আগের থেকেই রচনা ক'রে রাখেননি। ভূমিকা বিস্তার না ক'রে তিনি একেবারে মূল প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁর বক্তব্য বলে যেতে আরম্ভ করলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের 'প্রস্তাব' বস্তুত অত্যন্ত জটিল একটি রাজনীতিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মধ্যে বর্ণিত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলির পরিচয় যেমন জটিল বলে মনে হয়, তেমনি জটিল মনে হয় তার তাৎপর্য। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন এই পরিকল্পনার সকল জটিলতার আবরণ উন্মোচন ক'রে, বিষয় ও ব্যবস্থাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন। এ সম্মেলনে শ্রোতা হলেন সাংবাদিকেরা, যাঁদের বলা যায় পেশাদার সংশয়ী, অবিশ্বাস করতেই যাঁরা অভ্যস্ত। আমার ধারণা, মাউণ্টব্যাটেনের বক্তৃতা এই সংশয়ী শ্রোতৃমণ্ডলীর মন থেকে পরিকল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার অনেকখানি অবশ্যই দূর করতে পেরেছে।

একজন সাংবাদিক মুসলিম লীগের 'করিডর' দাবীর প্রসঙ্গ তুলে দিয়ে কিছু বলাবার চেষ্টা করলেন। অথচ, পরিকল্পনার মধ্যে করিডরের কোনই উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু সাংবাদিককে প্রশ্ন করলেন—আপনি পরিকল্পনার কোন্ অনুচ্ছেদের (প্যারাগ্রাফের) বিষয় জানতে চাইছেন?

শিখসমাজের কথা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কোন কোন সাংবাদিক জানতে চাইলেন, শিখসমাজ এই প্রস্তাব সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে শিখদের অবস্থাটাই বা কিরকম দাঁড়াবে।

মাউণ্টব্যাটেন প্রত্যুত্তরে পরিষ্কারভাবেই বললেন, এই প্রস্তাবে যতগুলি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে শিখসমাজের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি কঠিন বোধ হয়েছে এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি ভাবতেও হয়েছে।

বিশেষভাবে সীমানা কমিশন সম্পর্কেই মাউণ্টব্যাটেনের উপর প্রশ্নের চাপ পড়ল বেশি। পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের মুসলমানপ্রধান জেলা শ্রীহট্ট অঞ্চল দুইভাগে ভাগ করার ব্যাপারে কমিশন কি নীতি অনুসরণ করবেন এবং কোন্ তথ্য বিবেচনা ক'রে সীমারেখা নির্ধারণ করবেন, সে সম্বন্ধে সাংবাদিকেরা মাউণ্টব্যাটেনের কাছে জানতে চাইলেন। একজন শিখ সাংবাদিক জানতে চাইলেন, প্রদেশ ভাগ করার ব্যাপারে অর্থাৎ সীমারেখা নিরূপণের ব্যাপারে কোন সম্প্রদায়ের সম্পত্তির পরিমাণ বিবেচনা ক'রে দেখা হবে কি না?

মাউণ্টব্যাটেন হেসে উত্তর দিলেন—মহামান্য সম্রাটের কোন গভর্নমেণ্ট সম্প্রদায়-বিশেষের ভূসম্পত্তির পরিমাণ বিবেচনা ক'রে রচিত কোন দেশখণ্ডন পরিকল্পনা সমর্থন করতে পারেন না, বিশেষ ক'রে বর্তমান গভর্নমেণ্ট (শ্রমিক দলের গঠিত গভর্নমেণ্ট) তো একেবারেই পারেন না।

এই সাংবাদিক সম্মেলনেই মাউণ্টব্যাটেন সর্বপ্রথম একটি তথ্যের আভাস ইঙ্গিতে জানালেন যে, সম্ভবত আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখেই দুই নতুন ডোমিনিয়নের হাতে শাসনক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হবে। 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রসঙ্গ নিয়েই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের তীব্রতা দেখা দিল সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে তন্ন তন্ন ক'রে জানবার জন্য সাংবাদিকেরা একের পর এক প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলেন।

দেবদাস গান্ধী তাঁর ব্যবহারে স্বভাবত অত্যন্ত নিরীহ এবং অমায়িক। কিন্তু ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁরই সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের বেশ একটা তর্ক ও কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে দেবদাস বারবার যেভাবে প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছিলেন, তা থেকে আমি আর একটি তথ্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম। আমার মনে হলো, দেবদাসের কথার মধ্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সেটা সম্ভবত তাঁরই পিতার মনোভাবের আভাস।

দেবদাস কি বলতে চাইছেন, তাঁর আসল জ্ঞাতব্য বিষয়টি কি, এটা মাউণ্টব্যাটেন দেবদাসের প্রশ্নের রকম থেকে প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। পরে বোঝা গেল। দেবদাস বলতে চাইছেন, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র একটি রাষ্ট্র যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করতে চায়, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে এই দাবী করা কর্তব্য যে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার বা না থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ভারত সমগ্রভাবে; দুই অংশ পৃথকভাবে নয়। দেবদাস বললেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দুইটি গণপরিষদকে এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে নিয়ম করা হয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

এই কৌতূহল ও এই ধরনের প্রশ্নের পিছনে সেই পুরনো সন্দেহটিরই অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। সেই পুরনো ধারণা—ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র যেন পূর্ণস্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম মর্যাদার একটা রাষ্ট্র। এই সঙ্গে আর একটি নতুন সন্দেহেরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্থান যদি কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবার এবং ভারত কমন-ওয়েলথের বাইরে থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে পাকিস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা ঘাটিতে পরিণত হতে পারে, এই সন্দেহেরই ভাব সব প্রশ্নের ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর শেষ কথা জানিয়ে দিলেন—"যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো তা থেকে আমার ভালরকমই ধারণা হয়ে গেল যে, বিশেষ একটি বিষয়ের অর্থ জনসাধারণের কাছে এখনো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। যে কারণেই হোক্, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' কথাটার উপরেই জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র বস্তুত সর্বপ্রকারে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। অন্যান্য পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির তুলনায় কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্রগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য এই যে, তারা স্বেচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত থাকার নীতি গ্রহণ করেছে। কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে

সম্পর্কটিও বস্তুত হলো পরস্পরের সাহায্য, বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রীতি লাভ করার সম্পর্ক।"

দেবদাস তাঁর বিশেষ জিজ্ঞাস্য বিষয়টির যে উত্তর মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে পেলেন, তাতে তিনি নিঃসংশয় ও সন্তুষ্ট হলেন কিনা, বোঝা গেল না। কিন্তু সম্মেলনের শেষে যে দৃশ্য দেখা গেল, তার তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারা যায়। সম্মেলনের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল যে মুহূর্তে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, সেই মুহূর্তে প্রায় সকল সাংবাদিকের সপ্রশংস হর্ষধ্বনিতে সভাস্থল মুখর হয়ে উঠল। যাঁদের কোন বিষয় বোঝানো কঠিন, তাঁদেরই এত বড় একটা সম্মেলনের এই উল্লাস সত্যই বিস্ময়কর। এতটা কল্পনাও করা যায়নি।

আমি পরে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আজকের এই সম্মেলন সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জিজ্ঞাসা করেছি। ডেলি হেরাল্ডের অ্যান্ডি মেলর বললেন যে, সাংবাদিক কৌতূহল ও প্রশ্নের সম্মুখীন হবার এবং উত্তর দিয়ে সংশয় খণ্ডনের যে কৃতিত্বের প্রমাণ মাউন্টব্যাটেন দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এরকম ব্যাপার পূর্বে কখনো হয়েছে বলে তিনি শোনেননি, ভবিষ্যতেও কখনো শুনতে পাবেন বলে আশা করেন না। তিনি বস্তুত হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এরিক ব্রিটারের মতে—অদ্ভুত এক শক্তির পরিপ্রকাশ। বব স্টিমসন যা বললেন, তাতে বোঝা গেল যে, মাউন্টব্যাটেনের বক্তৃতা শুনে আমেরিকান সাংবাদিকেরা এই প্রথম এক নতুন তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। আমেরিকান সাংবাদিকেরা এই প্রথম বুঝতে পারলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস অর্থ সত্য সত্যই রাষ্ট্রের পূর্ণস্বাধীনতা। ক্ষমতা হস্তান্তরের শ্রেষ্ঠ নিয়মতন্ত্রসম্মত উপায় হলো ডোমিনিয়ন স্টেটাস। নতুন দুটি রাষ্ট্রকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করার অর্থ ব্রিটিশের অধিকার প্রকারান্তরে বজায় রাখার একটা সূক্ষ্ম ব্যবস্থা নয়। আমেরিকানদের কাছে এটা একটা নতুন তত্ত্ব এবং এই প্রথম তাঁরা এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন।

ভাইসরয় ভবনে ফিরে এসে মাউন্টব্যাটেন যেসব সংবাদ শুনতে পেলেন তাতে বুঝলেন যে, সাংবাদিক সম্মেলনে দেবদাসের কথায় যেসব সন্দেহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই সব নয় এবং তার অন্তরালেও অনেক ব্যাপার আছে। মাউন্টব্যাটেন শুনতে পেলেন, আজ সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

একথাও শুনতে পেলেন মাউন্টব্যাটেন, গত রাত্রে নেতারা প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বেতারে বক্তৃতা দেবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঠিক তার কিছুক্ষণ আগেই গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে নেতাদের সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। গান্ধী বলেছেন, নেতারা যা করছেন তার বিরুদ্ধে বলবার অনেক কিছু আছে। নেতাদের বর্তমান আচরণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এমন কি নেহরুর সম্পর্কেও গান্ধী মন্তব্য করতে ছাড়েননি। নেহরুর সম্বন্ধে তিনি একই সঙ্গে দু'টি মন্তব্য করেছেন, যার একটি হলো নেহরুর প্রশংসা এবং অন্যটি নেহরুর সমালোচনা। গান্ধী নেহরুকে 'আমাদের রাজা' বলে উল্লেখ ক'রেও সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন যে,—"রাজা যা কিছু করেন অথবা করেন না, সবই আমরা মুগ্ধভাবে প্রশংসা করব, এটা হতে পারে না। যদি তিনি এমন কোন উপায় বের ক'রে থাকেন যার ফলে আমাদের মঙ্গল হবে, তবে আমরা তাঁকে অবশ্যই প্রশংসা করব। কিন্তু সেরকম কিছু যদি

তিনি না ক'রে থাকেন, তবে আমাদের স্পষ্ট ক'রেই বলা উচিত যে, তিনি কিছু করতে পারছেন না।"

মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন এবং ঠিকই বুঝেছেন যে, গান্ধীর সঙ্গে সব বিষয় পরিষ্কার ক'রে নেবার সময় এবার এসে গিয়েছে। গান্ধীর মনে যেসব সংশয় এখন ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, সময় থাকতেই সেটা অপসারিত করা কর্তব্য, নইলে গান্ধীর এই সংশয় আরও দৃঢ় হয়ে বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানালেন মাউণ্টব্যাটেন, আজ প্রার্থনাসভায় যাবার আগেই যেন গান্ধী ভাইসরয় ভবনে একবার আসেন।

গান্ধী এলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, গান্ধীর মন একটা দুশ্চিন্তায় বিব্রত হয়ে রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনার কথা গান্ধীর মনের মধ্যে প্রথমেই যে ভাবনা উদ্বেলিত ক'রে তুলেছে, সেটা তাঁর পক্ষে আদৌ সুখকর নয়। তিনি অনুভব করছেন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা এতদিনে চরম বিফলতায় চূর্ণ হয়ে আর শূন্য হয়ে যেতে চলেছে।

মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীকে বোঝাবার জন্য তাঁর সকল শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'আপনি এই পরিকল্পনাকে মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা না মনে ক'রে গান্ধী-পরিকল্পনা বলেই মনে করুন।' মাউণ্টব্যাটেন জানালেন যে, তিনি আন্তরিকভাবে গান্ধী-নীতি অনুসারেই একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। অপরকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায় রাজি করাবার জন্য জোর না করা, নিজ সমাজের ইচ্ছা অনুসারে নিজ সমাজকে গড়ে তোলার অধিকার এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র ভারত হতে ব্রিটিশের প্রস্থান করা—গান্ধীজীর নীতি ও অভিমতের এই প্রধান কয়েকটি লক্ষ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন আরও বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে গান্ধীর ধারণায় যে একটা সহানুভূতিপ্রবণ সমর্থন আছে, তার পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সুতরাং পরিকল্পনাতে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের উল্লেখ করায় গান্ধী-নীতির ব্যতিক্রম বা বিরোধিতা করা হয়নি বলেই মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন।

সফল হলো মাউণ্টব্যাটেনের চেষ্টা এবং কতখানি সাফল্য যে লাভ করা হলো, তার প্রমাণও আজ রাত্রের মধ্যেই পেয়ে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন। আজকের প্রার্থনা-সভার ভাষণে গান্ধী বললেন—"দেশখণ্ডনের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দায়ী নন। দেশখণ্ডনে ভাইসরয়েরও কোন হাত নেই। বরং সত্য কথা হলো, দেশখণ্ডনের বিরুদ্ধে স্বয়ং কংগ্রেসের মনে যতটা আপত্তি আছে, ভাইসরয়ের মনেও ততখানিই আপত্তি আছে। কিন্তু আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যদি এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় সম্মত হতে না পারি, তবে ভাইসরয় আর কি করতে পারেন?"

লণ্ডন থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলাম। ৩রা জুনের টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছেন জয়েস।

জয়েস জানিয়েছেন—"আজ বিকালে কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। সভায় কোন আসন শূন্য ছিল না। গভীর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে সমগ্র সভা প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা শুনলেন। প্রস্তাব এবং প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের প্রথম মনোভাবের পরিচয় জানতে পেরে এখানে সকল দলের মনে একটা গভীর কৃতার্থতা ও তৃপ্তির ভাব দেখা দিয়েছে। সকল দলের মধ্যে যে ঐক্যবোধ দেখতে পাওয়া গেল এবং সকলেই এই বিরাট পরিবর্তন ও

সম্ভাবনার গুরুত্ব সম্বন্ধে যে সচেতনতার প্রমাণ দিলেন, তার সঙ্গে একমাত্র মহাযুদ্ধ-কালের এক একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ জাতির সকল দলের ঐক্যবোধ ও চেতনার তুলনা হতে পারে।"

জয়েস জানিয়েছেন, বি বি সি অতি সুন্দরভাবে এবং বিস্তৃতভাবে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন। জয়েসের টেলিগ্রামের শেষ কথা হলো—"আমাদের সকলের পক্ষেই আজকের দিনটা জীবনের একটা স্মরণীয় দিবস হয়ে রইল।"

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মাউণ্টব্যাটেন স্টাফের সভা আহ্বান করলেন। বিশ্রাম নেই মাউণ্টব্যাটেনের, আমাদেরও নেই। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের সুদীর্ঘ কালের একটা অচল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেবার পরেও মাউণ্টব্যাটেন নিশ্চিন্তমনে বিশ্রামলাভের সুযোগ পাচ্ছেন না।

একটা নতুন দুর্যোগের প্রথম লক্ষণ আমি এরই মধ্যে দেখতে পেয়েছি। দেশীয় রাজ্যগুলির মনোভাবের মধ্যে দুর্যোগের ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। নরেন্দ্রমণ্ডলের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করেছেন ভোপালের নবাব। যে ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং যে পরিবর্তন সম্মুখে এগিয়ে এসেছে, ভোপাল যেন সে সব স্বীকার করতেই চান না। বাস্তব ঘটনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আড়ালে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়ে থাকবার পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ চেষ্টা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হয়নি।

'দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম' সম্বন্ধে রচিত ব্যবস্থাপত্রের সম্পর্কে নেহরু অনুকূল মনোভাব দেখাতে পারছেন না। এখন বেশ স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারছি যে, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব ও বর্তমান গঠন অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় অনেক বাধা ও দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৫ই জুন, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নেতাদের আজ আবার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হলো। এটা হলো তৃতীয় নেতৃবৈঠক। দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম সম্বন্ধে রচিত ব্যবস্থাপত্রটির বিভিন্ন নির্দেশ এবং উল্লেখ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হলো।

আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হতে দেখা যাচ্ছে না। দুই পক্ষই প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরকম একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। প্রশাসন ব্যাপারে যেসকল ব্যবস্থার নির্দেশ এই দলিলে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রকৃত তাৎপর্যও নেতারা ভুলে যাচ্ছেন।

জিন্না অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, দু'টি রাষ্ট্রই দু'টি স্বাধীন এবং সর্বদিক দিয়ে 'সমান' রাষ্ট্র হবে। নেহরুও সমানভাবে জোর দিয়ে দাবী করলেন যে, ভারত রাষ্ট্র পূর্বের মতো ভারত রাষ্ট্রই আছে। ভারতের কয়েকটি 'অনিচ্ছুক' প্রদেশকে ভারতের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়ার ফলেই পাকিস্থান নামে একটা নতুন রাষ্ট্র গঠিত হতে চলেছে। ভারত হতে বিচ্যুত অংশ নিয়ে গঠিত এই নতুন রাষ্ট্র সর্বদিক দিয়ে ভারতের 'সমান' রাষ্ট্র হতে পারে না। পাকিস্থান হবে বলেই ভারত গভর্নমেণ্টের গঠনে, ব্যবস্থায় ও কাজে কোন ছেদ পড়তে পারে না। ভারত গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতিও যে ধারায় চলে আসছে তাও কোনরকমে ক্ষুণ্ণ করা চলতে পারে না।

পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ এবং বিসম্বাদপূর্ণ এই পরিবেশের মধ্যে এবং উভয়পক্ষের মনের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন স্পষ্টভাবেই জানালেন যে, তিনি

উভয়পক্ষের মধ্যে আর সালিশী করবার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না। দুই পক্ষই প্রত্যেক বিরোধীয় বিষয়ে সালিশী করবার জন্য তাঁকে বরাবর যে অনুরোধ ক'রে আসছেন, সে অনুরোধ আর রক্ষা করতে তিনি অক্ষম।

দু'পক্ষেরই নেতারা রাজি হলেন, তাঁরা এবার নিজেরাই পরামর্শ ক'রে এবং দু'পক্ষেরই সমর্থন আছে, এমন একজন 'বিচারক' এনে বসাবেন, যিনি এই ধরনের সালিশী করবার একটা আনন্দহীন ও প্রশংসাহীন কাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনার বয়স এখনো আটচল্লিশ ঘণ্টাও পার হয়নি। তবুও, পরিকল্পনার সংবাদে সারা দেশের মধ্যে একটা স্বস্তির ভাবও যে দেখা দিয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঘটনা দিল্লীর নেতাদের মনে এখনো একটা ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেনি। দিল্লীর মনের অবস্থায় স্বস্তি নেই। বিরোধের ভাব খুব তীব্র হয়ে রয়েছে। বস্তুত অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, অতি তুচ্ছ একটা ঘটনার জন্য অতি সহজেই একটা মস্ত বড় সংকট মুহূর্তের মধ্যেই দেখা দিতে পারে।

প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৮ই জুন, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন এখন তাঁর সম্মুখে যে সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন, সে সমস্যার ভিতরটা হলো পুরোপুরি রাজনৈতিক। সম্মুখে সবচেয়ে আগের যে বিপদ তিনি দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হলো অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা। যে দুই পক্ষের ব্যক্তিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়েছে, তাদের কোন একটি পক্ষ যদি পদত্যাগ ক'রে বসে, তাহলেই এই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট ভেঙ্গে যাবে। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে এ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট বরাবরই ঠুন্‌কো এবং দুর্বল ছিল এবং এখনো তাই আছে। তার উপর, এখন আবার দেশখণ্ডনের নীতি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে এবং সে নীতিকে কার্যে পরিণত করবার প্রতিশ্রুতিও দুই পক্ষই ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন। এই অবস্থায় অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে কারও মনে যেন কোন দরদের বালাই আর নেই। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সংহতি-টুকু রক্ষা করার জন্য উপরে উপরে একটা নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ভাব পর্যন্ত কেউ দেখাচ্ছেন না। মাউণ্টব্যাটেন বেশ স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পেরেছেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন ক'রে দেশখণ্ডনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করার আগেই যদি ভারতের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ পদত্যাগ করেন, তাহলে ৩রা জুনের পরিকল্পনা ভয়ানকভাবে বিপন্ন হবে। ফলে, ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর পক্ষেও নতুন ক'রে চেষ্টা করবার মতো কোন সুযোগ পাওয়ার ভরসাও ছেড়ে দিতে হবে।

আজ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যা দেখে বুঝতে পেরেছি, আশঙ্কিত এই বিপদটি ঘাড়ের উপর এসেই পড়েছে। আজ মন্ত্রিসভার এক বৈঠক হয়েছিল। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে আজকের এই বৈঠক ভেঙ্গে যেত যদি মাউণ্টব্যাটেন প্রায় মরিয়া হয়ে চেষ্টা ক'রে বৈঠকের আলোচনার মোড় অন্য দিকে ফিরিয়ে না দিতেন। মাউণ্ট-ব্যাটেনের জন্যই মন্ত্রিসভার বৈঠক একটা অবাঞ্ছনীয় পরিণাম হতে আজ রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। বাদ-বিতণ্ডার সুযোগ হ্রাস করার জন্য মাউণ্টব্যাটেন আলোচ্য বিষয়বস্তুর তালিকাও সংক্ষিপ্ত ক'রে দিলেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ আলোচনায় উত্থাপিত হতে তিনি দিলেন না। এ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই একেবারে স্থগিত রাখার প্রস্তাব করলেন। পলিসি নির্ধারণ এবং উচ্চপদের নিয়োগ, এই দুটি ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের কার্য-কালের সমাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখবার পরমার্শ দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার মধ্যে কংগ্রেস পক্ষই হলেন সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কোন বিষয়ে মতান্তর দেখা দিলে ভোটাধিক্যের দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রীতি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিসভার মধ্যে যদি প্রচলিত থাকে, তবে তার ফল এই হবে যে, কংগ্রেস পক্ষ ইচ্ছা করলেই যে-কোন সিদ্ধান্তই মন্ত্রিসভাকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নিতে পারেন। এই কারণেই ভোটাধিক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নীতিতে লীগ পক্ষের আপত্তি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটা ফরমুলা বা নিয়ামক সূত্র বের করা হলো। ব্যবস্থা হলো যে, পলিসি নির্ধারণ এবং

উচ্চপদে নিয়োগ সম্পর্কে মতভেদের বিষয়গুলি বিবেচনার ভার সরাসরি মাউণ্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, কংগ্রেসপক্ষের অমোঘ ভোটাধিক্যের প্রকোপ এড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একমাত্র এই-ভাবেই সম্ভবপর।

এখানে নেহরু একটি দাবী উত্থাপন করলেন। কয়েকটি বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের অনুমোদন চাইলেন। নেহরু বললেন—বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে, এটা সম্পূর্ণরূপে ভারতেরই ব্যাপার; এর সঙ্গে ভবিষ্যতের পাকিস্থান রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই।

লিয়াকৎ আলি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে বললেন, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের বলবার অধিকার আছে। লিয়াকৎ তাঁর আপত্তির কথা একটি দেশের নাম তুলেই বলে দিলেন—মস্কোতে কোন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হোক, এটা আমি একেবারেই চাই না।

লিয়াকতের এই উক্তির অর্থ কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কথা ভেবে দুশ্চিন্তা বোধ করছি। নেহরু সত্য সত্যই মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন এবং যাঁকে সেই পদে নিয়োগ করার কথা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং নেহরু-ভগিনী মিসেস্ পণ্ডিত।

লিয়াকতের এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বৈঠকের পরিবেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আরম্ভ হলো বাদ-প্রতিবাদের সংঘর্ষ। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে এবং একই সঙ্গে কণ্ঠস্বর ছেড়ে যার যার কথা বলে চললেন।

নেহরু বললেন যে, মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বরং ভোটের জোরেই নির্ধারিত করবার দাবী তিনি করবেন, তবু অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের কাজের মধ্যে মুসলিম লীগের এই ধরনের বাধা তিনি সহ্য করবেন না। যদি লীগের মরজির কাছে গভর্নমেণ্টকে নত করাবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করবেন।

শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্বোধন ক'রে বৈঠকের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্দেশ জানাতে বাধ্য হলেন। যে বিশেষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যে এই তিক্ততা ও ক্রোধের আলোড়ন জেগে উঠেছে, সেই বিষয়টির আলোচনাও তিনি আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করবার নির্দেশ দিলেন।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন বললেন—"আমার সম্মুখে যদি এখন আমি একসারি হাসি-হাসি মুখ না দেখতে পাই, তবে আমি এর পরের আলোচ্য প্রসঙ্গ উত্থাপনই করবো না।"

মাউণ্টব্যাটেনের এই কথায় ফল হলো। তিনি যা চাইছিলেন, তাই হলো। সকলেই হেসে ফেললেন। উত্তেজনার ভাব কেটে গিয়ে বৈঠকের পরিবেশও এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

এই ঘটনার মধ্যে শুধু অতি বাস্তব একটা সত্যের প্রমাণ পাচ্ছি। মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনার সাফল্য কত দুর্বল একটি সূত্র অবলম্বন ক'রে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলছে। যে দিনগুলি এগিয়ে আসছে, সেগুলি আরও সংকটের উপহার নিয়েই দেখা দেবে। বুঝতে পারছি, নিকট-ভবিষ্যতে এই রকম আরও কত বিরোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আরও কত কঠিন হয়ে উঠবে।

একটি প্রশ্ন একেবারে সম্মুখেই এসে পড়েছে। নতুন দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেলের পদে নিয়োগের প্রশ্ন। দুই নতুন ডোমিনিয়নের জন্য একজন গভর্নর-জেনারেল কি অন্তত কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হতে পারে না?

কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেনকেই ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জিন্নাও কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও মাউণ্টব্যাটেনের কিছুকাল থাকা উচিত, যাতে তিনি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা ক'রে নতুন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রথম অধ্যায়টি তাঁরই প্রত্যক্ষ সাহায্য, উপদেশ ও পরিচালনার দ্বারা সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন। মাউণ্টব্যাটেন বুঝেছিলেন, জিন্নার অনুরোধ রক্ষা করতে হলে তাঁকে পাকিস্থানেরও গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে হয়।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৯ই জুন, ১৯৪৭ সাল : ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কিছু-কালের মতো মাউণ্টব্যাটেন দুই ডোমিনিয়নের যুক্ত গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ ক'রে থাকতে পারেন কিনা, আজকের স্টাফের বৈঠকে এবিষয়ে আলোচনা হলো। ডোমিনিয়ন স্টেটাস বলতে যা বোঝায়, তাতে এভাবে দুই বিভিন্ন ডোমিনিয়নে এক গভর্নর-জেনারেলের নিয়োগে নিয়মতন্ত্রগত কোন প্রশ্নের বাধা আছে কিনা, সে বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হলো।

জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাতে মাউণ্টব্যাটেনের প্রথমে এই ধারণা হয়েছিল যে, জিন্নাও দুই ডোমিনিয়নের জন্য এক গভর্নর-জেনারেলের নিয়োগ চাইছেন। কিন্তু পরে, মাউণ্টব্যাটেন যখন লণ্ডন গেলেন তখন লণ্ডনে থাকতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, জিন্না বস্তুত তিন জন গভর্নর-জেনারেলের নিয়োগ চাইছেন। ভারতের একজন গভর্নর-জেনারেল, পাকিস্থানের একজন গভর্নর-জেনারেল এবং একজন অতিরিক্ত গভর্নর-জেনারেল। জিন্নার ইচ্ছা, স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন এই অতিরিক্ত গভর্নর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের ব্যাপারে সকল মতবিরোধের মীমাংসায় মাউণ্টব্যাটেন 'সর্বোচ্চ সালিশকারী' হিসাবে থাকবেন।

যেসব সম্পত্তি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করতে হবে, তার অধিকাংশই অবশ্য ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জিন্নার প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হননি, সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতে, এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব।

মাউণ্টব্যাটেনও মনের মধ্যে কোন কথা চেপে না রেখে জিন্নাকে স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এরকম একটা রাষ্ট্রোত্তর ভূমিকা গ্রহণ করা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন পাকিস্থানের এই অভিমত সমর্থন করেছিলেন যে, যুক্ত-গভর্নর-জেনারেল থাকলে ক্ষমতা হস্তান্তরের যাবতীয় ব্যবস্থাগত কাজ সব চেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। পাকিস্থানেরও পক্ষে সেটা যে বিশেষ সুবিধার বিষয় হবে, একথা মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন আমাদের কাছে বলেছেন যে, মাত্র এক পক্ষের অনুরোধে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে থাকতে তাঁর একটুও ইচ্ছা নেই। কংগ্রেস তাঁকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হতে অনুরোধ জানিয়েই রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এই যে, জিন্নাও যেন তাঁকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু জিন্নার মনের আসল ইচ্ছাটি যে কি, তা আজ পর্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। জিন্না তাঁর মনের ইচ্ছা খুলে বলছেন না, বেশ সাবধানে চেপে রাখছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, জিন্না যদি এই ইচ্ছা ক'রে থাকেন যে, দুই ডোমিনিয়নের জন্য

একজন যুক্ত-গভর্নর-জেনারেল থাকবেন, তবে স্বাধীনতা আইনে কয়েকটা বিশেষ অনুজ্ঞার উল্লেখের প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়, জিন্নার কাছ থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার।

ইম্পিরিয়াল হোটেলের দোতলার বলরুমে আজ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক হলো। বৈঠকের আলোচনা যখন শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় হঠাৎ এক দল খাকসার এসে বৈঠকের উপর আক্রমণ চালাল। আক্রমণটা অবশ্য আকস্মিক, কিন্তু আক্রমণের আয়োজন যে বেশ ভেবে-চিন্তে আগের থেকেই ক'রে রাখা হয়েছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়। হোটেলের পাশে একটা বাগানের ভিতর দিয়ে খাকসারের দল অলক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে, তারপর বারান্দার উপর সমবেত চা-পানরত হোটেলবাসীদের চমকে দিয়ে এবং বেলচা ঘোরাতে ঘোরাতে লীগ কাউন্সিলের বৈঠক-কক্ষ লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলল। 'পাকড়ো জিন্নাকো!' চিৎকার করতে করতে খাকসারেরা সিঁড়ি ধরে উপরতলার দিকে এগিয়ে গেল।

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক তখনো বলরুমের ভিতর চলছে এবং জিন্নাও বসে আছেন। কিন্তু বলরুম পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই অর্ধেক পথে মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ডেরা এসে খাকসার দলকে বাধা দিল এবং খাকসারে ও ন্যাশনাল গার্ডে আরম্ভ হলো ধস্তাধস্তি। শেষ পর্যন্ত খাকসারের দল বিতাড়িত হলো। হাঙ্গামা থামাবার জন্য অবশ্য পুলিশকে এসে কাঁদুনে-গ্যাস ব্যবহার করতে হলো। কিন্তু অতি অল্প সময়ে কত বেশি ক্ষতি করতে পারা যায়, তার প্রমাণ এরই মধ্যে ভালোভাবেই দিয়ে চলে গেল খাকসারের দল।

নয়াদিল্লীর সব চেয়ে বড় শৌখীন হোটেল হলো ইম্পিরিয়াল হোটেল। নয়াদিল্লীতে যেসব বৈদেশিক সাংবাদিকেরা থাকেন, তাঁদের অধিকাংশই ইম্পিরিয়াল হোটেলের বাসিন্দা। কিন্তু আজ ইম্পিরিয়াল হোটেলে যে এত বড় একটা ঘটনা হয়ে গেল, তার কোন সাড়া সাংবাদিকদের মধ্যে দেখা গেল না। তার কারণ এই যে, হোটেলেরই বাসিন্দা এই বৈদেশিক সাংবাদিকের দল ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি। ব্যাপারটা কতকটা প্রদীপের নীচেই অন্ধকারের মতো। এক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সাংবাদিকেরা সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন না; বরং সংবাদটাই সাংবাদিকদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঠিক ঘটনার সময় হোটেলে মাত্র অল্প কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন। কাজেই এই অভাবিত ও চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ প্রথম জানবার সুযোগ মাত্র কয়েকজন সাংবাদিকের হয়েছিল। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রেস্টন গ্রোভার এবং ওয়াল্ট মেসন একেবারে হাঙ্গামার মধ্যে দাঁড়িয়েই সকল ঘটনা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও এঁরা সাহায্য করেছেন। দ্রুত টাইপ করতে এঁদের দুজনের মতো দক্ষ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁদের এই দক্ষতাকে আজ তাঁরা ভাল ভাবেই কাজে লাগালেন। তাঁদের সতীর্থ সাংবাদিকেরা এ ঘটনার সংবাদ এক বর্ণও জানতে পারার আগেই প্রেস্টন গ্রোভার ও ওয়াল্ট মেসন ঘটনার পূর্ণ কাহিনী বিদেশের সংবাদ-জগতে প্রচার ক'রে দিলেন।

এই আকস্মিক ঘটনার আক্রমণের সম্মুখেও জিন্না খুবই নির্বিকার ও অবিচলিত ভাবের প্রমাণ দিয়েছেন। ডেলি এক্সপ্রেসের সিডনি স্মিথ পরে জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। স্মিথের কাছে আমি শুনেছি, জিন্নার মনে কোন সন্দেহই নেই

যে, তাঁকে হত্যা করার জন্যই এই আক্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। এর আগে, জিন্নার প্রাণনাশের জন্য মাত্র একবার চেষ্টা হয়েছিল বোম্বাইয়ে ১৯৪৩ সালে। এক্ষেত্রেও আক্রমণকারী ছিল জনৈক খাকসার।

খাকসার অর্থ 'ধূলির সেবক'। কতকটা নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর আদর্শে এবং পদ্ধতিতে গঠিত মুসলিম ধর্মোন্মাদদের একটা সঙ্ঘ। খাকসারদেরই মতো ঝটিকা বাহিনীর আদর্শে দীক্ষিত, অথচ খাকসারদের চেয়ে বহু গুণ বেশি দুর্ধর্ষ হলো আর একটি সঙ্ঘ—হিন্দু মহাসভারই মতবাদ থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। খাকসারদের নেতা হলেন ইনায়েতুল্লা মাশরিকী। ইনি ১৯৩১ সাল থেকেই এই সঙ্ঘ স্থাপন ক'রে নানারকম সন্ত্রাসমূলক কাজ ও আন্দোলন ক'রে আসছেন। এঁদের দাবী হলো, করাচী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এক 'অখণ্ড পাকিস্থানের' প্রতিষ্ঠা। গোঁড়া হিন্দু চরমপন্থীরা যেমন মনে করে যে, গান্ধী হলেন হিন্দুস্বার্থের একজন বিনাশকারী, তেমনি খাকসারেরাও জিন্নাকে মুসলিম স্বার্থের বিনাশকারী ও বিশ্বাসহন্তা বলে মনে করে।

সন্ধ্যার শেষ দিকে ভাইসরয় ভবন থেকে এক দল লোক এই হোটেলে ডিনারে যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। বলরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা দেখতে পেলেন যে, সমস্ত জায়গা জুড়ে জিনিসপত্র একেবারে তছনচ হয়ে রয়েছে। প্রকাণ্ড গ্রিল-রুমের সমস্ত জিনিস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটা জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে। সব ফার্ণিচার চূর্ণ করা হয়েছে, এয়ারকুলার (বাতাস শীতল করার যন্ত্র) ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দেওয়া হয়েছে।

ধর্মোন্মাদনা ও অরাজকতা সৃষ্টির শক্তিগুলি প্রস্তুত হয়েছে এবং পথে পা বাড়িয়েছে। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারা যায়, এই শক্তিগুলি এইবার অগ্রসর হবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ইম্পিরিয়াল হোটেলের ঘটনা থেকেই এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, বর্তমানে ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সকল ব্যবস্থার বহিরাবরণটুকু কত জীর্ণ ও ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সেটা বস্তুত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাবারই একটা সুযোগপূর্ণ পরিবেশ। যেভাবে উত্তেজনায় ও প্ররোচনায় আবহাওয়া অশান্ত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাবান নেতার প্রাণই সম্ভবত ঘাতকের লক্ষ্য হয়ে উঠবে এবং ঘাতক হয়ে উঠবার মতো বহুসংখ্যক লোকেরও অভাব হবে না।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১০ই জুন, ১৯৪৭ সাল : মুসলিম লীগ কাউন্সিল প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস যাতে ক্রুদ্ধ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রস্তাবের ভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাকে স্পষ্ট ক'রে সমর্থন জানাবার আগে জিন্নাকে কি কি বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, প্রস্তাবে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যেসব কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সেগুলি বস্তুত কতগুলি সর্ত, যা থেকে অনেকখানি স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যায় যে, কি কি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পেলে জিন্না মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা সমর্থন করতে পারবেন। মন্ত্রিসভা-মিশনের পরিকল্পনা বর্জিত হওয়ায় লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টিকে দু'ভাগে ভাগ করবার নীতিতে লীগের আপত্তি ও অসম্মতি প্রকাশ ক'রে প্রস্তাবে এই কথাও বলা হয়েছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ৩রা জুন পরিকল্পনাকে লীগ সমগ্রভাবে বিবেচনা ক'রে দেখবেন। একটা 'আপোষ' হিসাবেই পরিকল্পনার মূলগত

নীতিগুলিকে সমর্থন করবার জন্য এই প্রস্তাবে জিন্নাকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করা হয়েছে।

আজও আমাদের স্টাফের বৈঠকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং যুক্ত গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনা হলো। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত জিন্নার কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাইনি। আজকের আলোচনা কতকটা জল্পনার মতোই ব্যাপার হয়ে উঠল। কতগুলি অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর ক'রে আলোচনার মধ্যে আমরা শুধু প্রসঙ্গ বিস্তার ক'রে চললাম। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, নেহরুর মনে একটা বিষয়ে বেশ গোলমেলে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, নেহরু এখনো এই নির্দিষ্ট সময়-সীমাকেই একটা অমোঘ ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস ক'রে রয়েছেন। তাই নেহরু নানা কাজের চাপের মধ্যেও প্রবল চেষ্টায় ও পরিশ্রমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, যাতে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই শাসনতন্ত্রের রচনা সম্পূর্ণ ক'রে ফেলতে পারা যায়। একথা স্বয়ং নেহরুই মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন। নেহরুর ধারণা, যদি নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্রের রচনা সম্পূর্ণ না করা হয় তবে কংগ্রেসের মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে।

মাউণ্টব্যাটেন আমাদের বললেন, এখন আর '১৯৪৮ সালের জুন' কথাটার কোন অর্থ নেই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়-সীমা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন আমাকে এ সম্পর্কে পাব্লিক রিলেশনস্-এর যথাবিহিত কর্তব্যটুকু পালন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এবার থেকে সংবাদ-পত্রগুলিকে বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ প্রদানের সময় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় সম্বন্ধেও একটা আভাস যেন আমি জানিয়ে দিই, যাতে জনসাধারণ এই ধারণা করতে পারে যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

আমার এক বিবৃতিতে কয়েকটা অর্থপূর্ণ ঘটনার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রকে জানিয়ে দিয়েছি। আমার ধারণা, এতেই কাজ হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাব্য তারিখ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে উল্টো-পাল্টা জল্পনার প্রকোপ অন্তত কিছুদিনের জন্য বন্ধ হবে বলেই আশা হচ্ছে।

আমার বিবৃতিতে এই তথ্যগুলি জানিয়েছি :

(১) পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা 'সত্যিকারের খাঁটি' বিশ্রাম লাভের জন্য মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে সিমলা পাহাড় চলে যাচ্ছেন।

(২) কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে একটা 'সত্যিকারের খাঁটি' নিমন্ত্রণ পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন পরিবার আগামী ১৯শে তারিখে কাশ্মীরে যাচ্ছেন।

(৩) জনৈক 'সত্যিকারের খাঁটি' অতি-গুরুত্বপূর্ণ-ব্যক্তি 'প্রাচ্য ভূখণ্ডে মহা-পরিভ্রমণের' সম্পর্কে ভারতে আসছেন। ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং মণ্টগোমারি।

সিমলা, শনিবার, ১৪ই জুন, ১৯৪৭ সাল : দিল্লীর উত্তাপের রাজ্য থেকে সরে হিমালয়ের এক শীতলতার রাজ্যে এক সপ্তাহের মতো থাকবার জন্য এসেছি। জায়গাটার নাম মাশোব্রা, এবং বাড়িটার নাম 'দি রিট্রিট'। এই নিভৃতের স্তব্ধতা নষ্ট ক'রে কোন টেলিফোন বেজে ওঠে না।

আজ আমার মায়ের কাছে পত্র দিলাম,—"মাউণ্টব্যাটেনের চেষ্টা সফল হয়েছে। আলোচনার রীতিতে তিনি কত দক্ষ তার প্রমাণ তিনি ভালোভাবেই দিয়েছেন। গান্ধী, জিন্না, নেহরু ও প্যাটেল, যদিও এ'রা সকলেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ'দের প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্য নেই; বরং এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব এ'রা পরস্পরের থেকে পৃথক্। কিন্তু এহেন চারজন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের মানুষের কাছেই মাউণ্টব্যাটেন আস্থাভাজন হতে পেরেছেন।

"প্যাটেলের প্রভাব এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও বিশেষভাবেই পেয়েছি। বাইরে থেকে দেখে মানুষটিকে রূঢ় বলেই মনে হতে পারে। এরকমও ধারণা হয় যে, তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে আপোষ করা নিতান্তই অসম্ভব। প্যাটেলের প্রভাব এবং কৃতিত্বের পরিচয়ও বাইরে থেকে দেখে সব সময় ধরা যায় না, কিন্তু সব ঘটনাকে তিনি ভিতর থেকে প্রভাবিত করেন। কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে প্যাটেলই সবচেয়ে আগে উপলব্ধি করেছিলেন—২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, যদি ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ব্রিটিশের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেই হয়, তবে দেশখণ্ডনে সম্মত হতেই হবে। এটা উপলব্ধি করার পর তিনি তাঁর মনে কোন দ্বিধা ও কুণ্ঠার প্রশ্রয় দেননি। তাঁর সহকর্মীরা যেমন মাঝে মাঝে তাঁদের অন্তরের বাণী অথবা একটা না-এদিক ও না-ওদিক গোছের ধারণা নিয়ে বিব্রত হয়েছেন, প্যাটেলের মধ্যে সেরকম কোন মনোভাব দেখা দেয়নি। তিনি অবিচলিত ভাবেই তাঁর ধারণা অনুসারে চলেছেন।

"শিখদের ভবিষ্যৎই দুশ্চিন্তার বিষয়। পাঞ্জাবের সমুদয় অধিবাসীর শতকরা বিশজন হলো শিখ। তবুও ঐক্যবদ্ধ থাকায় এ'রা পাঞ্জাব প্রদেশে যে পরিমাণ প্রভাব স্থাপন করতে পেরেছেন সেটা তাঁদের জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশি। এরকম সুবিধা ও প্রভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিখসমাজ বস্তুত দ্বিখণ্ডিত হবে, সীমানা কমিশনের পক্ষে এটা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। শিখদের আর একটি দুর্ভাগ্য, বর্তমানে তাঁদের নেতৃস্থানীয় হয়ে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং শক্তিও উচ্চস্তরের নয়। বলদেব সিং যদিও দূরদর্শী ব্যক্তি এবং তাঁর যোগ্যতাও আছে, কিন্তু তিনি একা পড়ে গিয়েছেন। শিখ জনমত তাঁর কথায় তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। শিখদের উপর পাতিয়ালার মহারাজারও তেমন কোন প্রভাব নেই। এই অবস্থায় শিখ সমাজকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা মাস্টার তারা সিং এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কতিপয় অল্পবয়স্ক অফিসারের মতো উগ্রস্বভাবের লোকের হাতে গিয়ে পড়ছে।"

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৩শে জুন, ১৯৪৭ সাল : গত দশ দিন ধরে মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর স্টাফ বহুবিস্তৃত বিষয় ও ঘটনার ক্ষেত্র হতে তথ্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলনের জন্য বস্তুত এক বিরাট প্রয়াস করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনার পক্ষে কোথায় কোন্ পক্ষ থেকে কতখানি সমর্থন অথবা সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, সেই সব তথ্যেরই পর্যালোচনা হলো।

পরিকল্পনার সমর্থনের পক্ষে এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা হতে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে সুস্পষ্ট-ভাবেই দেশখণ্ডনের ব্যবস্থা সমর্থিত হয়েছে। কৃপালনী ও জিন্নাকে দিয়ে যদিও সম্মিলিতভাবে একটা 'সম্মতির চুক্তি' স্বাক্ষরিত করাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং

উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বাচনিক অগ্নিবর্ষণের ব্যাপারও অনেক হয়েছে, তবু একথা বলা চলে না যে, দু'পক্ষেরই মূল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এখন আর কোন অস্পষ্টতা আছে।

তা ছাড়া, গান্ধীও আসন্ন পরিবর্তনের প্রাক্কালে, যে সময়ে প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই সময়েই, পরিকল্পনার পক্ষে তাঁর সমর্থনের আভাস জানিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিদের (হাই কম্যাণ্ড) মধ্যে যাঁরা একটু বেশি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর লোক, পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব মনের গোপনেই থেকে গিয়েছে। শীর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় গান্ধীর বিরাট এবং বলিষ্ঠ কর্তৃত্বের প্রভাব শিথিল ক'রে দেবার মতো শক্তি এ'দের নেই এবং এ'দের বিরোধিতাও একটা শক্তি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

দেশখণ্ডন পরিকল্পনার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে যে কয়টি প্রদেশের পরিণাম বদলে যেতে চলেছে, তার মধ্যে একটি হলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সীমান্ত প্রদেশের জন্য জনমত গ্রহণের (রেফারেণ্ডাম) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত অথবা পাকিস্থান, এই দুই ডোমিনিয়নের কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ পোষণ করে, সেটা যাচাই ক'রে দেখবার নীতি গৃহীত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কংগ্রেসের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং এই ব্যবস্থার বদলে অন্য কোন ব্যবস্থা করার জন্য কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টাও হয়েছে। কংগ্রেস অনেক চিন্তা ও বিবেচনা ক'রে এবং তাঁদের নিজেদেরই মনের আপত্তিগুলিকে পরীক্ষা ক'রে শেষ পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থায় সম্মতি দান করেছেন। ডাঃ খান্ সাহেব এই ব্যবস্থা বয়কট করবেন বলে প্রথমে ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর পরামর্শে তিনি নিরস্ত হয়েছেন। গান্ধীর পরামর্শেই স্থানীয় লাল-কোর্তা সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের নীতি প্রয়োগ করবেন। জনমত গ্রহণের উদ্যোগে তাঁরা কোন অংশ গ্রহণ না ক'রে শান্তিপূর্ণভাবেই দূরে সরে থাকবেন।

ক্যারো ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণের সময় তিনি থাকবেন না। ক্যারো ও মাউণ্টব্যাটেনের যেসব চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছে, আমার সিমলা চলে যাবার আগেই সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হলো।

সীমান্ত প্রদেশকে এই সময় সামরিক শাসন ব্যবস্থার অধীন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের দক্ষিণ সামরিক কম্যাণ্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল স্যার রব লকহার্ট সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। সীমান্ত প্রদেশের জনমত গ্রহণের সকল ব্যবস্থা লকহার্টই প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করবেন। সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে লকহার্টের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, এবং তাঁরই উপর এই অতি জটিল দায়িত্বের ভার পড়েছে। যাই হোক্, আমার ধারণা এই যে, সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে যে সঙ্কট কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অন্তর্বিরোধের কারণ হয়ে উঠেছিল, সে সঙ্কটের চরম পর্যায় এতদিনে কাটিয়ে উঠতে পারা গিয়েছে।

বাংলার ব্যাপার নিয়ে জিন্না বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করছেন। কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে মুসলিম লীগ যেসব মন্ত্রিত্বের দপ্তর অধিকার ক'রে রয়েছেন, সেসব দপ্তর এখন বর্জন করতে জিন্না রাজি হচ্ছেন না। তাঁর দাবী হলো, এখনও কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে বিভিন্ন মন্ত্রিত্বের দপ্তর হাতে রাখবার অধিকার মুসলিম লীগের আছে। কিন্তু ঠিক এই নীতিকেই প্রদেশের অন্তর্বর্তী শাসন

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে দিতে তিনি রাজি নন। বাংলা প্রদেশ খণ্ডিত হবে। সাময়িক আনুমানিক সীমানার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয়েছে, তার অন্তর্বর্তী শাসন ব্যবস্থাতেও লীগ-মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখবার অধিকার চাইছেন জিন্না।

আজ পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশ খণ্ডনের ইচ্ছা ঘোষণা করলেন। তিন দিন আগে বাংলার ব্যবস্থা পরিষদেও প্রদেশ খণ্ডনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে অখণ্ড বঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য সুরাবর্দী যে চেষ্টা করেছিলেন, সে চেষ্টা দুই প্রধান দলের (কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ) বিমুখতায় চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

ঘটনার চক্র সত্য সত্যই এতদিনে ঘুরেছে, এবং চক্রের এক পাক সম্পূর্ণও হয়ে গেল। আজ দেখতে পাচ্ছি, যে কংগ্রেস একদিন কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, সে ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে সেই কংগ্রেসই আজ হুবহু সেই কার্জনীয় নীতিকেই প্রয়োগের জন্য উদ্যত হয়েছেন।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে কি নীতি অনুসরণ করা হবে, সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেতারা গ্রহণ করেছেন। 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর' নামে একটা নতুন দপ্তর দিল্লীতে স্থাপন করার প্রস্তাবে নেতারা সম্মত হয়েছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্যগুলি, উভয়ের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, নির্দেশ দেবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভারত গভর্নমেণ্টের তথা ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলি যে সম্পর্ক স্থায়িভাবে স্থাপন করবেন, সেই সম্পর্কের সংজ্ঞা, রূপ এবং রীতিনীতিও উদ্ভাবনের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা আরম্ভ করবার আগে, নেতারা এই ব্যবস্থাতেও সম্মত হয়েছেন যে, রাজ-প্রতিভূ ভাইসরয়ের খাস দপ্তর বর্তমান 'রাজনৈতিক বিভাগে'র সকল দায়িত্ব, কর্মভার ও ক্ষমতা এই নতুন দপ্তরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। বর্তমান 'রাজনৈতিক বিভাগ' উঠে যাবে, তার বদলে শুধু থাকবে এই নতুন 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর'। প্রচলিত সব ক্ষমতাও এই নতুন দপ্তরের থাকবে, শুধু একটি ক্ষমতা ছাড়া—অধিরাজক ক্ষমতা।

দেশীয় রাজ্যগুলি আইনত এবং রাষ্ট্রিক বিধান অনুসারেও বস্তুত ভারত গভর্নমেণ্টের অধীন নয়। তারা ব্রিটিশনৃপতির প্রত্যক্ষ অধিরাজক ক্ষমতার অধীন। সুতরাং, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে, ব্রিটিশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই সব স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যগুলির উপর থেকে ব্রিটিশের অধিরাজক ক্ষমতার অবসান হবে কি হবে না? অবসান হলে সে ক্ষমতা নতুন ভারত রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে কি না? অধিরাজক ক্ষমতার ভবিষ্যৎ নিয়ে এইভাবে যে সব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, এইদিক দিয়েও একটা সমস্যা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রিক ও আইনগত নানা প্রশ্ন ও আপত্তি এই সমস্যাকে দিন দিন কণ্টকিত ক'রে তুলছে।

সমস্যার এই অবস্থা লক্ষ্য করেছেন মাউণ্টব্যাটেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পথে যেসব রাজনৈতিক ও আইনগত অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, তা'ও উপলব্ধি করেছেন। নিয়মতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে নিজামের উপদেষ্টা স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটনের সঙ্গে

মাউণ্টব্যাটেনের আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া, ভোপালের নবাব ও তাঁর পরামর্শদাতা স্যার জাফরুল্লা খাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন আলোচনা করেছেন। আলোচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের বিষয়টি বস্তুত একটি দুরূহ সমস্যার রূপ গ্রহণ করেছে। এঁরা মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছেন—যে ব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা-মিশনের পরিকল্পনার মধ্যে যথাসঙ্গত ব্যবস্থাই বলা যায়, সে ব্যবস্থাকে দেশখণ্ডন পরিকল্পনার মধ্যে সঙ্গত মনে করা যায় না। মন্ত্রিসভা-মিশনের পরিকল্পনায় যে ব্যবস্থার ফল খুবই ভাল হবে মনে করা গিয়েছিল, দেশ-খণ্ডনের পরিকল্পনার মধ্যেও সে ব্যবস্থার ফল কখনও ভাল হতে পারে না। এঁদের বক্তব্য হলো, দেশখণ্ডনের ব্যবস্থা বস্তুত সাম্প্রদায়িক প্রভেদের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান। এর ফলে এইমাত্র নূতনত্ব হবে যে, একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের বদলে দু'টি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যুক্তি দেখিয়ে এঁরা দাবী করেছেন যে, কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

আজ কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেছেন মাউণ্টব্যাটেন। দেশীয় রাজন্যেরা চিন্তার দিক দিয়ে কিরকম জড়ত্বের পরিচয় দিচ্ছেন, তার একটা উদাহরণ কাশ্মীরে গিয়েই দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। নেহরু এবং গান্ধী উভয়েই চাইছেন যে, কাশ্মীরের মহারাজা যেন 'স্বাধীনতা' ঘোষণা না করেন, ঘোষণা করা উচিত হবে না। নেহরুও হলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান এবং তিনি কাশ্মীরে যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েও উঠেছেন। তার কারণ এই যে, কাশ্মীর রাজ্য কংগ্রেসের (কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের) সভাপতি শেখ আবদুল্লা এখনও কারাগারে বন্দী অবস্থায় দিন যাপন করছেন। শেখ আবদুল্লাকে মুক্ত করতে চান নেহরু। গত বৎসর নেহরু যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলেন, তখন কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছিল। গান্ধী চাইছেন, নেহরুকে না পাঠিয়ে প্রথমে তাঁরই পক্ষে একবার কাশ্মীর ঘুরে আসা উচিত। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, নেহরু এবং গান্ধী দু'জনের কাউকেই তিনি কাশ্মীরে আসতে দিতে চান না। মাউণ্টব্যাটেনও গান্ধী এবং নেহরুকে এই বলে নিবৃত্ত করতে পেরেছেন যে, প্রথমে স্বয়ং তিনিই একবার কাশ্মীর ঘুরে আসবেন। কাশ্মীরের মহারাজা পূর্বেই মাউণ্টব্যাটেনকে একটা আমন্ত্রণও ক'রে রেখেছেন।

কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে প্রথম আলোচনাতেই মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে, রাজনীতির ব্যাপারে মহারাজা সুস্পষ্ট কোন একটা ব্যবস্থার মধ্যেই ধরা-ছোঁয়া দিতে চাইছেন না। আলোচনাও যেটুকু হয়েছে, সেটুকু সত্যিকারের আলোচনার মতো হয়নি। মহারাজার সঙ্গে এক গাড়িতে চড়ে নানাস্থানে বেড়াবার সময় মহারাজার সঙ্গে যেটুকু আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন, তার মধ্যেই যা-কিছু আলোচনা হয়েছে।

কাশ্মীরের মহারাজা এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত কাক'কে মাউণ্টব্যাটেন এই অনুরোধ করেছেন যে, তাঁরা যেন কাশ্মীরকে স্বাধীনরাষ্ট্র বলে কোন ঘোষণা না করেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ কি চায়, সেটা জানবার ব্যবস্থা আগে করতে হবে। জনমত জানবার নানারকম পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ করা চলতে পারে। মাউণ্টব্যাটেন অনুরোধ করেছেন, এইভাবে কাশ্মীরের জনমত জেনে নেবার

পর মহারাজা যেন ১৪ই আগস্টের পূর্বেই দুই গণপরিষদের (ভারত ও পাকিস্থান) কোন একটিতে রাজ্যের প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

মহারাজা এবং প্রধান মন্ত্রী কাক'কে এই কথাও মাউণ্টব্যাটেন বলেছেন,—ভারতের সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় রাজ্য দপ্তর মহারাজাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছেন যে, কাশ্মীর যদি পাকিস্থানের সঙ্গেই যুক্ত হবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন, তবে সে ঘোষণাকে ভারত সরকার একটা বন্ধুত্ববিরোধী কাজ বলে মনে করবেন না। যদি দুই ডোমিনিয়নের কোন একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে কাশ্মীরের স্থায়ী রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই স্থিরীকৃত না হয়ে যায়, তবে এইরকম বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কাশ্মীর কোন ডোমিনিয়নেরই সমর্থনের অভাবে কি ধরনের বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবে, সে কথাও বুঝিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মহারাজাকে ব্যক্তিগত ভাবে এই পরামর্শ দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবও করেছিলেন যে, একটা বৈঠক আহ্বান করা হোক। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী, রেসিডেণ্ট কর্নেল ওয়েব এবং মাউণ্টব্যাটেনের সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেল। এই বৈঠকে মাউণ্ট-ব্যাটেন তাঁর পরামর্শ আর একবার উত্থাপন করবেন, এবং বৈঠকের আলোচনার বিবরণী যথারীতি লিপিবদ্ধ এবং নথীভুক্তও করা হবে।

মহারাজা বলেছিলেন, কাশ্মীর থেকে মাউণ্টব্যাটেন যেদিন দিল্লী ফিরে যাবেন সেইদিনই এই বৈঠক আহ্বান করা হবে। সম্মত হয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন, কিন্তু শেষ দিনে মহারাজা এক বার্তা পাঠিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি পেটের ব্যথায় শয্যাগত হয়ে রয়েছেন এবং বৈঠকে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে হচ্ছে, এটা মহারাজার সেই ধরনেরই ব্যাধি যেটা তাঁকে তখনই আক্রমণ করে যখন তিনি কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে যাবার সঙ্কল্প ক'রে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেন অত্যন্ত হতাশ হয়েছেন।

আজকের স্টাফের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়সূচীর মধ্যে এগারটি বিভিন্ন বিষয় উল্লিখিত ছিল। 'শাসন পরিষদের পুনর্গঠন', 'দুই গভর্নর-জেনারেল' এবং আরও নয়টি আলোচ্য বিষয়। ঠিক ঐ দুটি বিশেষ বিষয়েই জিন্না কোন কথাই স্পষ্ট ক'রে বলছেন না, কিসের এক রহস্যপূর্ণ কুণ্ঠায় নীরবতা অবলম্বন ক'রে রয়েছেন। এ বিষয়ে জিন্না তাঁর মনের প্রকৃত ইচ্ছা গোপন ক'রে রাখবার কৌশলে যে দক্ষতা দেখাচ্ছেন, সেটা নিতান্তই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস এবং মাউণ্টব্যাটেন যাতে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল ক'রে বসেন, জিন্নার কৌশল বস্তুত কংগ্রেস ও মাউণ্টব্যাটেনকে সেইরকমই একটা অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, উভয় পক্ষেরই মনোভাব ও আচরণে এখনো এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না যাতে বুঝতে পারা যেত যে, তাঁরা প্রশাসন ব্যবস্থার আসন্ন পরিবর্তন ও সমস্যার গুরুত্ব অথবা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন আছেন।

দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম ও সমস্যা সম্বন্ধে রচিত মেমোরেণ্ডামটি নেতাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। মেমোরেণ্ডামে যেসব ব্যবস্থাবিধি উল্লিখিত হয়েছে তা'ও মোটামুটি নীতিগতভাবে নেতারা স্বীকারও ক'রে নিয়েছেন একটি 'বিভাগ কমিটি' নিয়োগ ক'রে। ভের্নন ইতিমধ্যেই দীর্ঘ এক বিষয়তালিকা তৈরি ক'রে ফেলেছেন। এই সব বিষয়ে নেতাদের অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু নেতারা যে এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে

কিছুমাত্র সচেতন আছেন, তার প্রমাণ অথবা প্রমাণের একটা আভাসও আজ পর্যন্ত পেলাম না।

বিভাগ কমিটির প্রথম বৈঠক হয়েছিল ১৩ই জুন তারিখে এবং সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে দু'জন সদস্য নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটিও গঠিত হয়ে গিয়েছে। কাজের চাপ সব চেয়ে বেশি ক'রে এই কমিটিরই উপর পড়বে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই কমিটিতে সদস্য মনোনীত হয়েছেন মহম্মদ আলি, যিনি মিলিটারি ফাইন্যান্স বিভাগের অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। আর, কংগ্রেস পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন বর্তমান মন্ত্রিসভার সেক্রেটারি এইচ এম প্যাটেল। দু'জনেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দুই কৃতী ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী, সার্ভিসজীবনের প্রায় অর্ধেককাল পার ক'রে এনেছেন।

ব্যবস্থা হয়েছে, এই স্টিয়ারিং কমিটি কয়েকটি সুদক্ষ সাব-কমিটির সাহায্য ও সহযোগিতায় কাজ ক'রে যাবেন। নেতারা আরও সম্মত হয়েছেন যে, সাব-কমিটি-গুলি সরকারী কর্মচারীদের নিয়েই গঠিত হবে। প্যাটেল এবং মহম্মদ আলি, উভয়ে একটি বিষয়ে খুব আশাশীল। তাঁদের বিশ্বাস, দেশখণ্ডনের জন্য প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি অতি দ্রুত সম্পূর্ণ ক'রে ফেলা সম্ভবপর হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট এবং অবধারিত তারিখ সেই ১৫ই আগস্টের আগেই দুই ডোমিনিয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা পৃথক করার কাজও সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু এই সাফল্যলাভ করতে হলে তাঁদের কাজে এখন নেতাদের পক্ষ থেকে আরও বেশি ক'রে সোৎসাহ রাজনৈতিক সমর্থন দানের প্রয়োজন আছে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৪শে জুন, ১৯৪৭ সাল : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে '৩রা জুন' প্রস্তাবের আলোচনায় গান্ধী সাহেবের সঙ্গে যেভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং আপত্তিকারীদেরও কতকগুলি যুক্তির সমালোচনা করেছেন, তাতে '৩রা জুন' প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারা যাচ্ছে না। গান্ধীর অহিংস আগ্নেয়গিরি কখন্ যে হঠাৎ আবার '৩রা জুন' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গীরণ ক'রে বসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

দেবদাস গান্ধী হলেন নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি। আজ টেলিফোনে আমি দেবদাসের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানতে চাইলাম, তিনি কবে সম্পাদক সম্মেলন আহ্বান করবেন বলে ঠিক করেছেন? কথা প্রসঙ্গে দেবদাস রয়টারের প্রচারিত একটি রিপোর্ট সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে জানতে চাইলেন, আমি সে রিপোর্ট দেখেছি কি না। পার্লামেণ্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' গ্রহণের উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানবিধি পালনের ব্যবস্থা হয়েছে, তারই এক বিবরণ লণ্ডন থেকে প্রচার করেছেন রয়টার।

পার্লামেণ্টের দুই সভাতেই প্রত্যেক বিল আইনে পরিণত করার উদ্যোগ যেভাবে চালিত হয়, তারই ঐতিহ্যগত সাধারণ কতগুলি অনুষ্ঠানবিধির বিবরণ ছাড়া রয়টারের রিপোর্টে বস্তুত আর কিছু নেই। রয়টারের প্রচারিত রিপোর্টে ভূমিকা হিস্যবে প্রথম প্যারায় এই কথা বলা হয়েছে : "আগামী মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মাত্র ত্রিশ মিনিটের এক উদাত্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দান করবেন। দু'টি নতুন নেশনের

স্রষ্টা এই বিল অক্ষরে অক্ষরে দীর্ঘ পার্চমেণ্টের উপর উৎকীর্ণ করা হবে। রঙীন রাজকীয় প্রতীকে এবং স্বর্ণসূত্রে শোভিত অতি সুদৃশ্য এক পেটিকা হতে তুলে নিয়ে এই পার্চমেণ্টপত্র পার্লামেণ্টের দুই সভার সদস্যদের সম্মুখে পাঠ করা হবে।"

দেবদাস বললেন, রয়টারের রিপোর্টে 'দুটি নতুন নেশন' সৃষ্টির কথা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গান্ধী অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছেন। গান্ধীর ধারণা, পিছনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অভিমতের সমর্থন না থাকলে রয়টারের দ্বারা কখনই এরকম রিপোর্ট প্রচারিত হতে পারে না। 'দুই নেশন' থিওরির উল্লেখ গান্ধীর কাছে অত্যন্ত অশোভন বোধ হয়েছে।

বস্তুত সোমবারের প্রার্থনাসভার ভাষণেই মহাত্মা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ মন্তব্য না ক'রে ছাড়েননি। গান্ধী বলেছেন : "আজকের সংবাদপত্রগুলিতে দেখলাম, লণ্ডনে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেদিনও যে ভারতবাসী এক নেশন ছিল, তাদের দুই নেশনে ভাগ করার ঘটনায় লণ্ডন উৎসব করবে। কিন্তু এত বড় একটা দুঃখকর ঘটনার মধ্যে আহ্লাদে মত্ত হবার মতো কিছু আছে কি? আমরা এই বিশ্বাসই আমাদের মনের ভিতর ধরে রেখেছি যে, পরস্পরের শত্রু হবার জন্য নয়, বন্ধু হবার জন্যই আমরা পৃথক হতে চলেছি, এক পরিবারের দুই ভ্রাতা যেমন ক'রে পৃথক হয়। সংবাদপত্রের কথা যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে, ব্রিটিশ আমাদের ভাগ ক'রে দুটি নেশন তৈরি করতে চলেছেন এবং সে কাজটা বেশ ঘটা ক'রে ঢাক বাজিয়েই করবার ব্যবস্থা করছেন। চলে যাবার আগে ব্রিটিশ এইভাবেই কি তার শেষ আঘাত হেনে যাবেন? আমি আশা করছি, এরকম ব্যাপার হবে না।"

দেবদাস আমাকে বললেন, আমি যেন এ ব্যাপারটার প্রতি ভাইসরয়ের দৃষ্টি যত শীঘ্র সম্ভব আকর্ষণ করি। দেবদাস এই ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন, রয়টারের প্রচারিত এই সব উক্তি মাউণ্টব্যাটেন যে সমর্থন করেন না, সেকথা মাউণ্টব্যাটেন যদি ব্যক্তিগত-ভাবেই গান্ধীকে জানাতে পারেন, তবে ভাল হয়। তা ছাড়া, রয়টারের উক্তি খণ্ডন ক'রে একটা প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য মাউণ্টব্যাটেন যেন আমাকে নির্দেশ দেন, এই অনুরোধও জানালেন দেবদাস।

দেবদাস বললেন, রয়টারের এই সংবাদে তাঁর পিতার মন এত উত্ত্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে কাল সাক্ষাতের সময় অবশ্যই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন।

উত্তরে আমি আমার মনের কথা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবেই দেবদাসকে জানিয়ে দিতে পেরেছি। আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছি যে, গান্ধীর মতো এত বড় একজন মানুষ এত নির্দোষ ও সরল একটা সংবাদ থেকে এরকম অর্থ টেনে বের করতে পারেন! আমি দেবদাসকে বলে দিলাম, রয়টারের প্রচারিত কথাগুলির যে অর্থ হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ জোর ক'রে করা হচ্ছে, এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই।

সমস্ত ব্যাপার আমি মাউণ্টব্যাটেনকে জানালাম! এ ধরনের ব্যাপার দেখলে মাউণ্টব্যাটেনের মন সাধারণত ক্ষুব্ধ, দুশ্চিন্তিত বা বিচলিত হয় না। ক'দিন আগে ইস্মে আমাকে বলেছিলেন যে, প্রতিদিন সকালে উঠেই তিনি তাঁর মনকে এই দুটি নির্দেশবাণী শুনিয়ে রাখেন— 'ধৈর্য ধর ও সব কিছু মাত্রার মধ্যে রাখ'।

মাউণ্টব্যাটেনের মানসিক প্রকৃতি ও আচরণে ঐ দুটি নীতিবাক্যেরই ক্রিয়া সব সময় দেখতে পাচ্ছি।

গতকাল ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারি এসেছেন এবং ভাইসরয় ভবনের অতিথি হয়ে রয়েছেন। আজ রাত্রে মার্শালের সম্বর্ধনার জন্য বিরাট এক ডিনার সভা হলো। ইতোমধ্যেই মণ্টগোমারি এক দফা সাক্ষাৎ এবং আলোচনার ক্লান্তিকর কর্তব্য সেরে দিয়েছেন। অল্পকথায় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ব্যাপার সেরে দেওয়া মণ্টগোমারির অভ্যাস। সুতরাং, এরই মধ্যে অনেক কাজ তাঁর করা হয়ে গিয়েছে।

মণ্টগোমারির প্রাচ্য-ভ্রমণের পরিকল্পনার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নূতন অবস্থা ও ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, তার আগেই মণ্টগোমারির ভ্রমণ-পরিকল্পনা ও কার্যসূচী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, তাঁর ভারত-আগমন বস্তুত কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আগমনের ব্যাপার নয়। কিন্তু এমন একটি সময়ে তিনি ভারতে এসে পড়েছেন, যেটা অবস্থার প্রয়োজনেই বস্তুত অত্যন্ত সময়োচিত ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

ভারতের সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করার ব্যবস্থায় এপর্যন্ত যতখানি কাজ হয়েছে, সে সম্বন্ধে মণ্টগোমারি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা এরই মধ্যে ক'রে ফেলতে পেরেছেন। ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ব্যবস্থার যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানেও তাঁর পরামর্শ যথেষ্ট সাহায্য করেছে। উপযুক্তসংখ্যক জাহাজ পাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়টি সম্মুখে রেখে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। কংগ্রেসপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে শেষ পর্যন্ত এই আপোষ-চুক্তি হয়েছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন থেকে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে দফায় দফায় বিভিন্ন ব্রিটিশ সৈন্যদলকে ভারত হতে অপসারিত করা হবে। এই ছয়মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যকে ভারতে কোন প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যে নিযুক্ত করা হবে না, মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব মণ্টিও সমর্থন করলেন। মণ্টি এই অভিমত পোষণ করেন যে, পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কার্যক্ষেত্রে কতগুলি দায়িত্ব ঘাড়ে রাখার কোন অর্থ হয় না, এ ধরনের দুই ব্যাপার এক সঙ্গে চলতে পারে না।

গতকাল মণ্টি এখানে পৌঁছানো মাত্র ফটো তুলবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। ভাইসরয় এবং ফিল্ড মার্শালের ফটো তুলতে হবে, ব্যবস্থাও করছি, এমন সময় অদ্ভুত এক আগন্তুকের মূর্তি আমাদের কক্ষের জানালার কাছে দেখা দিল। একটা বলদ। মোগল উদ্যানের ঘাস তুলবার জন্য যন্ত্র টানবার কাজে নিযুক্ত একটি বলদ, সাময়িক বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে এখানেই চলে এসেছে। মণ্টি এই আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখে খুশি হলাম যে, সেই বলদটি আবার এসেছে। নিশ্চয় ও জানতে পেরেছে যে, আমি আবার এখানে এসেছি।

কয়েকমাস আগে এখানেই ওয়েভেল এবং অকিনলেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারি ফটো তুলিয়েছিলেন। সেই গ্রুপের মধ্যে একটি বলদও ছিল, এবং সবলদ সেই গ্রুপেরই ফটো তোলা হয়েছিল।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৫শে জুন, ১৯৪৭ সাল : 'গভর্নর-জেনারেল' নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিষ্কার ক'রে একটা সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত করা হলো না, বরং বিষয়টিকে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে কেবলই কালক্ষেপ করা হচ্ছে,

এই ব্যাপার দেখে মিয়েভিল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আমার কাছে তাঁর ক্ষোভ বেশ কড়া ভাষায় প্রকাশও ক'রে দিলেন। বিলম্বের জন্য কোন সঙ্গত কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, এ অবস্থার জন্য মিয়েভিল প্রধানত জিন্নাকেই দায়ী করছেন। মিয়েভিলের মতে, জিন্নার আচরণ মাত্রাহীনভাবে অভদ্র হয়ে উঠেছে। যেন গ্রীক পুরাণের ডেল্‌ফির দেবতার মতো তিনি প্রত্যাদেশ দেবার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং কতগুলি ধাঁধার খেলা খেলছেন।

সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ পত্রিকা এবং 'কেম্‌স্‌লি' পত্রিকাসমূহের সংবাদদাতা জসলিন হেনেসি আজ সকালে আমাকে বললেন যে, জিন্নার সেক্রেটারি খুরশিদ প্রচারের জন্য তাঁকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। খুরশিদ বলেছেন, পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ করার নীতি পাকিস্থান পছন্দ করে না। দুই রাষ্ট্রের জন্য দুই গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হোক পাকিস্থান এইরকম ব্যবস্থাই সমর্থন করেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনকেই ভারতের গভর্নর-জেনারেল হতে হবে। খুরশিদের মতে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনকে চলে যেতে দেওয়া সম্ভবপর হবে না, কারণ এখনো এমন সব কাজ বাকি পড়ে রয়েছে যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনকেই ক'রে দিয়ে যেতে হবে এবং সে কাজ একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনই করতে পারেন।

বব স্টিমসনও এসে আমাকে জানালেন যে, তাঁর কাছেও খুরশিদ ঠিক এই ধরনেরই উক্তি করেছেন। এ ছাড়া স্টিমসনকে একটি নতুন কথাও বলেছেন খুরশিদ। পাকিস্থানের যিনি গভর্নর-জেনারেল হবেন, তাঁর বিশেষ একটি ব্যক্তিগত গরিমা থাকা চাই। খুরশিদ বলেছেন, ইংলণ্ডের রাজবংশেরই কোন ব্যক্তি ছাড়া পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা চলবে না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সাল : পাঞ্জাব এবং বাংলা নিজ নিজ প্রদেশের খণ্ডন সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর ফলে এখন এই দুই প্রদেশের এক একটা অর্ধ-খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই নতুন গণপরিষদের রচনায় তাঁদের যথাবিহিত অংশ গ্রহণ করবেন। দেশখণ্ডনের আসল ব্যবস্থাযন্ত্র তৈরি হয়েছে এবং এইবার তার কাজও আরম্ভ হলো। এতদিন ধরে যে 'দেশবিভাগ কমিটি' কাজ করছিল, সে কমিটি শুধু অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের কংগ্রেস পক্ষ ও লীগ পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এইবার 'দেশবিভাগ কমিটি' উঠিয়ে দিয়ে স্থাপিত হলো একটি 'দেশবিভাগ পরিষদ' এবং সদস্যপদও আর শুধু কংগ্রেস পক্ষ ও লীগ পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হলো না। জিন্নাও দেশবিভাগ পরিষদের সদস্য হয়েছেন। এখন থেকে দেশবিভাগ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এই পরিষদ।

আজ নবপ্রতিষ্ঠিত দেশবিভাগ পরিষদের প্রথম বৈঠক হলো। বৈঠকে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। পূর্বের মতো আজও আবার মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন যে, কোন বিরোধীয় বিষয়ে তিনি সালিশকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না, শুধু সভার কার্য চালিয়ে যাবেন।

মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সালিশকারীর ভূমিকা গ্রহণের কোন প্রয়োজনও এখন থেকে আর হবে না। জিন্না প্রস্তাব করলেন, পাঞ্জাব ও বাংলার দুই সীমানা-কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে আমন্ত্রণ করা হোক। জিন্নার এই প্রস্তাব পরিষদের বৈঠকে বিস্ময়কর সমর্থন লাভ ক'রে

অবিসম্বাদিতভাবেই গৃহীত হলো। জিন্না এই প্রস্তাবও করলেন যে, দুই সীমানা কমিশনের চূড়ান্ত অভিমত নির্ণয়ের ব্যাপারে চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফের 'কাস্টিং ভোট' প্রয়োগের অধিকার থাকবে। এ প্রস্তাবে সকলেই একমত হলেন।

নেহরুও কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং প্রস্তাবগুলি সকলের সমর্থনে গৃহীত হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ কমিশন যেসব বিষয় বিবেচনা করবেন, সেই সম্পর্কে উল্লেখ করলেন নেহরু। নেহরুর মতে, কয়েকটি অতি সাধারণ ও সরল তথ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কমিশন সীমানা নির্ণয়ের কাজ ক'রে যাবেন। দুই প্রদেশকেই একটানা মুসলমানপ্রধান ও একটানা অমুসলমানপ্রধান অঞ্চল হিসাবে দুই ভাগ করতে হবে। কিন্তু এই নীতি অনুসারে সীমানা নির্ণয়ের ব্যাপারে 'অন্যান্য কতগুলি বিষয়ও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।' নেহরুর এই প্রস্তাবে বস্তুত একটা আপোষ হয়ে গেল। কংগ্রেস ও লীগ, দুই পক্ষেরই ইচ্ছার মর্যাদা এর মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। মুসলিম লীগ মনে করলেন যে, 'অন্যান্য কতগুলি বিষয়েও' বিবেচনার নীতি গৃহীত হওয়ায় তাঁদের পক্ষ থেকে কলকাতা শহর দাবী করবার সুযোগ পাওয়া গেল। কংগ্রেস ও শিখ পক্ষ মনে করলেন, অধিবাসীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অন্যান্য অধিকারের বিষয়গুলিকে বিবেচনার বিষয় ক'রে তুলে পাঞ্জাবের সীমানা নির্ণয়ের ব্যাপারে সুবিধা আদায়ের সুযোগ পাওয়া গেল।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সাল : দেশবিভাগ পরিষদের বৈঠকে সীমানা নির্ধারণের পন্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল যে, সীমানা নির্ণয়ের সব সমস্যা ও ঝঞ্ঝাট রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আপত্তি করেছেন নেহরু। নেহরুর মতে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সীমানা নির্ণয়ের ভার গ্রহণ করলে সঙ্ঘগত নানারকম রীতি ও ব্যবস্থাক্রম অনুসারে রাষ্ট্রপুঞ্জকে অগ্রসর হতে হবে। তার ফলে সমস্ত উদ্যোগই কতগুলি জটিলতার ভারে বিড়ম্বিত হবে এবং অনর্থক বিলম্বের কারণও হয়ে উঠবে।

র‍্যাডক্লিফের সহকর্মী হিসাবে দুই সীমানা কমিশনের প্রত্যেক কমিশনের চারজন ক'রে সদস্য থাকবেন, যাঁরা হাইকোর্টের বিচারপতি। কংগ্রেস এবং লীগ, উভয় পক্ষই দু'জন ক'রে সদস্য মনোনীত করবেন। দু'পক্ষেরই মনোনীত সদস্য নিয়ে যদিও কমিশন গঠিত হবে, তবুও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি কোন অপ্রিয় সিদ্ধান্ত করবার প্রয়োজন হয়, তবে সেটা করবার সব দায়িত্ব র‍্যাডক্লিফের উপরই পড়বে। এই সরল সত্যটুকু অনুমান করবার জন্য ঋষিসুলভ ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আমার ধারণা, এ ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে মাউণ্টব্যাটেন খুব ভাল কাজ করেছেন। সীমানা সম্বন্ধে বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকলে তাঁর বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও কাজে নানারকম বাধা ও অসুবিধা দেখা দেবার আশঙ্কা আছে।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৭ সাল : আজ আমাদের স্টাফের বৈঠকে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল ডন পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ৩রা জুন পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীহট্টে জনমত গ্রহণের যে ব্যবস্থা হয়েছে, ডন সেই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। ভাইসরয়ের আচরণ এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন ডন। শ্রীহট্টে যেভাবে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে ভাইসরয় নিরপেক্ষতার মর্যাদা রক্ষা করছেন না, এই হলো ডনের অভিযোগ। অভিযোগের সমর্থনে একটি প্রমাণও উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন ডন। উত্তর-

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণ বা রেফারেণ্ডামের সমগ্র ব্যবস্থা সামরিক কর্তৃ-পক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্টের রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হবে না। ভাইসরয়ের এই ত্রুটির বিরুদ্ধে ডন মন্তব্য করেছেন।

ডন-সম্পাদকের অভিযোগ শুনে মাউণ্টব্যাটেন প্রথমে সত্য-সত্যই অপ্রস্তুতের মতো বলে উঠলেন—'কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন।' মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কাজের ভিড়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকটা ভেবে দেখবার কথা তাঁর মনে হয়নি। তিনি একটা বিষয় ভাল ক'রে বিবেচনা করতে ভুলে গিয়েছেন যে, সীমান্ত প্রদেশের রেফারেণ্ডামের মতোই শ্রীহট্টের রেফারেণ্ডাম বস্তুত তাঁরই দায়িত্বে পরিচালিত অনুষ্ঠান।

কিন্তু ডন যেসব কারণ দেখিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে আক্রমণ করেছেন, সেগুলি সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্তিকর। শ্রীহট্টের রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থার দিক দিয়ে কোনই ত্রুটি হয়নি। অসুবিধা ও ত্রুটি হয়েছে বলে কোন অভিযোগও শোনা যায়নি।

আমার উপর একটা কাজের ভার চাপানো হলো। ডনের সম্পাদক আলতাফ হুসেনকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, ডনের অভিযোগের বিষয়টি যথোচিত বিবেচনা ক'রে দেখা হচ্ছে। নিজের কথা এবং বক্তব্য প্রকাশে হুসেনের সবচেয়ে বড় গুণ এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যেক কথায় আক্রমণ করতে এবং নিন্দা করতে পারেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে হুসেন এই ভয় দেখিয়েছেন যে,—"যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এই অভিযোগের একটা সন্তোষজনক উত্তর না পাই তবে আমরা পুনরায় এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বাধ্য হব এবং সেই সঙ্গে কতগুলি সোজা কথা খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দেব।"

হুসেন খোলাখুলিভাবে সোজা কথা জানিয়ে দেবার যে ভয় দেখিয়েছেন, সেটা আমারই পক্ষে কথা বলার একটা সুবিধা ক'রে দিয়েছে। আমিও আর দেরি না ক'রে হুসেনকে কয়েকটি সোজা কথা খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়ে এলাম।

হুসেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাবও ক্ষুণ্ণ হলো না। কিন্তু একথা স্বীকার না ক'রে পারি না যে, হুসেন একটু বাড়াবাড়ি করছেন। হুসেনের নেতা জিন্নারও আচরণে একটা ঔদ্ধত্যের ভাব আছে এবং জিন্নাও একটুতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু হুসেন এ ব্যাপারে তাঁর নেতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আজই জিন্নার কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন একটি চিঠি পেয়েছেন। এমন এক চিঠি, যা পড়ে ইস্‌মের মতো মানুষেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। ইস্‌মে স্বভাবত খুবই মার্জিতরুচি এবং শান্ত মেজাজের মানুষ, কিন্তু জিন্নার চিঠি পড়ে ইস্‌মে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মন্তব্য করলেন,—'এ চিঠি রাজার হাত থেকেও নিতে অথবা কোন কুলির হাতেও দিতে আমি রাজি হব না।'

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৩০শে জুন, ১৯৪৭ সাল : বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই তাগিদে দেশবিভাগ পরিষদ অতি দ্রুত সৈন্যবাহিনী ভাগ করার ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। এ বিষয়ে পরিষদে কোন তর্ক ওঠেনি, মতভেদও দেখা দেয়নি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ভাগ করার ব্যবস্থাবিধি সম্পর্কেও কোন মতবিরোধ দেখা দেয়নি।

সৈন্যবাহিনী ভাগ করার জন্য যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার জন্য

সবচেয়ে বেশি প্রশংসা দাবী করতে পারেন অকিনলেক এবং ইস্‌মে। অকিন-লেক নাম দিয়েছেন—'সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন'। এই কথাটার মধ্যেই অকিনলেকের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করার জন্য পরিকল্পিত এই পদ্ধতিকে মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য একটা নিখুঁত পদ্ধতি বলে এখনো মনে করতে পারছেন না।

দেশবিভাগ পরিষদ এখন অতি দুরূহ একটি কাজে হাত দিয়েছেন। ভারতীয় বাহিনী দু'ভাগ করার কাজ। এই অতি বৃহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং এটাও উপলব্ধি করেছেন যে, প্রচেষ্টার আরম্ভের দিকেই মুহূর্তের ভুলে সাধারণ একটা সমস্যা সহজেই সঙ্কটে পরিণত হতে পারে। এই কারণেই, তিনি ঠিক সময় বুঝেই দেশবিভাগ পরিষদের আলোচনা-সভায় এমন এক ব্যক্তিকে আহ্বান ক'রে এনেছেন যাঁর প্রতিভা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্তমানের প্রয়োজনে বিশেষভাবেই কাজে লাগবে। উড়িষ্যার গভর্নর ত্রিবেদী। মহাযুদ্ধের সময় ত্রিবেদী দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে ত্রিবেদীই একমাত্র ব্যক্তি, দেশরক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনকার্যে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে। ত্রিবেদী এরই মধ্যে নেহরু এবং প্যাটেলের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। তা ছাড়া, ত্রিবেদীর আর একদিক দিয়েও একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ত্রিবেদী ব্যক্তিগতভাবে লিয়াকৎ আলি খাঁ'র দীর্ঘকালের বন্ধু। গত এক সপ্তাহ ধরে ত্রিবেদীরই চেষ্টায় অনেকখানি কাজ হয়েছে। দুই পক্ষেরই দাবীকে সত্যিকারের একটা আপোষের পথে আনতে পেরেছেন ত্রিবেদী। যাতে দুই পক্ষই তাঁদের দাবীর কিছু কিছু ছেড়ে দিতে পারেন, তারই পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম হয়েছে, প্রধানত ত্রিবেদীরই চেষ্টার ফলে।

সৈন্যবাহিনী ভাগ করার ব্যবস্থায় এই মূল নীতি গৃহীত হয়েছে : ভারতে অ-মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল এবং পাকিস্থানে মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল থাকবে। ১৫ই আগস্টের পর থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সামরিক পরিচালনার সকল দায়িত্ব ও সমস্যা দুই রাষ্ট্রই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে। দুই পক্ষই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবী করেছেন যে, সামরিক বিষয়েও দুই রাষ্ট্রেরই পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে কোন নিষ্পত্তিই হতে পারে না। 'সামরিক স্বাধীনতাকে'ও দুই পক্ষই বস্তুত একটা সর্ত ক'রে তুলেছেন। জিন্না এবং লিয়াকৎ দু'জনেই একেবারে খোলাখুলিভাবেই বলছেন যে, তাঁরা তাঁদের নতুন গভর্নমেণ্টের (পাকিস্থানের) পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিতে রাজিই হবেন না, যদি তাঁদের রাষ্ট্রের জন্য সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত না হয়ে যায়।

দুই পক্ষই আর একটি বিষয়ে জোর আপত্তি তুলেছেন। ১৫ই আগস্টের পর দুই রাষ্ট্রেরই সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা-যুক্ত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা স্বীকার করতে দু'পক্ষই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এ আপত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, ১৫ই আগস্টের পরেও দুই রাষ্ট্রেই ব্যবস্থাপনার সকল বিষয় ও কাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অকিনলেকেরই থাকবে, যতদিন না দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারী কর্মচারী এবং সম্পত্তি ভাগাভাগির কাজ সম্পূর্ণ হয়।

মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুসারেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হলো যে, 'যুক্ত

দেশরক্ষা পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবেন, বর্তমান সেনাপতি, দুই রাষ্ট্রের দুই (অথবা এক) গভর্নর-জেনারেল এবং দুই গভর্নমেণ্টের দুই দেশরক্ষা মন্ত্রী। সাময়িকভাবে এবং কিছুকালের মতো দুই রাষ্ট্রেরই সৈন্য-বাহিনীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল কাজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এই যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদেরই থাকবে।

দুই ডোমিনিয়নে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হবেন। সুতরাং, কার্যোপাধির সংজ্ঞা নিয়ে যেন কোন ভুলে বা গোলমালে না পড়তে হয়, তার জন্য অকিনলেকের পদের নাম করা হলো 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডার'। ১৫ই আগস্ট থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন না কাজ সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত অকিনলেক সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে থাকবেন। তাঁর কার্যকালের অবশ্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পয়লা এপ্রিলের পর থেকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের আর কোন কাজ থাকবে না। কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কার্যকালের মধ্যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অকিনলেক দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য কোনই দায়িত্ব বহন করবেন না। কোন প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যও পরিচালনার বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁর নেই। বাহিনী বিভক্ত করায় যেসব সৈন্যদলকে এক ডোমিনিয়ন থেকে অন্য ডোমিনিয়নে প্রেরণ করার প্রয়োজন হবে, অকিনলেক শুধু সেই সব সৈন্যদলকে প্রেরণের ব্যবস্থাটুকু তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সম্পন্ন করবেন।

ভারতীয় বাহিনী বিভক্ত করার কাজটাও ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিবেচনা করতে হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য কোন নীতি নিয়ে বাহিনী ভাগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা একেবারেই সম্ভবপর হয়নি। সংশয়, অনিচ্ছেচ্ছা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির এই পরিবেশের মধ্যে উপায়ান্তর না দেখেই ভারতীয় বাহিনীকে ভাগ করার শোচনীয় প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় বাহিনী বিভক্ত করার যে ব্যবস্থাগত একটা সূত্র রচনা করা হয়েছে, কাজের দিক দিয়ে তার চেয়ে বেশি উপযোগী আর কোন সূত্র হতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষের বুদ্ধিতে এর চেয়ে ভাল কোন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভবপর নয় বলেই আমার ধারণা।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, পয়লা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : ১৫ই আগস্ট যেমন এগিয়ে আসছে, পাঞ্জাবের উত্তেজনা তেমনি তীব্রতর হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে ঝড়ের একটি ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছেন অকিনলেক, উৎক্ষিপ্ত খড়ের টুক্‌রো যেমন ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় বাতাসের গতি কোন্ দিকে। দিল্লীর এক শিখ শরণার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি অকিনলেক আজ মাউণ্টব্যাটেনের কাছে পাঠিয়েছেন। শিখ শরণার্থী অভিযোগ করেছেন—'সপ্তম শিখ রেজিমেণ্ট এখনো বসরাতে বসে আপনাদের তৈল-অঞ্চল পাহারা দিচ্ছে, এদিকে শিখের নিজের দেশ গত এক বছর ধরে নানা শোচনীয় ঘটনায় উৎপীড়িত হয়ে আসছে। ভারতের বাইরে যেসব বীর শিখ ভাই রয়েছেন, দেশের এই অবস্থার কথা শুনে তাঁদের মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভারতকে যখন দু'ভাগ করাই হচ্ছে এবং আমাদেরও এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে, তখন বাইরের শিখ ভাইদের এখন ঘরে ফিরিয়েই আনা উচিত। শিখ সিপাহীকে এখন তার স্বজন ও সমাজের কাছেই রাখা কর্তব্য। আমার অনুরোধ, আগামী আগস্টের নাটক আরম্ভ হবার আগেই ভারতের বাইরের শিখদের সত্বর দেশে ফিরে আসবার জন্য আপনি নির্দেশ দান করবেন।'

জেংকিন্‌স্‌ও জানিয়েছেন, লাহোর ও অমৃতসরের অবস্থা ভাল নয়, উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। হাঙ্গামার রূপ বদলেছে। ঘরবাড়ি পোড়ানো খুবই ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং মারামারির ব্যাপারটা সাধারণত চোরা আক্রমণ এবং ছুরিবাজির পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ পুলিশী অথবা মিলিটারি ব্যবস্থার দ্বারা এ ধরনের হাঙ্গামা দমন করা খুবই কঠিন। ভারতের কোন শহর পুড়িয়ে ফেলা কত সহজ কাজ, হাঙ্গামাকারীরা সেটা এখন বুঝে গিয়েছে। সেইজন্য, আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করার অপকার্যে লিপ্ত লোকগুলিই বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এরা ঘরের ভিতরে থেকে জানালা দিয়ে আগুনের বল ছুঁড়ছে। ঘরের স্কাই-লাইট দিয়েও অগ্নিনিক্ষেপের ব্যাপার সমানে চলছে। বাড়ির ছাতে লুকিয়ে থেকে এবং সরু সরু গলির ভিতর গা-ঢাকা দিয়ে এরা অনবরত আগুন ছুঁড়ছে। আড়ালে লুকিয়ে কাজ করবার এই সব সুযোগ থাকাতেই এদের হাতে হাতে ধরে ফেলা প্রায় অসম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

থাকা অথবা যাওয়া

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২রা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ ভাইসরয়ভবনে কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের নেতারা এসেছেন। কংগ্রেস নেতারা বসে আছেন একটি কক্ষে এবং লীগ নেতারা অন্য একটি কক্ষে। দুই কক্ষেই 'খসড়া ডোমিনিয়ন বিলে'র ধারাগুলি পাঠ করার ব্যাপার চলছে। খসড়া ডোমিনিয়ন বিলের নামটা অবশ্য বদলে দিয়ে নতুন একটা জোরদার নাম দেওয়া হয়েছে—'ভারতীয় স্বাধীনতা বিল'।

কিছুদিন থেকে জিন্না এই একটা ছুতো ক'রে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্টাস্পষ্টি জানাবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছিলেন যে, বিলটা একটু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেল পদের প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে কোন ধারণা লাভ করতে পারছেন না এবং কিছু বলতেও পারছেন না। বিলটা পড়বার সুযোগ হবার পরেও, গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যে আসল কথাটা এতদিন ধ'রে জানতে চাওয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। আরও কয়েক ঘণ্টা সময় তিনি এই অজুহাতে কাটিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর যেসব ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নেতা এখন রেফারেণ্ডামের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এবিষয়ে একবার পরামর্শ করতে তিনি ইচ্ছা করছেন।

এতদিন ধ'রে দেরি করিয়ে দেবার পর জিন্না শেষ পর্যন্ত নিজেকে পরিষ্কার করতে পারলেন। এইবার স্পষ্ট ক'রেই কথা বলতে পেরেছেন জিন্না। তিনি নিজের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। জিন্না জানিয়েছেন, পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদে স্বয়ং তিনিই নিযুক্ত হতে চান।

জিন্না এখনো মনে মনে এই মোহ পোষণ করছেন যে, ১৫ই আগস্টের পরেও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেলের উপরে বিচিত্র রকমের একটা পদ গ্রহণ ক'রে এবং বস্তুত একটা বায়বীয় ঊর্ধ্বস্তরে থেকে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যাবতীয় বিষয় ও বস্তু সংগতভাবে ভাগাভাগি করার কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর। জিন্না একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি অনেকখানি তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের অনুরোধের চাপে পড়েই এ সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন্ বন্ধুবর্গ? তাঁদের নাম কি? এই প্রশ্ন করতে গিয়ে একটা কৌতুক অনুভব না ক'রে পারা যায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। জিন্না যা বলেছেন, তার বিপরীতটাই হলো আসল সত্য। আমরা জানি, জিন্নার প্রবীণ সহকর্মীদের সকলেই এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে জিন্নাকে এই সনির্বন্ধ পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করা জিন্নার উচিত হবে না। জিন্নার বন্ধুবর্গ বরং তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকলেই জিন্নার পক্ষে সেটা বেশি ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার ব্যাপার হবে। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন আছেন যে, সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে প্রথম থেকেই এবং স্বাভাবিকভাবেই একটা সুবিধা থেকে যাচ্ছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন যদি আগামী আট

মাস (আগস্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত) দুই ডোমিনিয়নের যুক্ত গভর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে সেটা পাকিস্থানেরই পক্ষে অনেক সুবিধার ব্যাপার হবে।

মাউণ্টব্যাটেনও জিন্নাকে খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে কি ক্ষতি হতে পারে, তা কি জিন্না ভেবে দেখেছেন? জিন্না অত্যন্ত প্রসন্নভাবেই স্বীকার করলেন—হ্যাঁ ক্ষতি হবে। পাকিস্থান সম্ভবত তার প্রাপ্য সম্পত্তির মধ্যে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে, এই ক্ষতি।

জিন্না স্পষ্ট ক'রেই মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, ১৫ই আগস্টের পরে পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদ ছাড়া অন্য কোন পদ তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এ অভিমত শুনিয়ে দিয়েও জিন্না সংগে সংগে আবার এই কথাও বললেন যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত থাকবেন বলে তিনি আশা করছেন। জিন্নার ইচ্ছা, মাউণ্টব্যাটেনই যেন ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেল হন। কারণ, তা'তে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের ও রক্ষার কাজে বিশেষ সাহায্য হবে বলেই জিন্না মনে করছেন।

গভর্নর-জেনারেলের পদ, এই বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে জিন্না তাঁর আচরণে একটা অনিশ্চয় ও অস্পষ্টতার ভাব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রেখে এসেছেন এবং সব শেষে যা করলেন, সেটাও একটা অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। কেউ কল্পনাও করেনি যে, জিন্না সত্য সত্যই পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল হবার ইচ্ছা পোষণ করছেন। আমরা সকলেই ধ'রে নিয়েছিলাম যে, নতুন ডোমিনিয়নের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল না হয়ে জিন্না বরং প্রধান মন্ত্রী পদেরই মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বেশি পছন্দ করেন এবং করতে বাধ্যও হবেন। এই কল্পিত ধারণার উপরেই নির্ভর ক'রে আমরা এমনও অনুমান ক'রে ফেলেছিলাম যে, দুই ডোমিনিয়নের যুক্ত গভর্নর-জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকলে পাকিস্থানের পক্ষে সুবিধা লাভের যে সুযোগ আছে, সে সুযোগ গ্রহণ করতেই জিন্না চাইবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বস্তুত যা দাঁড়াল, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, জিন্না নিজেকেই মনোনীত ক'রে বসে আছেন এবং মাউণ্টব্যাটেনকে মনোনীত করেছেন একমাত্র কংগ্রেস। এরকম সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারিনি এবং কখনো অনুমানের মধ্যেও স্থান দিইনি।

আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো, এরকম অভাবিত অবস্থার মধ্যে এখন কি করা কর্তব্য? সব দিক বিবেচনা ক'রে সকলেরই এই অভিমত হলো যে, মাউণ্টব্যাটেনকে যে সর্তহীন অনুরোধ জানিয়েছেন কংগ্রেস, সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউণ্টব্যাটেনের উচিত। আমরা স্থির করলাম যে, ১৫ই আগস্টের পর ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণে সম্মত হবার জন্য মাউণ্টব্যাটেনকে আমরা বিশেষ জোর দিয়েই আমাদের অনুরোধ ও অভিমত জানাব।

গভর্নর-জেনারেল পদের ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার সম্ভাব্য সব উপায় এখন মাত্র তিনটি উপায়ে এসে ঠেকেছে। (ক) পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল পদে জিন্নার এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে সম্মত হওয়া। কিংবা (খ) পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল পদে জিন্না এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করার জন্য কংগ্রেসকে বলা। অথবা (গ) এমন একটি নতুন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফরমুলা উদ্ভাবন করা, যার দ্বারা মাউণ্টব্যাটেন দুই ডোমিনিয়নেরই গভর্নর-জেনারেল হতে পারবেন, অথচ

পাকিস্থান রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জিন্না যে ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চাইছেন, জিন্নার সে ইচ্ছারও অনেকখানি পূরণ করা সম্ভবপর হবে।

এরই মধ্যে আমি লণ্ডনে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। টেলিগ্রামে এই প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছি যে, ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠাবার জন্য পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করা হোক। পত্রিকার প্রতিনিধি যাতে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা ও অবস্থার কয়েকটা প্রাথমিক বিষয়ের বাস্তব তথ্য জেনে ও বুঝে যেতে পারেন, তারই জন্য এই অনুরোধ করা হয়েছে।

ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা সম্প্রতি তাঁদের অভ্যস্ত 'বিভারব্রুকাগিরি'র এক বেপরোয়া হঠকারিতার নমুনা দেখিয়েছেন। ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁদের পাঠকসমাজের কাছে এই তত্ত্ব পরিবেষণ করেছেন : "ভারতে দুটি ডোমিনিয়ন স্থাপন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যদি দুটি ডোমিনিয়নই স্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে একটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হবে না কেন? সোজা কথায় বলা যায়, যাঁরা এই উদ্যোগে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের যদি যথোপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিভার অভাব না হতো, তবে ভারতকে সহজেই ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ একটি ডোমিনিয়নে পরিণত করা সম্ভবপর হতো।" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আরও নানারকমের মন্তব্যের খোঁচাও আছে, 'বল্কানীকরণ', 'নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যম' ইত্যাদি। ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকেই নিন্দা ক'রে বলা হয়েছে যে, এটা একটা 'রাজনৈতিক নীলাম' মাত্র।

দুঃখের কথা এই যে, যে বিভারব্রুক 'উদার সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠার আদর্শে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী, তিনিই আমাদের চেষ্টার তাৎপর্য কিছুমাত্র বুঝতে পারছেন না। পৃথিবীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে তিনি উদার রাষ্ট্রসমবায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ সফল ক'রে তুলতে চান, আমরাও প্রাচ্যখণ্ডেও তারই প্রতিষ্ঠার আয়োজন করবার জন্য একটা শুভ প্রেরণা নিয়েই কাজ ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বিভারব্রুক এটুকুও উপলব্ধি করতে পারছেন না।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৩রা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বিকালে স্টাফের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর টেবিলের চার দিকে উপবিষ্ট প্রত্যেককে এক এক ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণের বিষয়ে প্রত্যেকে কি অভিমত পোষণ করেন? একজন ছাড়া প্রত্যেকেই জানিয়ে দিলেন যে, ভারত, পাকিস্থান এবং ব্রিটেনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনকে অবশ্যই কংগ্রেসের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে হবে। এটা তাঁর কর্তব্য।

মাউণ্টব্যাটেন বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কারণ, আমরাই এর আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, কোন একটি ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ও সরকারীভাবে যুক্ত হয়ে পড়া মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত হবে না। দুই পক্ষের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন যে নিরপেক্ষ বিচারকর্তার উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ ক'রে রয়েছেন, সে ভূমিকা বর্জন করা মাউণ্ট-ব্যাটেনের উচিত হবে না। আমাদের এই অভিমতের কথা মাউণ্টব্যাটেন জানতেন। তাই আমাদের নতুন অভিমত শুনে এবং আমাদের এরকম সম্মিলিতভাবে একমত হতে দেখে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অবস্থার

স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা অভিমত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। জিন্নার সিদ্ধান্ত অবস্থার বাস্তব পটভূমিকাই রূঢ়ভাবে বদলে দিয়েছে। আমরা এখন এটা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছি যে, পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদে নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে জিন্না সম্পূর্ণরূপে একটা নতুন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

এইবার আমার উত্তর দেবার পালা। আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন, এ বিষয়ে আমার মত কি?

আমার বক্তব্য আমি লিখেই নিয়ে এসেছিলাম। গভর্নর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে ব্যবস্থা করার বিষয়ে যে তিনটি সম্ভাব্য উপায় আমরা গতকালই বিবেচনা করেছিলাম, আমার বক্তব্যে প্রধানত সেই তিনটি উপায়েরই কথা আমি উল্লেখ করেছি। এই তিন উপায়ের কোন একটি উপায়ে যদি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে বৃহত্তর জন-মতের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, আমি বিশেষভাবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমার বক্তব্য রচনা করেছি। আমার বক্তব্য :

"একটা বাজে কথা রাজনীতিক মহলে খুবই বেশি প্রচারিত হয়েছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাকিস্থান বস্তুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাটি হয়ে উঠবে এবং কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অতি দ্রুত আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু এটা নিতান্তই বাজে ধারণা। এরকম আশঙ্কা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, সেটা ইতিমধ্যেই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন, কলভিল এবং নাই, এই তিন ব্রিটিশকেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা কংগ্রেস ঘোষণা করেছেন। এর পর আর ওধরনের সমালোচনার কোন ভিত্তি থাকে না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সত্তর বছর ধ'রে সংগ্রাম করার পর আজ কংগ্রেস তার সাফল্য ও জয়লাভের মুহূর্তে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহে কয়েকজন ইংরাজকেই ভারতে এইভাবে দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার দিয়ে ধ'রে রাখতে চাইছেন, এ ঘটনা ব্রিটিশেরই মর্যাদার দিক দিয়ে একটি বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

"কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আমন্ত্রণে বস্তুত ব্রিটিশ-ভারত সম্পর্কেরই একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এর ফলে নতুন ভারতের সংগে আমরা আরম্ভেই এমন এক সম্পর্কের সূত্র রচনার সুযোগ পাচ্ছি, যার বাস্তব সুফল আমাদের আশার সীমাও ছাড়িয়ে যাবে। মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলে লোকে ধারণা করবে যে, মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছেন, এমন আশঙ্কাও কেউ কেউ প্রকাশ করছেন। কিন্তু এ আশঙ্কাও অমূলক। কারণ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে শুধু কংগ্রেসেরই অনুরোধ রক্ষা করা হবে না, জিন্নারও অনুরোধ রক্ষা করা হবে। জিন্নাও ঠিক এই ব্যবস্থাই চাইছেন। নতুন ভারত রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকলে বরং জনমতে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা দৃঢ়তর হবে যে, ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধের পথে না গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পথেই চালিত হবার সুযোগ পাবে। বর্তমান অবস্থায় ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের অবস্থান বস্তুত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাছাড়া বৃহত্তর জনমতের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসও দেখা দেবে যে, সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যাপারে কোন

বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি মাত্রাছাড়া দাবী উত্থাপিত হয়, তবে মাউণ্টব্যাটেন স্বাভাবিকভাবেই সে দাবীর প্রতিবন্ধক হবেন।

"আর একটা কথা উঠেছে। জিন্না তাঁর বর্তমান মনোভাব এবং পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নিয়ে পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল হবেন, আর মাউণ্টব্যাটেন হবেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল। এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের উপর এমন কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। এই যুক্তির সারবত্তা অবশ্য কিছুটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এটা হলো ভিন্ন সমস্যা, এর জন্য জনমতের দিক থেকে কোন সমস্যা দেখা দেবে না। কোন সন্দেহ নেই যে, নিয়মতান্ত্রিক বিধান অনুসারে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল হওয়ায় তাঁর পক্ষে ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত করার সুযোগও সীমাবদ্ধ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সত্যও ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত হবে যে, ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত ও উন্নত করার কিছুমাত্র যোগ্যতা যদি কারও থেকে থাকে, তবে একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই আছে। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন যা করতে পারবেন, তার চেয়ে বেশি কিছু করবার সাধ্য অন্য কারও নেই। কারণ, এই সঙ্কটের কালে জিন্নার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ মাউণ্টব্যাটেনের হয়েছে, সে অভিজ্ঞতা অন্য কারও নেই।

"সমালোচকের আর একটি প্রশ্ন হলো, মর্যাদার প্রশ্ন। এই যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতিভূ হয়ে ভাইসরয়ের পদে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেল হচ্ছেন। সে ভারত আবার সমগ্র ও অখণ্ড ভারত নয়। পাকিস্থান নামে বিরাট একটা অংশ বাদ দিয়ে 'ভারত ডোমিনিয়ন' নামে পরিচিত একটা অংশের গভর্নর-জেনারেল। এ ব্যাপার মাউণ্ট-ব্যাটেনের ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক দিয়ে বস্তুত নেমে যাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু আমি মনে করি, এই যুক্তিও অর্থহীন। কিসের থেকে, কোন্ অবস্থা থেকে নেমে যাচ্ছেন মাউণ্টব্যাটেন? দেখতে হবে, মাউণ্টব্যাটেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছেন। তিনি এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের এক নতুন সম্পর্কের অধ্যায় আরম্ভ ক'রে দিয়ে যেতে। 'শেষ ভাইসরয়ের' মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি এখানে আসেননি। তাঁর কাজ অতীতের কোন বস্তুকে সুরক্ষিত

করা নয়, তিনি নতুন ভবিষ্যতের সূচনা ক'রে দিতে এসেছেন। সুতরাং বিশেষ জোর দিয়েই বলতে পারা যায়, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা থেকে নেমে যাওয়ার কোন প্রশ্ন এক্ষেত্রে নেই।

"১৫ই আগস্ট তারিখে মাউণ্টব্যাটেন যদি ভারতে অন্য কোন ব্যক্তিকে গভর্নর-জেনারেলের পদে দেখতে পান এবং তাঁর হাতে কার্যভার ছেড়ে দিয়ে চলে যান, তবেই বরং মাউণ্টব্যাটেনের আচরণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। সমস্ত সমস্যা যখন উদ্বেলিত হয়ে ঘটনাতরঙ্গের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় মাউণ্ট-ব্যাটেনের চলে যাওয়ার অর্থ এই হবে যে, তিনি পরিণামের সব দায়িত্ব এড়িয়ে সরে পড়েছেন। লোকে জানবে যে, কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেনকে কোন সর্তেই আবদ্ধ না ক'রে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণে অনুরোধ করেছিলেন, অথচ মাউণ্টব্যাটেন সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে গেলেন। এর ফলে নানা রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং যেমন বর্তমান, তেমনি ভবিষ্যতেও এই সমালোচনার জেরও চলতে থাকবে। এর ফলে মাউণ্টব্যাটেনের উপর এই অপবাদ

আরোপিত হবে যে, তিনি সব কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পিছনে ফেলে রেখে সোজা পালিয়ে গেলেন।"

আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এর পর বৈঠকে 'বিবিধ বিষয়' আলোচিত হলো। দেশ বিভক্ত করার প্রসঙ্গে এখন 'কুকুরের ক্লাব' বিভক্ত করার প্রসঙ্গও এসে পড়ছে। সত্য সত্যই এই রকম একটা প্রস্তাব দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং এখন আমরা বস্তুত এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হয়েছি—ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভাগ করতে গিয়ে কি একটা 'কুকুরের ক্লাব' পর্যন্ত ভাগ করতে হবে? সম্পত্তি ভাগ করার বিষয়ে মিলিটারী সেক্রেটারির দপ্তরে ভারতের নানা রকমের 'নিখিল ভারতীয়' প্রতিষ্ঠান এই প্রশ্ন ক'রে এবং পরামর্শ চেয়ে পাঠাচ্ছেন যে, দেশ যখন খণ্ডিত হতে চলেছে, তখন তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন? 'কুকুরের ক্লাব' ভাগ করার প্রস্তাব এই ধরনেরই মনোভাবের একটা নমুনা।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা হয়ে গেল। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ সঙ্কট পরিহারের জন্য মাউণ্টব্যাটেন অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টেরই সকল সদস্যকে পদত্যাগ করবার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও লীগ, উভয় পক্ষেরই সদস্যদের পদত্যাগ করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন পদত্যাগী প্রত্যেক সদস্যকে পুনরায় আহ্বান করেছেন প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দপ্তরের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য, যতদিন না পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

মাউণ্টব্যাটেন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, সেটা বস্তুত কালক্ষেপ করবার একটা ব্যবস্থা মাত্র; এর দ্বারা অবশ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে না। কিন্তু এ কাজ না ক'রে মাউণ্টব্যাটেনের উপায় ছিল না, কারণ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত বিসদৃশ রূপ গ্রহণ করেছে। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভিতরে দুই পক্ষের বিরোধের ব্যাপার যেমন জটিল তেমনি বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ৩রা জুনের পরিকল্পনা গৃহীত ও সমর্থিত হবার পর থেকেই মাউণ্টব্যাটেনকে দুটি পরস্পর-বিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চাপে পড়তে হয়েছে। মুসলিম লীগকে লক্ষ্য ক'রে প্যাটেল এই অভিযোগ করেছেন—"যদি আপনারা দেশের শাসনকার্য চালাতে না চান তবে অন্তত আমাদের চালাতে দিন।" কংগ্রেস পক্ষ থেকে বার বার যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তার মধ্যে প্যাটেলেরই এই মূল অভিযোগ আরও জোর দিয়ে সমর্থন করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জিন্নাও তাঁর মনের কথা বিশেষ জোর দিয়েই জানিয়েছেন—মুসলিম লীগ পক্ষের একজন মন্ত্রীকেও যদি অপসারিত করা হয়, তবে মুসলিম লীগ পক্ষের সকল মন্ত্রীই একসঙ্গে পদত্যাগ করবেন। এর দ্বারা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই সত্যই স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আর সহযোগিতা করতে পারবেন না এবং দেশখণ্ডনের সমগ্র উদ্যোগের সকল ব্যবস্থার ও কাজের দায়িত্ব তাঁরা হাত থেকে ধুয়ে ফেলবেন। কোন বিষয়ে লীগকে দায়ী করবার আর কোন যুক্তি থাকবে না। মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, লীগ যদি এরকম কোন ব্যাপার ক'রে বসে, তাহলে ভারতের শান্তি এবং পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠার ভরসা, উভয়ই বিনষ্ট হবে।

দেখতে পাচ্ছি, কংগ্রেস আর দেরি করতে রাজি নন। এই মুহূর্তেই নিজেকে নিজের ঘরের মালিক ক'রে ফেলবার দাবী করছেন কংগ্রেস। দাবীর জোরও দিন দিন বাড়ছে এবং নেহরুও কংগ্রেসের এই দাবীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে

পারছেন না। তিনিও কংগ্রেসের এই মনোভাব এবং দাবী সমর্থন করছেন। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও হানাহানির প্রকোপে পড়ে নেহরু বস্তুত হাঁপিয়ে উঠেছেন। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে লীগ মন্ত্রীদের এখনো থাকবার কি যৌক্তিকতা আছে, এই প্রশ্নের দাবীতেই নেহরু গত সপ্তাহে পদত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

লীগ মন্ত্রীরা দপ্তর ছাড়তে রাজি নন। যদি এমন কোন ব্যবস্থার সূত্র পরিকল্পিত হয় যে, লীগ মন্ত্রীদের হাত থেকে এখন দপ্তরের ভার ছাড়িয়ে নেওয়া হবে, তবে সে ব্যবস্থা জিন্না স্বীকার করবেন না। জিন্না প্রথমেই জানিয়ে রেখে দিয়েছেন যে, এ ধরনের কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করবেন। জিন্নার মতে, এ ধরনের প্রস্তাব বস্তুত লীগকে অপমান করারই প্রস্তাব।

জিন্নার এই মনোভাব লক্ষ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন অন্য ধরনের এমন একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব রচনা করলেন, যার মধ্যে লীগ কোন অপমানের কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাবেন না। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব ঘোষণা করার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটা বিবৃতিও রচনা ক'রে ফেললেন মাউণ্টব্যাটেন। জিন্না যখন দেখলেন যে, 'লীগের অপমানের' প্রশ্ন তুলে আপত্তি করার কোন যুক্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না, তখন জিন্না তাঁর আপত্তির যুক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেললেন। জিন্না বললেন, মাউণ্টব্যাটেনকে এই নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাবে তিনি বাধা দেবেন, কারণ এ প্রস্তাব ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বিধিসঙ্গত নয়।

এ যুক্তি শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন এবং এরকম একটা যুক্তি যে থাকতে পারে সেটাও তিনি ভেবে দেখেননি। জিন্নার কথা নিতান্ত আকস্মিক-ভাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে মনে পড়িয়ে দিল যে, আর একটা দিক ভেবে দেখবার প্রয়োজন এবং দায়িত্ব আছে, কারণ লণ্ডনে খোঁজ নিয়েও মাউণ্টব্যাটেন জানলেন যে, ১৯৩৫ সালের আইনের উপর নির্ভর ক'রে জিন্না যে আপত্তি ও অভিযোগ করছেন, তার যথেষ্ট যুক্তিগত ভিত্তি আছে। মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা বিল আইনে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভারত গভর্নমেণ্টকে পুনর্গঠিত করবার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর নয়।

আজকের স্টাফের বৈঠকেও আমরা গভর্নর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ১৫ই আগস্টের পর শুধু ভারত ডোমিনিয়নেরই গভর্নর-জেনারেলের পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকতে পারেন কি না এবং থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার কি ফল হতে পারে, এই বিষয়টি আজকের বৈঠকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হলো। মাউণ্টব্যাটেনের মনে এবিষয়ে ঘোর সংশয় এখনো রয়েছে এবং আমরা এখনো সে সংশয় দূর করতে পারছি না। মাউণ্টব্যাটেন এই ভয় করছেন যে, ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তাঁকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। তিনি এমন কোন পদ গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছেন না, যে পদে থাকলে তাঁর কাজ ও কর্মক্ষমতার নিরপেক্ষতা খর্বিত হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যে আস্থা ও শুভেচ্ছা তিনি এরই মধ্যে অর্জন করতে পেরেছেন, সেটা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হবে।

মাউণ্টব্যাটেন এখন লণ্ডনের পরামর্শের আশায় রয়েছেন। তিনি ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের কর্তৃস্থানীয় সকলেরই পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন। ইংলণ্ডের নৃপতি এবং প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে নীচের দিকের সকল কর্তাব্যক্তির পরামর্শ সরকারীভাবে

পাওয়ার পর মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মাউণ্টব্যাটেন এই রকমও মনে করছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁকে হয়তো ভুল বুঝবেন। ভারত গভর্নমেণ্ট মনে করবেন যে, মাউণ্টব্যাটেন তাঁদের বিভ্রান্ত করেছেন। একথা অবশ্য তিনি স্বীকার করছেন যে, বর্তমান গভর্নমেণ্ট তাঁর সম্পর্কে এরকম ধারণা যদি করেন, তবে সেটা অসঙ্গত কিছু হবে না। ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে এ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত যে, যুক্ত গভর্নর-জেনারেলের পদটিকেই একমাত্র কাম্য মনে ক'রে এবং সে পদ লাভের সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন অন্য পদকে নিতান্ত মূল্যহীন বলে উপেক্ষা করলেন এবং গভর্নমেণ্টকে এরকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেললেন।

অগত্যা মাউণ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থা করলেন যে, ইস্‌মে অবিলম্বে লণ্ডন চলে যাবেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গৃহীত হবার সময় ইস্‌মেকে সেখানে থাকতে হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোন বিষয়ে কিছু জানবার প্রয়োজন হলে সেটা ইস্‌মের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সরকারীভাবেই গভর্নমেণ্ট জেনে নিতে পারবেন। কিন্তু এটাই ইস্‌মের লণ্ডন যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আর একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে ইস্‌মে যাচ্ছেন। ১৫ই আগস্টের পর মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে থাকা উচিত হবে অথবা ইংলণ্ডে ফিরে আসাই উচিত হবে, এ বিষয়ে 'সর্বোচ্চ' কর্তৃপক্ষের গোপন পরামর্শ ও নির্দেশ সংগ্রহ করবেন ইস্‌মে। আমাকেও ইস্‌মের সঙ্গে যেতে হবে। আমার কাজ হবে, এই সুযোগে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মহলের মনোভাবের উপর লক্ষ্য রাখা। গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের সমস্যায় যে 'নতুন অবস্থা' দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচার ক'রে লণ্ডনের প্রতিক্রিয়া ও জল্পনাকে সংযত করার চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

লণ্ডন, সোমবার, ৭ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : ভাইসরয়ের ইয়র্ক বিমানের আরোহী হয়ে আমরা শনিবার অপরাহ্ণেই পালম ছেড়ে রওনা হয়েছি। আজ চায়ের সময় নর্থহল্টে একবার নামলাম এবং সন্ধ্যা ছটা বাজবার আগেই ইস্‌মেকে দেখা গেল, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী এটলির সঙ্গে বসে তিনি আলোচনা করছেন। সমস্যাটা বুঝতে এটলির একটুও দেরি হয়নি। এটলি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, সমস্যায় যে নতুন ও দুরূহ অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে ভারতে থেকে যাবার প্রয়োজনীয়তা একটুও কমেনি, বরং আরও বেড়েই গিয়েছে বলা যায়।

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ৮ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : গতকাল ডিনারের পর দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে এক বৈঠকে যোগদান করলেন ইস্‌মে এবং মাঝরাত্রি পার ক'রে দিয়ে তবে বৈঠক শেষ হলো। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে ব্যক্তিগতভাবে মাউণ্টব্যাটেনকে যে নতুন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, মন্ত্রীরা সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন। বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পদাধিকার অনুসারে যে ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, সেটা হলো বস্তুত নিরপেক্ষ সালিশকারীর ভূমিকা। কিন্তু ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলে মাউণ্টব্যাটেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই নিরপেক্ষ সালিশকারীর ভূমিকা এবং যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হবেন, কারণ তখন তাঁকে একটি রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ক'রে ফেলতে হবে। নিরপেক্ষতার ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তাঁকে একটা পক্ষভুক্ত অবস্থা স্বীকার ক'রে নিতে হবে। এই অবস্থায় দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ ও মতভেদ

দেখা দিলে নিরপেক্ষতার মর্যাদা নিয়ে মীমাংসার জন্য কোন চেষ্টা করাও মাউন্ট-ব্যাটেনের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে। এই ধরনের সংশয় মন্ত্রীদের কথায় এবং আলোচনায় ফুটে উঠলেও সকল মন্ত্রীই মোটামুটিভাবে মাউন্টব্যাটেনের ভারতে থাকার পক্ষেই মত দিলেন। বৈঠকের সাধারণ অভিমত এই দাঁড়াল যে, গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে কংগ্রেস যে অনুরোধ করেছেন, বর্তমান অবস্থায় সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউন্টব্যাটেনের উচিত হবে। এটলি এমনও বললেন যে, অন্য কেউ নয়, একমাত্র মাউন্টব্যাটেনই এই সমস্যার মধ্যেই কাজ ক'রে যাবার ক্ষমতা রাখেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ সমর্থন ক'রে লিয়াকৎ লিখিতভাবে মুসলিম লীগের যে মনোভাব জানিয়ে দিয়েছেন, লিয়াকতের সেই পত্রও মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে ইস্‌মে পেশ করলেন। মুসলিম লীগের এই মনোভাবের পরিচয় পেয়ে গভর্নমেণ্ট খুবই খুশি এবং আশান্বিত হলেন। শেষ পর্যন্ত বস্তুত এই দেখা গেল যে, মাউন্টব্যাটেনকে একটি রাষ্ট্রের পক্ষে থাকবার জন্য দুই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই অনুরোধ করা হয়েছে।

এর পর ইস্‌মেকে আর এক পক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হতে হলো। আজ সকালে এটলি বিরোধী দলের নেতাদের এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন—স্যালিসবেরি, ম্যাকমিলান, বাটলার, স্যামুয়েল এবং ক্লেম ডেভিস। বিরোধীদের এই বৈঠকে সমস্যার বিষয়টি বর্ণনা করলেন ইস্‌মে।

ইস্‌মের কাছ থেকে সমস্যার বিবরণ শুনে নিয়ে বিরোধী পক্ষের নেতারা তারপর এক এক ক'রে তাঁদের মত প্রকাশ করলেন।

প্রথমে কথা বললেন লর্ড স্যামুয়েল। এর আগে লণ্ডনে আমারই ফ্ল্যাটে একদিন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে স্যামুয়েল যে কথা বলেছিলেন, আজও তিনি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেলের উপরে ভাইসরয়ের মর্যাদা নিয়েই পরিচালকপদে মাউন্টব্যাটেন অধিষ্ঠিত থাকবেন, এইরকম একটি ব্যবস্থাই কল্পনা করেছিলেন স্যামুয়েল। আজকের সভাতেও তিনি তাঁর কল্পিত এই ব্যবস্থার কথাই উত্থাপন করলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে সকলকে সম্মত করাবার জন্য পীড়াপীড়িও কম করলেন না।

কিন্তু সভার সাধারণ অভিমত এই হলো যে, এখন আর ও-ধরনের ব্যবস্থার প্রস্তাব কাজের দিক দিয়ে নিতান্তই অবান্তর, কারণ যে সময়ে এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করার সুযোগ ছিল, সে সময় পার হয়ে গিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় স্যামুয়েলের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর নয়। এসব যুক্তি ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, স্যামুয়েলের প্রস্তাব কংগ্রেস কখনই সমর্থন করতে পারবেন না।

ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ মাউন্টব্যাটেনের গ্রহণ করা উচিত, এ প্রস্তাবের পক্ষে লিবারেল নেতারা অবশ্য তাঁদের পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন জানালেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতারা এরকম স্পষ্ট ক'রে কোন সমর্থন জানাতে পারলেন না। তাঁরা বললেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা প্রত্যেকেই যদিও এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে এখনই কোন কথা দিতে পারেন না। চার্চিল এবং ইডেনের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

চার্চিল সম্প্রতি রোগ থেকে সেরে উঠেছেন এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য এখন চার্টওয়েলে দিন যাপন করছেন। ইডেনও বিশেষ কারণে আজকের সভায়

উপস্থিত থাকতে পারেননি। এটলি প্রস্তাব করলেন, ইস্‌মেরই এখন সোজা চার্টওয়েলে গিয়ে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

দেরি করলেন না ইস্‌মে এবং সোজা চার্টওয়েলে গিয়ে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনা হলো।

ইস্‌মের মনে সম্ভবত এইরকম একটা আশঙ্কা ছিল যে, চার্চিলের সঙ্গে এ সাক্ষাৎ সুখের ব্যাপার হবে না এবং আলোচনার ফলও সুবিধের হবে না। কিন্তু এই মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইস্‌মের মন থেকে সে আশঙ্কার ছায়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চার্চিল বললেন, জিন্না নিজেই পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল হবেন বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাতে 'অবস্থার' আদৌ কোন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তারযোগে ভাইসরয়কে জানিয়ে দেবার জন্য চার্চিল তখনই তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে একটি 'বার্তা' ইস্‌মের হাতে দিয়ে দিলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে প্রেরিত চার্চিলের বার্তার মর্ম হলো : গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে সকল বিষয়ে তথ্য জানবার ও গ্রহণ করবার এবং গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দেবার যে অধিকার নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেলের আছে, সে অধিকার সীমাবদ্ধ নয়। এই অধিকারের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর নতুন গভর্নমেণ্টকে যে সাহায্য করতে পারেন, সেটা না-করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। অবশ্য মাউণ্ট-ব্যাটেনকে এমনও অবস্থায় পড়তে হতে পারে যে, নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল হয়েও তিনি গভর্নমেণ্টের কোন কাজে আসছেন না এবং কোন সাহায্যও করতে পারছেন না। কখন এবং কোন্ অবস্থা দেখা দিলে গভর্নমেণ্টের সাহায্যে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে আর কিছু করবার উপায় থাকবে না, সেটা উপলব্ধি করা মাউণ্টব্যাটেনেরই বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। ১৫ই আগস্টের পরেও ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে থাকলে মাউণ্টব্যাটেন সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রশমনে, দেশীয় রাজন্যদের স্বার্থরক্ষায় এবং কমনওয়েল্‌থের প্রতি ভারতের আগ্রহ দৃঢ়তর করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা ও প্রভাব কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। এসব কাজের রাজনৈতিক লাভের দিকটার উপরেই চার্চিল বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চার্চিল মনে করেন, রাজনীতির দিক দিয়েই মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করার বিশেষ একটা মূল্য আছে।

অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন ইস্‌মে এবং চার্চিলের বার্তা তৎক্ষণাৎ বেতারে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। দ্রুত লণ্ডনে ফিরে এসে চার্চিলের সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ইস্‌মে এবং চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা এবং দিল্লীতে প্রেরিত চার্চিলের বার্তার কথাও জানিয়ে দিলেন।

চার্চিল সুস্পষ্টভাবেই তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে অন্য যেসব কথা তাঁর এই বার্তায় উল্লেখ করেছেন, তাতে এক মহৎ মানুষের উদার দৃষ্টির বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। নিখুঁত যুক্তির সঙ্গে নিজের মনের আসল কথাটিকে ব্যক্ত করার এবং জটিল ঘটনা ও সমস্যার ভিতর থেকে আসল কাজের বিষয়টি দ্রুত খুঁজে বের ক'রে নেবার যে ক্ষমতা চার্চিলের আছে, মাউণ্টব্যাটেনের কাছে প্রেরিত তাঁর এই বাণীটিই তার একটি সার্থক উদাহরণ। চার্চিলের বক্তব্য শুনবার পর প্রত্যেকেই আশ্বস্ত হয়েছেন বলে বুঝতে পেরেছি।

প্রত্যেক দিনেরই এক একটি ঘটনায় একটা বিষয়ে আমিও নিঃসংশয় হয়ে যাচ্ছি। ঘরোয়া আলাপ ও আলোচনার দ্বারা কূটনৈতিক কাজ কত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে

সফল ক'রে তুলতে পারা যায়, প্রতিদিন তারই প্রমাণ পাচ্ছি। দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেন এবং লণ্ডনে গভর্নমেণ্ট ও বিরোধী দল, এই দুই দিকেরই যুক্তি, অভিমত এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যেসব সংশয় ছিল সেগুলি ইস্‌মে বস্তুত অতি দ্রুত শুধু ঘরোয়া আলোচনার দ্বারাই অপসারিত ক'রে ফেলতে পেরেছেন। দূর থেকে রাশি রাশি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও স্মারকলিপি আদান-প্রদান করলেও এ কাজ এতটা সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হতো না।

লণ্ডন, শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ইস্‌মের কাছে আহ্বান এসেছিল। শুধু বাকিংহাম প্রাসাদ নয়, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটেও ইস্‌মেকে একবার ঘুরে আসতে হয়েছে। ইস্‌মের বর্তমান দৌত্য এখানেই শেষ হলো, কারণ আর তাঁর জ্ঞাতব্য কিছু নেই। লণ্ডনের সর্বসমর্থিত ও চূড়ান্ত অভিমত এইবার আমরা মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিতে পারব।

ব্রিটেনের সংবাদপত্রের অভিমতও আমি এর মধ্যে সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি এবং এ ক'দিন এই কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। বহু সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এবং আলোচনা ক'রে আমি যে ধারণা লাভ করেছি, তারই একটি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত আমি আজ রচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠিয়ে দিলাম।

"আমি প্রত্যেকের কাছেই সমস্যার বিষয়টা শুধু জানিয়েছি এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি প্রকাশ করেছি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত কারও কাছেই প্রকাশ করিনি। আমি এ কথা আজ আপনাকে স্পষ্ট ক'রেই জানাতে পারি যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্রের অবিসংবাদিত অভিমত হলো, ১৫ই আগস্টের পরেও ভারতে আপনার থাকবার প্রয়োজন আছে। আপনি গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং সমগ্র বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ক'রে আপনার আচরণ সমর্থন করবে। ফ্র্যাঙ্ক ওয়েন বললেন—গত মার্চ মাসে ভারতে যাবার সময় আপনি (মাউণ্টব্যাটেন) যে মর্যাদা নিয়ে গিয়েছিলেন, সে মর্যাদা আজ দু'গুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। মার্চ মাসে পূর্ণ মর্যাদার নব্বই ভাগ আপনার সঙ্গে ছিল, আজ সে মর্যাদা হয়েছে একশত নব্বই। এখন আপনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, ব্রিটিশ জনসাধারণ তাতেই খুশি হবে, একমাত্র এই কারণে যে, সে সিদ্ধান্ত আপনি করেছেন। আপনি যা ভাল মনে ক'রে করবেন, ব্রিটিশ জনসাধারণ তাই ভাল হয়েছে মনে করবে।

"লর্ড লেটন বললেন যে, তাঁর মতে জিন্নার আচরণ একটা স্বার্থপর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বিলাসীর আচরণ বলে সকলেই মনে করবে। গত ডিসেম্বরে জিন্না যখন লণ্ডনে এসেছিলেন, তখন ব্রিটিশ সংবাদপত্র মহলে তাঁর সুনাম ও মর্যাদা চরমে উঠেছিল। কিন্তু এবার থেকে জিন্না সে সুনাম হারাতে আরম্ভ করবেন এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রের চক্ষে মর্যাদার দিক দিয়েও তিনি অনেক ছোট হয়ে যাবেন।"

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পর্কে পার্লামেণ্টের উভয় সভাতেই (লর্ডস্ ও কমন্স্) বিতর্ক আরম্ভ হবার আগে আমি ক্লেমেণ্ট ডেভিস এবং লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। প্রসঙ্গক্রমে আমি বললাম, গত মার্চ মাস থেকে ঘটনা এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে লর্ড স্যামুয়েলের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন দুই ডোমিনিয়নের জন্য একজন অধি-ভাইসরয় নিয়োগ করার কোন সুযোগ এখন আর নেই, বরং বহু বাধা এবং অসুবিধা আছে।

ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গত সপ্তাহেই কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং গৃহীতও হয়েছে। এ বিল নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানের কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি এবং তর্কের তুবড়িবাজিও হয়নি। লর্ড সভায় বিলের আজ দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়ে গেল। নক্ষত্রপ্রতীকচিহ্নিত এই লর্ডগোষ্ঠীর সকলের মধ্যে স্যামুয়েলই সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার উপসংহারে স্যামুয়েল এক স্মরণীয় উক্তি করলেন।— "এই বিল ইতিহাসেরই এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হতে চলেছে।"

গত মার্চ মাসের বিতর্কে হ্যালিফ্যাক্স ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের আলোচনা করতে গিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তাঁর স্বাধীনচিত্ততারই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বিল সম্বন্ধে তিনি তাঁর দলের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দিষ্ট পথ থেকে কিছুটা সরে দাঁড়াতেও দ্বিধা করেননি। যেখানে প্রশংসা করা উচিত বলে তিনি মনে করেছেন, সেখানে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। আজকের বক্তৃতাতেও হ্যালিফ্যাক্স বললেন : "এই জটিল সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে মহামান্য সম্রাটের গভর্নমেণ্টের পক্ষে যে সাহস ও পরিণামদর্শী বিচারবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত ছিল, গভর্নমেণ্টের আচরণে তার পরিচয় পেয়েছি। আমি মনে করি, মহামান্য সম্রাটের গভর্নমেণ্টের যে প্রতিনিধি বর্তমানে ভারতে রয়েছেন, তাঁরই অদম্য কর্মশক্তি এবং অতুলনীয় গুণাবলী এই বৃহৎ উদ্যমে প্রধান সহায়তা দান করেছে। বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিক দিয়েই এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও মূল্য বেশি। আমাদের চিন্তায় দূর-ভবিষ্যতের জন্য যেসব আশা ও পরিকল্পনা আমরা পোষণ করছি, তারই সাফল্যের পথ এই বিলের দ্বারা সুগম করা হয়েছে।"

কমন্স সভার বিতর্কেও একটা নতুন ব্যাপার দেখবার সুযোগ পেলাম। লেবার (শ্রমিক) দলের প্রধানেরাই শুধু নয়, সাধারণ সদস্যেরাও ভারত খণ্ডনের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তবসম্মত বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন। তাঁরা এ ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে সমর্থন তো করলেনই, অনেকে নীতিগতভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে অভিনন্দন জানালেন।

লণ্ডন, শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কার্যে আমার এ সময় লণ্ডনে আসা খুবই সময়োচিত হয়েছে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর এখানকার সংবাদপত্রগুলিকে একটা বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—সংবাদ সংগ্রহের সমস্যা। কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের জানিয়েছি যে, ভারত খণ্ডন হয়ে যাবার পর, দিল্লী-সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত পাকিস্থানের ঘটনাবলীর বিবরণ এবং করাচী-সংবাদ-দাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ভারতের ঘটনাবলীর বিবরণ, উভয়কেই নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করলে অসুবিধায় পড়তে হবে। দুই রাজধানীর দুই সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অপর রাষ্ট্রের বিবরণ প্রকাশ ক'রে সংবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না এবং সে চেষ্টারও কোন অর্থ হয় না। কোন কোন সম্পাদক অবশ্য সমস্যাটা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু অধিকাংশই এ বিষয়ে এখনো উদাসীন। ভারতীয় উপমহাদেশে এবার থেকে তাঁদের পত্রিকার প্রতিনিধিসংখ্যা যে দ্বিগুণ করতে হবে, সে দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনো এ'রা সচেতন হননি। যাই হোক, আমি লণ্ডনে এসে এ-দায়িত্ব তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলাম। মনে হয় তাঁরা এবার থেকে বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্বের তুলনায় বেশি সচেতন হবেন।

রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্র

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২২শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বিকালে পালমে এসে নেমেছি। বিমানযাত্রার যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ছয় হাজার মাইল আকাশপথ বিমানে অতিক্রম করার ব্যাপারটা কারও পক্ষে উপভোগ্য ও আনন্দকর হয়েছে বলে কখনো শুনিনি। লণ্ডনের এই ঘটনাপূর্ণ ও অস্থির কয়েকটি দিনের প্রবল ব্যস্ততার প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে আবার ভারতে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু লণ্ডন বেশ ক্লান্ত ক'রেই আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। তবু বিশ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। দেহমনের এই অবস্থা নিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এক সুবৃহৎ আয়োজনের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ করার কাজে এইবার লেগে পড়তে হবে।

লণ্ডনে থাকতেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে আমরা একটা খবর জানতে পেরেছিলাম। ভারতে থাকতেই আমরা দেখে এসেছি, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট পুনর্গঠনের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধে যে সঙ্কট তীব্রতম হয়ে দেখা দিয়েছে, নিকট ভবিষ্যতের সব ব্যবস্থার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এ সঙ্কট পরিহারের একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পেরেছেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। সরকারীভাবে একটা পরিকল্পনা তিনি ক'রে ফেলতে পেরেছেন কিন্তু অবস্থা সেইরকমই আছে। বিরোধ প্রবলভাবেই চলছে, পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হয়নি।

নতুন একটি পরিকল্পনা করেছেন মাউণ্টব্যাটেন, যার ফলে অন্তর্বর্তী গভর্ন-মেণ্টকে বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন দুটি 'অস্থায়ী সরকারের' যুক্ত গভর্নমেণ্টে পরিণত করা হবে। একটি অস্থায়ী সরকার ভারতের এবং অপরটি পাকিস্থানের সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দুই অস্থায়ী সরকারই স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের কাজ ক'রে যাবেন। উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শুধু উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করবেন। এই ব্যবস্থায় এইটুকু সুবিধা আছে যে, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগমন্ত্রীদের পদত্যাগ করবার প্রশ্ন আর দেখা দেবে না।

গত শনিবার, ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্রাটের অনুমোদন লাভ করার পর চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই একটি সরকারী 'অর্ডার' ঘোষিত হলো। এই অর্ডারে বলা হয়েছে যে, গভর্নর-জেনারেল 'দপ্তরের পুনর্বণ্টন' অনুমোদন করেছেন।

এই নতুন ব্যবস্থায় নেহরু এবং প্যাটেলকে অনেক কষ্টে সম্মত করানো গেল। তারপর, জিন্নার কাছে নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মাউণ্টব্যাটেন। প্রত্যেক প্রস্তাবে জিন্না বরাবর যেভাবে প্রথম উত্তর দিয়ে আসছেন, আজও সেই-ভাবেই উত্তর দিয়ে বললেন যে, প্রস্তাবটি তিনি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

মাউণ্টব্যাটেনও কোনদিন যে-কথা জিন্নাকে কখনো বলেননি, আজ এই প্রথম তিনি সেকথা বললেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জিন্নার

কোন অভিমত জানতে চাইছেন না। জিন্নার কোন পরামর্শও তিনি খ‍ুঁজছেন না। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে এবং বিবেচনা অন‍ুসারে একটি 'নির্দেশ' জারী করেছেন। এই নির্দেশের দ্বারা এই ম‍ুহ‍ূর্ত থেকেই একটা নতুন ব্যবস্থাকে সরকারীভাবে প্রবর্তিত করা হলো।

মাউণ্টব্যাটেন একটি ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকা তৈরি ক'রে ফেলেছেন। দেশ বিভক্ত করার প্রত্যেক ব্যবস্থা ও আয়োজনের স‍ুনির্দিষ্ট একটি কার্যক্রম। মাউণ্টব্যাটেনের নিজের স্টাফ, মন্ত্রিবর্গ এবং সরকারী কর্মচারিব‍ৃন্দ, প্রত্যেককেই এই পঞ্জিকায় উল্লিখিত কার্যক্রম্ অন‍ুসারে চলতে হবে। প্রতি তারিখের শীর্ষে বড় হরফে লেখা আছে— "ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হবার আর মাত্র 'এত' দিন বাকি আছে।" দেশবিভাগ পরিষদও সচেতন হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন-পঞ্জিকায় উল্লিখিত কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে বিভাগ পরিষদ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

দেশীয় রাজ্যগ‍ুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সমস্যা জটিল হয়ে রয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন এইবার সে সমস্যার একেবারে ভিতরে গিয়ে পড়লেন। ৩রা জ‍ুনের পরিকল্পনা ঘোষণার প‍ূর্বেই দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন যে নীতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, রাজন্যবর্গের মনোভাবের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা লক্ষ্য করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং এর পর যে ক‍ূটনীতিক পন্থায় তাঁকে অগ্রসর হতে হবে, সেটাও ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন। এইবার তিনি অগ্রসর হবার জন্যই প্রস্তুত হলেন। দেশীয় রাজ্যগ‍ুলির 'রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্র' রচনার কাজ তিনি আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন তৈরি হয়েছেন, রাষ্ট্রভুক্তির এই বিশেষ থলিয়াটির ভিতর প্রত্যেক দেশীয় রাজন্যকে প‍ুরে ফেলবার জন্য কাজ এইবার আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। ভি পি মেনন কংগ্রেসের কাছে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের লণ্ডন রওয়ানা হবার আগের দিনেই 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর' উদ্বোধন ক'রে প্যাটেল তাঁর বক্তৃতায় রাষ্ট্রনীতিক মনীষার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা মাউণ্টব্যাটেনকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। প্যাটেলের বক্তৃতায় মাউণ্টব্যাটেন স্পষ্টভাবেই তাঁর পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থনেরই প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন।

দেশীয় রাজ্যগ‍ুলির মধ্যে হায়দরাবাদই হলো সবচেয়ে দ‍ুর‍ূহ সমস্যা এবং কোনই সন্দেহ নেই যে, হায়দরাবাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, হায়দরাবাদের কাছ থেকে যদি কোন আমন্ত্রণ আসে তবে তিনি হায়দরাবাদে যেতে রাজি আছেন। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, হায়দরাবাদের ব্যাপারে একটা য‍ুক্তিসঙ্গত নিষ্পত্তি করবার একমাত্র স‍ুযোগ হলো, হায়দরাবাদে গিয়ে নিজামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা।

নয়াদিল্লী, ব‍ৃহস্পতিবার, ২৪শে জ‍ুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বেশির ভাগ সময় আমাকে দেশবিভাগ পরিষদের একটা গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ বিব‍ৃতি প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পাঞ্জাবের 'বিভক্ত অঞ্চলে' একটি 'সীমানা ফৌজ' স্থাপন করার পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদের এই বিব‍ৃতিতে ঘোষিত হয়েছে। পাঞ্জাবের চৌদ্দটি জেলার মধ্যে বারটি জেলাকে দ‍ুই পক্ষই দাবী করেছেন। এর মধ্যে কোন্ জিলা কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, এখনো সেটা চ‍ূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়নি। সে কাজের ভার নিয়ে র‍্যাডক্লিফ ব্যস্ত রয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে এই বারটি জেলা বস্তুত বিরাট একটি 'বিরোধীয়' অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার জন্যই সীমানা ফৌজ নামে একটি বিশেষ সামরিক কম্যাণ্ড গঠন করা হলো। কম্যাণ্ডের পরিচালক হয়েছেন মেজর-জেনারেল্ রীস, যিনি চতুর্থ ভারতীয় ডিভিসনের কম্যাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন।

এই নতুন কম্যাণ্ড তথা সীমানা ফৌজের জন্য সৈন্য ও অন্যান্য সকল উপকরণ চতুর্থ ডিভিসন থেকেই নেওয়া হবে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার অফিসার ও সৈনিক থাকবে এই ফৌজে। মুসলমান ও অ-মুসলমান সৈনিক নিয়ে যেসব 'মিশ্রিত' সৈন্যদল চতুর্থ ডিভিসনে রয়েছে এবং এখনো বিভক্ত হয়নি, সেই সব সৈন্যদলকেই সীমানা ফৌজের ভিতরে নেওয়া হয়েছে। ফৌজের অফিসারদের মধ্যে ব্রিটিশ অফিসারদের সংখ্যাই বেশি, ভারতীয় অফিসারদের তুলনায় অনেক বেশি। যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোন একটি অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এত বড় সামরিক ব্যবস্থা কখনো গৃহীত হয়েছে বলে শোনা যায় না। পাঞ্জাবের বিভক্ত অঞ্চলে নিযুক্ত এই সীমানা ফৌজ বস্তুত শান্তি-রক্ষার কার্যে বৃহত্তম সৈন্যসমাবেশের ঘটনা। যে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় এই সময়োচিত রক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে, তার রূপ সুস্পষ্ট ক'রে অনুমান করতে পারা যাচ্ছে না। কি ধরনের অশান্তির রূপ ধরে এবং কতখানি তীব্রতা ও ব্যাপকতা নিয়ে এই বিপদ যে দেখা দেবে, তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু সেই আশঙ্কিত বিপদকে প্রতিরোধ করার জন্য কাজের দিক দিয়ে যতখানি প্রস্তুত হওয়া এবং আয়োজন করা সম্ভবপর, তাই করা হয়েছে। উপমহাদেশের বাকি অংশে যে সাম্প্রদায়িক শান্তি বর্তমান রয়েছে, সে শান্তির ভবিষ্যৎ পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের এই প্রস্তুতি ও সাফল্যের উপর নির্ভর করে। পাঞ্জাবে শান্তিরক্ষার জন্য এই বিরাট সামরিক ব্যবস্থার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ভারতের অন্যান্য অংশের উপরেও পড়বে এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এই ভরসাও বিশেষ সামরিক কম্যাণ্ড গঠনের উদ্যোক্তাদের অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছে।

ব্যবস্থা হয়েছে, উচ্চপদস্থ দু'জন সামরিক কর্মচারী রীসের উপদেষ্টা হবেন। ভারতীয় ফৌজ থেকে একজন শিখ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্থানী ফৌজ থেকে একজন মুসলমান অফিসার। ১৫ই আগস্টের পর ঐ বারটি জেলার সর্বত্র সৈন্য পরিচালনার ও সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রীস গ্রহণ করবেন। দুই ডোমিনিয়নের সৈন্যদলই রীসের পরিচালনাধীনে কাজ করবে। রীস তাঁর সকল কাজের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবেন সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কাছে এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ড দায়ী থাকবেন দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নমেণ্টের কাছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটি সম্পূর্ণভাবে রচনা করবার অবাধ অধিকার ও দায়িত্ব দেশবিভাগ পরিষদ গত সপ্তাহেই মাউণ্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিবৃতির মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ কয়েকটি নীতি ও ব্যবস্থার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। দুই পক্ষকেই (কংগ্রেস ও লীগ) এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে হবে যে, দুই রাষ্ট্রে মাইনরিটি সমাজের নাগরিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকবে। উভয় ডোমিনিয়নেই যেসব ব্যক্তি রাজনীতির ক্ষেত্রে এতদিন ধরে গভর্নমেণ্ট গঠনকারী রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা ক'রে এসেছে, তাদের নাগরিক অধিকারও কোনমতেই ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। দুই গভর্নমেণ্টই দেশের অভ্যন্তরে কোন সমাজের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ ও অত্যাচারের ব্যাপার বরদাস্ত করবেন না। সীমানা

কমিশনের বাঁটোয়ারার দ্বারা যেসব 'বিরোধীয়' অঞ্চলের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে, সেই সব অঞ্চলে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং অশান্তি বিশেষ-ভাবে দমন করতে হবে।

এই বিবৃতি তথা ঘোষণাপত্রে দুই পক্ষই স্বাক্ষরদান করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের চিন্তায় অবশ্য একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিয়েছে। ঘোষণার মধ্যে এই সব প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ ক'রে দিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে, সুযোগ পেয়ে তিনি মস্ত বড় একটা কাণ্ড ক'রে বসেছেন। কিন্তু এর ফল কি হবে কে জানে? মাউণ্ট-ব্যাটেন খুব ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন যে, নেতারা এই বিবৃতি স্বাক্ষর করার সময় কখনই উপলব্ধি করতে পারেননি যে, তাঁরা সত্যি সত্যি কিসের উপর স্বাক্ষর দান করছেন। মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য এ ধারণাও করছেন যে, গত এপ্রিলের 'গান্ধী-জিন্না যুক্ত আবেদনে'র তুলনায় বিবৃতির এই অংশটি উদ্দেশ্য সাধনের দিক দিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অদূর ভবিষ্যতে বিবৃতির এই অংশটিই বস্তুত সকল সম্প্রদায়ের 'স্বাধীনতার সনদ' হয়ে উঠবে।

সকল প্রতিশ্রুতির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অর্থপূর্ণ হলো সীমানা কমিশনের বাঁটোয়ারা স্বীকার ক'রে নেবার প্রতিশ্রুতি। সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, বিনা প্রতিবাদে সে সিদ্ধান্ত দুই পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। সমগ্রভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, এই বিবৃতি বস্তুত অতি বৃহৎ ও আদর্শসম্মত একটি ব্যবস্থার নৈতিক গঠনতন্ত্র এবং মাউণ্টব্যাটেনেরই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বৃহৎ নৈতিক জয়লাভের দৃষ্টান্ত।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ এক সম্মেলনে দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন মিলিত হলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে মাউণ্ট-ব্যাটেনের এই সাক্ষাৎই তাঁর প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ; কারণ এর পর ব্রিটিশরাজের প্রতিভূ ভাইসরয়রূপে মাউণ্টব্যাটেন আর দেশীয় রাজন্যদের সম্মেলনে দাঁড়িয়ে কোন ভাষণ শোনাবেন না। তবুও, এ সম্মেলন নিতান্ত একটা আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্বর্ধনার সম্মেলনে পরিণত হয়নি। এ সম্মেলনকে বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক সম্মেলনই বলা যায়; কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণেই এই সম্মেলন আহূত হয়েছে।

ঘটনার গতি এবং পরিবর্তনের দ্রুততা লক্ষ্য ক'রে দেশীয় রাজন্যেরা কতকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মন স্থির ক'রে উঠতে পারছেন না এবং একমতও হতে পারছেন না। মতভেদের দ্বারা এঁদের মনোভাবও খণ্ডিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনও এখনো এঁদের কাছে স্পষ্ট ক'রে এবং বিশদভাবে কোন নীতির নির্দেশ দিতে পারছেন না। মাউণ্টব্যাটেন যে নীতি গ্রহণ করতে চান, তা সমর্থন ক'রে লণ্ডনের কোন নির্দেশও এখনো এসে পৌঁছয়নি। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা-মিশনের প্রস্তাব এবং ৩রা জুনের ঘোষণা, উভয়েরই মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি সামান্য যেটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এইটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মাত্র 'ব্রিটিশ ভারতে'র কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন। অর্থাৎ, এ ব্যাপারের সঙ্গে যেন দেশীয় রাজ্যগুলির কোন সম্পর্ক নেই, মাত্র ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন।

ভি পি মেনন যে 'রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্র' রচনা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেন তারই উল্লেখ ক'রে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বোঝাবার মতো যতখানি শক্তি ও যুক্তি মাউণ্ট-

ব্যাটেনের ছিল, সবই প্রয়োগ ক'রে তিনি দেশীয় রাজন্যদের মন থেকে দ্বিধা ও কুণ্ঠার ভাব অপসারণের চেষ্টা করলেন। শেষে স্পষ্ট ক'রেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব ও অনুরোধ করেছেন, সে প্রস্তাব ও অনুরোধ ভবিষ্যতে আর দ্বিতীয়বার করতে আসবেন না কংগ্রেস। এমন কি, কংগ্রেস এখনো এই প্রস্তাবকেও তাঁদের একটা পূর্ণ-সমর্থিত চূড়ান্ত প্রস্তাব বলে ঘোষণা করেননি। 'রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে'র অন্তর্নিহিত নীতি কংগ্রেস সমর্থন করেছেন, এই মাত্র। এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করছে মাউণ্ট-ব্যাটেনের কৃতিত্ব ও সাফল্যের উপর। প্যাটেল যদি দেখতে পান যে, মাউণ্টব্যাটেন দেশীয় রাজন্যদের কাছ থেকে একেবারে ঝুড়িভর্তি ক'রে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র নিয়ে আসতে পেরেছেন, তবেই কংগ্রেস সম্ভবত এই ব্যবস্থাকে স্থায়িভাবে স্বীকার ক'রে নেবেন।

সম্মেলনে উপস্থিত দেশীয় রাজন্যদের মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ১৫ই আগস্টের পর থেকে তিনি আর ভারতে ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতিভূ হয়ে থাকবেন না, সুতরাং ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ ও মতভেদের ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেনের আর মধ্যস্থতা করবার কোন অধিকার থাকবে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজন্যদের পক্ষ নিয়ে অথবা তাঁদের মুখপাত্র হয়ে দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবার নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্বও মাউণ্টব্যাটেন বর্জন করবেন। আসন্ন ভবিষ্যতের এই অবস্থার তাৎপর্য দেশীয় রাজন্যেরা একটু ভাল ক'রেই বুঝতে চেষ্টা করবেন, এই অনুরোধ জানালেন মাউণ্টব্যাটেন। এ সতর্কবাণীও তিনি শুনিয়ে দিলেন যে, দেশীয় রাজন্যদের মধ্যে যাঁরা নিজের নিজের রাজ্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের নজির দেখিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার আশা করেছেন, তাঁদের ঠকতে হবে। কারণ, যে সব রাজনৈতিক যুক্তির অস্ত্র তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন, সেগুলি আজকের এই পরিবর্তিত অবস্থায় নিতান্ত অচল, পুরনো ও সেকেলে কতগুলি অস্ত্র মাত্র এবং সে-সব কোন কাজেই আসবে না।

সময় বুঝে এবং বেশ জোর দিয়েই মাউণ্টব্যাটেন এইবার এমন একটি মন্তব্য করলেন, যেটা হিজ হাইনেসবৃন্দের একেবারে মনের তারে গিয়ে ঘা দিল। মাউণ্ট-ব্যাটেন বললেন যে, রাজন্যেরা যদি রাষ্ট্রভুক্তির ব্যবস্থায় সম্মত হন, তবে তাঁদের একটি অধিকারে প্যাটেল ও কংগ্রেস কোন বাধা দেবেন না বলেই তিনি বিশ্বাস করেন,—উপাধি লাভের অধিকার। ভারত ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে, সুতরাং ইংলণ্ড-নৃপতির কাছ থেকে খেতাব ও উপাধি গ্রহণের সুযোগ দেশীয় রাজন্যদের থাকবে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ক'রে রাজন্যেরা তাঁদের রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে একরাষ্ট্রভুক্ত ক'রে ফেললে তাঁরা ইংলণ্ড-নৃপতির কাছ থেকে খেতাব ও উপাধি গ্রহণ করতে পারবেন এবং এ অধিকারে কংগ্রেস সম্ভবত হস্তক্ষেপ করবেন না।

মাউণ্টব্যাটেন জানেন, যাঁরা রাজতন্ত্রের সমর্থক, তাঁরা সম্রাটদত্ত উপাধি ও খেতাবকে মত মূল্যবান বলে মনে করেন এবং এই খেতাব ও উপাধি তাঁদের রাজ-গৌরব রক্ষার কত বড় একটা অবলম্বন। মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এ ধরনের প্রতি-শ্রুতির কথা ঘোষণা করারও একটা বিশেষ সুবিধা আছে। তিনি শুধু ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতিভূ ভাইসরয় নন, তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কে ব্রিটিশ-নৃপতির ভ্রাতা। সুতরাং রাজন্যদের কাছে তাঁর মন্তব্যেরও একটা অতিরিক্ত মূল্য আছে এবং এই

বংশগত মর্যাদাই মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে রাজন্যদের সঙ্গে সকল সম্পর্কের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে অতিরিক্ত শক্তি ও সুবিধার বিষয় হয়েছে। এই শাসকগোষ্ঠী বংশানুক্রমে 'রাজত্বে'র অধিকার পেয়ে আসছেন, সুতরাং তাঁদের কাছে সম্রাটবংশীয় ব্যক্তিমাত্রই প্রভুত্বের মর্যাদা লাভ ক'রে থাকেন। আজকের বিকালের এই সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন দেশীয় রাজন্যদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশ করলেন, তার সারমর্ম মাউণ্টব্যাটেনেরই ভাষণের শেষ দিকের একটি উক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন,—"আপনারা আপনাদের রাজ্যের প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের জন্য দায়ী, সেই হেতু প্রজাদের কোন রকমের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে পারেন না। যেমন প্রজাদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে আপনারা সরে যেতে পারেন না, তেমনি ভারত ডোমিনিয়নের সম্পর্ক থেকে সরে যাওয়াও আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ ভারত ডোমিনিয়ন আপনাদের প্রতিবেশী।"

আজ মাউণ্টব্যাটেনকে যে ধরনের সম্মেলনে ভাষণ দিতে হলো, আমি এরকম দুর্বোধ্য এবং অবুঝ কোন সম্মেলন কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সম্মেলনে যাঁরা শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা যেন বংশানুক্রমে অধিকারভোগী এক দল মেষপালক, কিন্তু মেষপাল তাঁদের হারিয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থা লাভের জন্য কারও লোভ হতে পারে না। কিন্তু এ হেন ব্যক্তিবর্গের সম্মেলনকেই বাস্তব-বুদ্ধি নিয়ে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। অবসন্ন ও বিষণ্ণের মনোবল উদ্দীপ্ত করবার অদ্ভুত প্রতিভা আছে মাউণ্টব্যাটেনের। আজও দেখলাম, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর এই প্রতিভাকে দেশীয় রাজন্যদের মনে বাস্তবসচেতন কর্তব্যবোধ জাগ্রত করবার কাজে লাগালেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহ এবং বিবেচনাশক্তির কিছুটা রাজন্যদের মনেও সঞ্চারিত করতে পারলেন। বিষণ্ণ রাজন্যদের উৎফুল্ল করতে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে আলোচনার রীতিও বদলাতে হলো। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে যে সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল, শেষ দিকে সেই সম্মেলনই বস্তুত একটা কৌতুকালাপের আসরে পরিণত হলো, হাল্‌কা হাসি-ঠাট্টার আমোদে। রাজন্যেরা রাশি রাশি অর্থ-পূর্ণ, দুরূহ এবং জটিল প্রশ্ন বর্ষণ করছিলেন, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন তার উত্তরে যা বলছিলেন, তাতে গুরুগম্ভীর সম্মেলন সরস কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল।

জনৈক মহারাজা এ সম্মেলনে আসেননি, কারণ তিনি এখন তাঁর রাজ্যের রাজ-প্রাসাদে নেই, ভারতেও নেই। আছেন বিদেশে। তিনি তাঁর দেওয়ানকে নির্দেশ দিয়েছেন সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার জন্য এবং দেওয়ানও উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, এ সম্মেলনে তাঁর উপস্থিত হবার কোন প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটাকে তিনি এতই তুচ্ছ মনে করছেন যে, দেওয়ানকেও কোন পরামর্শ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। দেওয়ান এখানে উপস্থিত হয়েছেন মাত্র, কিন্তু কোন প্রস্তাবে হাঁ বা না করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই, কারণ মহারাজা তাঁকে কোন রকম নির্দেশ দেননি। এই দেওয়ানকেই লক্ষ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন—'আপনার মহারাজা কি মনোভাব পোষণ করেন, সেটা অবশ্যই আপনার জানা আছে। সুতরাং মহারাজার হয়ে আপনিই কি একটা অভিমত স্পষ্ট ক'রে এখনই জানাতে পারেন না?' বেচারা দেওয়ান উত্তর দিলেন—'মহারাজার মনোভাব সম্বন্ধে আমি কোনই খবর রাখি না এবং টেলিগ্রাম ক'রেও যে মহারাজার কাছ থেকে কোন উত্তর পাব, এমন আশা করি না।'

সভাপতির উপবেশন মঞ্চের উপর একটি টেবিলে কাগজ-চাপার জন্য একটি গোলাকার কাচখণ্ড রাখা ছিল। মাউণ্টব্যাটেন হঠাৎ এই কাচখণ্ডটি হাতে তুলে নিয়ে দেওয়ানকে বললেন—'আমি এইবার এই কাচের ভিতরে তাকাব এবং তারপর যা বলব তাতে আপনার সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।'

মাত্র দশ সেকেণ্ড সময়—সম্মেলনের একটা নাটকীয় স্তব্ধতার মধ্যে মাউণ্ট-ব্যাটেন কাচখণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—"রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেবার জন্যই হিজ্ হাইনেস আপনাকে বলতে বললেন।"

উচ্চ হাসির উচ্ছ্বাসে নীরব সম্মেলন মুখর হয়ে উঠল। এ কৌতুক রাজন্যেরা খুবই খুশি হয়ে উপভোগ করলেন। কিন্তু এ কৌতুকের সঙ্গে যে একটা সবিনয় তিরস্কার মিশে ছিল, সেটাও বুঝতে পারলেন। সকলেই বুঝলেন যে, মাউণ্টব্যাটেন সময়োচিত একটা উপদেশ শুনিয়ে দিয়ে রাখলেন।

এই রাজন্য সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মন ও চিন্তা কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি সেটা বুঝতে মাউণ্টব্যাটেনের একটুও ভুল হয়নি, তাই এই বিচিত্র পন্থাতেই তাঁর বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন। যাঁদের মাথার খুলি বড় বেশি পুরু হয়ে গিয়েছে তাঁদের মস্তিষ্কে কোন বস্তু ঢোকাতে হলে এই ধরনের সরস পন্থাতেই চেষ্টা করা বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাইসরয় ভবনে ফিরে আসবার পর মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। আজকের রাজন্য সম্মেলনেরই কথা আলোচিত হলো। মাউণ্টব্যাটেনকে আমি একথা বলতে দ্বিধা করলাম না যে, গত সাংবাদিক সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন, তার তুলনায় আজকের সম্মেলনেও তিনি কম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। আজকের সম্মেলনে তিনি যে সব কথা যেভাবে বলেছেন, তার ফল ভালই হয়েছে। সকলেরই মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে।

মনে পড়ল, সম্মেলনে প্রদত্ত মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণের একটা প্রামাণ্য রিপোর্ট রচনা করতে হবে সংবাদপত্রের জন্য। আমি প্রস্তাব করলাম, এখনি গিয়ে ভি পি মেননের সঙ্গে বসে এবং আলোচনা ক'রে এই রিপোর্ট প্রস্তুত ক'রে ফেলতে হবে। মাউণ্টব্যাটেন এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, ভি পি মেনন ও আমি আলোচনা ক'রে যে রিপোর্ট লিখব, তাই তাঁর মনোমত হবে। আরও জানালেন, সংবাদপত্রে প্রকাশের আগে রিপোর্ট তাঁকে দেখাবারও প্রয়োজন নেই।

দেশীয় রাজন্যদেরই কথা আর একবার উত্থাপন করলেন মাউণ্টব্যাটেন। রাজন্যেরা যে এত অবাস্তব ও অবান্তর প্রশ্ন করবেন, সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম, যাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁদের চারদিকে এখন কি ব্যাপার চলছে। যদি রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে রাজন্যেরা এখনও সম্মত না হন, তবে তাঁদের নিশ্চিহ্ন হতে হবে।

এখন দেশীয় রাজন্যেরাই বস্তুত একটা সমস্যা হয়ে উঠেছেন। মাউণ্টব্যাটেনও বুঝেছেন, এ সমস্যা তাঁকেও ব্যক্তিগতভাবে নতুন একটা শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে চলেছে। রাজন্যদের নিজেদের মধ্যে কোন সংহতি নেই, তাঁদের পরিচালনা করবার মতো কোন নেতা নেই এবং তাঁরা কারও নেতৃত্ব স্বীকার করেন না। গদির

অধিকারের ব্যাপার নিয়ে এবং রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার নানারকম প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা নিজেরাই শত বিরোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। এই অবস্থা সত্ত্বেও তাঁরা এখনো আশা করছেন যে, স্পষ্ট ক'রে কোনরকম সিদ্ধান্ত ঘোষণা না ক'রে শুধু কালক্ষেপ করতে পারলেই তাঁরা বেঁচে যাবেন এবং তার ফলে এমন একটা সুযোগ পেয়ে যাবেন, যখন ভারত ডোমিনিয়নের রাজনৈতিক আধিপত্যের বাইরে থাকা তাঁদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু চারদিকের ঘটনা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং তার পরিণামও বহুব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এই পরিবর্তনের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছেন রাজন্যেরা। কিন্তু এটা দুরাশা। এভাবে থম্‌কে থাকার কৌশল কোনই কাজে আসবে না।

অতীতে এবং এতদিন ধরে দেশীয় রাজন্যদের সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং সে নীতি যা-ই হোক্ না কেন, বর্তমান অবস্থায় সে নীতির দ্বারাও কোন কাজ হবে না। শেষ ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন আজ দেশীয় রাজ্যগুলিকে যে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন, সেটা সম্পূর্ণভাবেই নতুন একটা অবস্থা। এখন ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির একটা সুষ্ঠু সম্পর্ক নতুন ক'রে স্থাপন করতে হলে তাঁকেই মধ্যস্থ হয়ে কাজ করতে হবে। দেশীয় রাজন্যেরা যদি এভাবে জীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের এক একটা অচল বস্তু-পিণ্ডের মতো পড়ে থাকেন, তবে আগামী পরিবর্তনের একটি ধাক্কাও তাঁরা সামলাতে পারবেন না, সমগ্রভাবেই তাঁদের লুপ্ত হতে হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরেছেন বলেই দেশীয় রাজন্যদের পক্ষে টিকে থাকার একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন। রাষ্ট্রভুক্তির ব্যবস্থায় মহারাজাদের সম্মত হওয়াই তাঁদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। চুক্তিপত্রে বস্তুত দেশীয় রাজন্যদের সমূহ লুপ্ত থেকে আত্মরক্ষা করবার মতো একটা সুযোগের সূত্র দেওয়া হয়েছে। এ চুক্তিপত্র যদি তাঁরা স্বাক্ষর করেন, তবে ভারতের বর্তমান ক্ষমতাভিমুখী রাজনীতির আসল স্রোতের মুখে তাঁদের পড়তে হবে না, একেবারে ভেসে যাবার দুর্ভাগ্য হতে বাঁচতে পারবেন, অথচ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কিত কতগুলি বিশেষ সুবিধা এবং গদির বংশানুক্রমিক অধিকারও অক্ষুণ্ণ থাকবে। রাজন্যদের সম্মুখে সব কিছুই যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, সময়ের ও ঘটনার কোন অর্থ তাঁরা বুঝতে পারছেন না। এখন রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাই এ'দের একমাত্র কর্তব্য। চুক্তিপত্রে তাঁদের যতখানি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এই অবস্থায় তার চেয়ে বেশি কিছু তাঁরা আশা করতে পারেন না এবং তার চেয়ে বেশি কিছু চাওয়াও তাঁদের উচিত নয়।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৬শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : গত রাত্রের ডিনার পার্টির একটা ব্যাপার নিয়ে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেলের সঙ্গে আজ আমার আলোচনা হলো। মহামহিম ভাইসরয় ও তদীয় পত্নী গত রাত্রে জিন্না-পরিবারকে এক ডিনারে আপ্যায়িত করেছিলেন। বড় রকমের কোন ব্যাপার নয়, কতকটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মতোই এ ডিনারে জিন্না-পরিবার, ভাইসরয় ভবনের অতিথিরা এবং মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফের ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ডিনারে বসে জিন্নাই কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বলেই চললেন। নানারকম ঠাট্টা ও হাসির কথা তুলে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন জিন্না। অজস্র কথা বলে যে ধরনের বৃহদাকার এক-একটা ঠাট্টা তৈরি করছিলেন জিন্না, তার মধ্যে হাসবার মতো

কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও জিন্নাই কথা বলে চললেন এবং আর কাউকে কথা বলার কোন সুযোগই দিলেন না। তারপর লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে একটা গল্প শোনাতে আরম্ভ করলেন জিন্না। ডিনারে আলাপরীতির এই বিসদৃশ অবস্থা দেখে মাউণ্টব্যাটেন অগত্যা তাঁর পাশের অতিথির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এতেও বাদ সাধলেন জিন্না। টেবিলের ওপার থেকেই জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে আলাপে বাধা দিয়ে বললেন—'আমি আশা করি, মাউণ্টব্যাটেন আমার এ গল্পটি শুনবেন।'

আর একটি কাণ্ড করলেন জিন্না। প্রচলিত নিয়ম এই যে, রাজপ্রতিভূ ভাইসরয়ই ডিনার কক্ষে অতিথিদের আগে আগে আসবেন এবং যাবার সময়ও অতিথিদের আগে আগে যাবেন। কিন্তু ডিনার শেষ হবার পর যেই ভাইসরয় ও ভাইসরয়-পত্নী উঠে দাঁড়ালেন, জিন্না-পরিবারও একই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ডিনার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় জিন্না-পরিবার ভাইসরয়-দম্পতির সঙ্গে সঙ্গেই হেঁটে চলে গেলেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আজ একটা নতুন কাহিনী শুনলাম। এটাও গতকালেরই একটা বাস্তব ঘটনার কাহিনী। কাহিনীটা এখন শুনতে বেশ মজাই লাগছে, কিন্তু ঘটনার আর একটু এদিক-ওদিক হলে কাহিনীও একেবারে উল্টো রকমের হয়ে যেত।

সিঙ্গাপুর থেকে লর্ড কিলার্ণকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। কিলার্ণ পূর্ববঙ্গের গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে পারেন কি না, এই বিষয়টিই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জিন্নার খুব ইচ্ছা যে, তাঁর দূর পাকিস্থানের গভর্নর পদে একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও শাসন-কর্মকুশল ব্রিটিশকেই নিয়োগ করতে হবে। পাকিস্থানের এই সার্ভিসের সর্ত ও নিয়ম সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে কিলার্ণের অনেক কথা হলো। কথাপ্রসঙ্গে কিলার্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—দার্জিলিং শহরের পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি সেরকম কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে গ্রীষ্মকালে শিলং অথবা আসামের অন্য কোন ঠাণ্ডা পাহাড়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে কি না। কিলার্ণ বললেন, তাঁর সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-পিলে রয়েছে এবং তাঁর বয়সও ছেষট্টি হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার গরম সহ্য করা তাঁর শক্তিতে কুলোবে না। কিলার্ণ একথাও জেনেছেন যে, ঢাকাতে যে বাড়িতে গভর্নরের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা একটা ভাঙা-চোরা বাড়ি। মাউণ্টব্যাটেন কিলার্ণকে জানালেন, এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

কিলার্ণ চলে যাবার পরেই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ। আসাম সম্বন্ধে কতগুলি মামুলি সরকারী বিষয়ে আলোচনা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেরে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন বরদলৈয়ের কাছ থেকে ঢাকা শহর সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য জানতে চাইলেন। মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন—ঢাকাতে কি কোন উঁচু পাহাড়ী জায়গা আছে?

বরদলৈ উত্তর দিলেন—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতায় মাত্র এগার শো ফুটের চেয়ে বেশি উচ্চ কোন স্থান পূর্ববঙ্গেই নেই।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন দার্জিলিং সম্বন্ধে বরদলৈয়ের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—দার্জিলিং জায়গাটা কেমন? র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারাতে দার্জিলিং শহর

কোন্ ডোমিনিয়নের ভাগে পড়বে বলে আপনি মনে করেন? ভারতে, না পাকিস্থানে?

বরদলৈ বললেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, দার্জিলিং ভারতেরই ভাগে পড়বে।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন আসামের শিলং ও পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে বরদলৈকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের এই সব প্রশ্নের সমস্ত উদ্দেশ্যটাকেই একেবারে ভুল বুঝলেন বরদলৈ। অত্যন্ত বিচলিত, উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে সোজা গান্ধীর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন বরদলৈ—দার্জিলিং, শিলং এবং আসামের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্থানের ভিতর ঢুকিয়ে দেবার জন্য মস্ত বড় একটা চক্রান্তের ব্যাপার চলছে।

বরদলৈয়ের কথা শুনে গান্ধী বললেন যে, ব্রিটিশের পক্ষে এরকম ভিতরে ভিতরে একটা কাণ্ড করবার চেষ্টা যদিও একেবারেই অসম্ভবপর বলে তিনি মনে করেন না, তবুও তিনি এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের কোন সংস্রব আছে।

এর পর বরদলৈ গেলেন প্যাটেলের কাছে। বরদলৈয়ের কাছ থেকে সব কথা শুনে প্যাটেল মেজাজ হারালেন। এর ফলে এই হলো যে, আজ সকালে ভি পি মেনন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে এলেন এবং আতঙ্কিতভাবে একেবারে মাউণ্টব্যাটেনের শয়নকক্ষের কাছে এসে হাজির হলেন।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য ভি পি'র আতঙ্ক দূর ক'রে দিলেন। কেমন ক'রে এবং কোন্ কথা থেকে কাহিনীটা এতদূর গড়িয়েছে, সেটা আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। নিশ্চিন্ত হলেন ভি পি। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করলেন যে, আগামীকাল তিনি কংগ্রেস নেতাদের কাছে এই গল্পটা বলে বেশ খানিকটা হেসে নিতে পারবেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ ভাইসরয় ভবনে একটা জাঁকালো রকমের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। দেশীয় রাজন্যদের অভ্যর্থনার জন্য একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে। পঞ্চাশজনের বেশি মহারাজা ও রাজা এসেছেন। তা ছাড়া, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের একশত জন প্রতিনিধিও এসেছেন। আড়ম্বর, বৈচিত্র্য ও চাকচিক্যের এই সমারোহ দেখতে অবশ্য একটা রঙীন উৎসবের মতোই লাগছে। কিন্তু কি করুণ ও অবাস্তব! এই রাজকীয় আড়ম্বর এখন কত বড় একটা ফাঁকি হয়ে রাজন্যসমাজের অদৃষ্টকে ঘিরে ধরেছে, এ'দের দেখে সেই কথাই শুধু বার বার মনে পড়ছে। এ'রা এখনো এ'দের মন স্থির করতে পারেননি, এবং সকলে মিলে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেননি। চিন্তা, উদ্দেশ্য ও বিবেচনায় এ'দের মধ্যে এখনো সেই ঐক্য দেখা দেয়নি, যেটা এখন এ'দের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। রাজোচিত গৌরবে কে কার চেয়ে বড়, এ'রা এখনো এই ধরনের ব্যক্তিগত মর্যাদার সমস্যাটাই চিন্তা করছেন। প্রত্যেকেই শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন এবং যেন উঁকি দিয়ে দেখছেন, অপরে কি করেন বা না করেন। নিজের বিবেচনা ও মনের জোর নিয়ে কেউ অগ্রসর হতে চাইছেন না। রাজন্যদের এই অবস্থা ও মনোভাব লক্ষ্য ক'রে জনৈক দেওয়ানই মন্তব্য করেছেন যে, এ'রা এখন 'বিনাটিকিটের চিঠির মতো শুধু এখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি করছেন।'

রাজন্যদের আসর। পর পর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার সারিতে বসেছিলেন রাজন্যেরা

ও রাজন্যদের প্রতিনিধিরা। রাজন্যদের মধ্যে যাঁরা এখনো রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে তাঁদের সম্মতি দান করেননি বা সম্মতিদানের ইচ্ছা জানাননি, ভাইসরয়ের পার্শ্বচর অফিসারেরা তাঁদের এক এক ক'রে ডেকে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে উপস্থিত করছিলেন, 'ভাইসরয়ের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের' জন্য। মাউণ্টব্যাটেনও সঙ্গে সঙ্গে মহারাজাদের সঁপে দিচ্ছিলেন ভি পি মেননের কাছে। ভি পি আবার এক এক ক'রে তাঁদের নিয়ে যাচ্ছিলেন সভাকক্ষ পার হয়ে পাশের একটি কক্ষে, যেখানে বসেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। অর্ধবৃত্তাকার তিনটি সারিতে উপবিষ্ট রাজন্যের দল এ দৃশ্য দেখছিলেন।

রাজন্যদের পরস্পরের মধ্যে মৃদুস্বরের আলাপ এবং কথাবার্তারও কিছু কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। জনৈক জবরদস্ত মহারাজা তাঁর পাশের মহারাজাকে প্রশ্ন করলেন—'হিজ্ এক্সেলেন্সি এবার কা'কে ধরলেন?' তারপরেই বকের মতো ঘাড় লম্বা ক'রে উঁকি দিয়ে একবার তাকালেন, এবং পরক্ষণেই বললেন—'আমাকে ধরবার আর কোন দরকার নেই, আমি কালই চুক্তিপত্রে সই ক'রে দেব।'

কে কান পেতে শুনতে পেলেন, জনৈক বৃদ্ধ মহারাজা ও জনৈক যুবক মহারাজার মধ্যে আলাপ চলছে। বৃদ্ধ মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার স্টেটের অবস্থা কি রকম?'

যুবক মহারাজা বললেন—'এক জায়গায় একটু গোলমাল ছিল, কিন্তু সেটার নিষ্পত্তি এখন হয়ে গিয়েছে।'

বৃদ্ধ মহারাজা বললেন—'আমার স্টেটের সব বিষয়েই গোলমাল হয়ে আছে। কিন্তু আমি এ গোলমালের ব্যাপারকে কোন নিষ্পত্তির দিকে একেবারে ঘেঁসতেই দিই না।'

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৩০শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাউণ্টব্যাটেন কলকাতা চলে গেলেন। কলকাতার ব্যাপার ভাল নয়, সংকট সেখানে ঘনিয়েই রয়েছে। ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন কলকাতার অবস্থা শেষবারের মতো এবং দ্রুত একবার পর্যবেক্ষণ ক'রে আসবার জন্য আজ রওনা হয়ে গেলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের অনুপস্থিতিতে কাজের চাপ থেকে আমি কিছুটা রেহাই পেলাম। অনেকদিন থেকেই মনের একটা ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সুযোগ ও অবসর খুঁজছিলাম। গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। আজ সেই বাঞ্ছিত সুযোগটি পেয়ে গেলাম।

গান্ধী এখন রয়েছেন দিল্লীর অস্পৃশ্যদের অঞ্চলে ভাঙ্গী কলোনিতে। দুপুর হতেই ভাঙ্গী কলোনিতে এসে গান্ধীর ঘরের কাছে দাঁড়ালাম। ভিতরে প্রবেশ ক'রেই দেখলাম, মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু একটা কাঠের চৌকির উপর গান্ধী বসে রয়েছেন, তাঁর পিছনে মস্ত বড় একটা তাকিয়া। দু'জন সেক্রেটারি নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মসচিবের আচরণে যতটা সৌজন্য আশা করা যায়, গান্ধীর সেক্রেটারি দু'জনের আচরণে তার যথেষ্ট পরিচয় পেলাম।

আমি কাছে এগিয়ে যেতেই গান্ধী হেসে হেসে বললেন—'আমি উঠে দাঁড়াব এটা আপনি আশা করবেন না।'

আমাকে একটি চেয়ার দেওয়া হলো, কিন্তু চেয়ারের দিকে না তাকিয়ে আমি কতকটা আমার মনের অজ্ঞাতসারেই গান্ধীর সম্মুখে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। আলাপের আরম্ভেই আমি আমার অতীতের স্মৃতি থেকে একটা ঘটনার কথা গান্ধীকে জানালাম। প্রায় সতের বছর আগে গান্ধীকে দেখবার প্রথম সুযোগ আমার

হয়েছিল। আমি তখন ওয়েষ্টমিনষ্টার স্কুলের ছাত্র। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই গান্ধী একদিন আমাদের স্কুলে উপস্থিত হলেন এবং বক্তৃতা দিলেন। সে ঘটনা আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

গান্ধী বললেন, সে ঘটনার কথা এখনো তাঁর মনে আছে, যদিও অস্পষ্টভাবে। এ কথা তাঁর মনে আছে যে, কতিপয় অতি সদাশয় ব্যক্তি তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

আমি বললাম—আপনি যেদিন আমাদের স্কুলে এসেছিলেন, ঠিক তার দু'দিন পরেই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (আরুইন) আমাদের স্কুলে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বছরেই আরুইন-গান্ধী চুক্তি সম্পাদিত হয়। আপনি এবং আরুইন, দু'জনেই দু'জনের সম্বন্ধে যেসব হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলেছিলেন, তার স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে আজও অটুট হয়ে রয়েছে। সেই ছাত্রবয়সেই আমাদের মনের উপর আপনাদের দু'জনের ভাষণ এই ধারণা গভীরভাবে অঙ্কিত করেছিল যে, মানুষের অন্তরের শুভেচ্ছাই সবচেয়ে বড় শক্তি। আপনাদের ভাষণে সেই শুভেচ্ছারই পরিচয় পেয়েছিলাম। আমরা সেই তরুণ বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই শুভেচ্ছা থেকেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মীমাংসার একটা পথ পাওয়া যাবে।

গান্ধী আগ্রহের সুরে বললেন—সে সময় লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কত ঘনিষ্ঠ ছিল! অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, সে বন্ধুত্বের ভাব এখন কমে গিয়েছে।

গান্ধীকে জানালাম, আমি সম্প্রতি লণ্ডন ঘুরে এসেছি এবং পার্লামেণ্টের উভয় সভাতেই ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের আলোচনা ও গ্রহণের অনুষ্ঠান সবই সেখানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্লামেণ্টের বিতর্কের যে রিপোর্ট সরকারী-ভাবে ছাপা হয়েছে, তার তিনটি কপি গান্ধীকে আমি এই সুযোগে উপহার দিলাম।

মনে হলো, গান্ধী খুশি হয়েছেন। লর্ড স্যামুয়েল গান্ধীর সম্পর্কে লর্ড সভায় যেসব প্রশংসার কথা বলেছেন, সে বিষয় উল্লেখ ক'রে আমি এইবার জানতে চাইলাম, তিনি এ কথা জানেন কি না।

গান্ধী বললেন, তিনি সংবাদপত্রে লর্ড স্যামুয়েলের বক্তৃতার বিবরণ পাঠ করেছেন। গান্ধী মন্তব্য করলেন, তাঁর সম্বন্ধে এধরনের প্রশংসাকর উক্তি করা লর্ড স্যামুয়েলেরই উদারতার প্রমাণ। গান্ধী বললেন, অনেকদিন আগে লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে তাঁর একবার এমন একটি বিষয়ে পত্রালাপ হয়েছিল, যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ ছিল। উভয়েই উভয়ের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে চিঠিতে বাদ-প্রতিবাদ বিনিময় করেছিলেন। গান্ধী বললেন, কিন্তু লর্ড স্যামুয়েলের এই ঔদার্য আমি দেখেছিলাম যে, যখনই তিনি বুঝলেন যে, তাঁর ভুল হয়েছে, তখনই তিনি সে ভুল স্বীকার করলেন। এটা মানুষের একটা বড় গুণ।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি নিকট ভবিষ্যতের নতুন অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি বললেন, ভারতের উপর থেকে ব্রিটিশের প্রভুত্ব অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের উপর এক বিরাট দায়িত্বের ভার এসে পড়ছে। এতদিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গতি ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা, এবং তারই সাহায্যে নেতারা দেশের কাজ এতদিন ধরে ক'রে এসেছেন। বিরাট পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ দেশের কাজে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার কোন অভিজ্ঞতা কংগ্রেস নেতাদের নেই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের

সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ব্যয়, বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার কংগ্রেস নেতাদের হাতে আসবে। নতুন দুই রাষ্ট্রের এবং উভয়ের সম্পর্কের প্রসঙ্গেও গান্ধী মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, দুই রাষ্ট্রেরই পক্ষে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সব কিছু করবার যোগ্যতা এবং শক্তি লাভ ক'রে ফেলবেন না। সব দিক সামলে গুছিয়ে উঠতে এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে ভালভাবে প্রস্তুত হতে দুই ডোমিনিয়নেরই কিছুটা সময় লাগবে। গান্ধী বললেন, দেশ খণ্ডনকে দেশের একটা অকল্যাণ ও ক্ষতি বলেই তিনি মনে করেন। তবে এই অকল্যাণের ব্যাপার সত্ত্বেও কল্যাণ দেখা দিতে পারে, যদি দুই গভর্নমেণ্ট পরস্পরের প্রতি সৎ ও সঙ্গত আচরণের প্রমাণ দিতে পারেন।•

আমি বললাম—শুধু ভারতেরই ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে। বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। এশিয়ার আর একটি বৃহৎ দেশ হলো চীন, কিন্তু চীন গৃহযুদ্ধে অশান্ত ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। এখন ভারতই একমাত্র বৃহৎ দেশ, এশিয়ার দেশগুলিকে প্রভাবিত করবার যোগ্যতা যার আছে এবং এদিক দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গান্ধী সমর্থন করলেন—হ্যাঁ, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এখন আমাদের উপর পড়েছে। অনুবীক্ষণী যন্ত্রের চোখের মতো পৃথিবীর চক্ষু ভারতের সব অবস্থা ও আচরণ লক্ষ্য করছে।

যে কাজের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, সেটা হলো সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার এবং তথ্য প্রচারের কাজ। গান্ধীর কাছে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সংবাদ-পত্রের সম্পর্কেও কয়েকটি বিষয় জানালাম। বললাম, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির পক্ষে এবার থেকে বিশ্বজনমতের দিকে লক্ষ্য রাখবার এবং বিশ্ব-স্বার্থের ভালমন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক ঘটনার ভালমন্দ বিচার করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, ভারতীয় সাংবাদিকদের এখন থেকে দায়িত্বশীল কার্যসূত্রে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে গিয়ে এবং সেখানে থেকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করা কর্তব্য।

আমার এ অভিমত সমর্থন করলেন গান্ধী। তিনি বললেন, ভারতীয় সাংবাদিকদের পক্ষে এ ধরনের বিশ্বদৃষ্টি লাভ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু এবিষয়ে একটা সাবধানতারও প্রয়োজন আছে।

আমি এমন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ফেলেছি, যে বিষয়ে গান্ধী এর আগে অনেক আলোচনা করেছেন এবং এবিষয়ে তাঁর নিজের একটা ধারণাও আছে। গান্ধী বললেন—'নিজের ভালমন্দের বিচার করার বিষয়ে অপর দেশের মতামতের ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করার একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর মনোবৃত্তি ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায়। নিজের মুক্তির জন্য অপরের সাহায্য আশা করার এই মনোবৃত্তি ভারতীয়দের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক। আমাদের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই সবার আগের প্রয়োজন, নিজের সাহায্যেই নিজেকে গঠিত করতে হবে। বৈদেশিক চিকিৎসক এবং ঔষধের কথাই ধরা যাক। আমি কখনো এমন ঘটনার কথা শুনিনি যে, কোন ইংরাজ চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছেন। কিন্তু প্রায়ই শোনা যায় যে, ইওরোপের অমুক বিখ্যাত সার্জন অথবা অমুক চিকিৎসকের কাছে ভারতীয়েরা চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। ভারত শুধু ভারতীয়দেরই জীবন-মৃত্যুর দেশ হয়ে উঠবে, আমি এটা

চাই না। বিদেশীকেও এখানে শিখবার জন্য এবং উপকার লাভের জন্য আসতে হবে। চিকিৎসার কথাই আবার ধরা যাক, ভারতেও তো ডাঃ আনসারির মতো অত্যন্ত গুণী ও বিজ্ঞ সার্জন রয়েছেন।'

গান্ধীজী কৌতুক ক'রে বললেন—তবে, ডাঃ আনসারির আসল কাজ হলো জরাগ্রস্তের দেহে যৌবন দান করা। ত্রিশ বছর বয়স পেতে এবং হারেম রাখতে যাঁর ইচ্ছা হবে, ডাঃ আনসারির চিকিৎসার সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

গান্ধীর সকল বক্তব্যের মর্ম হলো : ভারত এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছে। এইবার থেকে ভারতবাসীকে তার নিজের দেশের উপরেই যথার্থ বিশ্বাস রাখতে হবে। দেশের মর্যাদা নিয়ে গৌরববোধও করতে হবে। কিন্তু দেশের প্রতি এই বিশ্বাস এবং দেশের জন্য গৌরববোধের প্রমাণ শুধু কথা দিয়ে নয়, কাজের ভিতর দিয়েই দেখাতে হবে। যেসব গুণ ও যোগ্যতাকে নিতান্ত বৈদেশিকেরই একচেটিয়া অধিকার বলে ভারতবাসী এতদিন ধরে ধারণা ক'রে এসেছে, সে ধারণা বর্জন করতে হবে। ভারতবাসীকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঐসব গুণ ও যোগ্যতা তাঁদেরও আছে এবং তাঁদেরও হতে পারে। নিজের উপর অবিশ্বাস, এটাই হলো ভারতের স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় আশঙ্কা ও বিপদের বিষয়।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, পয়লা আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : ভারতের কয়েকজন প্রধান প্রধান দেশীয় রাজন্য ভাইসরয় ভবনে মধ্যাহ্নভোজনে আজ আপ্যায়িত হয়েছেন। এই ভোজন অনুষ্ঠানেরও কিছু কিছু বিবরণ শুনতে পেলাম। এক্সেলেন্সির উদ্দেশ্যে 'রুটি-মাখন' শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর রাজন্যেরা রাষ্ট্রভুক্তি সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত হলেন। ভাইসরয়ের পার্শ্বচর অফিসারেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের একদিকে হলো 'হাঁ'-এর আসর। রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে যাঁরা সম্মত, তাঁরা এই আসরের ভিতর দিয়ে চলে যাবেন। আর এক পাশে হলো 'না'-এর আসর, যাঁরা রাষ্ট্রভুক্তি চান না, তাঁরা এই দিক দিয়ে চলে যাবেন।

একটা কৌতুক করার জন্যই পাতিয়ালা এবং বিকানীর 'না'-এর আসরের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন এবং দু'জনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোন দেশীয় রাজ্য বিশেষ রকমের কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শের সুফল যে হয়েছে, তার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের কথা বাদ দিলে, মাত্র দু'তিন জন ঊর্ধ্ব শ্রেণীর রাজন্য এ বিষয়ে একটা বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ এখনো দিচ্ছেন। রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এঁদের পক্ষে কোন লাভ হবে বলে এঁরা মনে করতে পারছেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, মাউণ্টব্যাটেনের বন্ধু ভোপালই হলেন এই বিরুদ্ধ দলের প্রধান নেতা। ভোপালের সঙ্গে ভিড়েছেন ভোপালেরই নিকট প্রতিবেশী ইন্দোর। ভোপাল হলেন মুসলিম রাজন্যদের মধ্যে প্রতিভায় ও বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি জানি এবং অনুমান করতেও পারি যে, পাকিস্থানের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভোপাল বিশেষ একটি নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করবার ইচ্ছা পোষণ করছেন। কিছু দিন থেকে তিনি জিন্নার একজন অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভোপালের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর রাজ্যটি হলো ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি রাজ্য এবং প্রজাদের মধ্যে হিন্দুরাই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : রাজন্যদের মধ্যে এমন কেউ কেউ

আছেন, যাঁরা কতকগুলি বিশেষ কারণে রাষ্ট্রভুক্তির ব্যবস্থায় সম্মত হতে পারছেন না। এই ধরনের যাঁরা বিশেষ সমস্যা ও অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত-ভাবে যথাসাধ্য পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। চরম দিবসটি যতই এগিয়ে আসছে, কাজ কর্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলিও আকারে প্রকারে এবং সংখ্যায় ততই অতিমাত্রায় প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। একটা নতুন রকমের কাজ আমার উপর চাপিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। ঢোলপুরের রাণার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যোগাযোগ রক্ষার কাজ। এটা সম্পূর্ণভাবেই বে-সরকারী কাজ। ভাইসরয়ের স্টাফের লোক হিসাবে নয়, ঢোলপুরের রাণার পুরনো বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনের লোক হিসাবে রাণার কাছ থেকে তাঁর বাধা ও অসুবিধার বিষয়গুলি জেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে জানাতে হবে। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তখন মাউণ্টব্যাটেন ও ঢোলপুরের রাণা উভয়েই যুবরাজের পার্শ্বচর অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন।

রাণার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। আলাপ ক'রেই বুঝেছি যে, তিনি পণ্ডিত মানুষ, প্রায় গোঁড়া পণ্ডিতই বলা যায়। বেশ সুরুচিসম্পন্ন মানুষ এবং প্রকৃতিতেও একটা সন্ন্যাসী গোছের ভাব আছে। রাজার অধিকার হলো ঈশ্বরদত্ত অধিকার, এই তত্ত্বকে তিনি মতবাদ ও কর্মবাদ হিসাবে বিশুদ্ধ তত্ত্ব বলেই আন্তরিক-ভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজধর্ম ও রাজনীতির ইতিহাস থেকে অনেক উদাহরণ উল্লেখ ক'রে তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। রাজা হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং প্রজার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে রাণা যে ধারণা পোষণ করেন, সেটা প্রায় একটা অবাস্তব ও অস্পষ্ট ভাবলোকের ধারণা। নিজের রাজকীয় মহিমা ও অধিকার সম্বন্ধে এত সচেতন হলেও রাণার বেশভূষা ও ব্যবহারে কোন রাজকীয় চাকচিক্য নেই। এদিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। ছোটখাট চেহারার মানুষটি, দেখতে গান্ধীজীর চেয়ে সামান্য একটু লম্বা, মাথায় বেগুনী রঙের একটি পাগড়ী এবং চোখের দৃষ্টিতে একটা আগ্রহ ও কৌতূহলের ভাব।

আস্তে আস্তে ও নিবিড় ভাবাবেগে বিচলিতস্বরে রাণা বললেন, ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে স্থাপিত এত বড় একটা সম্পর্ক আজ শেষ হতে চলেছে। রাণার কণ্ঠস্বরে উষ্মার কোন পরিচয় পেলাম না। একজন অসহায়ের কণ্ঠস্বর, অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে যার আর উপায় নেই। অদৃষ্টবাদীর মতো ভাব নিয়ে গভীর বিষাদে ডুবে রয়েছেন রাণা। স্বার্থ রক্ষা করতে হলে নতুন অবস্থায় নতুন পন্থা গ্রহণ করতে হয়, এ কৌশলসূত্র এমন মানুষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে বিশেষ কোন ফল হবে না। ঢোলপুরের রাণা যেটা পেতে চাইছেন, সেটা হলো সহানুভূতি। তিনি যে পন্থাই গ্রহণ করুন না কেন, তাতে ঢোলপুরের কোন দোষ ধরা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি তিনি খুঁজছেন। নতুন ভারত ডোমিনিয়ন টিকে থাকবে কি না, এ বিষয়ে তাঁর মনের গভীরে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। ভারত ডোমিনিয়ন এবং ঢোল-পুরের একটা তুলনামূলক বিচার করলেন রাণা। ভারত ডোমিনিয়ন এই তো সেদিনের কতগুলি রাজদ্রোহকর বিপ্লবের সৃষ্টি। আর ঢোলপুরের সঙ্গে অধিরাজক সন্ধিসূত্রে ব্রিটিশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। ব্রিটিশ-রাজের প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্যের ঐতিহ্য কত দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা ক'রে ও বহন ক'রে আসছেন ঢোলপুরের রাণাবংশ। রাণার এই সব উক্তি ও আক্ষেপ

শ্নে ব্ঝতে পারছি কোথায় তাঁর দ্ঃখ। শ্নে দ্ঃখিত না হয়েও পারা যায় না। কত দ্র্বল-কোমল ও নিজের প্রতি কত খাঁটি একটি মান্ষ আজ কি সঙ্কটেই না পড়েছেন! ভারতীয় স্বাধীনতা নামে যে ঘটনা পাহাড়-ধ্বসানো প্রপাতের মতো দ্র্বার ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে, তার প্রকোপ থেকে সরে দাঁড়াবার মতো শক্তি পাচ্ছেন না রাণা। যদি নিজের মনের সংস্কারগ্লির উপর তাঁর এতটা আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকতো, তবে আত্মরক্ষার জন্য এই প্রপাতের পথ থেকে একট্ পাশে সরে যাওয়ার কাজটা তাঁর পক্ষে বেশি সহজ হতো।

এগিয়ে আসছে ১৫ই আগস্ট এবং এখন থেকেই দিল্লী ও করাচীর স্বাধীনতা অন্ষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে।

করাচীতে ১৩ই আগস্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা 'স্বাধীনতা'র অন্ষ্ঠান হবে। মাউণ্টব্যাটেনকে করাচীর অন্ষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও জিন্না একটি সমস্যা স্ষ্টি ক'রে ফেলেছেন। পাকিস্থানের স্বাধীনতার অন্ষ্ঠানে যখন মাউণ্টব্যাটেন সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তখন তাঁকে কি ধরনের মর্যাদা দেওয়া হবে? জিন্নার উপরে, না নীচে? পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় অন্ষ্ঠানে উপস্থিত মাউণ্টব্যাটেনকে মর্যাদার অগ্রবর্তিতা দান করার বিষয়ে জিন্নার যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সেটা স্বীকার ক'রে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে করাচী যাওয়া সম্ভবপর হতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে অথচ দ্ঢ়ভাবেই পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হিজ এক্সেলেন্সি করাচীতে ভাইসরয়ের মর্যাদা নিয়েই স্বাধীনতা অন্ষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। স্তরাং, পাকিস্থানের আইনসভার বিশেষ অধিবেশনে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার উপরের আসনেই উপবেশন করবেন, জিন্নার নীচের আসনে নয়। মাউণ্টব্যাটেনকে জিন্নার নীচের আসনে বসবার জন্য কোন প্রস্তাব ও অন্রোধ করার কোন অর্থ হয় না, প্রয়োজনও নেই। এ প্রস্তাব সম্প্র্ণভাবেই বিবেচনার অযোগ্য।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : দেশ-বিভাগ পরিষদ এবং য্ক্ত দেশরক্ষা পরিষদ, দ্ই পরিষদেরই আজকের বৈঠক শেষ হবার পর প্যাটেল, জিন্না ও লিয়াকতকে মাউণ্টব্যাটেন এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক অফিসারকে জেংকিনস্ পাঠিয়েছেন। নেতাদের সঙ্গে এই অফিসারের পরিচয় করিয়ে দেবেন মাউণ্টব্যাটেন এবং নেতারা অফিসারের ম্খ থেকেই কতকগ্লি গ্প্ত তথ্যের বিবরণ শ্নবেন।

অফিসার বললেন, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা আরম্ভ হবার পর হাঙ্গামার প্ররোচনাকারী যে সব লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নানারকম বিব্তি থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ধ্ত ব্যক্তিদের প্রশ্ন ক'রে এবং গোপনভাবে অন্যান্য স্ত্রে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানতে পারা গিয়েছে যে, শিখ নেতারা ষড়যন্ত্র ক'রে নানারকম অন্তর্ঘাতী কাজ ও আক্রমণের কতগ্লি পরিকল্পনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো জিন্নাকে হত্যা করার পরিকল্পনা। আগামী সপ্তাহে করাচীতে স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় অন্ষ্ঠানের সময় জিন্না যখন শোভাযাত্রা ক'রে আইনসভার দিকে অগ্রসর হবেন, সেই সময় তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছে।

জিন্না এবং লিয়াকৎ দাবী করলেন, অবিলম্বে মাষ্টার তারা সিং ও অন্যান্য শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হোক। প্যাটেল এ প্রস্তাবের বির্দ্ধে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন

করলেন। প্যাটেল বললেন, হাঙ্গামা তো এমনিতেই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে, তার উপর যদি শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তবে সঙ্কট আরও জটিল এবং কঠিন হয়ে উঠবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, শিখ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে প্রস্তুত আছেন, যদি পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, এখন এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই বিজ্ঞোচিত কাজ করা হবে। সুতরাং, এ বিষয়ে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের অভিমত ও পরামর্শ আগে গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ পাঞ্জাবের শান্তিরক্ষার জন্য কি করা উচিত, সেটা সেই গভর্নমেণ্টই বেশি বুঝতে পারবেন, যে গভর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষ-ভাবে পাঞ্জাবের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন'

মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন, তিনি বর্তমান পাঞ্জাব-গভর্নর জেংকিনস্‌কে এক চিঠি দিয়েছেন। ত্রিবেদী এবং মুডির (পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের দুই নব নির্বাচিত গভর্নর) সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জেংকিনস্‌কে বিবেচনা করতে বলেছেন মাউণ্টব্যাটেন, জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে মাষ্টার তারা সিং এবং অন্যান্য মাথা-গরম শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি না?

জেংকিন্‌সের সম্বন্ধে অতি উঁচু ও ভাল ধারণা পোষণ করেন মাউণ্টব্যাটেন। দুঃসহ অপবাদ এবং উদ্বেগের মধ্যেও তিনি পাঞ্জাবকে আগলে রাখার দায়িত্ব পালন ক'রে যাচ্ছেন। ক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত এই প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার অবশেষটুকুই রক্ষা করার জন্য জেংকিনস্‌ যা করেছেন, তার চেয়ে বেশি কেউ করতে পারতেন না। শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর এই বিরামহীন পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি দুই পক্ষের কোন পক্ষেরই কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাচ্ছেন না, যদিও পাওয়া খুবই উচিত ছিল।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : দুরূহ কাজের বিস্তীর্ণ তালিকার মধ্যে এমন একটা কাজের উল্লেখ দেখলাম, যে কাজের চাপ নেই বরং মনের চাপ হাল্‌কা ক'রে দেয়। ভাইসরয়ের স্টাফের ৬৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে আজ লিখতে হয়েছে—'প্রথম আলোচিত বিষয়, জ্যোতিষী গণনা।' ভাইসরয় বললেন, মধ্য প্রদেশের নির্বাচিত গভর্নর মিঃ মঙ্গলদাস পাকবাসা এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্যার ফ্রেডরিক বোর্ণের কাছ থেকে ১৪ই আগস্ট তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য মিঃ মঙ্গলদাস পাকবাসা রওনা হবেন, যাতে স্যার ফ্রেডরিকও ১৫ই আগস্টের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন, এই ব্যবস্থা আগের থেকেই হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাকবাসা বললেন, ১৪ই আগস্ট তারিখে তিনি রওনা হবেন না। তিনি ১৩ই তারিখে রওনা হতে চান। কারণ, জ্যোতিষী-গণনা অনুসারে ১৪ই তারিখটা ভাল দিন নয়। পাকবাসাকে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তাঁর স্টাফে জ্যোতিষী-গণনা সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার মতো উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন লোকের খুবই অভাব আছে।

এই অভাব আজ এখনি দূর করা হলো। কার্যবিবরণীতে লেখা হলো—'হিজ এক্সেলেন্সি ভাইসরয় আজ তাঁর প্রচার-কর্মচারীকে গভর্নর-জেনারেলের জ্যোতিষী-গণকের অবৈতনিক ও অতিরিক্ত পদে নিযুক্ত করলেন'।

আজ বল্লভভাই প্যাটেলের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত হয়েছি আমরা দু'জন—আমি ও ফে। এটা একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণ মাত্র, কোন উপলক্ষ্য ছিল না। প্যাটেলের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন মঙ্গলদাস পাকবাসা, যিনি আমার এই বিচিত্র জ্যোতিষী-পদে নিয়োগের মূল কারণ। পাকবাসা ছাড়া

মাত্র আর একজন অতিথিকে সেখানে দেখলাম, জনৈক আমেরিকান আগন্তুক। আর দেখলাম আমার অক্সফোর্ডের ছাত্রজীবনের সতীর্থ দলশঙ্করকে, যিনি এখন প্যাটেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। এ ছাড়া রয়েছেন সর্দারের পিতৃসেবাপরায়ণা কন্যা মণিবেন। পিতার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কন্যা বললেই বরং মণিবেনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়।

নেহরুর বাড়ির খুবই কাছাকাছি একটি বাড়িতে থাকেন প্যাটেল। প্রায় পাশা-পাশি দুই বাড়ি বলা যায়, কারণ উভয়ের মধ্যে সামান্য মাত্র ব্যবধান। নেহরুর বাড়ির তুলনায় প্যাটেলের বাড়িটি আকারে ছোট। তা ছাড়া, প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির তুলনায় প্যাটেলের বাড়িতে কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা ও উপকরণের আড়ম্বর অনেক কম।

নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্যের তুলনা ও আলোচনা করা লোকের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহরু এবং প্যাটেল ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বরং, অনুমান করা যায় যে, তাঁরা দু'জনে একত্রে বস্তুত একই রাজনৈতিক শক্তির দ্বিমূর্তিরূপে নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তবুও, ব্যক্তিত্বে এবং চেহারায় দু'জনের পার্থক্য বেশ ভালভাবেই চোখে পড়ে। ধুতি-পরিহিত প্যাটেলকে দেখলেই টোগাপরিহিত রোমক সম্রাটের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সত্যসত্যই এই মানুষটির মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান চরিত্রের বিশেষ কতগুলি গুণ নিহিত আছে। যথা—শাসনকার্য পরিচালনার প্রতিভা, দুরূহ বিষয়ে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সে সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠভাবেই রক্ষা করার যোগ্যতা। তা ছাড়া, সকল কাজের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটি অবিচল শান্ত ও নির্বিকার ভাব দেখা যায়, যেটা সত্যিকারের চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা বড় লক্ষণ।

নেহরুর যে বিশ্বখ্যাতি এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্যাটেলের তা নেই। প্যাটেল ইচ্ছে ক'রেই নিজের জন্য এমন একটি কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন, যেখানে বস্তুত দেশের ঘরোয়া রাজনীতিকেই সামলানো এবং চালনা করাই প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব আদৌ ক্ষুদ্র নয়। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অতি-বেশি পরিমাণেই প্যাটেল তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন। সরকারী সংবাদ ও তথ্য প্রচারের সকল ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং পুলিশ, এ সবেরই পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্যাটেলের হাতে। তা ছাড়া, আর একটি দায়িত্বও পালনের ক্ষমতা প্যাটেল গ্রহণ করেছেন, যেটা গুরুত্বে কোন দায়িত্বের চেয়ে কম নয়। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব, যেটা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে বস্তুত একটি জীবন-মরণের প্রশ্ন।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রভুক্ত করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছেন প্যাটেল, সে নীতি অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত ডোমিনিয়নেরই রূপ বদ্‌লে যাবে। পাকিস্থান হওয়ায় যতসংখ্যক অধিবাসী ভারত ডোমিনিয়নের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অধিবাসী ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর মিলিয়ে দুই কোটি অধিবাসীকে বাদ দিলেও দেখা যায় যে, দেশীয় রাজ্যগুলির রাষ্ট্রভুক্তিতে প্রায় নয় কোটি অধিবাসী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। পাকিস্থানের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যা নয় কোটিরও কম।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরও উপর প্রভুত্বের প্রায় সকল ক্ষমতা প্যাটেলই নিজের হাতে

রেখেছেন। কোন সময়ে কোন রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একজনের হাতে এতগুলি ক্ষমতা থাকার ব্যাপারকে বস্তুত ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীভূত করারই একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই সব বহু এবং বিভিন্ন রকমের ঘরোয়া দায়িত্ব নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বরাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্যাটেল সচেতন আছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের যেসব বিশেষ সুবিধা আছে, সেটা বুঝবার মতো একটা সহজ গূঢ়বুদ্ধি প্যাটেলের আছে।

যখন প্যাটেল কাজের মধ্যে থাকেন তখন তাঁর মন আচরণ ও চেহারা একরকম এবং যখন কাজের বাইরে থাকেন, তখন সম্পূর্ণ আর একরকম। আজ প্যাটেলকে তাঁর কাজের বাইরে স্বাভাবিক ও সহজ মূর্তিতে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, কঠিন ও উদ্ধত কোন মূর্তি নয়, একজন নম্রস্বভাব 'জেণ্ট্‌ল্ হিন্দু'র মূর্তি। সদয় প্রীতি ও হাস্যে পরিপূর্ণ একটি মুখ। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বেশ খুশি হয়েই শুনলেন প্যাটেল। কথায় কথায় বক্তৃতার কথা উঠল। বক্তৃতা করতে প্যাটেলের ভালো লাগে কি না, আমি এই প্রশ্ন করতেই প্যাটেল এবং মণিবেন দু-জনেই হেসে উঠলেন। মণিবেন বললেন যে, তাঁর পিতা গুজরাটি ভাষায় একজন বড় বক্তা।

সর্দারের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ও সরকারী ক্রিয়াকলাপের সকল বিষয়ের সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপারগুলিও মণিবেনের অজানা থাকে না। যতক্ষণ আমাদের খাওয়ার ব্যাপার চলল, ততক্ষণ মণিবেন শুধু নিঃশব্দে কর্তব্যশীলা কর্মচারিকার মতো কাজ ক'রে গেলেন। পরিধানে সাদা খদ্দরের শাড়ি, ভোগবিমুখ জীবনের একটা অনাড়ম্বর সরলতা তাঁর এই সজ্জার মধ্যে ফুটে রয়েছে। কোমরে কতকগুলি চাবির মস্ত বড় একটা থোকা ঝুলছে। সাধারণ গৃহস্থালীর কাজে সর্বদা ব্যস্ত এক নিপুণা কর্মকর্ত্রীর মতোই তাঁকে দেখতে লাগছিল।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁদের কাজের ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের আলাদা ক'রে রাখেন না। সম্পর্কে পত্নী, ভগ্নী অথবা কন্যা, যাই হোন্ না কেন তিনি, নেতাদের কাজের ব্যাপারেও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং নেতাদের ক্রিয়া-কলাপের উপরেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও শক্তি বড় কম নয়। আমি যখন ভারতে প্রথম এলাম, তখন এই ধারণাই নিয়ে এসেছিলাম যে, ভারতে রাষ্ট্র এবং রাজনীতির ব্যাপারে মেয়েদের কোন উৎসাহ ও আগ্রহ নেই, এবং মতামতের কোন বালাই নেই। বরং, আমার এই ধারণাই ছিল যে, ভারতে পুরুষেরাই সব, মেয়েদের ব্যক্তিত্ব পুরুষের আধিপত্যে চাপা পড়ে একেবারে তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসে দেখলাম যে, রাষ্ট্র ও রাজনীতির বড় বড় ব্যাপার যেখানে চলছে, সেখানে ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্ব বেশ সক্রিয়। মিস্ ফাতিমা জিন্না, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বেগম লিয়াকৎ আলি খাঁ, এবং মিসেস কৃপালনী, এঁরা এক একজন অতি প্রবল ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের দিক দিয়ে তাঁদের পুরুষ আত্মীয়ের প্রায় সমান সমান যান। কিন্তু এঁরা সকলেই মণিবেনের মতো নন, যিনি প্রকাশ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে না টেনে নিয়ে এসে আড়ালে থেকেই তাঁর পুরুষ আত্মীয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যের সাহায্যকারিণী হয়ে কাজ করতে ভালবাসেন। বাইরের রাজনীতির ক্ষেত্রে মণিবেনকে দেখতে পাওয়া যায় না, পিতার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপেও তাঁকে প্রকাশ্যে সহকর্মিণীরূপে দেখা যায় না। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত

প্রভাবের কথা ধরা যায়, তবে সেদিক দিয়ে কোন মহিলা-নেতাই মণিবেনকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেননি। পিতা প্যাটেলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর মণিবেনের যে প্রভাব, অন্য কোন মহিলা-নেতাই তাঁর পুরুষ-আত্মীয়ের নেতৃত্ব ও ক্রিয়াকলাপের উপর সে প্রভাব প্রয়োগের শক্তি লাভ করতে পারেননি।

আমি জানি, লেডি মাউণ্টব্যাটেনও ভারতের সকল সমাজকল্যাণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় নারীদের সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। কর্মশক্তিতে ও যোগ্যতায় ভারতীয় নারী অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে সকল সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজের মধ্যে একটা হীনদশার স্তরে ভারতীয় নারীরা পড়েছিলেন, সে বন্ধনও তাঁরা দ্রুত ছিন্ন ক'রে ফেলছেন। ভারতের স্বাধীনতা যে-সকল ঘটনা ও আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনও স্বাভাবিক-ভাবেই নিষ্পন্ন হয়ে এসেছে। এই সব সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ভারতীয় নারীসমাজের মুক্তি।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৯ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : জেংকিন্‌স্ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, দুই পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী সীমানা অঞ্চলের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। আরও সৈন্য, আরও বিমান এবং আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন জেংকিন্‌স্। এদিকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আজই সন্ধ্যার সময় পাঞ্জাব সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত (বাঁটোয়ারা) ভাইসরয়ের হাতে সঁপে দেবেন র‍্যাডক্লিফ। যা ধারণা করা গিয়েছিল, তাই হয়েছে। সীমানা কমিশনের হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের মধ্যে একবিন্দুও মতের মিল হয়নি। এই অবস্থায়, নিয়ম অনুযায়ী র‍্যাডক্লিফের যা করবার ছিল, তিনি তাই করেছেন। তিনি নিজেরই সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁর বাঁটোয়ারা রচনা ক'রে ফেলেছেন। এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করার দায়িত্ব অবশ্য ভাইসরয়ের।

আমাদের স্টাফের বৈঠকে আজ এই বিষয়টিই আলোচিত হলো, বাঁটোয়ারা এখন ঘোষণা করা হবে কি না? মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি এ বিষয়ে একটু বুঝে ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে চান। তাঁর ইচ্ছা, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌-যাপিত হবার পর এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করা উচিত। তিনি জনসাধারণের মনের অবস্থার কথা চিন্তা ক'রেই ঘোষণার সময় সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ক্ষোভ ও আলোচনা দু'পক্ষের মধ্যেই তীব্রভাবে দেখা দেবে বলে তিনি অনুমান করেছেন, সেগুলিকে স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই জাগিয়ে তুলতে চাইছেন না মাউণ্টব্যাটেন। স্বাধীনতা দিবসের সব আনুষ্ঠানিক আনন্দ মাটি হয়ে যাবে, যদি এই বাঁটোয়ারা ১৫ই আগস্টের আগেই ঘোষিত হয়। বৈঠকে এ বিষয়ে আজ আর চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো না।

১৫ই আগস্টের পূর্বেই শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে ফেলার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন জেংকিন্‌স্। জেংকিন্‌স্ মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন যে, তিনি ত্রিবেদী এবং মুডির সঙ্গে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং ত্রিবেদী ও মুডি উভয়েই তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, এভাবে শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করলে বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থার তো কোন উন্নতিই হবে না, বরং তাতে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবারই সম্ভাবনা আছে। তাঁরা তিনজনেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করা হবে না।

জেংকিন্‌সের অভিমতই গ্রহণ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিনি জানেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর কোন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বা অন্য কোন অপবাদ আরোপ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হবে না। মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণার বিশেষ একটা কারণ আছে। তিনি এরই মধ্যে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন যে, করাচীতে ১৪ই আগস্ট তারিখে স্বাধীনতা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রার সময় তিনি স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল জিন্নার সঙ্গে একই গাড়িতে বসবেন। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীরা এই শোভাযাত্রার সময়েই জিন্নার প্রাণনাশের চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গেই থাকবেন, সুতরাং কোন সমালোচক মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে এই অপবাদ দিতে পারবে না যে, তিনি সব জেনে-শুনেও জিন্নার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : শুনেছিলাম, র‍্যাডক্লিফ তাঁর বাঁটোয়ারা প্রস্তুত ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু তিনটি দিন পার হয়ে গিয়েছে, আজ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন কাগজপত্র এল না। মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে জন ক্রাইস্টি ও আমি র‍্যাডক্লিফের সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে পরালাম যে, পাঞ্জাব ও বাংলা সম্বন্ধে তাঁর বাঁটোয়ারা তৈরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্রীহট্ট সম্বন্ধে তাঁর বাঁটোয়ারা রচনার কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অন্তত ১৪ই আগস্টের আগে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে বাঁটোয়ারার কাগজপত্র এসে পৌঁছবে না এবং খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ছাপিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলেও ১৬ই আগস্টের আগে কখনই বাঁটোয়ারা প্রচার ও ঘোষণা করা সম্ভবপর হবে না। যাক্‌, সমস্যার সামাধান এক রকম আপনা হতেই হয়ে গেল। স্বাধীনতা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে যাবার পর কোন একটি দিনে বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবে।

স্বাধীনতা দিবস

করাচী, বুধবার, ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : আজ মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে করাচী এসে পেঁৗছেছেন, পাকিস্থানের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। অখণ্ড ব্রিটিশ-ভারতের ভাইসরয় হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনের এই হলো শেষ কাজ। নতুন ডোমিনিয়ন পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠার সূচনাক্ষণে ইংলণ্ড-নৃপতির শুভেচ্ছার বাণী মাউণ্টব্যাটেন সরকারীভাবে নিবেদন করবেন।

মাউণ্টব্যাটেনকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিমান স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সিন্ধুর নির্বাচিত গভর্নর হেদায়েতুল্লা। বিমান স্টেশন থেকে গভর্নমেণ্ট হাউসে যাবার পথে জিন্নার মিলিটারী সেক্রেটারি কর্ণেল বির্নি মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন যে, আগামীকাল শোভাযাত্রার সময় জিন্নার উপর বোমা নিক্ষেপ করবার যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে সম্বন্ধে সব খবর তিনি পেয়েছেন। শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানটিই বাদ দেওয়া হবে কি না, অথবা অন্যপথে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। কর্ণেল বির্নি বললেন—'জিন্না এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি এই শোভাযাত্রায় মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে থাকেন তবে তিনি পূর্বনির্দিষ্ট পথেই শোভাযাত্রা ক'রে যেতে রাজি আছেন।' মাউণ্টব্যাটেনও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বললেন যে, শোভাযাত্রার পথ বদল করার কোন প্রয়োজন নেই। যে পথে শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা হয়েছে সেই পথেই শোভাযাত্রার মধ্যে তিনি জিন্নার পাশেই থাকবেন।

গভর্নমেণ্ট হাউসের হল ঘরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়েছিলেন জিন্না ও মিস জিন্না মাউণ্টব্যাটেন পরিবারকে স্বাগত জানাবার জন্য। স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের জন্য গভর্নমেণ্ট হাউসের পরিসজ্জার কাজ তখনো চলছে। হল ঘরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন হলিউডের ফিল্মের জন্য তৈরী দৃশ্যবস্তুর সেট। চোখ-ধাঁধানো আলো আর তপ্ত কড়াইয়ের মতো আর্কল্যাম্পের ভাজা ভাজা উত্তাপের মধ্যে জিন্না, মিস জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলা হলো। ঠিকমত তোলা হয়নি সন্দেহ ক'রে আর একবার এবং বার বার ফটো তোলা হলো।

করাচীতে উপস্থিত কয়েকজন বৈদেশিক সংবাদদাতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। করাচীর স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন আর ব্যবস্থা যথাসময়ে সম্পূর্ণ হবে কি না, সে বিষয়ে এঁদের মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে বুঝতে পারলাম। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বললেন যে, বিমান স্টেশনে স্বয়ং উপস্থিত না থেকে জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে অপমান করেছেন। আমি বললাম, মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য এ রকম ধারণা করেননি। ভাইসরয় দম্পতিকে অভ্যর্থনার জন্য বিমান স্টেশনে জিন্না উপস্থিত না থাকায়, আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের দিক দিয়ে কোন ত্রুটি হয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন না। সংবাদদাতাদের কাছ থেকে গতকালের একটা ঘটনার কথাও শুনতে পেলাম। পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশনে গতকাল বিরাট একটা মোসাহেবীর মহড়া হয়ে গিয়েছে। কায়েদে আজমের কাছে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কুর্নিশ ক'রে কে কত বেশি ঝুঁকে পড়তে পারেন, সদস্যদের মধ্যে যেন তারই একটা প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে।

ডিনারের আয়োজন। জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি ডিনারকক্ষে উপস্থিত

হলেন। অতিথিরাও এসে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তিনটি চেয়ার খালি পড়ে আছে, তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আসেননি। কর্ণেল বির্নি এবং এ-ডি-সির দল ঠিক করলেন যে, সব টেবিল আবার নতুন ক'রে সাজাতে হবে, তিনটি টেবিল মাঝখানে শূন্য পড়ে থাকায় বড়ই খারাপ দেখাচ্ছে। জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ছুট্‌কো আলাপে নিযুক্ত রইলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল টেবিল সাজাবার পালা।

ডিনার শেষ হবার পর দেখলাম, এ অনুষ্ঠানের যিনি হলেন প্রধান 'হোষ্ট এবং হিরো', সেই জিন্নাই বেশ একটু দূরে, যেন এই অভ্যাগত জনতার সংস্পর্শ এড়িয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত জিন্নার এই আভিজাতিক গাম্ভীর্যের জন্যই অনুষ্ঠানের আনন্দ স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। মাথায় রূপোর মতো সাদা চুল এবং গায়ে ধবধবে সাদা একটি আচকান, দীর্ঘদেহ জিন্না যেন সমবেত অতিথিপুঞ্জের ঊর্ধ্বে উঠে রয়েছেন। খুব কম লোকেরই সংগে কথা বলছিলেন জিন্না।

করাচী, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে আইনসভার ভবন, আরম্ভ হলো পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল জিন্নার আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পথের দু'পাশে জনতা। কিন্তু যে রকম আশা করে-ছিলাম, সে রকম কিছুই দেখলাম না। জনতার মধ্যে উৎসাহ ও উল্লাসের তেমন কিছু আধিক্য দেখলাম না, লোকের ভিড়ও খুব বেশি নয়। আইনসভার সাধারণ একটা বাৎসরিক উদ্বোধনের দিনে জনসাধারণের মধ্যে যতটা উদ্দীপনা দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি কিছু লক্ষ্য করলাম না।

আইনসভার ভবনদ্বারে প্রথমে পৌঁছলেন মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি। তারপর এলেন জিন্না ভিন্ন গাড়িতে। যেমন জিন্নাকে, তেমনি মাউণ্টব্যাটেনকেও সমান আন্তরিকতার সংগে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না উভয়েরই বক্তৃতার সকল কথার মধ্যে সৌহার্দ্যের সুরই সব চেয়ে বেশি ক'রে এবং বড় হয়ে বেজে উঠল। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের মর্যাদার অগ্রবর্তিতার সমস্যাও আপনাআপনি চুকে গেল। জিন্নার বক্তৃতা শেষ হবার সংগে সংগে লেডি মাউণ্টব্যাটেন সস্নেহে মিস জিন্নার হাত ধরলেন।

জিন্না অবশ্য তাঁর কঠিন ও হিমশীতল ব্যক্তিত্ব নিয়ে সকলের সংগছাড়া হয়ে একটু দূরে দূরেই সরে থাকেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা আকর্ষণী শক্তিও আছে। নিজের নেতৃত্বশক্তি সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন এবং তাঁর এই সদাজাগ্রত প্রভুভাবের দ্বারাই তিনি অপরকে অভিভূত করেন। নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেলের পদ তাঁর কাছে নামে মাত্র একটা পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিয়মতান্ত্রিক বশ্যতার প্রমাণ তাঁর মনোভাবে ও আচরণে দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু হলো একটা লোকদেখানো ফাঁকা আচরণ। গভর্নর-জেনারেল পদের জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করার পরেই তিনি প্রথম যে কাজটি করেছেন, সেটা হলো অতিরিক্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার কাজ। ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম তপশীল অনুসারে তিনি বিশেষ ক্ষমতার জন্য (ইংলণ্ড-নৃপতির কাছে) আবেদন করেছিলেন এবং সে ক্ষমতা পেয়েও গিয়েছেন। জিন্না এখন যে ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন ডোমিনিয়নের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল কখনো সে-রকম ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। চোখের সামনে আজ

পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলরূপে যে জিন্নাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি বস্তুত হলেন একই আধারে কেন্দ্রীভূত পাকিস্থানের সম্রাট, আর্কবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি, স্পীকার এবং প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা দিয়ে তৈরী প্রচণ্ড এক কায়েদে আজম।

আইনসভা ভবনের অনুষ্ঠান এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এইবার শোভাযাত্রা ক'রে জিন্না গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে যাবেন। একই গাড়িতে জিন্নার সঙ্গে বসলেন মাউণ্টব্যাটেন। আবার পথের দু'পাশের জনতার উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। কয়েকটি লরীতে একদল পাকিস্থানী নাবিকের এবং ছোট ছোট ছেলেপিলেদের কয়েকটি দলের চীৎকার ছাড়া জনতার মধ্যে আনন্দমত্ত উল্লাসের কোন সাড়া পেলাম না।

শোভাযাত্রার সঙ্গে জিন্নার গাড়ি যেই গভর্নমেণ্ট হাউসের ফটকে এসে পেঁৗছল, জিন্না অমনি মাউণ্টব্যাটেনের হাঁটুর উপর একটি হাত রেখে আবেগবিগলিত স্বরে বললেন, "থ্যাঙ্ক গড, আমি আপনাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।"

মধ্যাহ্ন হতেই আমরা দিল্লী ফিরে চললাম। করাচী হতে দিল্লী, আমাদের বিমান আকাশে সাঁতার দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে একবার তাকালাম, আমাদের বিমান তখন পাঞ্জাবের সীমানা অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। দেখলাম, এখানে ওখানে যেন বিরাট এক একটা অগ্নিকুণ্ড শিখা বিস্তার ক'রে জ্বলছে। মাইলের পর মাইল, মাটির রূপ এ আগুনের জ্বালায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এ আগুনের শিখার মধ্যে ভয়ানক এক অমঙ্গলেরই ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

দিল্লী এসেই অতি প্রবল কাজের আবর্তের মধ্যে ডুবে গেলাম। মধ্য রাত্রিতে, ১৪ই আগস্টের শেষ মুহূর্তটি ক্ষয় হয়ে যাবার আগেই ক্ষয় ক'রে দিতে হবে ভারতে ভাইসরয়তন্ত্রের শেষ চিহ্ন। আর এখানে ভাইসরয়ের কাজ নেই, এখন ভাইসরয়তন্ত্রের এই শিবির ভাঙার কাজটুকুই আমাদের তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

এখন মাঝরাত্রি। সংবাদদাতার দল একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন। সংবাদদাতাদের কাছ থেকে শুনলাম, আইনসভার ভবনে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তাতে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। নেহরু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন—'আজ মধ্যরাত্রিতে যখন সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময় ভারত ঘুম থেকে জেগে উঠে এক নতুন ও স্বাধীন জীবন লাভ করবে।'

প্রসাদ এবং নেহরু উপস্থিত হলেন, মাউণ্টব্যাটেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করার জন্য। সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারের দল এসে ঘর ভরে ফেললেন। উৎসাহী ফটোগ্রাফারেরা গোলাকার টেবিলটির উপরে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ঘোরাতে লাগলেন।

'আমি আপনাদের প্রদত্ত এ সম্মানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। নিয়মতান্ত্রিক বিধান অনুসারে আপনাদের উপদেশ পালনে আমি আমার সাধ্যমতো সব চেষ্টাই করব।' আনুষ্ঠানিকভাবেই ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

প্রসাদ ও নেহরু চলে যাবার আগে, আর একটি ব্যাপার হলো। নেহরু আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গেই একটি বড় খাম হাতে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাষায় গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে বললেন—'ভারতের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও তাঁদের দপ্তরের নামের তালিকা আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি।'

চলে গেলেন প্রসাদ ও নেহরু। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যপদে যাঁরা মনোনীত

করাচীতে ১৪ই আগস্টের অনুষ্ঠানে
লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন, এবং
জিন্না ও ফাতিমা জিন্না

হয়েছেন বলে মাউণ্টব্যাটেন পূর্বে শুনেছিলেন, ঠিক তাঁদেরই নাম এ তালিকায় আছে কি না, সেটা মিলিয়ে দেখবার ইচ্ছা হতেই কৌতূহলী হয়ে এবং সাগ্রহে তিনি খামটি খুললেন। কিন্তু, খাম শূন্য। খামের ভিতরে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামের কোন তালিকা ছিল না।

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : দামামার ধ্বনি বেজে উঠল সকাল সাড়ে আটটায়। লাল ও সোনালী মখমলের উর্দিতে ভূষিত যে বডিগার্ডের দল দামামা ধ্বনির সঙ্গে ও বর্শাফলকের ঝলক তুলে ভারত ইতিহাসের বিশজন ভাইসরয়কে দরবারকক্ষে নিয়ে গিয়েছে, তারাই আজ স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেলকে দরবারকক্ষে নিয়ে এল। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডাঃ কানিয়ার পৌরোহিত্যে মাউণ্টব্যাটেনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হলো। সেই লাল মখমলের চন্দ্রাতপের নীচে সোনার সিংহাসনের উপর আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ল। সেই বিরাট সোনালী কার্পেট, যেন সোনা দিয়ে ঢাকা এক টুকরো ময়দান। লেডি মাউণ্টব্যাটেনের পরিচ্ছদের স্বর্ণঝালর দরবারকক্ষের এই বর্ণবহুল শোভা আরও উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো।

এর পর কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠান। আড়াই লক্ষ উৎসাহমত্ত লোক কাউন্সিল হাউসের কাছে এসে ভিড় করেছে। প্রবেশের পথ পাচ্ছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু এবং নেতৃবৃন্দ জনতার চাঞ্চল্য শান্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন, ফলে জনতা আরও উল্লাসে বিপুল 'জয় হিন্দ্' রবে বাতাস মুখরিত ক'রে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। যাই হোক, কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠানও হলো। বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন বাণী এক এক ক'রে পড়ে শোনালেন প্রসাদ। এখানেও গত রাত্রের 'শূন্য খামে'র ঘটনার মতো একটা ভুলের ঘটনা ঘটে গেল। সব দেশের অভিনন্দনবাণী পাঠ করলেন প্রসাদ, শুধু ট্রুম্যানের প্রেরিত বাণীটিই পড়তে ভুলে গেলেন। মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি চাপা-গলায় চেঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবার পর প্রসাদ ট্রুম্যানের বাণী পড়ে শোনালেন।

প্রসাদের বক্তৃতার পর জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে একত্রিশবার তোপধ্বনি। কাউন্সিল হাউস থেকে ফিরবার পথে মাউণ্টব্যাটেনকে জয় হিন্দ্ ধ্বনি তুলে জনতা অভিনন্দন জানালো। 'পণ্ডিত মাউণ্টব্যাটেন কি জয়'—এমন ধ্বনিও শোনা গেল।

কাউন্সিল হাউসের পর রোশেনারা বাগ। বিভিন্ন স্কুলের প্রায় পাঁচ হাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের অপেক্ষায় এখানে বসেছিল। ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মাউণ্টব্যাটেন। মিঠাই বিতরণ করা হলো। একজন সাপুড়ে খেলা দেখালো। সাপুড়ে তার মুখ এগিয়ে দিয়ে একটা সাপের মাথা কামড়ে ধরতেই বেচারা প্যামেলা ভয়ে শিউরে উঠে প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্যামেলার বাবা ও মা অবশ্য এই রোদ ধুলো চীৎকার আর সাপ-খাওয়ার দৃশ্য খুশি মনেই সহ্য করলেন এবং ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের প্রীতির পরিচয় দিলেন।

রোশেনারা বাগের পর প্রিন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান। পতাকা-দণ্ডের চারদিকে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ। হর্ষে উল্লাসে ও আনন্দে চঞ্চল এই জনসমুদ্রে সব জাত শ্রেণী ও ভাষা মিলে একাকার হয়ে গিয়েছে। পতাকাদণ্ডের দিকে মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ি অনেক কষ্টে এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। নেহরু

বার বার চীৎকার ক'রে জনতার কাছে আবেদন করছিলেন, মাউণ্টব্যাটেনকে একটু রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য। পতাকাদণ্ড থেকে পঁচিশ গজ দূর পর্যন্ত এসে মাউণ্ট-ব্যাটেন আর এগুতে পারলেন না। সেখানেই গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাল্‌কা বৃষ্টি ঝরে পড়ল এবং আকাশ জুড়ে ফুটে উঠল একটি রামধনু। পতাকার শ্বেত সবুজ ও গাঢ় গৈরিকের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে দিল স্বাধীন ভারতের প্রথম দিনের আকাশে অভ্যুদিত এই রাম-ধনু। যদি হলিউডের কোন ফিল্মকাহিনীর একটি দৃশ্যে এভাবে নিসর্গের রঙীন ইঙ্গিত মিশিয়ে ছবি তোলা হতো, তবে আমরা এ অভিযোগ না ক'রে পারতাম না যে, কল্পনার বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু দিল্লীর আকাশের বাস্তবতা সে কল্পনাকেও ভাবব্যঞ্জনায় ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাঁরা বিষণ্ণ গণকের মত শুধু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন, স্নিগ্ধ রামধনুর এই নাটকীয় আবির্ভাব প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, তাঁরা ভুল করছেন, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক। আমার স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, যাঁদের মনের অবিশ্বাসটাই একেবারে লোহার মতো কঠিন হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ছাড়া আর সকলেই ভারতের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রকৃতির এমন একটি ইঙ্গিতকে ভবিষ্যতেরই একটি কল্যাণের ইঙ্গিত বলে মনে করবেন।

নতুন অশান্তি

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে পুরনো দিল্লীর লালকেল্লার উপর কংগ্রেস পতাকা উড়ছে। কেল্লা থেকে আরম্ভ ক'রে মোগলগরিমার ঐতিহাসিক সাক্ষী বিরাট জুম্মা মসজিদ পর্যন্ত সকল স্থান প্লাবিত ক'রে পাঁচ লক্ষ লোকের জনতা নেহরুর বক্তৃতা শুনলো। কিন্তু সকাল বেলার এই আনন্দের রেশ বিকাল হতেই ফুরিয়ে গেল। আনন্দের বদলে দেখা দিল বিষাদ। র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পত্র নেতাদের হাতে আজই বিকালে স'পে দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন।

নেতাদের ছ'ঘণ্টা সময় দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন, তারই মধ্যে র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারার সকল বিষয়, বৃত্তান্ত ও নির্দেশ পাঠ ক'রে ফেলতে হবে নেতাদের। তার পরেই গভর্নমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল কক্ষে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে এক বৈঠকে সম্মিলিত হতে হবে।

লিয়াকৎ দিল্লীতেই রয়েছেন এবং বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পত্র তাঁর হাতেও দেওয়া হয়েছে। লিয়াকৎকে এই সময় দিল্লীতে আনতে পেরেছেন, এটাও মাউণ্টব্যাটেনের কম কৃতিত্বের কথা নয়। সদ্যঃ-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে চব্বিশ ঘণ্টাও পার না হতেই ভারতের রাজধানীতে হাজির হতে দিতে জিন্নার আপত্তি ছিল। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে জিন্না শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাকুণ্ঠিতভাবেই রাজি হয়েছেন।

এই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। গম্ভীর ও বিষণ্ণ একটি বৈঠক। দু পক্ষেরই নেতাদের অভিমতের মধ্যে একটি বিষয়ে শুধু ঐক্য লক্ষ্য করলাম। দু পক্ষই এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রত্যেক নেতারই মতে এই বাঁটোয়ারায় তাঁর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সুবিচার করা হয়নি।

কিন্তু সকল দলের এই অসন্তোষ ও ক্ষোভের দ্বারাই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। সব নেতাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঁটোয়ারা ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারসম্পন্ন হয়েছে। আর একটি নৈতিক সত্যেরও অক্ষুণ্ণতার প্রমাণ পেয়ে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন। দু পক্ষই সমানভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সুতরাং আরও বেশি ক'রে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, বাঁটোয়ারায় দু পক্ষেরই প্রতি সুবিচার করা হয়েছে।

বাঁটোয়ারার বিষয় নিয়ে যে সমালোচনা ও বিতণ্ডা শীঘ্রই তুমুল হয়ে উঠবে, আজকের বৈঠকেই তার প্রথম পরিচয় পেয়ে গেলাম। লিয়াকৎ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন, গুরুদাসপুর জেলাকে কেন পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? অপর দিকে প্যাটেল ক্রুদ্ধ হয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোন্ যুক্তিতে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? আর শিখভূমির বিভক্ত অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বলদেব একেবারে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু এই ক্ষোভ সত্ত্বেও কোন নেতাই তাঁদের সমালোচনার তীব্রতাকে এমন স্তরে নিয়ে এলেন না, যার অর্থ এই হতে পারে যে, তাঁরা বাঁটোয়ারাকেই অস্বীকার করছেন। তাঁরা পূর্বেই এই সর্তহীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাঁটোয়ারা যেরকমই হোক না কেন, তাঁরা সেটা মেনে নেবেন। এই প্রতিশ্রুতির অন্যথা হবে, নেতাদের মন্তব্যের মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত পেলাম না।

এই বৈঠকেই নেতারা যখন বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ নিয়ে বিব্রতভাবে আলোচনা করছেন, তখনই পাঞ্জাবের এক-একটি সংবাদ এসে পৌঁছতে লাগলো। অত্যন্ত শোচনীয় এক-একটি ঘটনার সংবাদ। পাঞ্জাবের জনসাধারণই এখন আইন-কানুন ও রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্ত্রের সব নির্দেশ তুচ্ছ ক'রে নিজের হাতেই ব্যবস্থা করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এ সংবাদ এই বাস্তব সত্যই রূঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এখন বিশেষভাবেই সতর্ক হতে হবে এবং এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

জেংকিন্‌স্‌ ঠিকই বলেছেন, পঞ্চনদীর দেশে পূর্ণ উদ্যমে এবং প্রচণ্ডভাবেই 'ওয়ার অব সাকসেশন' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অকিনলেক আজ পাঞ্জাবের সাংঘাতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নেতাদের দিয়েছেন। রিপোর্ট পেয়ে নেতারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাঞ্জাবের সীমানা ফৌজের সৈন্যদল অবিলম্বে বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

ওদিকে কলকাতার অবস্থাও কম উদ্বেগপূর্ণ নয়। সেখানেও এই ধরনের 'ওয়ার অব সাকসেশন' যে কোন মুহূর্তে দেখা দেবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ওখানে অতর্কিতভাবে আক্রমণের বিক্ষিপ্ত কতগুলি ছোট ছোট ঘটনা ছাড়া কলকাতায় এখন বড় রকমের কোন অশান্তির ব্যাপার নেই। এদিকের তুলনায় কলকাতাকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত বলা যায়। গান্ধী রয়েছেন কলকাতায় এবং তাঁর উপস্থিতির প্রভাবও কলকাতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। কলকাতাকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছে গান্ধীর উপস্থিতি।

অবস্থাবিশেষে কোন্‌ কাজ আগে এবং কোন্‌ কাজ পরে করতে হয়, সে সম্বন্ধে গান্ধীর নিজের একটা প্রখর ঔচিত্যবোধ আছে। অবস্থাবিশেষে কোন্‌ আচরণ নিতান্তই বিসদৃশ হবে, সে সম্বন্ধেও নিজের নীতি অনুযায়ী ধারণা তাঁর আছে। তাই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই তিনি রাজধানী দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তিনি জানেন, এই সব সরকারী উৎসব ও আনন্দমত্ততার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে এ-অনুষ্ঠানকে সাহায্য করার মতো কোন কাজের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি অনুভব করেছেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলেই এখন তাঁর অনেক প্রয়োজনীয় কর্তব্য অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ১৩ই আগস্ট তারিখেই গান্ধী অখণ্ড বঙ্গের শেষ প্রধান মন্ত্রী শহিদ সুরাবর্দিকে নিজের কাছে আহ্বান করেছেন, সহযোগী হয়ে কাজ করার জন্য। সুরাবর্দি হলেন বেশ সৌখীন ও সুখের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ। কিন্তু গান্ধী তাঁকে ডেকেছেন, অস্পৃশ্যদের একটি পাড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘরে থেকে গান্ধীর সঙ্গে একযোগে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করার জন্য। সেই রাত্রেই একদল হিন্দু যুবক গান্ধীর ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ক'রে চলে গেল।

১৩ই তারিখের এই ঘটনার পর গান্ধীও ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন যে, ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতার দিনটিকে তিনি কিভাবে যাপন করবেন। গতকাল যখন সারা ভারত উৎসব করেছে, তখন গান্ধী উপবাস ক'রে দিন কাটিয়েছেন।

পাঞ্জাবের সাংঘাতিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে নেহরু ও লিয়াকৎ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে প্রথমে আম্বালা যাবেন, তার পর যাবেন অমৃতসরে। অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁরা সমগ্র সমস্যা বিবেচনা করবেন এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেখানেই ক'রে ফেলবেন।

বোম্বাই, রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন বোম্বাইয়ে এসেছেন। ভারত হতে ব্রিটিশ বাহিনী সরে যাচ্ছে। তাদেরই প্রথম দলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন মাউণ্টব্যাটেন। জেটিতে সৈন্যবাহী জাহাজ 'জর্জিক' অপেক্ষা করছিল এবং নরফোক রেজিমেণ্টের একটি দল দাঁড়িয়েছিল বিদায় নেবার জন্য। অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে ভারতে নরফোক রেজিমেণ্টের শেষ প্যারেডও হয়ে গেল। ছোট একটি কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে মাউণ্টব্যাটেন বক্তৃতা দিলেন। নেহরুর প্রেরিত একটি আন্তরিক বিদায়-বাণী পাঠ করলেন কারিয়াপ্পা।

নরফোক রেজিমেণ্ট তাঁদের পতাকা নামিয়ে এবং গুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে চললেন। সৈনিকের খাকি পরিচ্ছদে ভূষিত মাউণ্টব্যাটেন বক্তৃতার সময় বৃষ্টিতে ভিজছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে উৎসাহপূর্ণ উদ্দীপনার কোন অভাব হলো না। পতাকা গুটিয়ে ভারত হতে চলে যাবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, যাবার সময় সম্মান, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা অটুট রেখেই আমরা যেন বিদায় নিতে পারি। কারিয়াপ্পা যখন নেহরুর বাণী পাঠ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, ভারতের মনোভাব ও ধারণার কত বড় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, এ-বাণীতে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২০শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : নেহরু এবং লিয়াকৎ আম্বালা থেকে অমৃতসর পৌঁছে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি সনির্বন্ধ আবেদন প্রচার করেছেন। এক বেতার-বক্তৃতায় নেহরু বলেছেন যে, দুই পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টই শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ ক'রে এই 'নিদারুণ উন্মত্ততার' অবসান ঘটাবার সংকল্প করেছেন। নেহরু আরও বলেছেন—'ভারত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়, ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। নাগরিকের এই অধিকার রক্ষায় গভর্নমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাবেই কাজ ক'রে যাবেন।'

শরণার্থীর সমস্যা এরই মধ্যে প্রবল রূপ ধারণ করেছে। আনুমানিক হিসাব অনুসারে প্রায় দু' লক্ষ নরনারী কতগুলি বে-বন্দোবস্ত আস্তানায় গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে এবং 'ক্যাম্প' নামে আখ্যাত এই সব আস্তানায় থাকবার ব্যবস্থা এমনই শোচনীয় যে, অতি ব্যাপক ও ভয়ানকভাবে কলেরার আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : আজকের যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেনকে একটা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সীমানা ফৌজের সম্পর্কে দুই গভর্নমেণ্টের মনে যে-সব আপত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে, সেটা জানতেন মাউণ্টব্যাটেন। দুই গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা, সীমানা ফৌজ অবিলম্বে ভেঙ্গে দেওয়া হোক। দুই গভর্নমেণ্টই নিজের নিজের এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে নিজেরই প্রধান সেনাপতির প্রত্যক্ষ দায়িত্বে পরিচালিত দুই ফৌজ নিয়ে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। তাঁদের মতে, দুই রাষ্ট্রের সৈন্য নিয়ে এরকম একটা সম্মিলিত কম্যাণ্ডের এখন আর কোন অর্থ হয় না। দুই পক্ষই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের কম্যাণ্ড স্থাপন করতে ইচ্ছুক। মাউণ্টব্যাটেন এ বৈঠকে আসবার পূর্বেই জানতেন যে, সীমানা ফৌজ ভেঙে দেবার প্রস্তাব অকিনলেক এবং রীস, দু'জনের কেউই সমর্থন করবেন না। সামরিক অধিনায়ক ও নায়কের অভিমত যাই হোক, এ ধরনের প্রস্তাব স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেনেরও মতের বিরোধী। সুতরাং,

পরিষদের বৈঠকে এসে তিনি সমস্ত আলোচনাকে এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে রাখতেই চেষ্টা করলেন। আলোচনাও অন্য প্রসঙ্গের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পাকিস্থানের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত চুন্দ্রিগড়কে ঠেকাতে পারলেন না মাউণ্টব্যাটেন। চুন্দ্রিগড় হঠাৎ সীমানা ফৌজ সম্পর্কে কতগুলি অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য ক'রে বসলেন।

চুন্দ্রিগড়ের এ আচরণ মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ আগেই মাউণ্টব্যাটেন উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ ক'রে এই অনুরোধ করেছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় নেতাদের পক্ষ থেকে সীমানা ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্কে একটু প্রশংসাবাণী ঘোষিত হওয়া দরকার। সীমানা ফৌজের উপর দুরূহ কাজের ভার পড়েছে এবং পাঞ্জাবের যে-ধরনের অশান্তি দমনের জন্য তাদের চেষ্টা করতে হচ্ছে, সেটা তাদের মনোবল, নিষ্ঠা ও উৎসাহের একটা কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার। এই অবস্থায় তাদের উৎসাহ ও মনোবল অটুট রাখবার জন্য একটু প্রশংসাসূচক উৎসাহ-বাক্যেরই প্রয়োজন। যদি সীমানা ফৌজের পিছনে গভর্নমেণ্টের যথোপযুক্ত সমর্থন না থাকে, তবে অবশ্য ফৌজকে সরিয়ে দেওয়াই কর্তব্য হবে। কিন্তু এর ফলে যে রক্তারক্তি ব্যাপার আরম্ভ হবে, তার জন্য দোষের ভাগী হতে হবে তাঁদেরই, যাঁদের দাবীতে ফৌজ ভেঙে দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য বলতে বলতে হঠাৎ চুন্দ্রিগড়ের দিকে তাকিয়ে অভিভাবকের মতোই ভঙ্গীতে ধমক দিলেন—'আপনার এ ধরনের কথাগুলি যদি আপনার গভর্নর-জেনারেলের কানে যায়, তবে তিনি আপনাকে কি বলবেন, সেটা ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সীমানা ফৌজ সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল ভের্নন ও আমার উপর। সমস্ত বিকালটাই হার্ডিঞ্জ এভেন্যুয়ে পাক-হাই-কমিশনারের অফিসে এবং সেক্রেটারিয়েটে নেহরুর অফিসে দৌড়াদৌড়ি ক'রেই কেটে গেল। বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একটা কথা উল্লেখ করবার জন্য খুব জেদ ধরলেন চুন্দ্রিগড়। সীমানা ফৌজ যদি ভবিষ্যতে কর্তব্যের ত্রুটি করে, তবে ফৌজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে—এই ধরনের একটি মন্তব্য বিজ্ঞপ্তির মধ্যে রাখতে চাইছিলেন চুন্দ্রিগড়। আমরা বিজ্ঞপ্তির মধ্যে কঠোর উক্তি বর্জন ক'রে একটু মৃদুভাবেই অবশ্য একটি মন্তব্য ক'রে রেখেছিলাম—'বিশেষ বিশেষ এবং অল্পসংখ্যক কয়েকটি ঘটনার কথা বাদ দিয়ে অবশ্যই বলা যায় যে, সীমানা ফৌজ তাঁদের কর্তব্য ভালভাবেই ক'রে যাচ্ছেন।'

যাই হোক, আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত চুন্দ্রিগড়ের প্রস্তাবিত কঠোর মন্তব্যটি বাদ দিয়েই বিজ্ঞপ্তি রচনা করতে সক্ষম হলাম। সমস্ত ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে যে, দুই গভর্নমেণ্টকেই দুরূহ কর্তব্য পালনে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, যদি দেশের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দেখবার ইচ্ছা তাঁদের না থাকে। রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলার কাজে নিযুক্ত লোকের বিরুদ্ধে নিন্দা ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার দিন আর নেই।

নয়াদিল্লী, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে আসতেই মাউণ্টব্যাটেন একখানি চিঠি দেখালেন। মঙ্কটন জানিয়েছেন, তিনি নিজামের উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়েছেন, যদিও তিনি এখনও নিজামের আস্থাভাজন হয়েই আছেন। মঙ্কটন লিখেছেন, তিনি এখন আর গভর্নমেণ্ট হাউসে থাকতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, ইস্তফা দেবার পরেও এখানে থাকলে ব্যাপারটা লোকের চোখে

ভাল ঠেকবে না এবং লোকে তাঁকে ভুল বুঝতেও পারে। সংবাদটা মাউণ্টব্যাটেনের উপর একটা আঘাতের মতোই এসে পড়েছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমরা ডুবলাম!

গত জুলাই মাস থেকেই হায়দরাবাদ ও ভারত গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলে আসছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে যাবতীয় আলোচনার ব্যাপার এতদিন ধরে চলতে পেরেছে, তার মূলে রয়েছে মঙ্কটনের প্রতিভা। নিজামের প্রতিনিধি দলের মধ্যে মঙ্কটন এতকাল ছিলেন বলেই এবং তাঁর পরামর্শের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বলেই আলোচনাও এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে। ১২ই আগস্টে পেঁছেও মাউণ্টব্যাটেন যখন দেখলেন যে, মীমাংসার সম্ভাবনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তিনি হায়দরাবাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ ক'রে দিলেন। নিজামকে আরও দু'মাস সময় দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। পনরই আগস্টের পরেও দু'মাসের মধ্যে যে কোন দিন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার প্রস্তাব করতে পারবেন নিজাম এবং ভারত গভর্নমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য দু'মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন আমাদের বললেন যে, যদিও তিনি এখন আর ইংলণ্ডরাজের প্রতিভূ নন, তবুও ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁকে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করবার অধিকার দিয়েছেন। বেরার অঞ্চল সম্পর্কেও একটি ব্যবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্টকে রাজি করাতে পেরেছেন মাউণ্টব্যাটেন। বেরার এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই থাকবে, এখন বেরারের রাজনৈতিক ভিত্তির কোন নড়চড় করা হবে না। বেরার যদিও আইনত নিজামেরই রাজ্যের অংশ, কিন্তু বেরার এতকাল মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের দ্বারাই শাসিত হয়ে এসেছে। আপাতত এই ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ ছাড়া ভি পি মেননের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউণ্টব্যাটেন আর একটি বিষয় স্পষ্ট ক'রে নিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত না ক'রে হায়দরাবাদ ভারত ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণের প্রমাণ দিয়েছে, ভারত গভর্নমেণ্ট এরকম কোন ধারণা করবেন না, এই আশ্বাস নিজামকে এখন দিতে পারবেন মাউণ্টব্যাটেন। কারণ একটা বিষয় নিঃসংশয়ভাবেই তিনি জেনে নিয়েছেন যে, হায়দরাবাদকে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা চাপ দেবার কোন ইচ্ছাই ভারতীয় নেতাদের নেই।

কথা ছিল, আজকেই হায়দরাবাদ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নতুন ক'রে আলোচনা আরম্ভ হবে। মঙ্কটনের চিঠি পেয়ে ভি পি মেননকে ডেকে পাঠালেন মাউণ্টব্যাটেন এবং এই 'নতুন অবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই সময় সীমানা ফৌজের সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি তৈরীর বাকি কাজটুকুর জন্য আমরা বেরিয়ে গেলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি নিজামের কাছ থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটি টেলিগ্রাম পেঁছেছে। নিজাম মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন যে, মঙ্কটনের সঙ্গে দেখা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন যেন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, এসময় পদত্যাগ করা তাঁর উচিত হচ্ছে না। নিজাম একথাও জানিয়েছেন যে, মঙ্কটন যদি এসময়ে চলে যান তবে তাঁর স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা এখন নিজামের পক্ষে খুবই দুরূহ হবে।

এই সময় উপস্থিত হলেন স্বয়ং মঙ্কটন। মঙ্কটন বললেন, হায়দরাবাদের চরমপন্থী মুসলিম সঙ্ঘ ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন তাঁর বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের সংবাদ-পত্রগুলিতে অত্যন্ত হিংস্র ধরনের যে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন, তারই

জন্য তিনি পদত্যাগ করেছেন। মঙ্কটন বললেন, ঠিক এই একই কারণে প্রতিনিধি-দলের অন্যান্য দু'জন সদস্যও (নিজামের প্রধান মন্ত্রী ছত্তারির নবাব এবং নিজামের নিয়মতন্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী) ডেলিগেশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ছত্তারির নবাবের পদত্যাগপত্র নিজাম গ্রহণ করেননি। মঙ্কটন বললেন, তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন, যদি তার আগে ইত্তেহাদ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার করেন।

মঙ্কটন মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে তিনি নিজামকে অন্তত এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়ে আনতে পেরেছিলেন যে, নিজাম ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে বিশেষ ধরনের একটি সন্ধিসূত্রে আবন্ধ হবার প্রস্তাব করতে রাজি হয়েছিলেন। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, এই তিনটি বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে নিজাম রাজি হয়েছিলেন। তাৎপর্যের দিক দিয়ে বস্তুত রাষ্ট্র-ভুক্তিরই সমান, অথচ নামের দিক দিয়ে ভিন্নতর একটা সম্পর্ক স্থাপনে নিজামকে রাজি করাতে তিনি পারতেন। 'রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্র' নামটার বদলে 'সম্পর্কের ঘোষণাপত্র' নাম দিয়ে একটা শ্রুতিমধুর নামের ব্যবস্থা করলেই কাজ হয়ে যাবে বলে মঙ্কটন ধারণা করেছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কিন্তু এখানেই অসুবিধা আছে। নিজামের বেলায় একটা নতুন ধরনের কোন সম্পর্ক অথবা সম্পর্কের চুক্তিপত্র মেনে নিতে রাজি হলে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অবিচার ও অমর্যাদা করা হবে, প্যাটেল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন। প্যাটেল মনে করেন, নিজামের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের একটা সম্পর্ক স্থাপন করলে রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য রাজন্যদের প্রতি বস্তুত বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করা হবে।

মাউণ্টব্যাটেন মঙ্কটনকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মঙ্কটন যদি নিজামকে রাজি করাবার ব্যাপারে সাহায্য করেন, তবে তিনি নিজামের জন্য একটা নতুন ধরনের সম্পর্কের ব্যবস্থা অনুমোদনে ভারত গভর্নমেণ্টকেও রাজি করাবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করবেন। নতুন সম্পর্ক বলতে সম্পূর্ণভাবেই নতুন একটা সম্পর্ক অবশ্য বোঝাবে না, এ সম্পর্ক মূলত এবং মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রভুক্তিরই অনুরূপ সম্পর্ক হবে।

আজই খবর পেলাম, ভোপাল রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। সিদ্ধান্ত করার জন্য ভোপালকে অতিরিক্ত দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। মাউণ্ট-ব্যাটেন মন্তব্য করলেন—দেখতে পাচ্ছি, ১৫ই আগস্টের আগে যে ধরনের তাড়াহুড়ার মধ্যে উদ্‌ব্যস্ত হতে হয়েছিল, আবার সেই ধরনেরই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হচ্ছে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৭শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন তাঁর শয়নকক্ষে বসেই ভি পি ও আমার সঙ্গে একটা অতি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করলেন। পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রে অভিযোগের তুফান চলছে। হিন্দুস্থান টাইমসের দেবদাস গান্ধী এবং নিউজ ক্রনিকেলের সাহানিকে ডেকে পাঠালেন মাউণ্টব্যাটেন।

বিকাল চারটার সময় সম্পাদকদ্বয় এলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, দেশের সৈনিকদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি কোনরূপ আক্রমণমূলক সমালোচনা করা উচিত নয়, কারণ সৈনিকেরা এসব সমালোচনার উত্তর দিতে পারে না। যদি সৈনিকেরা

প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করে, তা'হলে দেশে মেক্সিকোর দশা দেখা দেবে, যেখানে প্রতিবাদকারী সৈনিক সম্পাদকদের শেষ ক'রে দিয়ে থাকে। মাউণ্টব্যাটেন প্যালেস্টাইনের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে বললেন যে, প্রত্যেক দেশে সাধারণত প্রত্যক্ষ-ভাবে সৈনিকদের অথবা সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না ক'রে সমর বিভাগেরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, মন্ত্রিসভার অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনা করা হয়ে থাকে। প্যালেস্টাইনে জেনারেল বার্কার যা করছেন, তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের যা বলবার সেটা সামরিক মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারি এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই বলা হচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে জেনারেল বার্কারকে আক্রমণ ক'রে কোন সমালোচনা করা হচ্ছে না।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পাঞ্জাবে কি ব্যাপার চলছে, তারই বর্ণনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ৩রা জুনের আগেই জ্ঞানী কর্তার সিং এবং তারা সিং তাঁকে বলেছিলেন যে, শিখেরা সময় উপস্থিত হলেই আক্রমণ আরম্ভ করবেন। সেই পরিকল্পিত আক্রমণ এখন শিখেরা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। তারা সিং ও কর্তার সিংকে মাউণ্টব্যাটেন বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁরা যে সময় আক্রমণ আরম্ভের পরিকল্পনা করেছেন, সে সময়ে ব্রিটিশেরা ভারতে থাকবে না। সুতরাং এ ধরনের আক্রমণ বস্তুত ভারতীয় বনাম ভারতীয়ের সংঘর্ষেরই ব্যাপার হয়ে উঠবে। কিন্তু শিখ নেতারা মত বদলাননি এবং তাঁরা বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ যতদিন না চলে যায় ততদিন তাঁরা শুধু প্রতীক্ষা করবেন এবং একবার চলে গেলেই হয়।

পাঞ্জাবের অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। আড়াই শত মাইল দীর্ঘ এবং দুইশত মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চল, আকারে ওয়েল্‌সের সমান, এরই মধ্যে এক কোটি মানুষ ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়েছে দেশান্তরে যাবার জন্য। পূর্ব পাঞ্জাবের পুলিশের শক্তিও বর্তমানে শোচনীয়ভাবে দুর্বল হয়ে রয়েছে। মুসলমান পুলিশেরা সকলেই পাকিস্থানে চলে যাওয়ায় পূর্ব পাঞ্জাবে এখন পুলিশের সংখ্যা মাত্র সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। শান্তিরক্ষার সরকারী ব্যবস্থার এই আকস্মিক হ্রাস-প্রাপ্তি পূর্ব পাঞ্জাবের বিপদকেই অবাধ হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২৮শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং লেডি মাউণ্টব্যাটেন সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। শরণার্থীদের বারটি শিবির ও কেন্দ্র, সাতটি হাসপাতাল এবং অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র তাঁরা পরিদর্শন করেছেন। পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, দুই প্রদেশেরই দুই গভর্নর এবং অন্যান্য বহু-সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে তাঁরা আলোচনাও করেছেন। বিপদ তুচ্ছ ক'রে অশান্তি ও হাঙ্গামার এক ভয়ানক মুহূর্তেই তাঁরা বস্তুত এক আর্তনাদমুখর ও যন্ত্রণাকাতর অঞ্চলে সেবা ও মমতার বাণী নিয়ে তাঁদের নির্ভীক অভিযাত্রা সমাপন ক'রে ফিরে এসেছেন।

রাজকুমারী অমৃত কাউর হলেন কাপুরথলার রাজ-পরিবারের মেয়ে। ধর্মে খৃস্টান এবং মহাত্মার অন্তরঙ্গ শিষ্য-সমাজের অন্যতমা। অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ এই রাজকুমারীর মুখের উপর একটা বিষাদমেদুর অবসাদের ভাব দেখা যায়, কিন্তু এটা বিষণ্ণ মুখোশের মতো বাইরের একটা আবরণ মাত্র। ঐ আবরণের আড়ালে কঠিন ও দুর্দম্য একটি প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা

মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে নিপীড়িত মানুষের সেবাব্রতের যে দায়িত্ব নিতে হয়েছে তার তুলনা হয় না। যুদ্ধ-নিপীড়িত পৃথিবীতে শত শত অবরোধ শিবিরে নির্বাসিত এবং লক্ষ লক্ষ দেশচ্যুত মানুষকে বিরাট এক দুর্দশার অভিশাপ বহন করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই দুর্দশার যুগেও রাজকুমারীকে আজ সরকারী কর্তব্য হিসাবে পাঞ্জাবভূমির মানুষের যে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আকারে প্রকারে ও ভয়ঙ্করতায় তার তুলনা নেই।

লেডি মাউণ্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি মুরিয়েল ওয়াটসনও পাঞ্জাব পর্যটনে এ'দের সঙ্গে ছিলেন। গত পরশু দিন তাঁরা জলন্ধর ও অমৃতসরে ছিলেন। মুরিয়েল বললেন, এই দুটি শহরকেই নিস্তব্ধ মৃতের শহর বলে মনে হলো। লেডি মাউণ্টব্যাটেন এবং রাজকুমারী যখন হাসপাতাল ও শরণার্থীদের শিবিরগুলি পরিদর্শন ক'রে ফিরছিলেন তখনই তাঁরা একটা বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ শুনতে পেলেন। শিয়ালকোট থেকে অমুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে একটি লরী আসছিল। আসবার পথে শরণার্থীদের অতি হিংস্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্ত ও আহত শরণার্থীদের অবস্থা দেখলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। বীভৎসভাবে জখম করা দেহ নিয়ে শরণার্থীরা পড়ে রয়েছে।

সকাল সাড়ে দশটার সময়ে মাষ্টার তারা সিংকে ডেকে এনে নিভৃতে আলোচনা করলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। শঙ্কিত তারা সিং কাঁপছিলেন। যে ক্রোধোন্মত্ততাকে তিনিই প্ররোচিত ক'রে এবং বল্‌গা খুলে ছেড়ে দিয়েছেন, তারই প্রতিক্রিয়া ও পরিণামের রূপ দেখে তিনি আজ আতঙ্কে কাঁপছেন।

শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি এবং গুজরাঁওয়ালা পরিভ্রমণ ক'রে আজ দিল্লী ফিরেছেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন।

সিমলা, ৩০শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : এবার যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক হয়েছে লাহোরে। সভাপতি হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনও বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ বৈঠকে জিন্নার যোগদানের কোন কথা ছিল না, কিন্তু সকলকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে জিন্নাও এই বৈঠকে যোগদান করলেন।

আলোচনাও অনেকক্ষণ ধ'রে চলল। তারপর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল যে, সীমানা ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়াই হবে।

দুই গভর্নমেণ্ট এবং দুই রাষ্ট্রেরই সংবাদপত্র যখন আর সীমানা ফৌজ রাখবার ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারছেন না, তখন এ ব্যবস্থা রাখবার আর কোন যৌক্তিকতা নেই। আর একটা কারণ ছিল। সীমানা ফৌজের সৈনিকেরা অবশ্যই যথেষ্ট অভিজ্ঞ কর্মদক্ষ এবং সামরিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাশীলও ছিল। কিন্তু এটা বুঝতে পারা গিয়েছে যে, সামরিক নিয়মানুগত্যের চেয়ে সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের দিকেই সৈনিকেরা এখন বেশি টান অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। অতি দুরূহ ও অসাধারণ রকমের দায়িত্ব পালনে রীস তাঁর সাধ্যমতো যে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য দু'পক্ষের কোন পক্ষ থেকেই রীসের কপালে বিশেষ কিছু ধন্যবাদ জুটল না।

পাঞ্জাব সীমানা ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়া হলো, সুতরাং সীমানা ফৌজের উপর যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের কর্তৃত্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এইসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনেরও শেষ 'এক্‌জিকিউটিভ' দায়িত্ব শেষ হলো। শাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কার্যপরিচালনার এই একটিমাত্র দায়িত্বভারই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সে দায়িত্বের অবসান হয়ে গেল।

মাউণ্টব্যাটেন এখন একটি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ক'রে নিয়েছেন। নিয়ম-

তন্ত্র অনুসারে তাঁর যে সব দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে, তার বাইরে তিনি যাবেন না। গভর্নমেণ্ট তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী কাজ ক'রে যাবেন। অবস্থা বুঝে যে ব্যবস্থা সব চেয়ে আগে করণীয় বলে গভর্নমেণ্টের মনে হবে, প্রশাসনিক দায়িত্ব হিসাবে গভর্নমেণ্ট সেটা অবশ্যই করবেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের এইসব দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ এবং সাময়িক প্রয়োজনের নানারকমের ব্যবস্থাপক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চান না মাউণ্টব্যাটেন। তিনি ঠিক করেছেন, গভর্নর-জেনারেল হিসাবে বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের যে পরিকল্পনা তিনি পূর্বেই ক'রে রেখেছেন, এবার থেকে মাত্র সেই পালনীয় কাজটুকু ক'রে যাবেন। তার আগে একবার সিমলা গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। তাই সিমলাতে এসেছেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেছেন মাউণ্টব্যাটেন।

ইস্‌মেও বিশ্রামের জন্য কাশ্মীর এসেছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন একটা কাজের ভার চাপিয়ে দিয়েছেন ইস্‌মের উপর। কাশ্মীর মহারাজের সঙ্গে ইস্‌মেকে দেখা করতে বলেছেন মাউণ্টব্যাটেন। মহারাজাকে বলতে হবে যে, আর এদিক-ওদিক না ক'রে এইবার মন স্থির ক'রে ফেলুন। মহারাজা ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে সে ডোমিনিয়নে যোগদান ক'রে ফেলতে হবে। কাশ্মীরকে এইভাবে আর বিপজ্জনক সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা উচিত হবে না। অতি দ্রুত এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়।

সিমলা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সিমলা এসে আমাদের বিশ্রামের একটি সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বিশ্রামের মধ্যেই বিচলিত হবার মতো কয়েকটি সংবাদ পেয়েছি এবং তাই নিয়েই চিন্তিত হয়ে রয়েছি। একদিকে ভারত গভর্নমেণ্ট ও তাঁদের অফিসারবর্গ, অপরদিকে বৈদেশিক সংবাদদাতার দল—এই দু'য়ের মধ্যে একটা মতভেদ ও মন-কষাকষির ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। না ভেবে-চিন্তে প্রসঙ্গের মধ্যে হঠাৎ যে-ধরনের এক একটা কথা বলে বসেন নেহরু, সেই ধরনেরই একটি উক্তির ফলে এই কাণ্ডটা আরও জোর বেধে উঠেছে। জনৈক বৈদেশিক সংবাদদাতার প্রেরিত এমন একটি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যেটা নেহরু খুবই আপত্তিজনক মনে করেছেন। রিপোর্টের সঙ্গে সংবাদদাতার নামেরও কোন উল্লেখ নেই। এই বিশেষ একটি রিপোর্টকে উপলক্ষ্য ক'রে নেহরু সকল বৈদেশিক সংবাদদাতাকেই সাধারণভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। এর ফলে বৈদেশিক সংবাদদাতাদের মনে এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট সংবাদ সেন্সর করবার ব্যবস্থা করবেন। আর, সরকারী কর্মচারীদের মনে যে বৈদেশিকাতঙ্ক আগের থেকেই ছিল, সেটা এবার তাঁদের আচরণে বেশ ভাল ক'রেই ফুটে উঠেছে। অনেক বৈদেশিক সংবাদদাতা এই অভিযোগ করেছেন যে, যদিও তাঁদের উপর প্রতিশোধ তুলবার মতো কোন কাজ ভারত গভর্নমেণ্ট করছেন না, কিন্তু যেটা করছেন সেটাও ভয় দেখাবার একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

মাউণ্টব্যাটেন আজ বিকালে বললেন, ভি পি মেনন একটা জরুরী বার্তা জানিয়ে টেলিফোন করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনকে অবিলম্বে দিল্লীতে ফিরে যাবার জন্য প্যাটেল জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন। ভি পি জানিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুতর অবস্থা দেখা দিয়েছে। নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পোঁছেছে যেখানে একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতির দ্বারাই সঙ্কট সামলানো সম্ভবপর হতে পারে।

বিপদ ও ব্যবস্থা

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেণ্ট হাউসে এসেই দেখলাম, প্যাটেলের একটি চিঠি নিয়ে ভি পি আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্যাটেল এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন অবিলম্বে এই অবস্থার সম্মুখীন হবার মতো সকল ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নেহরু উপস্থিত হলেন। এই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, সে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, প্রয়োগের এবং পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব মাউণ্টব্যাটেনকে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন নেহরু।

স্বাধীনতা লাভের পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রী উভয়েই মাউণ্টব্যাটেনকে সিমলার বিশ্রাম-নিবাস থেকে ডেকে নিয়ে এসে তাঁর উপর এই যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ভার অকুণ্ঠভাবে অর্পণ ক'রে দিলেন, এ'তে দুই ভারতীয় নেতারই চরিত্রের ঔদার্য এবং নেতৃত্বেরও মহত্ত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। কারণ, এই অনুরোধের দ্বারা তাঁরা অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে, উচ্চতরের প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে সে অভিজ্ঞতা তাঁরা এখনো অর্জন করতে পারেননি।

দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত তথ্য ও বিবরণ অনুধাবন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন সংকটের স্বরূপটুকু বুঝে নিলেন। তার পরেই প্রস্তাব করলেন—একটি 'জরুরী কমিটি' গঠন ক'রে ফেলতে হবে। নেহরু ও প্যাটেল এ প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন।

যে ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সেটা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। অবস্থাটা যুদ্ধজনিত অবস্থার মতোই, কিন্তু অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে ধরনের সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে সেটা আদৌ যুদ্ধকালীন জরুরী আয়োজনের মতো নয় এবং প্রয়োজনের পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানির হিংস্র মত্ততা, বিদ্বেষ, ভয় ও আতঙ্ক পাঞ্জাব থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকাণ্ডও ক্রমেই আরও ব্যাপক এবং আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আবার দেশান্তরের উদ্দেশ্যে ধাবমান হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃখের মিছিল। যুদ্ধে দুই বিবদমান পক্ষের সৈন্যবাহিনীর বিরাট সংঘর্ষেও মানুষের এরকম প্রাণনাশ ও নিপীড়ন ঘটতে দেখা যায় না। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নিজ বাসভূমি থেকে উৎসাদিত হয়ে দেশান্তরে চলে যাবার প্রত্যেকটি বড় বড় ঘটনায় দেখা গিয়েছে যে, দেশান্তরগামী নরনারীর দল এমন অবস্থা সৃষ্টি করে, যার সুযোগ নিয়ে অনেকেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধ ক'রে নেয়, কিন্তু অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেউ পারে না। পাঞ্জাবের ঘটনার মধ্যেও সেই ধরনের শোচনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করছি।

পাঞ্জাবের ঘটনার সব আঘাত দিল্লীর উপরে এসে পড়ছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী। সুতরাং এ সঙ্কট প্রাদেশিক গণ্ডি বিদীর্ণ ক'রে একেবারে সারাজাতির সঙ্কটে পরিণত হতে চলেছে। এই দিক দিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্কট ভারতের পক্ষে যতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, পাকিস্থানের পক্ষে ততটা নয়, কারণ পাক-রাজধানী করাচী পাঞ্জাব হতে অনেক দূরে।

রাজধানী দিল্লী ভারতের উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু কতদূর উত্তরে? অনেকেই এই দূরত্বের পরিমাণটুকু মনে রাখতে ভুলে যান। দূর দিল্লী বলতে অনেকেই এমন ধারণা ক'রে বসে থাকেন যে, দিল্লী যেন মাউন্ট এভারেস্টেরও উত্তরে অবস্থিত একটি জনপদ, এবং ভারতের অন্যান্য অংশের জীবনযাত্রার সঙ্গে যেন তার কোন নিকট-সম্পর্কের যোগ নেই। দেশ খণ্ডনের পর এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় দূর দিল্লী থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাবার যৌক্তিকতা অনেকেই আলোচনা করছেন। কিন্তু একটা দিক অনেকেই ভেবে দেখছেন না। স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে দেশের প্রান্তভাগ থেকে রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে স্থাপন করা এক ব্যাপার এবং স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক মাসের মধ্যেই অবস্থার আঘাতে ও চাপে পড়ে দিল্লী বর্জন ক'রে রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আর এক ব্যাপার। ঘটনার আক্রমণে বিব্রত হয়ে রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বস্তুত রাষ্ট্রশক্তির মর্যাদাকেই সমূহভাবে বিনষ্ট করা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটাই এখন একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে আজ আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়েছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ শরণার্থী এই ঘনবসতিবহুল জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, যেখানে এমনিতেই সব লোকের থাকবার জায়গা হয় না। পাঁচ লক্ষ শরণার্থীর সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের সমস্যা দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে, তার প্রতিকার করার মতো সরকারী ব্যবস্থা ও শক্তি দিল্লীর নেই।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ বিকাল পাঁচটার সময় গভর্নমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বারে জরুরী কমিটির প্রথম বৈঠক হলো। বৈঠকের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করতে গিয়ে নেহরু প্রথমেই মাউন্ট-ব্যাটেনকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—'আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করব, কিন্তু একটি সর্তে। সর্ত হলো, আপনাকে এই সমিতির সভাপতি হতে হবে।'

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলাম, কিন্তু একটি -সর্তে। সর্ত হলো, এ সংবাদ কখনই বাইরে প্রকাশ করা হবে না যে, আমি কমিটির সভাপতি হয়েছি।

সিদ্ধান্ত হলো, মন্ত্রিসভার ভিতর থেকে শুধু নেহরু, প্যাটেল, বলদেব সিং, মাথাই এবং নিয়োগী এই কমিটির সদস্য হবেন। তা ছাড়া, প্রধান সেনাপতি, সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের পক্ষ থেকে জনৈক প্রতিনিধি, দিল্লীর চীফ কমিশনার, দিল্লী পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা, বেসামরিক বিমান-ব্যবস্থা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এবং রেল-ওয়ে ও মেডিক্যাল বিভাগের কয়েকজন প্রতিনিধিও এই কমিটিতে থাকবেন। ইস্‌মের উপর এই কমিটি ও পাক-গভর্নমেণ্টের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজের ভার দেওয়া হলো।

কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি, অতি দুরূহ একটি কাজে সকল শক্তি উৎসর্গ করার জন্য এই কমিটিতে বস্তুত একটা সংকল্পের দীক্ষা মাত্র গ্রহণ করা হলো। ভবিষ্যৎ কোন্ রূপ নিয়ে দেখা দেবে, তার কিছুই স্পষ্ট ক'রে ধারণা করতে পারা যাচ্ছে না। যেন অজ্ঞাত এক পরিণামের দিকেই অগ্রসর হবার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। কমিটির প্রথম দিনের বৈঠকে সকলের মধ্যে এইরকম একটা হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করছি, যেন একটা ধাঁধার মধ্যে কোন পথ ঠাহর করতে না পেরে সবাই স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন। নেহরুর মুখে যে বেদনাভিভূত ভাব ও বিষাদ ফুটে উঠেছে, তা আর বর্ণনা করা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর এক মাসের মধ্যেই এইসব বীভৎস ঘটনা যে

বিভীষিকা তাঁর চোখের সম্মুখে উপস্থিত করেছে, সেটা যেন তাঁর সারা জীবনের সাধনা, লক্ষ্য ও আশাগুলিকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। প্যাটেল অশান্ত ও অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্যাটেলকে দেখে স্পষ্টত বোঝা যায়, তিনি ক্রোধে এবং ব্যর্থতা-বোধজনিত একটা আক্রোশে ছট্‌ফট্‌ করছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে একটা সুবিধা এই যে, তাঁর মনের মধ্যে এইরকম কোন বিষন্ন অবসাদের ভাব অথবা চিন্তার জ্বালা নেই। অভিভূত না হয়ে সমস্ত অবস্থা সুস্থিরচিত্তে এবং শান্তবুদ্ধি দিয়ে বিচার করা তাঁরই পক্ষে সহজ। সংকটে আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয় উদ্যম গ্রহণ করতে হলে যে দৃঢ়-সংযত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন, বর্তমান অবস্থা মাউণ্টব্যাটেনকে সেই প্রয়োজনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ সংকট বস্তুত মাউণ্টব্যাটেনেরই প্রতিভার উপর একটা পরীক্ষার মতো এসেছে। তিনিও প্রস্তুত হলেন। আশা, আত্মবিশ্বাস এবং সংকল্পনিষ্ঠার ভাব সঞ্চার ক'রে তিনি বৈঠকের মন থেকে অবসাদগ্রস্ত শূন্যতার ভাব দূর ক'রে দিলেন।

কলকাতা থেকে গান্ধীর 'অলৌকিক' কীর্তির সংবাদ আমরা পেয়েছি। সুরাবর্দীর সহযোগিতায় তিনি সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের যে কাজ করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন, তাঁর সে আশা প্রথম দিকে সফল হয়নি। কলকাতা শহরের এখানে-ওখানে ছুরিবাজি ও অন্যান্য হিংসাত্মক আক্রমণের ব্যাপার চলছিল। এই অবস্থা দেখে, তিনি গত সোমবার থেকে উপবাস আরম্ভ করেছিলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন, যতদিন না কলকাতা শহর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বর্জন ক'রে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়, ততদিন তিনি উপবাস ক'রে যাবেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি উপবাস ভঙ্গ করেছেন, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, উপবাস ক'রে মানুষের হিংসার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর আত্মার যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সে প্রতিবাদ সফল হয়েছে, গান্ধীর আবেদন জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

কলকাতার ময়দানে গান্ধীর একটি প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর হিন্দু ও মুসলমান হাজারে হাজারে পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়েছে ও কোলাকুলি করেছে। সহজে ভোলেন না এবং ভাল কথাও সহজে বলতে চান না, এই ধরনের সংশয়-কঠিন ও ঝানু সংবাদদাতারাও লিখেছেন, এরকম দৃশ্য তাঁরা কখনো দেখেননি। কয়েকটি দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মন বদলে দিয়েছে, কোন মানুষের এত বড় প্রভাব সত্য হয়ে উঠবার ঘটনা সংবাদদাতারা জীবনে দেখেননি। ব্যক্তিত্বের এ ধরনের প্রভাবের তুলনা পাওয়া যায় না।

কলকাতায় গান্ধীর কীর্তির কথা শুনে মাউণ্টব্যাটেন একটি মন্তব্যে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মানুষের সৎপ্রবৃত্তির কাছে আবেদন জানিয়ে এবং নৈতিক শক্তির সাহায্যে গান্ধী কলকাতায় যেভাবে শান্তি এনে দিয়েছেন, সেটা চার ডিভিসন সৈন্যও অস্ত্রশক্তির সাহায্যে করতে পারত কিনা সন্দেহ।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : জরুরী কমিটির বৈঠক। ত্রিবেদী এবং পূর্ব পাঞ্জাবের মন্ত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈঠকে এসে পৌঁছতে পারেননি। আলোচনার আরম্ভেই মাউণ্টব্যাটেন জানালেন, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে। শহরের চারদিকেই অনেক-গুলি ঘটনা ঘটেছে। এমন কি গভর্নমেণ্ট হাউসেরই এলাকায় কয়েকজন কর্মচারীকে ছুরি মারা হয়েছে। যা অনুমান করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি

সংখ্যক শরণার্থী দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে, অথচ শরণার্থীদের জায়গা দেবার ও নিয়ন্ত্রণ করবার কোন ব্যবস্থাই নেই।

অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে জনসাধারণের চলাফেরা নিষিদ্ধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিখদের কৃপাণের কথাও উঠল। প্যাটেল বললেন, সঙ্গে কৃপাণ রাখা শিখদের ধর্মসঙ্গত অধিকার এবং এ অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন বললেন, এ সময় শিখদের পক্ষে কৃপাণ সঙ্গে রাখবার অবাধ অধিকার স্বীকার করা চলে না। পৃথিবীর কোন শহরেই শান্তিরক্ষার জরুরী প্রয়োজনের সময় কোন নাগরিকেরই এ ধরনের অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার করেন না। মানুষের প্রাণ রক্ষা করাই এখন প্রথম লক্ষ্য। শিখদের একটা ধর্মীয় সংস্কার রক্ষার প্রশ্নের তুলনায় নাগরিকের প্রাণরক্ষার প্রশ্নকেই বড় ক'রে দেখতে হবে।

গভর্নর ত্রিবেদীও এলেন। জরুরী কমিটির উপরই তাঁর মনোভাব বিরূপ হয়ে রয়েছে। এ কমিটি স্থাপন ক'রে যেন তাঁরই কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে, তিনি এইরকম ধারণা করছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট ভালমতো কাজ করতে পারছেন না, এই ধারণা থেকেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এই জরুরী কমিটি স্থাপন করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন—পূর্ব পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার মতো শক্তি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের এখন আছে কিনা? মাউণ্টব্যাটেনের মতে পূর্ব পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ এবং সবচেয়ে প্রথম কাজ।

ত্রিবেদী বললেন, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে শরণার্থী অপসারণ করাই এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ।

মাউণ্টব্যাটেন অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা ফিরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন—যদি আমরা দিল্লীতেই হার স্বীকার করি, তা'হলে আমরাই শেষ হয়ে যাব।

প্যাটেল ও নেহরু উভয়েই শিখদের আচরণের বিরুদ্ধে বেশ একটু শক্ত হয়েই দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করলেন। সাধারণভাবে সকলেরই পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হলো, সেই সঙ্গে শিখদের কৃপাণও।

প্যাটেল বললেন—আমি দিল্লীকে কখনই লাহোরে পরিণত হতে দেব না।

নেহরু বললেন—শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, জীপ গাড়ির ব্যবহারও নিষিদ্ধ করতে হবে। এই জীপগুলি বহু অনিষ্ট ও নষ্টামির মূল।

সঙ্গে সঙ্গে এবং একে একে খবরও পেয়ে যাচ্ছি, দিল্লীর অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। উইলিংডন বিমান ময়দানেই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে শিখেরা শাসিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপর যদি কোন রকমের আক্রমণ হয় তবে ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রীয় মর্যাদাই বিনষ্ট হবে।

এদিকে দিল্লীর গ্যারিসনও প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছে, কারণ দফায় দফায় এক একটি সৈন্যদলকে শান্তিরক্ষার কাজে গুরগাঁও জেলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লীর শান্তিরক্ষার জন্য মাউণ্টব্যাটেন আজ তাঁর বডি-গার্ড বাহিনীকে দিল্লীর গ্যারিসন কম্যাণ্ডারের হাতে ছেড়ে দিলেন। ব্যবস্থা হলো, এক একটি সাঁজোয়া গাড়িতে দু'জন ক'রে বডি-গার্ড বাহিনীর সৈনিক থাকবে। একজন শিখ সৈনিক এবং একজন পাঞ্জাবী মুসলমান সৈনিক নিয়ে সাঁজোয়া গাড়িগুলি দিল্লী শহরে টহল দেবে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বারের পাশে একটি কক্ষের নাম এখন হয়েছে ম্যাপ-রুম বা মানচিত্র কক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের সুদক্ষ অধিনায়ক মাউণ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থাটি করেছেন। জরুরী অবস্থায় সকল উদ্যোগ সুসংহত ক'রে অতি দ্রুত কাজ করতে হলে এ ধরনের ম্যাপ-রুমের উপযোগিতা কতখানি, সেটা সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মাউণ্টব্যাটেনের ভালরকমই জানা আছে। সমগ্র উপদ্রুত অঞ্চলের মানচিত্রের উপর ছোট ছোট পতাকা প্রোথিত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব রিপোর্ট প্রতিদিন আসছে, তারই তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিদিন পতাকাগুলি ঘটনাস্থল অনুসারে প্রোথিত করা হয়। দেখা মাত্র বোঝা যায়, হাঙ্গামার গতি কোন্ দিকে, শরণার্থীরা কত সংখ্যায় কোন্ দিকে চলেছে, কোথায় অবস্থা শান্ত এবং কোথায় নতুন সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। রিপোর্ট অনুসারে সারাদিন ধরে এবং মাঝ রাত্রি পর্যন্ত মানচিত্রের উপর পতাকা সন্নিবেশ করার পালা চলতে থাকে। জরুরী কমিটির সদস্যেরা সকাল বেলাতেই এসে সমস্ত অবস্থার একটা তথ্যগত রূপ এই মানচিত্র থেকেই বুঝে নিয়ে যান। কাজটা খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। যে লেঃ কর্ণেলের উপর এই প্রাত্যহিক মানচিত্র প্রস্তুত করবার ভার পড়েছিল, তিনি প্রথম দিনেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

সাহায্য ও সেবাকার্যের জন্য একটি 'সংযুক্ত পরিষদ' স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিষদের পরিচালনার ভার নিয়েছেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। পনরটি বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান পরিষদের প্রথম দিনের বৈঠকে যোগদান করেছেন।

ছত্তারির নবাব এবং মঙ্কটন, উভয়েই এখন গভর্নমেণ্ট হাউসে রয়েছেন। নবাবের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। নবাব বললেন, নিজামের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি কাজ করতে চান, কিন্তু নিজাম যে ধরনের নানারকম নির্দেশ পাঠাচ্ছেন সেগুলি পালন করতে তাঁর খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

দিল্লীতে এখন যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তার তুলনায় হায়দরাবাদকে এখন আর তেমন কোন গুরুতর সমস্যা বলে মনে হয় না। মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, হায়দরাবাদ সম্বন্ধে বর্তমানের এই মনোভাবের মধ্যেই একটা কাজ ক'রে নেবার সুযোগ আছে। রাষ্ট্রভুক্ত হতে চাইছেন না নিজাম, কিন্তু চুক্তির নাম ও ভাষার রকম-সকম একটু বদ্‌লে দিলেই নিজাম বস্তুত রাষ্ট্রভুক্তি গোছের একটা ব্যবস্থায় রাজি হয়ে যেতে পারেন। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এদিক দিয়ে কিছু কাজ এই সময়েই এগিয়ে রাখা যেতে পারে। ওদিকে নিজামও একটা কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিনিধি মণ্ডলীর সদস্যদের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ সংবাদপত্রে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, তারই বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নিন্দা ক'রে নিজাম এক ফারমান জারি করেছেন। এর পর মাউণ্টব্যাটেনের কাছেও কয়েকটি চিঠি দিয়েছেন নিজাম। মঙ্কটনের উপর তিনি তাঁর অক্ষুণ্ণ আস্থার কথা জানিয়েছেন। ইত্তেহাদের ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে জাঁকালো ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং সব চেয়ে বেশি নিন্দা করেছেন ইত্তেহাদের ধর্মোন্মাদ নেতা কাশিক রেজভিকে।

দেখা যাচ্ছে, নিজাম যেন থেমে-থেমে এবং ধীরে সুস্থে একটা আপোষের দিকে আসবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কংগ্রেস যেসব তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করছেন, তার থেকে উল্টো রকমেরই ধারণা করতে হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহের এবং সব রকম সংবাদ রাখবার দক্ষতা কংগ্রেসের আছে এবং এ দক্ষতাও

বস্তুত বিস্ময়কর। কংগ্রেস যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে হায়দরাবাদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। কংগ্রেস এ তথ্য জানতে পেরেছেন যে, নিজাম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হবারই পরিকল্পনা করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বহু পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াতে অর্ডার পাঠিয়েছেন নিজাম গভর্নমেণ্ট।

ছত্তারি বললেন, এরকম কোন চেষ্টা হলে তার ফল হায়দরাবাদ ও ভারত উভয়েরই পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে।

হায়দরাবাদ ও ভারতের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার এই অচল অবস্থা দূর করার প্রয়োজনীয়তা ছত্তারি ও মঙ্কটন উভয়েই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করছেন। আজকের আলোচনায় ঠিক হলো যে, দু'জনেই এখন হায়দরাবাদে ফিরে যাবেন এবং ভারত গভর্নমেণ্ট ও নিজামের মধ্যে মতভেদের পরিসর হ্রাস করবার জন্য তাঁরা নতুন ক'রে চেষ্টা আরম্ভ করবেন। প্রধান দুই পক্ষ হয়তো ছত্তারি ও মঙ্কটনের প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থার সূত্র প্রথমে মেনে নিতে রাজি হবেন না। প্রথম প্রথম ব্যর্থ হতে হবে, এই বাস্তব সত্যটি স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং স্মরণে রেখেই মঙ্কটন ও ছত্তারি এখন হায়দরাবাদ চলে যাবেন।

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালাম। অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে সুপ্রাচীন শহর দিল্লী। স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে, যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি জনপদের মতোই দিল্লীকে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, এখনি সাইরেনের বিলাপ বেজে উঠবে এবং শোনা যাবে বিমানের গম্ভীর গুঞ্জন। অন্তত জনতার একটা সোরগোলও শুনতে পাব। কিন্তু না, যুদ্ধাক্রান্ত ও বিধ্বস্ত একটা জনপদের প্রাণে যতটুকু সাড়াশব্দের চাঞ্চল্য থাকে, এ দিল্লীর প্রাণে তা'ও নেই। দিল্লীর এই অভিশপ্ত রাত্রির নিস্পন্দ স্তব্ধতা ভেঙে দিতে পারে, এমন সাড়া-শব্দও কোথাও শোনা গেল না।

ব্রিটেনের এক সংবাদপত্র গালভরা খবর জমাবার উৎসাহে দিল্লীর অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তা'তে বলা হয়েছে—'পাঁচ লক্ষ লোক দিল্লীর আগুন-ঝল্‌সানো পথে পথে মারামারি ক'রে ফিরছে।' অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের একটা বড় উদাহরণ। তা ছাড়া, এই ধরনের উক্তিতে হাঙ্গামার সম্পর্কেই সম্পূর্ণ ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়। হাঙ্গামাগুলি ঠিক দু'পক্ষের প্রকাশ্য মারামারি ও সংঘর্ষের ব্যাপার নয়। আড়ালে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ একজনের উপর মারাত্মক আঘাত ক'রে তখনি পালিয়ে যাওয়া—এই হলো দাঙ্গা। আগুন লাগাবার রীতিও এই ধরনের। একদল লোক চুপে চুপে এসে এক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দ্রুত সরে পড়ে। সমস্ত হত্যাকাণ্ড ও আগুন-লাগানো কাণ্ডের পিছনে রয়েছে এই ধরনেরই অতর্কিত আক্রমণ ও পালিয়ে যাবার পদ্ধতি।

আমি ঠিক করলাম, এইবার একদিন পথে বের হয়ে নিজের চোখেই ভাল ক'রে দেখতে হবে, ঠিক কি ধরনের হাঙ্গামা চলছে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : কলকাতার 'অলৌকিক' ঘটনার পর গান্ধী দিল্লীতে এসেছেন। কলকাতার 'অলৌকিক' ঘটনা সম্বন্ধে গান্ধী কিছু বলতে চান না। বরং দেখলাম যে, তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকতেই ইচ্ছা করেন।

জরুরী কমিটির কাছে আজ পেশোয়ার এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। মন্ত্রীদের ধারণা, রিপোর্ট থেকে যা জানা যাচ্ছে, বস্তুত তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক ঘটনার সংবাদে বিচলিত হয়ে, অতি নিদারুণ কিছু হয়ে গিয়েছে বলেই বিশ্বাস করবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এক এক সময় মনে হয়, এই দুই নতুন জাতির মন যেন একটা মৃত্যুমুখী আবেগে অভিভূত হয়ে রয়েছে এবং কেউই এ বিষয়ে একটুও সচেতন নন যে, সাম্প্রদায়িক হানাহানির পথেই মীমাংসার চেষ্টা করার অর্থ জাতি হিসাবে আত্মহত্যা করারই ব্যাপার হবে।

গভর্নর-জেনারেলের বডি-গার্ডের সঙ্গে এখন ষষ্ঠ গোর্খা রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়নও দিল্লীর শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে হাসপাতাল-গুলিকে পাহারা দিয়ে রক্ষা করার ভার গোর্খা ব্যাটালিয়নের উপর দেওয়া হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার এই যে, হত্যার জন্য সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায়কে খুঁজে বের করা হয়। বিশেষভাবে দুর্বল ও অসহায় অবস্থার মানুষকেই হত্যা করার একটা নিষ্ঠুর লালসা। এই কারণেই রোগীর আশ্রয় হাসপাতাল এবং শরণার্থীবাহী ট্রেণগুলিই উন্মত্ত খুনীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

হাসপাতালগুলি যাতে সুরক্ষিত হয়, তার জন্য লেডি মাউণ্টব্যাটেন খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পুরনো দিল্লীতে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালে পাহারার জন্য সান্ত্রী মোতায়েনের কি ব্যবস্থা হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য আমরা বের হলাম। আমরা অর্থ, গভর্নমেণ্ট হাউসেরই একটি লক্কর বুইক, একজন শিখ ড্রাইভার, ড্রাইভারের পাশে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ইনস্পেক্টর এল্‌ডার, ভিতরে আমি ও মার্টিন। হাসপাতালে এসে শুনলাম, আজ আর কোন আক্রমণের ঘটনা সেখানে হয়নি। গোর্খা সৈনিকদের উপস্থিতিতে রোগীরা আশ্বস্ত হয়েছে ও নিরাপদ বোধ করছে।

হাসপাতাল ছেড়ে আমরা এইবার রওনা হলাম পাহাড়গঞ্জের দিকে। দেখতে হবে, দিল্লীর একটি প্রধান হাঙ্গামা-অঞ্চল পাহাড়গঞ্জের অবস্থা এখন কি রকম।

চারদিকে শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতা, পথে মানুষের চিহ্ন নেই। দিল্লী স্টেশনের কাছে প্রকাণ্ড ওভার-ব্রিজটার নিকট দিয়ে ঢালু পথে আমাদের গাড়ি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলী আমাদের গাড়ির উপর সশব্দে এসে পড়ল। বুঝতে পারছি না, কিসের জন্য এ আক্রমণ? কারা আক্রমণ করেছে?

শুধু শুনতে পাচ্ছি, দূরে কারা যেন হল্লা করছে। তার পরেই আবার কয়েক ঝাঁক গুলী এসে পড়ল আমাদের গাড়ির উপর। আমি ও মার্টিন গাড়ির গদির নীচে গড়িয়ে পড়লাম, প্রাণরক্ষার জন্যই একটা আড়াল খুঁজছিলাম। দেখলাম, মার্টিনের গায়ে একটি গুলী লেগেছে। মার্টিনের ডানদিকের কান থেকে অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থাতেই শুনতে পাচ্ছি, সামনের সীটে বসে এল্‌ডার চীৎকার করছেন—গুলী করো না। গুলী বন্ধ কর।

আরও বুঝতে পারছি, আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে ব্রিজের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি ধাক্কা খেয়ে এখনি উল্‌টে গিয়ে একেবারে তলায় পড়ে যাবে। পর মুহূর্তেই মনে হলো, গাড়িটা হঠাৎ যেন সোজা পথে ঘুরে গেল এবং কিছু দূরে এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, কি ব্যাপার হয়েছে। আমাদের শিখ ড্রাইভার তখনো স্টিয়ারিং-চকা ধরে বসেছিল, কিন্তু প্রাণহীন তার দেহ, পাথরের মতো নিশ্চল। যে গুলীর ঝাঁক ঠিক আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুটে এসেছিল, সেই গুলীর ঝাঁকই শেষ ক'রে দিয়েছে শিখ ড্রাইভারকে, কারণ আমি প্রাণরক্ষার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মুহূর্তের মধ্যে সীটের নীচে বসে পড়েছিলাম। আমি বেঁচে গেলাম, কিন্তু শিখ ড্রাইভারের প্রাণ গেল। ড্রাইভারের আত্মরক্ষার কোন সুযোগও ছিল না, কারণ তার হাত ছিল স্টিয়ারিং-চাকার উপর। নিঃশব্দে একটি আক্ষেপের শব্দও উচ্চারণ না ক'রে শিখ ড্রাইভাব তার কাজের মধ্যেই মরে গেল। দুঃসহ দৃশ্যটা যেন আমার মনের ভিতর একটা বোবা বেদনার মতো ছট্‌ফট্‌ করছিল।

আমার মনে হলো, মার্টিনেরও আর দেরি নেই, বাঁচবে না মার্টিন। তা ছাড়া আবার আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও করছিলাম। গাড়ির চাকার টায়ার ফুটো হয়ে গিয়েছে। সাদা ডিনার জ্যাকেট আর বো-টাই প'রে মধ্যাহ্নের রোদে দিল্লীর একটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের পথের উপর পড়ে রয়েছি আর এক ঝাঁক গুলীর প্রতীক্ষায়। জীবনে এটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বটে।

কিছুক্ষণ পরেই স্টেশনের দিক থেকে একটি সামরিক লরী এগিয়ে এল। দেখলাম, লরীতে সৈন্যদের একটি পিকেট রয়েছে। আমাদের সব ইঙ্গিত ও সঙ্কেত তুচ্ছ ক'রে সৈনিকেরা আবার সোজা রাইফেল তুলে আমাদের দিকে তাক্‌ করল। ইন্সপেক্টর এল্‌ডার অনেক চীৎকার ক'রে বোঝালেন—'আগে গুলী না মেরে আগে জেনে নিন, আমরা কারা।'

অনেক ক'রে বোঝাবার পর সৈনিকেরা রাইফেল নামাল এবং উইলিংডন হাস-পাতাল হয়ে গভর্নমেণ্ট হাউসে আমাদের পেঁৗছিয়ে দিতেও রাজি হলো।

মার্টিনকে হাসপাতালে রেখে আমরা গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এলাম। রক্তস্রাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মার্টিন।

পরে খবর পেলাম, মার্টিনের আঘাত মারাত্মক নয়। শুনে খুশি হলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মাউণ্টব্যাটেন কি ভাববেন? যাবার আগে অনুমতি নিইনি। নিজের ব্যক্তিগত একটা কৌতূহলের ঝোঁকে বাইরের বিপদের মধ্যে গিয়ে শুধু নিজেকেই যে বিপন্ন করেছিলাম তা নয়, গভর্নর-জেনারেলের স্টাফের কয়েক ব্যক্তিকেও বিপন্ন করেছি।

বেলা দুটোর সময় মাউণ্টব্যাটেনের কাছে গিয়ে সব ব্যাপার জানিয়ে বললাম—মার্টিন সুস্থ হয়ে উঠছেন। যাই হোক, মাউণ্টব্যাটেন কোনরকমের 'মহতী ভর্ৎসনার' দ্বারা আমাকে অপ্রস্তুত আর করলেন না। বরং, আমি যে বাঁচতে পেরেছি, তার জন্যই আমাকে এমনভাবে কয়েকটি প্রশংসার কথা বললেন, যা শুনে মনে হলো যে, আমার এই বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টার জন্য মাউণ্টব্যাটেন যেন আমাকে তারিফ করছেন।

আমি অতীতের একটি বোমা পতনের কাহিনীও মাউণ্টব্যাটেনকে শোনালাম। সেই বোমা পতনেও মৃত্যুর হাত থেকে আমি একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম। তারপর, আজ এই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম। আজ হলো, ৯ই সেপ্টেম্বর; আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে ১৯৪০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে সেই হিটলারী আক্রমণের একটি ভয়ঙ্কর দিনে ওয়েষ্টমিনষ্টারে আমাদের নীচের তলার ফ্ল্যাটের বাইরের রোয়াকের উপরেই একটি প্রচণ্ড পাঁচশত পাউণ্ডার পড়েছিল।

সেদিনও কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, তার বিররণ শোনালাম মাউণ্টব্যাটেনকে। সব শ্বনে মাউণ্টব্যাটেন একটিমাত্র মন্তব্য করলেন—'১৯৫৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে আমাকে একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন, আপনার কাছ থেকে সেদিন একট্ব দ্বরে সরে থাকতে হবে।'

নয়াদিল্লী, ব্হস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজকের জর্বরী কমিটির বৈঠকে ভি পি মেনন আমাকে বললেন যে, দিল্লীর অবস্থা ভালর দিকে। শিখেরা প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দিয়ে শান্ত হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আজকের বৈঠকেই একটা নতুন কথা শ্বনলাম। শিখদের কৃপাণ সম্বন্ধে প্যাটেল তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মতে, কৃপাণ সঙ্গে রাখবার অধিকার ক্ষ্বন্ন করা উচিত নয়। আরও শ্বনলাম, এই কৃপাণের প্রশ্ন নিয়েই ভারত রাষ্ট্রের দ্বই শক্তিমানের মধ্যে বেশ কথাকাটাকাটি হয়ে গিয়েছে। নেহর্ব বলেছেন—ধর্মগত অধিকার রক্ষার নামে খ্বন করার অধিকার স্বীকার করা যায় না।

প্যাটেল বলেছেন—এটা সংগত কথা হলো না। খ্বন করার অধিকার স্বীকার করবার কথা কেউ বলছে না। কিন্তু সকল ধর্মের মর্যাদা গভর্নমেণ্টকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

মন্ত্রিসভার যে জর্বরী কমিটি গঠিত হয়েছে, সেই কমিটিই হলো সরকারীভাবে প্রধান কর্তৃত্বসম্পন্ন কমিটি। এইবার বিশেষভাবে শ্বধ্ব দিল্লীর জন্যই একটি জর্বরী কমিটি গঠিত হলো। মন্ত্রিসভার জর্বরী কমিটি বৃহত্তর সমস্যা ও অন্যান্য গ্বর্ত্বপ্র্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কাজে ব্যাপৃত থাকবেন, আর দিল্লীর জর্বরী কমিটি শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরণার্থীর বন্দোবস্ত ইত্যাদি বহ্ব ও বিবিধ প্রাত্যহিক কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকবেন। এর ফলে এই স্ববিধা হবে যে, নানারকম প্রাত্যহিক এবং নিত্য নতুন প্রয়োজনের তাগিদ অন্বযায়ী ব্যবস্থা করার পাঁচমিশালী ঝঞ্ঝাট থেকে প্রধান জর্বরী কমিটি ম্বক্ত থাকতে পারবেন এবং বৃহত্তর সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়গ্বলিতে বেশি মন দেবার স্বযোগ পাবেন।

বাণিজ্য-মন্ত্রী বৈজ্ঞানিক ভাবা এবং মন্ত্রিসভার সেক্রেটারি এইচ এম প্যাটেল দিল্লী জর্বরী কমিটির চেয়ারম্যান ও ডেপ্বটি চেয়ারম্যান নিয্বক্ত হয়েছেন। দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল পরিচালনার কার্যের সকল দায়িত্ব এই জর্বরী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হলো।

খাদ্য বাঁচাবার এবং খাদ্যের অপচয় নিবারণেরও একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভ করেছেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। খাদ্যসঙ্কোচের নীতি প্রথম প্রয়োগ করলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন গভর্নমেণ্ট হাউসেরই রন্ধনশালাতে।

হিজ এক্সেলেন্সির নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এসেছেন লর্ড লিস্টাওয়েল এবং স্যার গিলবার্ট লেটওয়েট। মাত্র তিন পদ ভোজ্যের দ্বারা অতিথিদের আজ তুষ্ট করা হলো—স্বপ নামে বস্তুত এক বাটি কপি-সেদ্ধ জল, একটি আল্ব এবং সামান্য চীজ মাখানো একটি বিস্কুট। এই হলো ডিনার।

দেখে মনে হলো, লিস্টাওয়েল এই সরল ও সামান্য ভোজনের ব্যবস্থা দেখে খ্বশিই হয়েছেন। আমরাও আশা করেছিলাম, খাদ্যসঙ্কোচের এই ব্যবস্থা দেখে লিস্টাওয়েল খ্বশিই হবেন। কিন্তু ডিনার শেষ হয়ে যাবার পরেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্বধ্ব কি আমাকেই আপ্যায়িত করার জন্য এই চমৎকার ভোজনের ব্যবস্থাটি আজ করা হয়েছিল?'

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করছি আমরা তিনজন—আমি, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বি এল শর্মা এবং প্রধান সেনাপতির পক্ষ থেকে লেঃ কর্ণেল উন্নি নায়ার। শর্মা অত্যন্ত ধীরবুদ্ধির মানুষ। উন্নি নায়ার প্যারাসুটবাহিনীর দক্ষ সৈনিক। আমরা তিনজনে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই কাজ ক'রে যাচ্ছি।

মানচিত্র কক্ষে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সমগ্র অবস্থার পরিচয় নিতে এসেছেন। আমাদের কাজ হলো, মানচিত্র অনুসারে সকল তথ্য ব্যাখ্যা ক'রে অবস্থার একটা বাস্তবোচিত ও যথার্থ বিবরণ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে রীস উপস্থিত হয়েছেন। তিনি 'মিলিটারী মুখপাত্র' হিসাবে অবস্থার বিবরণ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের শোনাবেন। যেসব তথ্য রীস পরিবেষণ করবেন, সেসব একটা বিবৃতিরূপে লিপিবদ্ধ ক'রেই তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনেরই সাংবাদিক সম্মেলনে রীস একটা কাণ্ড ক'রে বসলেন। বক্তব্য বলবার সময় তিনি লিখিত বিবৃতির বাইরে এবং অতিরিক্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ আরম্ভ করলেন। তা'ছাড়া, আরও অসতর্ক হয়ে তিনি একেবারে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের চোরাবালির মধ্যে তাঁর বক্তব্য টেনে আনতে আরম্ভ করলেন। এমন সব উক্তি করলেন রীস, যেগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র। এর ফলে উপস্থিত সাংবাদিক ও সংবাদদাতারা অস্বস্তিবোধ করতে আরম্ভ করলেন। কয়েকজন সংবাদদাতা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এর পর থেকে অন্য রকমের ব্যবস্থা হলো। মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন, বর্তমানের মানসিক পরিবেশের মধ্যে এবং ব্যবস্থার সৌষ্ঠবের দিক দিয়েও রীসকে এ কাজের ভার আর দেওয়া চলে না। রীসও এই অভিমত সমর্থন করলেন। ঠিক হলো, এবার থেকে উন্নি নায়ারই সাংবাদিক সম্মেলনে অবস্থার রিপোর্ট বর্ণনার কাজ করবেন।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হলো মানচিত্র কক্ষে। নেহরু বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ ক'রে একটি বক্তৃতা দিলেন। সঙ্কট দেখা দেবার পর নেহরুর সঙ্গে এই প্রথম বৈদেশিক প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ হলো। অত্যন্ত সরলভাবে এবং মনের মধ্যে কোন ভাব চাপা না রেখে, নেহরু বক্তৃতা করলেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তার্কিক দক্ষতা দেখাবার কোন চেষ্টা তাঁর বক্তৃতায় ছিল না। কিংবা, কৈফিয়তের সুরে ত্রুটি ঢাকবারও কোন চেষ্টার আভাস তাঁর বক্তৃতায় দেখা গেল না। বর্তমানে যেসব দুঃখকর ঘটনা ঘটেছে, তারই উল্লেখ ক'রে তিনি সব সমস্যার গভীরে নিহিত কয়েকটি ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় বর্ণনা করলেন, যার মধ্যে নেহরুর পণ্ডিতোচিত সন্ধিৎসা এবং তত্ত্বদর্শিতারই প্রমাণ নতুন ক'রে পেলাম। নেহরু বললেন—'ভারতের ইতিহাস হলো আহরণ ও সমন্বয়ের ইতিহাস। বাইরে থেকে বহু বিভিন্ন এবং বিচিত্র যা কিছুই ভারতে এসেছে, ভারত সে সবই আহরণ এবং আত্মস্থ করেছে। সম্ভবত আমরা ভারত ইতিহাসেরই এই চিরন্তন প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করেছি, তারই ফলে আমাদের আজ এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।...বর্তমান অবস্থার অবিলম্বে অবসান বাঞ্ছনীয়। এটা আমাদেরই সকলের সাধারণ স্বার্থের ব্যাপার। এ অবস্থাকে অবিলম্বে আয়ত্তের মধ্যে না আনতে পারলে দুই ডোমিনিয়নেরই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সচেতন আছি বলেই আম্বালা ও লাহোরে দুই ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দু'বার সাক্ষাৎ আলোচনা হতে পেরেছে। অবশ্য

এটা ঠিক যে, আলোচনার সভাতে বসে একটা সিম্ধান্ত ক'রে ফেলা অনেক সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে সিম্ধান্ত প্রয়োগ করা খুবই দুরূহ। কিন্তু এ সত্ত্বেও, এখন দুই গভর্নমেণ্টের পক্ষে আলোচনা ক'রে মোটামুটিভাবে একটা সম্মিলিত ও সাধারণ নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হলে কাজের এবং প্রয়োজনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সুবিধার বিষয় হবে।'

নেহরুর বক্তৃতা থেকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় বৈদেশিক প্রতিনিধিরা পেলেন, তাতে তাঁরা খুশি হয়েছেন এবং অনেকটা আশ্বস্তও হয়েছেন মনে হলো। নেহরুর বক্তব্যের মধ্যে কথার কোন বাড়াবাড়ি ছিল না। এটাই বৈদেশিক প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। ভারত রাষ্ট্রের তথা ভারতীয় জাতীয়তার মূল নীতি সম্বন্ধেই বৈদেশিক প্রতিনিধিরা কোন ধারণা করতে পারছিলেন না। নেহরুর কথা থেকে তাঁরা অন্তত এইটুকু বুঝে আশ্বস্ত হলেন যে, বৈদেশিকের পক্ষে এখানে বিব্রত হবার কোন কারণ নেই। ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার টেরেন্স শোন আজ আমাকে 'প্রথম আক্রান্ত ব্রিটিশ' ভদ্রলোকের নাম ও পরিচয় পাঠিয়েছেন। জনৈক ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের উপর গুলী করা হয়েছে।

বৈদেশিক প্রতিনিধিরা চলে যাবার পর মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর কাছে গিয়ে একটি বিষয় আলোচনার জন্য আমার ডাক পড়ল। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, মাষ্টার তারা সিং তাঁর একটি বিবৃতিতে এমন সব কথা বলেছেন যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এখন 'যুদ্ধ' চলছে। তারা সিং-এর এই ঘোষণা তথা বিবৃতির কথা পাকিস্থানে খুব বেশি ক'রে রটেছে। এ অভিযোগের কতখানি সত্য এবং প্রকৃত ব্যাপারটা কি, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে গভর্নমেণ্টকে জানাবার জন্য জেনারেল থিমাইয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সংবাদ শুনে নেহরু বিব্রত বোধ করছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, বর্তমানের এরকম একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে যদি আবার উত্তেজনা ও বিদ্বেষের প্ররোচক নানারকম বিবৃতি, ঘোষণা ও উক্তি অবাধে প্রচারিত হতে থাকে, তবে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

নেহরু প্রস্তাব করলেন, তিনি এবার 'মানচিত্র কক্ষে' সাংবাদিকদের আহ্বান ক'রে তাঁর বক্তব্য বলবেন। সাংবাদিকদের কাছে কি কি বিষয়ে বলার প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি জানালাম, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এবং পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট, উভয়কেই এখন কি ধরনের এবং কত বড় প্রশাসনিক দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সাংবাদিকদের প্রদান করা কর্তব্য, যা'তে সাংবাদিকেরাও বর্তমান অবস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্বের দুরূহতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারেন।

নেহরুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ চলছে, তখনই লিয়াকতের টেলিফোন এল। নেহরুকে একবার লাহোরে আসতে আহ্বান করছেন লিয়াকৎ। 'কনভয়' সমস্যা, অর্থাৎ শরণার্থীদের দলগুলিকে আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার সমস্যা সম্পর্কে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছেন লিয়াকৎ।

কনভয় সমস্যা সত্য সত্যই যে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে তার প্রমাণও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্থানযাত্রী মুসলমান শরণার্থীদের একটা বড় কনভয়কে শীঘ্রই অমৃতসরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই কনভয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। শিখেরা এই কনভয়ের প্রতি কি ধরনের মনোভাব ও আচরণের প্রমাণ দেবেন, সেটা স্পষ্ট ক'রে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

নেহর্ লাহোরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে, লাহোরে গিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন দরকার নেই, লাভও নেই। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ জোর দিয়ে বোঝালেন যে, দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা হওয়াটাই একটা বড় লাভ এবং প্রয়োজনের দিক দিয়েও খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। এ রীতি বন্ধ করা উচিত নয়। মাউণ্টব্যাটেন আরও বললেন, মুসলিম শরণার্থীদের এই বিরাট কনভয়টিকে নিরাপদে অমৃতসর পার ক'রে নিয়ে যেতে না পারলে গভর্নমেণ্টের সমস্ত মর্যাদাই বিনষ্ট হবে এবং নিয়ে যেতে পারলে গভর্ন-মেণ্টেরই মর্যাদা বহু গুণে বেড়ে যাবে। মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তির যাথার্থ্য ও সারবত্তা উপলব্ধি করলেন নেহর্ এবং শেষ পর্যন্ত লাহোরে যেতে রাজি হলেন। আমি প্রস্তাব করলাম, নেহর্ যেন তাঁর লাহোর যাবার কথাটা এই সাংবাদিক সম্মেলনেই প্রকাশ করেন। ব্যবস্থা হলো, সংবাদ প্রচারের সব ব্যবস্থার ভার নিয়ে উম্নি নায়ারই নেহর্র সঙ্গে যাবেন।

নেহর্ এইবার প্রসঙ্গের বহির্ভূত একটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি আমাকে প্রশংসা করলেন। আমি যেভাবে কাজ করছি, সেটা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। তিনি আমাকে এই অনুরোধও করলেন যে, আমি যেন তাঁকে নিয়মিতভাবে এবং একটা প্রাত্যহিক কাজ হিসাবেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করি। এই বৃহৎ সঙ্কটের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী নেহর্ আমাদের উপর কতটা বিশ্বাস রাখেন, তার প্রমাণ পেয়ে উৎসাহিত এবং আনন্দিতও হলাম। হ্যাঁ, খুবই বড় রকমের সঙ্কট বটে, কিন্তু সিমলা থেকে আসার পর এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারিনি এ সঙ্কট কত বড়, কত জটিল ও কত দুরূহ। এত তাড়াতাড়ি ধারণা লাভ করাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার ধারণা খুবই সুস্পষ্ট। মাউণ্টব্যাটেন এসময় এখানে উপস্থিত আছেন বলেই রাজধানী এবং গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের পরিণাম থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

মাত্র সাত দিন হলো জরুরী কমিটি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যেই এই পরিব্যাপ্ত অরাজক অবস্থার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযানের জন্য কমিটি এক বিরাট প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে ফেলেছেন। সমস্ত বে-সরকারী যানবাহন গভর্নমেণ্ট রিকুইজিশন ক'রে নিয়েছেন। যে সব প্রদেশ ও রাজ্য শরণার্থীদের জন্য জায়গা দিতে ও ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, দিল্লী থেকে লাখ লাখ অমুসলমান শরণার্থীকে সেই সব প্রদেশে ও রাজ্যে প্রেরণ করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মুসলমান-দের পাকিস্থানে পোঁছে দেবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বেচ্ছা-কনস্টেবল এবং গার্ড সংগ্রহ ক'রে পাকিস্থানগামী মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলির ক্ষেতের শস্য রক্ষার জন্য এবং শস্য তুলবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেণের যাত্রীদের তল্লাসী ক'রে অস্ত্রশস্ত্র বের করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রেণের যাত্রীদের রক্ষা করবার কার্যে নিযুক্ত মিলিটারী ও পুলিশের মধ্যে কেউ কর্তব্যবিরোধী কাজ করলে তাকে কঠোরতর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী অফিসের ছুটির দিন আর নেই, রবিবারেও কাজ চলছে। দিল্লীর দু'টি সংবাদপত্র যাতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য সরকারী ব্যবস্থার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশনকে চালু রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের অফিসে নিয়ে আসা ও বাড়ি পোঁছে

দেওয়া, হাসপাতাল রক্ষার জন্য রক্ষী মোতায়েন করা, রাস্তা থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে নিয়ে কবর দেওয়া, খাদ্য আনয়ন ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা, প্রত্যহ সরকারী বুলেটিন প্রচার করা এবং ব্যাপকভাবে কলেরানিরোধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরুরী কমিটির কাজের সম্পূর্ণ তালিকা এটা নয়, মাত্র কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করলাম। এর থেকেই বোঝা যাবে, কত সংখ্যক এবং কত বিভিন্ন ধরনের কাজের ভার নিয়েছেন জরুরী কমিটি।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : নেহরুর আহূত সাংবাদিক সম্মেলন প্রয়োজনের দিক দিয়ে একরকমের সফলই হয়েছে বলা যায়। তবে নেহরুর আলোচনা একটু বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। গত কাল বৈদেশিক প্রতিনিধিদের কাছে যতটা সাফল্যের সংগে নেহরু তাঁর বক্তব্য বলতে এবং বোঝাতে পেরেছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে ততটা সাফল্য তিনি লাভ করতে পারলেন না। আমি যেসব তথ্য, যুক্তি ও বিষয়বস্তু তাঁকে দিয়েছিলাম, তার সবই তিনি উল্লেখ করলেন, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা সুসংহত বক্তব্য তিনি ভালভাবে দাঁড় করাতে পারলেন না। এই সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুর সব কথা শোনার পর এই ধারণাই হয় যে, নেহরু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

তবুও, এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে নেহরুকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা বস্তুত একটা প্রেরণার উৎস দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। নেহরুকে এ সময় দেখলে মানুষের সভ্যতা-মার্জিত সম্বুদ্ধির এবং মানবপ্রেমের শক্তির উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। বিপুল এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হানাহানি, এ বিদ্বেষের রূপ এবং প্রকাশভংগীও বহুতর, তবু এরই মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে নেহরু প্রায় একাকী নিঃসঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন দৃঢ়ভাবেই। এ বিদ্বেষ কোথাও ব্যক্তি-বিশেষের গোপন অভিসন্ধির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, কোথাও বা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্য জন-উন্মত্ততার রূপে। কিন্তু এই বিদ্বেষ-ক্ষুব্ধ ও উদ্‌ভ্রান্তিপূর্ণ পরি-বেশের সকল অর্থহীন কোলাহলের মধ্যেও মমতা, সুযুক্তি ও প্রীতির একটি সুর শোনা যায়—শান্ত ও অবিচলিত নেহরুর বিদ্বেষহীন আবেদনের সুর।

গত মার্চ থেকে আরম্ভ ক'রে আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে যে বিরাট আলোচনার ব্যাপার হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যেও নেহরুকে দেখেছি। কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে যেন প্রকৃত নেহরুর পরিচয় পাইনি। নেহরুর শক্তি কোথায় এবং কেন তিনি শক্তিমান, তার প্রমাণ আলোচনা-সভায় নেহরুর ব্যক্তিত্বে ও আচরণে তেমন ক'রে ফুটে উঠতে দেখিনি। সে সময় বরং দেখেছি যে, নেহরু কেমন যেন আন্‌মনা হয়ে থাকেন, যেন অন্য কোন ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তা ছাড়া, নিতান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের মতোই তাঁকে দেখাতো। বিরক্তির ভাবও তাঁর আচরণে প্রায়ই ফুটে উঠতে দেখেছি। কিন্তু আজ দেখছি, নেহরু যেন বদলে গিয়েছেন। এই দুরূহতর সঙ্কট ও বিপদের মধ্যেই তাঁর শক্তি পূর্ণরূপে স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। বড় রকমের বিপদের ও সঙ্কটের ভ্রূকুটি দেখতে পেয়েই যেন নেহরু-চরিত্রের সব শক্তি সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। আজ তিনি অত্যন্ত নির্ভীক, অতি প্রবল তাঁর সঙ্কল্পের আবেগ। এ সত্ত্বেও তিনি শান্ত এবং সমস্ত ঘটনাকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়েই বিচার করতে সক্ষম। নেহরু আমাদের এই যুগেরই এক জ্ঞানদীপ্ত মনস্বী।

জুনাগড়ের ছায়া

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন আজ তাঁর স্টাফের সঙ্গে বেশির ভাগ পুরাণা কেল্লার অবস্থা সম্পর্কেই আলোচনা করলেন। পুরাণা কেল্লা এলাকার ঘটনাগুলি বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ সৃষ্টি করেছে। প্যাটেল প্রায় সিদ্ধান্তই ক'রে ফেলেছিলেন যে, মুসলমানদের অস্ত্রশস্ত্র বের করবার জন্য এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োগ করা হবে, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের আপত্তির জন্যই প্যাটেল এ সিদ্ধান্ত আর করলেন না। মাউণ্টব্যাটেন এই যুক্তি দেখালেন যে, মুসলমানদের অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বের করার জন্য এভাবে সৈন্য নিয়োগ করলে তার ফলে একটা হত্যাকাণ্ডই ঘটে যাবে। এ ধরনের একটা ব্যবস্থার প্রস্তাবও যে উত্থাপিত ও বিবেচিত হতে পারে, এটা ভাবতেও মাউণ্টব্যাটেন বিস্ময় বোধ করছেন।

জরুরী কমিটির কাউন্সিলের একটা বৈঠক হলো সকাল দশটার সময়। এই বৈঠকে এসে প্যাটেল জানালেন যে, দিল্লীর কতগুলি বড় বড় বাড়ির ভিতর থেকে আগের মতো এখনও গুলী বর্ষণ চলছে। এইসব এক একটি 'প্রতিরোধ ঘাঁটি' ভেঙে দেবার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার দাবী খুব জোর দিয়েই জানালেন প্যাটেল। প্রধান সেনাপতি জেনারেল লকহার্ট বললেন যে, তিনি তিন দিনের মধ্যেই দিল্লীর সব 'প্রতিরোধ ঘাঁটি' ও উৎপাত পরিষ্কার ক'রে দিতে পারেন, যদি তাঁকে অন্যান্য অঞ্চলের শান্তিরক্ষার কাজ আপাতত ছেড়ে দিয়ে মাত্র দিল্লীর শান্তিরক্ষার জন্যই সৈন্য নিয়োগ করতে বলা হয়।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার আজ একটি ভাল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। যে সব ব্রিটিশ সৈন্যদল এখন দেশে যাবার অপেক্ষাতেই চুপচাপ বসে আছেন, তাঁদের মনের অবস্থাও লক্ষ্য করছেন মাউণ্টব্যাটেন। ব্রিটিশ সৈনিকেরা চারদিকের এই দুর্দশা দেখছে, কিন্তু দেখেও তাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, কিছুই করবার সুযোগ নেই। এ অবস্থাটা তাদের কাছে বড়ই দুঃসহ বোধ হচ্ছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন তাই ব্রিটিশ সৈন্যদলগুলির সাধারণ সৈনিক ও জুনিয়র অফিসারদের একটা কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন। শরণার্থীদের শিবির সংগঠন করবার এবং শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা করবার কাজের ভার ব্রিটিশ সৈনিকদের দেওয়া হলো। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই জরুরী কমিটির কাজের ও দায়িত্বের চক্র থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবার একটা পন্থা স্থির করেছেন। প্রথম দিকে এক দিন অন্তর একদিন বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, তার পরে নেহরুকেই চেয়ারম্যান ক'রে দিয়ে তিনি আলগা হয়ে যাবেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন আজ স্বীকার করলেন যে, তিনি ১৫ই আগস্টের পরে ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত না ক'রে এবং সে বিষয়ে সকলের পরামর্শ মেনে নিয়ে ভালই করেছিলেন।

করাচী থেকে ইস্‌মে আজ ফিরেছেন। ইস্‌মের কাছে শুনলাম, জিন্না অত্যন্ত উত্তপ্ত। ভারতের কংগ্রেসের উপর জিন্নার রাগ চরমে গিয়ে উঠছে। ইস্‌মের কাছে জিন্না বলেছেন যে, কংগ্রেসের লোকগুলির এই বিদ্বেষের অর্থ তিনি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারেননি। জিন্না বলেছেন, এখন তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে, ভাল ক'রে লড়ে এ ব্যাপার শেষ ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ইস্‌মে বললেন, ভারত গভর্নমেণ্টের উপর যেটুকু বিশ্বাস জিন্নার ছিল, এখন তা'ও আর নেই। জিন্না এখন ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সব কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ফেলার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। ইস্‌মে করাচীতে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ছিলেন, এর মধ্যে জিন্নার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতেই এগার ঘণ্টা সময় লেগেছে। ১৫ই আগস্টের পর ইস্‌মেই বস্তুত করাচীর গভর্নমেণ্ট হাউসের প্রথম অতিথি। ইস্‌মের ধারণা, তিনি জিন্নার আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। ইস্‌মের কাছেই জিন্না ইস্‌মেকে বেশ 'ভাল লোক' বলে প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া, আন্তরিকভাবেই ইস্‌মেকে একটা অনুরোধ ক'রে রেখেছেন জিন্না—'আপনার যখন ইচ্ছা হয় তখনই এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ভারত গভর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিন্নার সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখে ইস্‌মে জিন্নার সঙ্গে একটু তর্ক'ও করেছেন। ইস্‌মে বলেছেন—'কোন বিষয়ে অত্যুক্তি করা আমার অভ্যাস নয়। কিন্তু আমি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হলপ ক'রেই বলতে পারি যে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের সাধ্যমতো সকল শক্তি প্রয়োগ ক'রে হাঙ্গামা দমনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের পরিচালকেরা খাঁটি মানুষ এবং শান্তিরক্ষার জন্য সব চেষ্টাই করছেন।' ইস্‌মের ধারণা, তিনি এইটুকু ক'রে আসতে পেরেছেন যে, বড় রকমের অথবা সাংঘাতিক রকমের কোন একটা ব্যাপার ক'রে ফেলবার আগে জিন্না একবার অন্তত কিছুক্ষণের মতো থেমে নিয়ে চিন্তা ও বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

আজ সন্ধ্যায় দিল্লীর উপর দিয়ে মেঘবৃষ্টির ও বাতাসের একটা প্রচণ্ড তুফান ছুটে গেল। তুফানের কৃপায় আজ সন্ধ্যার হাঙ্গামা শান্ত হলো বটে, কিন্তু শরণার্থীদের শিবিরগুলির দুর্দশা চরম হয়ে উঠল। একে তো স্থানাভাব এবং অতিরিক্ত ভিড়, তার উপর ঝড়, তার উপর আবার শিলাবৃষ্টি। বিদ্যুতে ও বজ্রে আকাশ যেন ঝল্‌সে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : করাচী গিয়ে সমস্যার পরিচয় যেটুকু বুঝে এসেছেন এবং যেটুকু কাজ ক'রে আসতে পেরেছেন ইস্‌মে, তার ফলে এখন অবস্থাটা সমগ্রভাবে কি দাঁড়াল, সে সম্বন্ধেই আজকের স্টাফের বৈঠকে আলোচনা হলো। মাউণ্টব্যাটেন সমগ্র ঘটনা এবং অবস্থাকে তথ্যগতভাবে বিশ্লেষণ ক'রে এখন এই ধারণা করছেন যে, দুই রাষ্ট্রেই হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীরা এখন তাদের নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের নিয়ম, নির্দেশ ও কথা মেনে চলবার লক্ষণ তাদের আচরণে প্রমাণিত করছে। দুই গভর্নমেণ্টই সমানভাবে তাঁদের নিজ নিজ হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীকে সংযত করতে পারছেন। সংযত হচ্ছে না এবং কথা শুনতে চাইছে না একমাত্র শিখেরা। এমন কি, শিখ নেতারাও এখন তাঁদের সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে ভয় পাচ্ছেন। শিখদের সংযত করার ক্ষমতা শিখ নেতাদেরও নেই।

ভি পি মেননের মতে, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে নিকট ভবিষ্যতেও যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে, এমন আশা নেই।

মাউণ্টব্যাটেন আরও খারাপ সম্ভাবনার আশঙ্কা করছেন। তাঁর মতে, এ অবস্থায় দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবারই সব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন ভাবছেন, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যদি একটা সাধারণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তবে অন্তত এইটুকু করতে হবে যে, দুই

ডোমিনিয়নকেই যুদ্ধ-সংঘর্ষের পথ-থেকে যতদূর সম্ভবপর দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করতে হবে।

ভি পি মেননের ধারণা, এটুকু আশা করারও এখন কোন ভিত্তি আর নেই। জিন্নার মনের প্রকৃতি এখন যে রূপ গ্রহণ করেছে, তাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাবার ভরসাও আর করা যায় না।

মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন—শিখদের ইচ্ছাটা কি? কি চাইছেন তাঁরা? শিখেরা কি স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র স্থাপন করতে চান?

ভি পি উত্তর দিলেন—না, সে রাজনীতিক সুযোগ শিখদের আর নেই, বরং সে সুযোগ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। জলন্ধর বিভাগও সম্পূর্ণভাবে শিখেরা লাভ করতে পারেননি। এখন শিখদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

ভি পি বললেন, তাঁর এক ছেলে এখন তিনজন শিখ সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করছেন। এই তিনজন শিখেরই পরিবারবর্গ হাঙ্গামায় নিহত হয়েছে। এঁরা এখন প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছু খুঁজছেন না। একজন আত্মীয়ের প্রাণের বদলে অন্তত দু'জন মুসলমানের প্রাণ নেওয়াই এখন তাঁদের একমাত্র সংকল্প। ভি পি'র ধারণা, তারা সিং আসলে হলেন ভীরু স্বভাবের মানুষ।

লিয়াকতের সঙ্গে আলোচনা সেরে লাহোর থেকে নেহরু আজ ফিরেছেন। আজকের জরুরী কমিটির বৈঠকে নেহরু জানালেন যে, লিয়াকতের সঙ্গে আলোচনার পর দুই গভর্নমেণ্টই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শরণার্থী-দের পথে আটক ক'রে আক্রমণ করা সম্ভবপর হয় এই কারণে যে, সীমানা অতিক্রম করার আগে পুলিশ ও সৈনিকেরা শরণার্থীর দলগুলিকে একবার থামতে বাধ্য করে, অস্ত্রশস্ত্র তল্লাসীর জন্য। সীমানা অতিক্রম করার আগে এইভাবে পথের মাঝে থামিয়ে শরণার্থীদের দলগুলির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবার ব্যবস্থার ফলেই শরণার্থীদের উপর আক্রমণে হাঙ্গামাকারীরা বেশ সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দুই প্রধান মন্ত্রী সম্মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু নেহরু ও লিয়াকতের এই আলোচনা সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিয়াকৎ লাহোরের এক জনসভায় বক্তৃতা ক'রে এই অভিযোগ করলেন যে, যেসব ব্যবস্থা করবার জন্য দুই গভর্নমেণ্ট সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তার কোনটিই ভারত গভর্নমেণ্ট পালন করছেন না। লিয়াকৎ বললেন—"আজ আমাদের পাকিস্থানকে চারদিক থেকে তারাই ঘিরে ধরেছে যারা আমাদের ধ্বংস করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।"

গত দশদিন ধ'রে আমরা প্রধানত দু'টি সমস্যার সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রবলভাবে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি। পাঞ্জাব-বিপর্যয় এবং দিল্লীর দুর্দশা—এই দু'টি সমস্যারই প্রকোপ থেকে অবস্থাকে উদ্ধার করা ও সুস্থ করার কাজেই আমাদের সব চেষ্টা নিয়োগ করতে হয়েছে। এখন চোখে পড়ছে আর একটি সমস্যা। এখানে নয়, ভারতের এক দূর প্রান্ত থেকে এমন এক সমস্যার মেঘ ধেয়ে আসছে যেটা আমরা একেবারেই কল্পনা করতে পারিনি।

মোট দুইশত আশিটি ছোট-বড় দেশীয় রাজ্য নিয়ে হলো কাথিয়াবাড় রাজ্য-গোষ্ঠী। এর মধ্যে একটি রাজ্য হলো জুনাগড়। ১৫ই আগস্ট কবেই পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জুনাগড় এখনো ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্ত হবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন-

নি। এখন জানা গেল, জুনাগড় পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন এবং জিন্নাও জুনাগড়ের এই ঘোষণা সরকারীভাবে সমর্থন ও স্বীকার ক'রে নেবেন বলে কথা দিয়েছেন। আজ একথা বললে উচিত কথাই বলা হবে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এবং পরে নানা রকম বড় বড় ঘটনার ভিড়ের মধ্যে জুনাগড়ের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন। সেই অসতর্কতার সুযোগ নিয়েই জুনাগড় এখন এমন একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে, রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে যার সঙ্গে কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের সমস্যার তুলনা চলতে পারে। প্যাটেলের 'থলিয়া' পূর্ণ হয়নি। জুনাগড় এখনো বাইরে রয়ে গিয়েছে।

জুনাগড় রাজ্যের অঞ্চলটিও বস্তুত নানা তালি দিয়ে জোড়া বিচিত্র-গঠন একটি কাঁথার মতো। আয়তনে তিন হাজার তিনশো বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা হলো সাত লক্ষ, তার শতকরা বিরাশি জনই হিন্দু। শাসক হলেন মুসলমান এবং রাজ্য সরকারেরও সকলেই মুসলমান। জুনাগড় চারদিক থেকেই অন্যান্য দেশীয় রাজ্য দিয়ে ঘেরা এবং এরা সবাই ভারতের রাষ্ট্রভুক্ত হয়ে গিয়েছে। জুনাগড় রাজ্যের অভ্যন্তরে আবার বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যের ছোট ছোট শাসনিক এলাকা আছে। আরও বিচিত্র ব্যাপার, জুনাগড়ের অভ্যন্তরে এইসব ছোট ছোট পররাজ্য অঞ্চলের মধ্যেই আবার জুনাগড়ের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনিক অঞ্চল আছে। জুনাগড়ের রেলওয়ে, বন্দরগুলি এবং টেলিগ্রাফব্যবস্থা— সবই ভারতীয় চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জুনাগড়ের নবাবও অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, যাঁর তুলনা মেলা ভার। নিজের খামখেয়ালের নেশাতেই মেতে আছেন নবাব। তাঁর পোষা মোট আটশো আদুরে কুকুর আছে। এই প্রত্যেকটি আদুরে প্রাণীর লালন-পালনের কাজ করবার জন্য একজন ক'রে মানুষ-কর্মচারী তিনি নিযুক্ত করেছেন। একবার তিনি তাঁর একটি কুকুর ও একটি কুকুরীর বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়েতে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মর্যাদা রক্ষার জন্য সারা রাজ্যে এক দিনের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ হেন জুনাগড়ই একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কেন, কিসের জন্য এবং কিভাবে জুনাগড় আজ এত দুরূহ একটা সমস্যা হয়ে উঠল?

গত ২৫শে জুলাই তারিখে যে সময় ভারতের দেশীয় রাজন্যেরা মাউণ্টব্যাটেনের আহ্বানে এক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই সময় জুনাগড়ের দেওয়ানও নবাবের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ান মাউণ্টব্যাটেনকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু এইসব প্রশ্নের মধ্যে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, যা থেকে ধারণা হতে পারে যে, জুনাগড়ের মনে পাকিস্থানে যোগদানের কোন ইচ্ছা আছে। বরং দেওয়ান তখন মাউণ্টব্যাটেনকে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি জুনাগড়ে গিয়েই ভারতে যোগদানের জন্য নবাবের কাছে প্রস্তাব করবেন। জুনাগড়ের গভর্নমেণ্টও একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য রাজ্য যা করবেন, জুনাগড়ও তাই করবেন। কিন্তু ১০ই আগস্ট তারিখে জুনাগড়ে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র পাঁচ দিন আগে জুনাগড়ে ক্ষমতা অধিকারের জন্য একটা 'আকস্মিক বিদ্রোহে'র ব্যাপার হয়ে গেল। একদল সিন্ধী মুসলমান হঠাৎ শাসনভার গ্রহণ ক'রে বসলেন, শাহ নওয়াজ ভুট্টো দেওয়ানের পদ গ্রহণ করলেন এবং নবাবকে তাঁর প্রাসাদের অভ্যন্তরে একরকমের বন্দী ক'রেই রাখা হলো।

এর আগে সকল পক্ষ থেকেই প্রকাশ্যভাবে এই নীতি স্বীকার ও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দুই ডোমিনিয়নের কোন ডোমিনিয়নে কোন দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত করবার পূর্ণ ক্ষমতা এবং একমাত্র ক্ষমতা, সেই রাজ্যের নৃপতি তথা শাসকেরই থাকবে। রাজন্যের সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃত হবে। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে এই কথাও পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারত এই নীতি স্বীকার করবেন, তার পরে নয়। ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত রাজন্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হবে। যে রাজন্য যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে চান, সে ডোমিনিয়নে তিনি অবাধে যোগদান করতে পারবেন, কিন্তু ১৫ই আগস্টের পূর্বেই তাঁকে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে ফেলতে হবে। ১৫ই আগস্টের পরে রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারে রাজন্যের ইচ্ছাকেই রাজ্যের ইচ্ছা বলে আইনগত চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া আর হবে না। ২৫শে জুলাইয়ের রাজন্য সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের এই নীতি অনুসারেই রাজন্যদের প্রতি জরুরী আবেদন জানিয়েছিলেন যে, অবিলম্বে এবং ১৫ই আগস্টের পূর্বেই যেন তাঁরা রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন। তা ছাড়া, রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত করার সময় দুটি বিশেষ বাস্তব সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত করার জন্য রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। প্রথম হলো—'রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান' অনুসারে যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে দেশীয় রাজ্যগুলি বাধ্য না হয়ে পারেন না, সেই অপরিহার্য বাস্তবতাটুকু যেন রাজন্যেরা অস্বীকার না করেন। দ্বিতীয়, রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, সেই বাস্তব তথ্যটির প্রতিও লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত করতে হবে।

জুনাগড় রাজ্য সমুদ্রের সঙ্গে সংলগ্ন এবং ভেরাবল নামে একটি বন্দরও আছে। উপকূলের সঙ্গে যুক্ত একটি 'সমুদ্র-অঞ্চল' আছে বলেই জুনাগড় একথাও বলতে পারে যে, জলপথে করাচীর সঙ্গে এ রাজ্যের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে। কিন্তু নবাব যদি পাকিস্থানে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন, তবে সেটা রাষ্ট্রভুক্তি সম্বন্ধে ঘোষিত, সমর্থিত ও স্বীকৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত মাত্র হবে। এর প্রতিক্রিয়াও হবে খুবই খারাপ। প্রথমে কাথিয়াবাড়ের রাজ্যগুলির উপরেই একটা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আঘাত পড়বে। দ্বিতীয়, হায়দরাবাদের সঙ্গে সমগ্র আলোচনার প্রচেষ্টাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, কারণ জুনাগড়ের পাকিস্থান-ভুক্তির ব্যাপার দেখে হায়দরাবাদের চরমপন্থী মুসলিম দল আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠবে। জুনাগড় সম্বন্ধে সতর্ক না থাকায় ভারতের যে ভুল হয়েছে, জিন্না সেই ভুলের মধ্যে তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনের একটা বৃহত্তর সম্ভাবনারও সুযোগের ক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন। ভারতে যোগদানে রাজি করাবার জন্য জুনাগড়ের উপর ভারত গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত কোন চাপ দেননি। এর পর যখন দেখা গেল যে, জুনাগড়ের পক্ষে পাকিস্থানে যোগদানের অভাবিত ব্যাপারটাই সত্য হয়ে উঠতে চলেছে, তখন করাচীর কাছেই সরকারীভাবে দু'বার প্রশ্ন প্রেরণ করলেন দিল্লী। পাকিস্থানের ইচ্ছাটা কি? দিল্লী জানতে চেয়েছেন, জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত করলে পাকিস্থান কি সে সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন? এ প্রশ্নের উত্তর করাচীর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মাউণ্টব্যাটেন আজ ইস্‌মে ও ভি পি'র সঙ্গে জুনাগড়ের বিষয়ে আলোচনা করলেন। আমাকেও এই আলোচনায় ডাকা হয়েছিল। ভি পি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠেছেন। মাউণ্টব্যাটেনকে একটা বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করলেন ভি পি। ভি পি'র ধারণা, বর্তমান অবস্থায় জুনাগড়ের সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে সে অঞ্চলে স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীকে প্রস্তুত রাখবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভি পি এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, পাকিস্থান লোকবল ও অর্থবল দিয়ে জুনাগড়কে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে ভি পি একটা কর্তব্যের ও ব্যবস্থার খসড়াও রচনা ক'রে ফেলেছেন।

আজ সন্ধ্যায় আমি ইস্‌মের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম, জুনাগড়ের ব্যাপার নিয়ে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তাতে তিনিও একটু বিচলিত হয়ে রয়েছেন। সরকারী ইন্‌ফরমেশন তথা সংবাদ বিভাগ থেকে যে রিপোর্ট এসেছে, সে সম্বন্ধেই তিনি কয়েকটি কথা বললেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পাকিস্থান জুনাগড়ের বন্দর উন্নয়নের জন্য জুনাগড়কে আট কোটি টাকার সাহায্য এবং বিশ হাজার সৈনিকের একটি গ্যারিসন রাখবার জন্য সামরিক সাহায্য দেবার সঙ্কল্প করেছেন। ইস্‌মে বললেন, পাকিস্থান জুনাগড়কে এরকম সাহায্য দিতে সক্ষম, এটা একটা ছেলেমানুষী চিন্তা মাত্র। বর্তমানে পাকিস্থান নিজেই যে আর্থিক অনটনের মধ্যে রয়েছেন, তাতে জুনাগড়কে এরকম সাহায্য দেবার ক্ষমতা পাকিস্থানের থাকতে পারে না।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : খবর পেলাম, জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানেই যোগদানের সিদ্ধান্তই ঘোষণা ক'রে এবং চুক্তিপত্রে একেবারে সরকারীভাবে ছাপ মোহর ও স্বাক্ষর দিয়ে বিশুদ্ধ একটি দলিলরূপে সেই চুক্তিপত্রকে করাচীতে প্রেরণ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু এখনো ভারত গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হননি। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আবার ইস্‌মে ও ভি পি'র আলোচনা হলো। জিন্না কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে জুনাগড় নিয়ে এই কাণ্ড করছেন, ইস্‌মে সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বেশ সুযুক্তির সঙ্গে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন। একটা অঞ্চল হিসাবে জুনাগড় এমন কোন মহামূল্যবান অঞ্চল নয়। পাকিস্থানের আঞ্চলিক সুবিধা বা স্বার্থের জন্য জুনাগড় একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। বরং জুনাগড় পাকিস্থানের পক্ষে একটা বোঝা মাত্র, যার জন্য পাকিস্থানের আর্থিক লোকসান ছাড়া আর কোন 'লাভ' নেই। জুনাগড়কে সামরিক-ভাবে রক্ষা করাও পাকিস্থানের পক্ষে অসাধ্য, রক্ষাব্যবস্থার খরচ বহন করাও অসাধ্য। তা ছাড়া, ভারতের সীমানার কাছাকাছি এক একটা ছাড়া-ছাড়া ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র 'মুসলিম অঞ্চল' এভাবে পাকিস্থানের ভিতর টেনে নেবার চেষ্টা করার ব্যাপারটাকে জিন্নার মুসলিম-প্রীতির ব্যাপার বলেও মনে করা যায় না। কারণ খাস পাকিস্থানের বাইরে অর্থাৎ ভারতের অভ্যন্তরে কম ক'রেও প্রায় চার কোটি মুসলমান সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। চার কোটি মুসলমানকেই যদি ভারতের ভিতরে থাকবার জন্য জিন্না ছেড়ে দিতে পারেন, তবে জুনাগড়ের কয়েক হাজার মুসলমান সম্বন্ধে জিন্নার বিশেষ চিন্তা করবার কোন যুক্তি নেই। সম্পূর্ণভাবেই একটা কূট উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি জুনা-গড়কে পাকিস্থানের ভিতর টানছেন। জিন্নার লক্ষ্য জুনাগড় নয়, জুনাগড়ের সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে অন্য কোন ক্ষেত্রে দাবী প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

ইস্‌মে বললেন, জুনাগড় নিয়ে জিন্না যে ব্যাপার করছেন, সেটা আসলে হলো ভারতকে উত্ত্যক্ত করা এবং একটা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা। ভারত জুনাগড় সম্পর্কে একটা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেই হবে, এই কল্পনাই জিন্নাকে প্রলুব্ধ

করেছে। জিন্নার আশা, ভারত জুনাগড়ে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করলে তিনি আইনগত একটা রাজনৈতিক 'পয়েন্ট' লাভ করবেন, যার জোরে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। জিন্নার কাছে জুনাগড় অতি তুচ্ছ বস্তু। তাঁর লক্ষ্য কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ। জুনাগড়ে একটা সমস্যা ঘটিয়ে তিনি কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কে তাঁর আরও বড় একটা রাজকীয় পরিকল্পনা সফল করতে উদ্যত হয়েছেন। জুনাগড়ও সমস্যা হিসাবে বস্তুত একটা ছোট হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের মতোই জুনাগড়ের রাজন্য হলেন মুসলমান, প্রজারা অধিকাংশ হিন্দু এবং রাজ্যটিও ভারতীয় অঞ্চলে পরিবৃত একটি অভ্যন্তরবর্তী ভূখণ্ড।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আমি জুনাগড় পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তির খসড়া রচনা করছি। জুনাগড় সম্পর্কে ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতা খুবই সঙ্গত। কিন্তু জুনাগড় নিয়ে সংবাদপত্রে যে ধরনের আলোচনা প্রবল হয়ে উঠতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি, এবং সেইজন্য একটি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন হয়েছে। আমার রচিত বিজ্ঞপ্তিতে সেই সতর্কতার বাণী আমি শুনিয়ে রাখলাম। "জুনাগড়ের উপর ভারতের দাবী যদিও যুক্তিসহ, কিন্তু সে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য কোনপ্রকার সামরিক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করলে বিদেশের জনমতে ভারত সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হবে, সেটা ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। যতই সঙ্গত হোক না কেন, জুনাগড়ের উপর দখল নেবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করলে, ভারতের সে আচরণ প্রত্যক্ষভাবে পররাজ্য আক্রমণের একটা সুস্পষ্ট উদহারণ বলে সর্বত্র ধারণা ছড়িয়ে যাবে।" জনমতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি এই পরামর্শ দিলাম যে, এখন ভারত গভর্নমেণ্টের শুধু সুস্পষ্টভাবে এবং সোজাসুজি এই ঘোষণা ক'রে দেওয়া কর্তব্য যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি ভারত গভর্নমেণ্ট বৈধ বলে স্বীকার করলেন না। মাত্র এইটুকু ঘোষণা ক'রে রাখলে সুবিধা এই যে, জুনাগড়-সমস্যা নিয়ে পাকিস্থানের সঙ্গে অথবা জুনাগড়ের নবাব ও গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার সব পথই খোলা রইল, অথচ ভারত গভর্নমেণ্টের নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথেও কোন বাধা রইল না।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ জুনাগড়-সমস্যা আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। তার আগেই প্যাটেল এবং নেহরুর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের দীর্ঘ আলোচনা হলো। যুক্তি-তথ্য দিয়ে বোঝাবার যতখানি শক্তি ছিল মাউণ্টব্যাটেনের, তার সবই তিনি প্রয়োগ করলেন। দুই নেতাকে এই একটি কথাই বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন মাউণ্টব্যাটেন যে, ঝোঁকের মাথায় এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলা উচিত হবে না, যার ফলে আন্তর্জাতিক জনমতের সম্মুখে ভারতকে বেকায়দায় পড়তে হতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশ ভারতকেই দোষী বলে ধারণা করতে অথবা ধারণার সুযোগ পেতে যেন না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য। সুতরাং, জুনাগড় সম্পর্কে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করা উচিত হবে না, যেটা বস্তুত একটা সামরিক ব্যবস্থা। জুনাগড়ের বিরুদ্ধে এখন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পৃথিবীর লোক বুঝবে যে, ভারত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল আক্রমণ করেছে। ভারতের এই আচরণ বস্তুত পররাজ্য আক্রমণের ব্যাপার বলেই সর্বত্র ধারণার সৃষ্টি হবে।

ইস্‌মের অভিযোগের কথাও উল্লেখ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। জিন্নার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইস্‌মে যে ধারণা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেনও সেই ধারণা করেছেন। জুনাগড়ের সমস্ত ব্যাপারটাই জিন্নার তৈরী একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, জিন্না পৃথিবীর জনমত লক্ষ্য ক'রে খুব বড় রকমের একটা প্রচারকার্য চালাবার পরিকল্পনা করেছেন। পৃথিবীর কাছে এটাই জিন্না প্রমাণিত করতে চান যে, পাকিস্থান কত নিরীহ ও দুর্বল এবং এই নিরীহ ও দুর্বল পাকিস্থানের নিরাপত্তা আজ হৃদয়হীন ও পররাজ্যগ্রাসী ভারতের আক্রমণে কি ভয়ানকভাবে বিনষ্ট হতে চলেছে। জুনাগড়ের সম্পর্কে কোনপ্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই জিন্না পৃথিবীর কাছে তাঁর পরিকল্পিত এই প্রচারকার্য ভালভাবে করবারই সুযোগ পেয়ে যাবেন। নেহরু এবং প্যাটেল, দুই নেতারই কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই অনুরোধ জানালেন যে, গণভোটের দ্বারা রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির ইচ্ছা নির্ণয় করবার নীতিকেই এখন ভারত গভর্নমেণ্ট যেন অবলম্বন ক'রে থাকেন। গণভোটের নীতি অক্ষুণ্ণ রাখলে ভারতের মনোভাবের দু'টি বিষয় পরিষ্কার ক'রেই বলা হয়ে যাবে। প্রথমত, এটাই প্রমাণিত হবে যে, ভারত কোন রাজ্যের প্রজাসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা চাপাতে চান না। দ্বিতীয়ত, মাত্র শাসনিক সুবিধার জন্য কোন রাজ্যকে নিজের রাষ্ট্রভুক্ত করবার ইচ্ছা ভারত আদৌ পোষণ করেন না।

নেহরুকে বোঝাতে মাউণ্টব্যাটেনের বেশি দেরি হয়নি, বেশি বেগ পেতেও হয়নি। কিন্তু প্যাটেলকে বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হলো। রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারে বিশেষ একটি নীতি স্থির ক'রে নিয়ে প্যাটেলই এতদিন ধরে সব কর্তব্য পালন ক'রে আসছেন। এ কাজে প্যাটেল তাঁর মনের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই জুনাগড়ের ব্যাপার সহ্য করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন। তিনি আজ দেখতে পাচ্ছেন যে, এই জুনাগড়ই তাঁর নীতি ও আগ্রহের উপর একটা আঘাতের মতো এসে পড়েছে। যাই হোক, প্যাটেলও শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন। জিন্নার বর্তমান উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্বন্ধে ইস্‌মের ধারণাকেই বিশেষ-ভাবে সমর্থন করলেন প্যাটেল।

নেহরু ও প্যাটেল উভয়েই একই সঙ্গে গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে সোজা চলে গিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত হলেন এবং জুনাগড় সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য শোনালেন। অনুমান করতে পারি, দুই নেতার কাছ থেকে নতুন ধরনের কথা শুনে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যেরা অবশ্যই বিস্মিত হয়েছেন। নেহরু এবং প্যাটেলের বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে এবং তাড়াহুড়ো না ক'রে একটু ভেবে চিন্তে চলবার নীতিই মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছেন।

মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, কিছুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য এবং কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য ভারতভুক্ত রাজ্যগুলির স্থানীয় সৈন্য জুনাগড় রাজ্যের চারদিকে ভারতীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। আর ভি পি যাবেন জুনাগড়ে। পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে জুনাগড় যে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে, তার পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, মাত্র এইটুকুই জুনাগড়ের নবাব ও দেওয়ানকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন ভি পি।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : ভারত গভর্নমেণ্টের অতিথি হয়ে লিয়াকৎ এখন এখানে রয়েছেন। নতুন গভর্নমেণ্টের নতুন নীতি অনুসারে

এই ব্যবস্থা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট সরকারী অতিথিরা এবার থেকে গভর্নর-জেনারেলেরই অতিথি হয়ে থাকবেন।

আজ বিকালে বি এল শর্মা, উন্নি নায়ার ও আমি পাকিস্থান-পক্ষের কর্ণেল মজিদ মালিকের সঙ্গে সংবাদ ও প্রচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে সংবাদদাতাদের পক্ষে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ ও সুবিধা আরও উন্নত করা যায় কিনা, এবং উভয় প্রদেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য সরকারীভাবে একটা সংযোগ ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলো। এত কথা হলো, কিন্তু এর মধ্যে মজিদ মালিক একটি কথা চেপে গেলেন। আজ রাত্রেই ডিনারের পর লিয়াকৎ এখানে এই গভর্নমেণ্ট হাউসেরই একটি কক্ষে যে বৈদেশিক সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এবং সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করাও হয়ে গিয়েছে, সে ব্যবস্থার বিন্দুবিসর্গও তিনি আমাদের জানালেন না। জানলাম অনেক পরে। লেডি মাউণ্টব্যাটেনের কাছে হঠাৎ এই অনুরোধ উপস্থিত হলো যে, ডিনারের পর আজ রাত্রে লিয়াকতের ঘরে বিশজন অতিথির জন্য মদ্য পাঠাতে হবে। লেডি মাউণ্টব্যাটেন চমকে উঠেছেন এবং ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন অনুরোধের কারণ সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখি কিনা?

আমি এ রহস্যের উপর কোন আলোকপাত করতে পারলাম না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই বি এল শর্মার কাছ থেকে এক টেলিফোন পেলাম। খুবই উত্তেজিতভাবে শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন—লিয়াকৎ আজ রাত্রে গভর্নমেণ্ট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন, এর অর্থ কি?

এতক্ষণে রহস্য দূর হলো। দেখলাম, মাউণ্টব্যাটেন অতিথিদের নিয়ে ডিনার কক্ষে চলেছেন, সঙ্গে নেহরু এবং লিয়াকৎও চলেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ এক টুকরো কাগজের উপর একটি 'জরুরী বার্তা' লিখে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। লিখলাম—"শর্মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। লিয়াকৎ একমাত্র বৈদেশিক সাংবাদিকদেরই আমন্ত্রণ করেছেন, এটা শর্মার একেবারেই ভাল লাগছে না। শর্মার ধারণা, ভারতীয় সাংবাদিকেরা এই ব্যাপারের সুযোগ নিয়ে অভিযোগ না ক'রে ছাড়বেন না। ভারতীয় সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে শুধু বৈদেশিক সাংবাদিক-দের সঙ্গে আলোচনার যে ব্যবস্থা লিয়াকৎ করেছেন, তাতে এই অভিযোগ করারই সুবিধা হবে যে, পাক-প্রধান মন্ত্রী ভারতের গভর্নমেণ্ট হাউসকে তাঁর প্রচারকার্যের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছেন।" আমি একথাও জানিয়ে দিলাম যে, যেভাবেই হোক, কোন অজুহাতে এই সাংবাদিক সম্মেলন বন্ধ করতে হবে।

আমার 'বার্তা-পত্র' পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু কিছুক্ষণের জন্য পাশের কক্ষে গিয়ে বসলেন। ছেলেমানুষের মতোই আমোদ করার উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেহরুকে বললেন মাউণ্টব্যাটেন—"আমি ডিনারের টেবিলে বসেই আলাপে আলাপে লিয়াকতের ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেবার ভার নিলাম। কিন্তু আপনাকেও একটা ব্যবস্থায় রাজি হতে হবে। লিয়াকৎ চেয়েছেন শুধু বৈদেশিক সাংবাদিকদের সম্মেলন করতে। আমি সেই সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিকদেরও ঢুকিয়ে দিতে চাই। লিয়াকৎ এবং আপনি দু'জনেই বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের এই যুক্ত-সম্মেলনে আলোচনায় যোগদান করবেন। যদি আপনি এ ব্যবস্থায় রাজি হন, তবে আমিই সম্মেলনের সভাপতি হতে রাজি আছি।"

নেহরু এই আমোদজনক পরিকল্পনার কথা শুনে হেসে ফেললেন। সাধারণত নেহরুর মুখের উপর একটা বিষাদের ভাবই সর্বদা দেখা যায়, কিন্তু এ প্রস্তাব শুনে তাঁর সারা মুখে একটা কৌতুকপূর্ণ আমোদের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মাউণ্টব্যাটেনের দিকে চোখের ইসারা ক'রে নেহরু জানালেন, তিনিও রাজি আছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনও হয়ে গেল। অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ সম্মেলন। আশা করা যায়নি, এ সম্মেলন এমন হৃদ্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। শান্তির কথা, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে মৈত্রীভাব রক্ষার কথা, এমন কি অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও দুই ডোমিনিয়নের নীতিগত সামঞ্জস্য রক্ষার কথাও আলোচিত হলো।

সাংবাদিক সম্মেলনের সময় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অতি দ্রুত ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁদের আমন্ত্রণ করাও হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তের এইরকম দ্রুত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডিনারের পর যে সাংবাদিক সম্মেলন হলো, সেটা বস্তুত বলা-নেই কওয়া-নেই ধরনের আকস্মিক একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানেরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

বৈদেশিক সাংবাদিকদের মনে এই প্রশ্নই সবচেয়ে বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে—দুই ডোমিনিয়নের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ও আগ্রহ কি এখন আর দুই কর্তৃপক্ষের কারও মনে সত্য সত্যই আছে?

মাউণ্টব্যাটেন আলোচনার আরম্ভেই বললেন—দুই প্রধান মন্ত্রী যে এখানে আজ মিলিত হয়েছেন, তার কারণ এই যে, দু'জনেরই পক্ষে মিলিত হবার একটা সাধারণ ভিত্তি রয়েছে। আমি অবশ্য এতখানি বাড়িয়ে বলতে চাই না যে, দুই ডোমিনিয়ন পরস্পরকে সাহায্য করবার বা পরস্পরের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দুই গভর্নমেণ্টই এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, যদি তাঁরা নিজের নিজের রাষ্ট্রেরই উপর আপতিত বর্তমানের বিপদ ও সমস্যাগুলিকে দৃঢ়ভাবে আয়ত্তের মধ্যে না আনতে চেষ্টা করেন, তবে একটা অরাজক অবস্থার গ্রাসে পড়তে হবে এবং দুই রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হবে।

নেহরু বললেন—গত কয়েক মাস ধরে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলি রাষ্ট্রকে নানারকমের সমস্যার মধ্যে ফেলেছে সত্য, কিন্তু সেসব সত্ত্বেও দেশের সম্মুখে এখন অর্থনৈতিক সমস্যাই হলো প্রধান সমস্যা। এইসব হাঙ্গামা ও অশান্তির অবসান শীঘ্রই কিংবা বিলম্বে একদিন হয়েই যাবে, কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যাটি থাকবে। এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে, নইলে এ সমস্যা আমাদেরই সমাধান ক'রে ছাড়বে। চারদিকে যুদ্ধের সমর্থনেও নানা কথা আলোচিত হতে শুনেছি। এ আলোচনা নিতান্তই উদ্ভট। যুদ্ধ হলে আমাদের সব উন্নতির স্বপ্ন ও আশা এক যুগের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

লিয়াকৎও স্পষ্ট ভাষায় বললেন—ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার আলোচনা করাও নিতান্ত উদ্ভট এবং অবাস্তব। যুদ্ধ হলে ভারত ও পাকিস্থান উভয়েরই ভয়ানক ক্ষতি হবে, বস্তুত ধ্বংসেরই দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাপার হবে। পাকিস্থান পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে। যাই বলা হোক না কেন, আমরা উভয়েই তো একই উপ-মহাদেশের দু'টি অংশ। আমি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা কল্পনাও করতে পারি না।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের বব টার্নবুল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করলেন—বর্তমানে লোকের মনের ভাব যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে মনের অবস্থাকেই একটা সমস্যা বলা যায় এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

নেহরু বললেন—উপায় হলো, সব কাজের আগে মন থেকে ভয়ের ভাব দূর করা। ভয়ের ভাবই মনের সব আশা-ভরসাকে দুর্বল এবং চিন্তাশক্তিকে বিকৃত করে। অপরকে ভয় করবার এই বিকার হতে মুক্ত হতে পারলেই আর সব মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি সহজেই দূরীভূত করা সম্ভবপর হবে এবং জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ও সুস্থ নীতিগুলি আবার জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

নেহরুকে আরও তিনটি প্রশ্ন করা হলো।—আপনি কি সত্যিই নিঃসংশয়ে সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন যে, আপনার নীতি অনুযায়ী পথে আপনি গভর্নমেণ্টকে চালিত করতে পারছেন? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি তাঁদের সাধ্যমতো আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট তাঁদের যথাসাধ্য এবং যথাশক্তি বর্তমানের অশান্তিপূর্ণ অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ ও উন্নত করার চেষ্টা করছেন?

নেহরু বললেন—ভারতের কোন ব্যাপার, অবস্থা ও ঘটনায় আমি 'সন্তুষ্ট' হতে পারছি না। বস্তুত আমি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও যথার্থ সন্তুষ্ট হতে পারিনি। অবশ্য, বর্তমানের এই অবস্থা ও অবস্থার অবনতি প্রতিরোধ করবার জন্য আমাদের সবদিক দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টার কিছুটা হবে লোকের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা এবং কিছুটা হবে জোর করা। আজ চোখের সম্মুখে যে ধরনের ঘটনার আলোড়ন দেখতে পাচ্ছি, সেটা বস্তুত দেশের নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আলোড়ন। সমাজের এই শ্রেণীই হিটলারকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছিল। সমাজে যখন কোন ঘটনার সংঘাতে প্রচলিত ব্যবস্থার ওলট-পালট হতে দেখা যায়, তখন সেই পরিবর্তনের আবর্তে নানা অদ্ভুত ধরনের এক একটা শ্রেণীগত স্বার্থবাদ চাড়া দিয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করে। এইসব স্বার্থবাদী শ্রেণীর প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি হয় সম্পূর্ণভাবেই ফাসিস্তপন্থী, নয় ফাসিস্তপন্থার কাছ-ঘেঁসা। এরাই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবাদের ব্যাপার অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রেই বিদ্বেষের আক্রমণ চলেছে, একথা সত্য। কিন্তু এখন একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আক্রমণের রূপ, ভঙ্গী এবং লক্ষ্যই বদলাতে আরম্ভ করেছে। এখন হত্যা করার চেয়ে লুঠ করার দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। শিখেরা শিখেদের দোকান লুঠ করছে, হিন্দু হিন্দুর সম্পত্তি এবং মুসলমান মুসলমানের সম্পত্তি লুঠ করছে। একদিক দিয়ে বিচার করলে, এগুলিকে ঘটনা হিসাবে আরও খারাপ এবং মনোবৃত্তিরও আরও বেশি অধঃপতন বলা যায়। কিন্তু আর একদিক দিয়ে এটা ভরসারই লক্ষণ এবং ভাল লক্ষণ। বোঝা যাচ্ছে, এ ঘটনা মূলত সাম্প্রদায়িক নয়; মূলত শ্রেণীবিশেষের অর্থনৈতিক স্বার্থবাদেরই উগ্র প্রকাশ। জোর ক'রে অথবা লোকের মনোভাব পরিবর্তন করিয়ে এ ধরনের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ঘটনাকে আয়ত্তে আনা বেশি সহজ। এই পন্থাতেই আমাদের এখন কাজ করতে হবে।

লিয়াকৎও নেহরুর এই 'থীসিস' মোটামুটিভাবে সমর্থন করলেন।

প্রশ্ন করা হলো, রাজনৈতিক দলের মধ্যে তরুণ বয়স্ক যারা এভাবে 'ধূসর

কোর্তা' ফাসিস্ত দলের মতো হয়ে উঠেছে, তাদের সংযত করার এবং তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করার উপায় কি?

লিয়াকৎ বললেন—'মুসলিম লীগের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তারাই এ ধরনের হাঙ্গামার আসল কর্তা, প্ররোচক এবং পরিচালক, এমন ধারণা আমি সমর্থন করতে পারি না।'

প্রশ্ন করা হলো, বর্তমানের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে সেরে উঠবার জন্য যে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অবলম্বন করতে হবে, তার জন্য দুই ডোমিনিয়ন কি বৈদেশিক পুঁজি এবং বিদেশের কারিগরী সাহায্য ভারতে আহ্বান করতে রাজি আছেন?

নেহরু উত্তর দিলেন—"আমার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশের পুঁজি এবং কারিগরী সাহায্য আমার দেশে খাটতে দিতে অবশ্যই আমি রাজি আছি। কিন্তু বিদেশের কোন কায়েমী স্বার্থ এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেব না।"

লিয়াকৎ বললেন—আমারও এই বক্তব্য।

সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকেরা এই ধারণা নিয়েই চলে গেলেন যে, দুই ডোমিনিয়নের দুই প্রধান মন্ত্রীই বর্তমানের অবস্থা ও ঘটনার বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশের দ্বারা আদৌ অভিভূত হননি। তাঁদের চিন্তা ও বিবেচনার সুস্থতা সম্পূর্ণভাবেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মনোভাবে ও মতবাদে চরমপন্থী উগ্রতা দু'জনের কারও নেই। দু'জনেই গঠনধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। পশ্চিমের চিন্তাধারার দ্বারাই উভয়ের প্রতিভা অভিষিক্ত। দু'জনেরই কিছুসংখ্যক সহকর্মী অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ব্যাধি হতে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু নেহরু ও লিয়াকৎ, উভয়েরই যথেষ্ট প্রতিরোধশক্তি আছে, সাম্প্রদায়িক ব্যাধির বীজাণু এঁদের দু'জনের মনের স্বাস্থ্য বিকৃত করতে পারেনি।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : পাহাড়গঞ্জের সেই গুলী-বর্ষণের ঘটনা সম্বন্ধে একটা তদন্ত হয়ে গিয়েছে। ঘটনার দিন সকাল বেলায় দক্ষিণ ভারত থেকে একদল মাদ্রাজী সৈনিক দিল্লী এসে পেঁছায় এবং পেঁছানো মাত্রই দিল্লীর শান্তিরক্ষার কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলী চালাবার ঢালা অর্ডার দিয়ে রাজপথে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সৈনিকদের অপরাধী মনে করবার মতো কোন যুক্তি পাওয়া গেল না।

নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের এখন অবস্থা এই যে, একই সঙ্গে চারিটি বৃহৎ সঙ্কট সামলাবার জন্য তাঁকে বহু দায়িত্বের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এ নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেলের কাজে বিশ্রাম নেই। নিজামের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে হায়দরাবাদ থেকে মঙ্কটন আজ গভর্নমেণ্ট হাউসে এসে পেঁছেছেন। ইত্তেহাদ আবার গোলমাল করেছে। নিজামের উপর আবার চাপ দিয়েছে ইত্তেহাদ দল।

মঙ্কটন নিজামের উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ড চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইত্তেহাদ দল একটু বিচলিত হয়েছে। দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ ফিরে গিয়ে মঙ্কটন যখন নিজামের কাউন্সিলকে জানালেন যে, ভারতের সঙ্গে আলোচনার সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, তখন ইত্তেহাদী মনোভাবে একটু পরিবর্তন দেখা দিল। আলোচনা ভেঙে গেলে কি বিপদ দেখা দিতে পারে, সে বিষয়েও মঙ্কটন নিজামের কাউন্সিলকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইত্তেহাদ দল একটু

ভীত হয়েই উঠল বোধ হয়। মঙ্কটনের ইংলণ্ড চলে যাবার প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে ইত্তেহাদ দলই তাঁকে থেকে যাবার জন্য খুব জোর অনুরোধ করেছে। ইত্তেহাদ দলই মঙ্কটনকে বলেছে—আপনি এখন চলে গেলে তার ফল খুবই বিপজ্জনক হবে।

তাই মঙ্কটন আবার প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়ে দিল্লী এসেছেন আলোচনার জন্য। মাউণ্টব্যাটেনের এখনো বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যাবে, যদিও হায়দরাবাদকে সিদ্ধান্ত করবার জন্য যে দু'মাস সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার তিন সপ্তাহ এর মধ্যেই কেটে গিয়েছে এবং হায়দরাবাদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও করেনি।

নিজামের ডেলিগেশনের সঙ্গে আজকের আলোচনা বৈঠকে ভি পি'ও যোগদান করলেন। 'রাষ্ট্রভুক্তি' এবং 'সম্পর্ক-স্থাপন'—এই দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, নিজাম তারই উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সবচেয়ে বেশি। এরকম একটা পৃথক ব্যবস্থার প্রতি নিজামের যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়েই ভি পি অনেক কথা বললেন। নিজামের ডেলিগেশন বলছেন, হায়দরাবাদ যদি ভারতের রাষ্ট্রভুক্ত হয় তবে রক্তারক্তির ব্যাপার দেখা দেবে। ডেলিগেশনের আর একটা ভয় হলো, হায়দরাবাদ অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রভুক্ত হতে গেলে বাইরের থেকেও বাধা আসবে।

মাউণ্টব্যাটেন এবং ভি পি উভয়েই ডেলিগেশনকে বুঝিয়ে বললেন যে, এরকম ব্যাপার হলেও ভয়ের কোন হেতু নেই। ভারত গভর্নমেণ্ট সঙ্গত পন্থাতেই কাজ করছেন, তাঁদের আচরণে কোন ভুল নেই। তা'ছাড়া যদি কোন হাঙ্গামা দেখা দেয়, তবে তার জন্যেও নিজামের পক্ষে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ নেই। হাঙ্গামা দমনের জন্য ভারতের সব শক্তির সাহায্য নিজাম যে কোন সময়ে চাইলেই পাবেন।

নিজামের ডেলিগেশন তথা প্রতিনিধিমণ্ডলীকে মাউণ্টব্যাটেন পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক ক'রে দিলেন যে, আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে নিজামকে ভারতের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে ফেলতেই হবে। তা না হ'লে ভারতের সঙ্গে আলোচনার সূত্রও ছিন্ন হয়ে যাবে চূড়ান্তভাবেই, মিটমাটের আর কোন সুযোগ থাকবে না। মাউণ্ট-ব্যাটেন বললেন, এর ফলে ভারতকে অবশ্যই বিশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে হায়দরাবাদের।

নিজামের সঙ্গে চুক্তির কতকগুলি সর্ত ও বিষয়বস্তুর এক তালিকা দাখিল করেছেন ডেলিগেশন। সর্ত এবং বিষয়বস্তুগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, দ্রুত একটা মিটমাট ক'রে ফেলবার মনোভাব বা ইচ্ছার পরিচয় তার মধ্যে নেই। সমস্ত ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত ক'রে রাখার এবং বিলম্বিত ক'রে শুধু কালক্ষেপ করবার পন্থাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শুধু খেলা চলতে থাকুক এবং হার-জিতের কোন নিষ্পত্তিই না হয়, এই তাঁদের ইচ্ছা।

মঙ্কটন পরে কথাপ্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত জানালেন। মঙ্কটন বললেন যে, মূলত মাউণ্টব্যাটেনের অভিমতে এবং তাঁর অভিমতে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর ইচ্ছা, তিনি উপযুক্ত একটা 'ফরমুলা' আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন যাতে 'রাষ্ট্রভুক্তি' কথা উল্লেখ না ক'রেও অন্যভাবে রাষ্ট্রভুক্তিরই নীতি অনুযায়ী প্রধান ব্যবস্থাগুলিকে চুক্তিপত্রের বিষয়ীভূত করা সম্ভবপর হবে। মঙ্কটনের ধারণা, সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে থাকবার ও চলবার যোগ্যতা হায়দরাবাদের আছে।

মঙ্কটন জানালেন, যদি ভারত-হায়দরাবাদের আলোচনার সূত্র ছিন্ন না হয়ে যায় তবেই নিজাম তাঁকে আরও কিছুদিন উপদেষ্টার পদে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন। কিন্তু যদি একটা আপোষের সম্ভাবনা না দেখা যায়, তবে তিনি আর এ পদে নিযুক্ত থাকতে চান না, এ পদে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই, প্রয়োজনও হবে না। নিজাম এবং তাঁর গভর্নমেণ্ট, উভয়েরই মনের কোন স্থিরতা নেই, মতেরও কোন স্থায়িত্ব নেই। তাঁদের নীতির মধ্যে পূর্বাপর কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কখনো এদিক এবং কখনো ওদিক, নানারকম ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে তাঁরা অস্থির-ভাবে ছুটোছুটি করছেন।

বাসভূমির সন্ধানে

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নর-জেনারেলের ডাকোটার আরোহী হয়ে ষোলজনের একটি দল আজ সকাল সওয়া সাতটার সময় পালম বিমানক্ষেত্র হতে আকাশে উঠলেন। সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল জুড়ে শরণার্থীদের ভ্রাম্যমাণ এক একটি দল প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে—পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশবর্জনের বৃহত্তম ঘটনা এবং বাস্তুচ্যুত দুর্ভাগার বৃহত্তম অভিযানের রূপ স্বচক্ষে দেখবার জন্য আমরা যাত্রা করলাম। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পদক্ষেপে পীড়িত দীর্ঘ চারশত মাইল পথের উপর দিয়ে আকাশ-পথে আমাদের বিমান-যাত্রা শুরু হলো। ডাকোটার যাত্রীদের মধ্যে গভর্নমেণ্ট হাউসের লোক হলো মাউণ্টব্যাটেন-পরিবার, ইস্‌মে, ভের্নন এবং আমি। গভর্নমেণ্টের সাক্ষী হয়ে চলেছেন—নেহরু, প্যাটেল, নিয়োগী, রাজকুমারী অমৃত কাউর, জেনারেল লকহার্ট, এইচ এম প্যাটেল এবং শঙ্কর। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত কুঞ্জরু, যিনি সম্প্রতি শরণার্থীনীতি সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা করেছেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সময়মতো বিমান স্টেশনে এসে পৌঁছতে পারেননি। কুঞ্জরুকে বাদ দিয়েই আমাদের ডাকোটা রওনা হলো। পথের এক স্থানে শরণার্থীদের দেখবার জন্য আমাদের ডাকোটা ভূমি থেকে মাত্র দু'শো ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলল।

আমরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিমে ফিরোজপুর ও কুসুরের দিকে চললাম। দেখলাম, জলন্ধর এবং লুধিয়ানা অঞ্চল থেকে মুসলিম শরণার্থীর দল এই সড়ক ধরে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। রাভি নদীর ব্রিজের মুখে এসে আটকে-পড়া হিন্দু ও শিখ শরণার্থীর সমাবেশ থেকে জনতার একটা প্রবাহ এই সড়ক ধরেই পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। পার হলাম কল্লানুর, হিসারের উপর দিয়েও চলে গেলাম। রবিবারের এই শান্ত সকালবেলার শান্তি আটুট হয়ে আছে বলেই মনে হলো। কোথাও আক্রমণের বা আতঙ্ক-চাঞ্চল্যের ব্যাপার দেখা গেল না।

ভাটিণ্ডার রেল-জংশনের নিকটে পৌঁছেই বিপর্যয়ের চিহ্ন প্রথম লক্ষ্য করলাম। দু'টি ট্রেণ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু ট্রেণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষ দিয়ে মোড়া দীর্ঘাকার ও সর্পিল কোন বস্তু যেন পড়ে রয়েছে। ইঞ্জিনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঁকড়ে ধরে রয়েছে শরণার্থীরা। ফিরোজপুরে পৌঁছেও এই ধরনের মনুষ্যদেহে আবৃত একটি ট্রেণকে চলমান অবস্থায় দেখলাম। রাভি নদীর কাছাকাছি যতই এগিয়ে আসছি ততই বেশি ক'রে চোখে পড়ছে, কি বিরাট মানুষের স্রোত, কত ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এসে মিলিত হচ্ছে এবং এখান থেকেই আবার একমুখী হয়ে পূর্বদিক্‌প্রান্ত লক্ষ্য ক'রে চলেছে।

হাঙ্গামার প্রথম দিকেও লোক ঘর ছেড়ে এবং স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু সে যাওয়া আর আজকের যাওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম দিকে যারা ঘর ছেড়েছে, তারা এই ধারণা নিয়েই গিয়েছে যে, শান্তি দেখা দেবার পর আবার তারা ফিরে আসবে। কিন্তু, আজ এরা চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো চলে যাওয়ার জন্যই, আর ফিরে আসবার আশা রাখে না, ইচ্ছাও নেই।

ক্লান্তিহীন ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো শরণার্থী জনতার ধারা যেন এক অন্তর্ধানের আবেগে এগিয়ে চলেছে। কোথাও ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে এই ধারা শীর্ণ হয়ে এসেছে, কিন্তু তার পরেই আবার ফেঁপে উঠেছে নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ, পশু ও গো-শকটের ভিড়ে। রাভির ব্রিজ 'বাল্লোকি হেড'-এ শরণার্থীর দলগুলি এসে যেন থমকে ব'সে পড়েছে। দেখে মনে হয়, যেন যাযাবরদের বিরাট একটা সাময়িক ডেরা। ব্রিজ পার হতে অসুবিধা এবং বাধা আছে। অনেকে তাদের গরু-বাছুরও সঙ্গে নিয়ে এসেছে, কিন্তু কতজনের পক্ষে গরু-বাছুর পার ক'রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে জানি না। হলেও খুব কমসংখ্যকেরই সে সৌভাগ্য হবে। এরই মধ্যে ব্রিজের ভারবহন যোগ্যতা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

ফিরোজপুর থেকে আবার দিল্লীর দিকে ফিরলাম। দেখতে পেলাম, লাহোর-লায়ালপুর সড়ক ধরে মুসলিম শরণার্থীর দল চলেছে। অমৃতসর এড়িয়ে যাবার জন্য অনেকখানি ঘুরে ভিন্ন পথে বিপাশা পার হয়ে শরণার্থীরা এইখানে এসে পেঁছেছে। শরণার্থীদের এই ভ্রাম্যমাণ দলটি দৈর্ঘ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল হবে।

দেখা হলো ইতিহাসের এক সুবৃহৎ দেশবর্জনের রূপ, সমগ্র রূপ নয়, অতি সামান্য একটি অংশ মাত্র। আমাদের হিসাব অনুযায়ী আজকের পথের এই শরণার্থীদের সংখ্যা হবে পাঁচ লক্ষের উপর। এক জায়গায় এমন দৃশ্যও দেখলাম—পাশাপাশি প্রায় গা ঘেঁসেই মুসলিম শরণার্থীর এবং অমুসলমান শরণার্থীর দল দুই বিপরীত দিকে হেঁটে চলেছে। কিন্তু কোন সংঘর্ষ বাঁধছে না, নিজের নিজের গন্তব্যের দিকেই সবাই ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে। শুধু সীমানা ছাড়িয়ে দূরান্তরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন আবেগের তাড়না বোধ হয় তাদের মনে এখন আর বড় বেশি নেই।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : নেহরু এবং লিয়াকৎ, দু'জনের কাছ থেকেই আমরা এর আগের আলোচনার সময় জানতে পেরেছি যে, প্রথম দিকে তাঁরা দুজনেই সমস্ত অধিবাসী অপসারণের অথবা বিনিময়ের বিরুদ্ধেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নীতি আর অটুট রইল না, অটুট রাখা সম্ভবপর হলো না। ঘটনা এমন রূপ গ্রহণ করেছে যে, সমগ্রভাবে মাইনরিটিকে চলে যেতে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চারটি আক্রমণের রিপোর্ট এসে পেঁছেছে। সবই শরণার্থী ট্রেনের উপর আক্রমণের ব্যাপার। দু'টি ঘটনা হয়েছে জলন্ধরে বিপাশার ব্রিজের কাছে মুসলিম শরণার্থীদের উপর। দু'টি ঘটনা হয়েছে লাহোর অঞ্চলে অমুসলমান শরণার্থীদের উপর। এই ধরনের হিংস্রপশুসুলভ ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ও জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই আজ জরুরী কমিটির সকালবেলার বৈঠকে আলোচনা হলো।

লিয়াকৎ সেদিন দিল্লীতে শরণার্থী ট্রেণ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একটি ট্রেণ ভারত থেকে দু'হাজার মুসলমান নিয়ে রওনা হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্থান পেঁছবার পর দেখা গেল, ট্রেণে সাতশত লোক আছে। তিনি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। ভারত থেকে পাকিস্থানগামী মুসলমান শরণার্থীদের একটি ট্রেণের যাত্রীরা তিন দিনের মধ্যে এক ফোঁটাও জল পায়নি। এই ধরনের নিদারুণ কাহিনী

অনেক শোনা যায়, কিন্তু মুশকিল এই যে, এর সত্যতা প্রমাণিত করবার মতো নির্ভর-যোগ্য তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেন না। একটা নিদারুণ কাহিনী বলে দিলেই হলো, সেটা সত্য বলে বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত আর হয় না। লাভের মধ্যে এই হয় যে, এই কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরও বেশি ক'রে শিখায়িত হতে থাকে।

একটা ভরসার বিষয় এই যে, যুক্তপ্রদেশ এবং পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তাঁদের সঙ্কল্পে ও আচরণে দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে আরম্ভ করেছেন। হাঙ্গামাকারী গ্রামগুলির উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে জরিমানা আদায় করাও হচ্ছে। রাত্রিকালে ট্রেণ চলাচল বন্ধ ক'রে দেবার প্রস্তাবও তাঁরা চিন্তা করছেন। ট্রেণের যাত্রীদের রক্ষা করার জন্য ট্রেণের সঙ্গেই ছোট ছোট সৈন্যদল দেওয়া হচ্ছে। একটি ট্রেণ-আক্রমণের ঘটনার বিবরণ সম্প্রতি পেয়েছি। মুসলিম শরণার্থীদের একটি ট্রেণের উপর আক্রমণ হয়েছিল, মাত্র জনকয়েক হিন্দু অফিসার এবং চৌষট্টিজন হিন্দু সৈনিক প্রবলসংখ্যক আক্রমণকারী জনতার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে হাতাহাতি লড়াই করেছেন।

আজকের জরুরী কমিটির বৈঠকের আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন 'ভবিষ্যতে'র কথা তুললেন। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসছে এবং এই আগমনের ব্যাপারও একদিন শেষ হবে। কিন্তু তারপর কি হবে? অশান্তি দমনের কাজকেই এখন অবশ্য সবার আগের কাজ বলে মনে করা হয়েছে এবং কাজও হচ্ছে। অশান্তিও একদিন মিটে যাবে, কিন্তু তার পরে কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে?

বস্তুত শরণার্থীদের বসতি সম্পর্কিত সমস্যাটাই এই সময় মাউণ্টব্যাটেনের চিন্তায় দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন থেকে ব্যবস্থার সূত্রপাত করতে হবে এবং পুনর্বাসনের বৃহৎ দায়িত্বটি স্মরণে রেখে শরণার্থীদের রিলিফ তথা সেবাকার্যের ব্যবস্থাও করতে হবে।

মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবের সম্যক্ অর্থ হলো, এখনই একটা পরিকল্পনা ক'রে ফেলা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের দিকে এবং সমস্যার বৃহত্তর স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমস্ত ব্যবস্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা কর্তব্য। আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। শরণার্থীর বসতির সমস্যাকে নিতান্তই পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশের সমস্যা বলে মনে করলে ভুল হবে এবং নিছক প্রাদেশিক উদ্যোগে প্রদেশের মধ্যেই শরণার্থীর স্থান ক'রে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

আরও একটি কথা। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, বর্তমানের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং অশান্তি দমন করা হয়ে গেলেই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া গেল, এরকম ধারণা করার কোন হেতু নেই। সাম্প্রদায়িক অশান্তি কেটে যাবার পর নতুন ক'রে নতুন ধরনের অশান্তি দেখা দিতে পারে, যদি শরণার্থীদের সম্পর্কে বসতির একটা সুব্যবস্থা না ক'রে ফেলা যায়। শরণার্থীরা লক্ষে লক্ষে আসছে, কিন্তু তারা যাবে কোথায়? কোন্ দিকে? কোথায় তারা ঠাঁই নেবে? এলোমেলোভাবে, যার যেখানে খুশি সেখানেই কি শরণার্থীরা জায়গা ক'রে নেবে? এই ধরনের শৃঙ্খলাহীন অবস্থায় প্রদেশের সর্বত্র শরণার্থীদের যে শত শত উপনিবেশ দেখা দেবে তাদের অর্থনৈতিক অসহায়তা একেবারে চরম হয়েই উঠবে

এবং সে দুর্দশায় তাদের উপর চোরাবাজারী, দুর্নীতি, শোষক এবং প্রবঞ্চকেরই আধিপত্য প্রবল হয়ে উঠবে।

মাউণ্টব্যাটেন যে সমস্যার কথা বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন গভর্নমেণ্টকে তার চেয়ে বৃহৎ ও দুরূহ প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। আর কয়েক-দিনের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমানা পার হয়ে শরণার্থীদের পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ একটি পায়ে-হাঁটা দল ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করবে। পশ্চিম পাঞ্জাবের উর্বর শস্যশালী 'ঐশ্বর্যের অঞ্চল' ছেড়ে তারা নতুন অঞ্চলে আসছে, যেখানে শুধু প্রাণের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোন ঐশ্বর্য তাদের জন্য অপেক্ষা করছে না।

মাথাই বললেন, তাঁর মতে প্রথম ছয় মাসের সমস্যাই সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে উঠবে। ভারতে পৌঁছানো মাত্র শরণার্থীদের সরিয়ে নিয়ে জায়গা দেবার ব্যবস্থা এবং ছয় মাসের জন্য খাওয়াবার ব্যবস্থা, এইটুকু এখন করতে পারলেই পরের দিকের সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মাথাই বললেন, ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে বসতি করিয়ে দেবার পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলা বর্তমানের কাজের তুলনায় অনেক সহজ হবে বলেই তাঁর ধারণা।

মাথাই জিজ্ঞাসা করলেন—পরিত্যক্ত ক্ষেতের ফসল তোলবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

নিয়োগী বললেন,—শরণার্থীদের অনেকেই নিজের থেকেই শস্যপূর্ণ ক্ষেতগুলি দখল নিতে আরম্ভ করেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শরণার্থী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ফসলও তুলছে। নিয়োগী জানালেন যে, তিনি 'যৌথ আবাদে'র ব্যবস্থা করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী করছেন।

মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ করিয়ে দিলেন—কিন্তু গতকালই শরণার্থীদের যে কনভয়টিকে পথে দেখে এলাম, তারা এসে পড়ল বলে। এদের সংখ্যা দু'লক্ষের কম নয়। এদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করাই আপাতত সবচেয়ে আগের প্রয়োজন।

প্যাটেল বললেন,—পূর্ব পাঞ্জাবে তিন মাসের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য আছে। কিন্তু এই খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন করাই আসল কাজ।

এইভাবেই আলোচনা চলছিল। ইস্‌মে আমাকে কানে কানে বললেন—এ আলোচনা এখানে না হয়ে প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকেই হওয়া উচিত।

অবশ্যই উচিত। কিন্তু আমার ধারণা কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে, এবং কোন্ ব্যবস্থাকে 'জরুরী' পদ্ধতিতে প্রবর্তন করতে হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতি এবং পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজকের সব ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, কমনওয়েলথের কাছে জিন্নার আবেদন। ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধে হস্তক্ষেপ করার জন্য কমনওয়েলথকে অনুরোধ করেছেন জিন্না। নেহরু শান্ত-সংযত ভাষায় রাজনীতিজ্ঞোচিত একটি প্রত্যুত্তরও দিয়েছেন।

এর আগে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন বড় পলিসি গ্রহণের ব্যাপারে জিন্নাকে যেভাবে একটা সময় বেছে নিতে দেখেছি, আবার তাই দেখলাম। তিনি খুব ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন যে, এই সময়েই কমনওয়েলথকে উদ্দেশ্য ক'রে একটা আবেদন ছাড়তে হবে। ব্রিটিশ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল হয়েও জরুরী কমিটির ভার নিয়ে যেসব কাজ করছেন, তার মধ্যে ব্রিটিশে ও ভারতে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার একটা প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন জিন্না। সুতরাং জিন্নার পক্ষে

কুপ্রচারকার্য আরম্ভ করার এই তো সুযোগ। কিছুদিন থেকে বৈদেশিক সংবাদদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টেও জেনেছি যে, পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব এবং মন্তব্য নতুন ক'রে উথ্‌লে উঠেছে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির সমালোচনাতেও যে অভ্যস্ত একটা রীতি দেখতে পাই, পাকিস্থানের কাগজগুলিও সেইরকমই রীতি গ্রহণ করেছে। পাকিস্থানের সংবাদপত্র বলতে আরম্ভ করেছে, বর্তমানের সব অশান্তির মূলে রয়েছে ব্রিটিশ-বেনিয়া মিতালী। পাকিস্থানী পত্রিকা একথাও বলছে যে, ডবল গভর্নর-জেনারেলগিরি করবার সুযোগ না পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানী পত্রিকার এই সব মন্তব্যের প্রতিবাদ করছেন না। সামান্যসংখ্যক ব্যক্তি ও পত্রিকাকে বস্তুত পাকিস্থানের জনমত গঠনের পূর্ণ সুযোগ তাঁরা দিচ্ছেন।

কিন্তু আমি এটা ভাল ক'রেই বুঝতে পারছি যে জিন্না ভুল করছেন। তাঁর আবেদনে কমনওয়েলথের বিভিন্ন গভর্নমেণ্টের রাজধানীর প্রধান দপ্তরে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেবে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। চাল চালতে গিয়ে জিন্না বড় বেশি হাত ঘোরাচ্ছেন, তাতে চাল ফস্‌কেই যাবে।

এদিক থেকেও একটা ভুল হয়ে যাবে বলে আমার ভয় হচ্ছে। জুনাগড়ের ব্যাপার নিয়ে ভারতও পাকিস্থানী ধরনের ভুল ক'রে ফেলতে পারেন, এরকম সম্ভাবনাও দেখছি। নবনগরের জামসাহেব এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে বড় বেশি লড়াইয়ের উৎসাহ দেখিয়ে ফেলেছেন। জুনাগড়ের সমস্যা সমাধানের নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 'অ-নিষ্ক্রিয়তা' এবং 'আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াবার' প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন।

অমৃতসরের অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। কলেরা দেখা দিয়েছে, এবং ট্রেণের উপর আক্রমণের ব্যাপারও চলছে। গতকাল কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, সব ট্রেণ ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, অমৃতসর হয়ে কোন ট্রেণ নিয়ে যাওয়া হবে না। আজও আবার এই ট্রেণ সম্পর্কেই আলোচনা হলো। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন নেহরু। গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে নেহরু সুস্পষ্টভাবেই কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, অমৃতসর দিয়ে কোন ট্রেণ আর নিয়ে যাওয়া হবে না।

অমৃতসরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সংবাদ পেয়েছি, দু'জন বিশিষ্ট শিখ নেতা—তারা সিং ও উধম সিং, সম্মিলিতভাবে এক 'শান্তি আবেদন' প্রচার করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন এবং গভর্নমেণ্টও এই 'শান্তি-আবেদনের' সংবাদ শুনে খুবই খুশি হয়েছেন এবং বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন যে, এই আবেদন যেন অতি দ্রুত এবং খুব বেশি ক'রে প্রচার করা হয়। এই আবেদনে কি বলা হয়েছে, তাই জানবার প্রয়োজন ছিল। এসোসিয়েটেড প্রেস অনেক চেষ্টা ক'রেও টেলিফোনে কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারেননি। অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত সফল হলাম। টেলিফোনে অমৃতসরকে পাওয়া গেল। এসোসিয়েটেড প্রেসের স্থানীয় সংবাদদাতাদের কাছ থেকে আমি 'শান্তি-আবেদনে'র বক্তব্য সংগ্রহ করলাম।

অদ্ভুত 'শান্তি-আবেদন'! নারী এবং শিশুদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে নিন্দা জ্ঞাপন ক'রে এই আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে—"আমরা মুসলমানদের বন্ধুত্ব চাই না, কোনকালেও মুসলমানদের

সঙ্গে আমাদের আর বন্ধুত্ব করতে হবে না। আমাদের হয়তো আবার লড়াই করতেই হবে, কিন্তু আমরা নিষ্কলঙ্ক হাতে লড়বো। এ লড়াইয়ে পুরুষ মানুষের মতো শুধু পুরুষ মানুষকেই হত্যা করা হবে।”

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ জরুরী কমিটির বৈঠকে শরণার্থীদের অপসারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আবার আলোচনা হলো।

চেট্টি প্রস্তাব করলেন—সবচেয়ে আগে দিল্লী শহর থেকে শরণার্থীদের সরাতে হবে। বাইরে থেকে শরণার্থীদের দলগুলিকে দিল্লীতে আর প্রবেশ করতে দেওয়া চলে না।

নেহরু বললেন, পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন রাজধানীর জন্য শহর নির্মাণের কাজ দ্রুত আরম্ভ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, শরণার্থীদের মধ্যে বহু সংখ্যক বিত্তবান লোকও আছেন, যাঁরা নতুন রাজধানী অঞ্চলে যেতে চাইবেন।

বাস্তববাদী প্যাটেল বললেন—সবার আগে ট্রেণগুলিকে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শরণার্থীদের শিবিরগুলি খালি করতে হবে। প্যাটেলের মতে, শরণার্থীদের এক-একটি শিবির হলো বিক্ষোভ ও অসন্তোষের এক-একটি আড্ডা।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, ট্রেণ চালু করার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয়েছে শরণার্থী-দের পায়ে-হাঁটা দলগুলিকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে আসা ও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। পথে বহু স্থানে শরণার্থীদের দল থেমে রয়েছে। এই দলগুলিকেই চালু করা সবার আগের কাজ।

এই প্রসঙ্গে হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও উল্লেখ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিনি বললেন, এখনো হাঙ্গামা করার দিকে বেশ ঝোঁক রয়েছে এবং হাঙ্গামা হয়েই চলেছে। আইন এবং শৃঙ্খলাকে এতটা অবাধে তুচ্ছ করার সুযোগ দেওয়া চলতে পারে না। জনসাধারণকে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করাতেই হবে। এই হাঙ্গামার সম্পর্কে কারও বিরুদ্ধে হত্যা ও আগুন লাগাবার অভিযোগে একটা মামলা বা বিচারের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হলো না। এতদিন ধরে যে বিখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতার কথা শোনা গিয়েছে, সেই গোয়েন্দা বিভাগেরই বা কি দশা হলো? এই বিভাগটি একেবারে অকেজো হয়ে গেল কেন? মাউণ্টব্যাটেন প্রশ্ন করলেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই দিক দিয়ে ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য আজ পর্যন্ত কি চেষ্টা হয়েছে?

একটা খারাপ খবর শুনে মাউণ্টব্যাটেন খুবই দুশ্চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারদের মনের অবস্থার কথা এবং তাঁদের সম্পর্কে স্থানীয় মনোভাবের পরিচয় নানা সূত্রে জানতে পেরেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ব্রিটিশ অফিসারেরাও এই হাঙ্গামায় শান্তিরক্ষার কাজে ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গেই নিযুক্ত রয়েছেন। বিশেষ বাধা ও অসুবিধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। নিজেদের বিবেচনা মতো কাজ করবার ‘সামরিক’ ক্ষমতা এখন তাঁদের নেই। হাঙ্গামা দমনের কাজে জনসাধারণও তাঁদের সমর্থন করেন না। এই অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারদের মনে এই ধারণাই হয়েছে যে, তাঁদের কৃতিত্বের কোন মূল্যই কেউ দিচ্ছেন না—না গভর্নমেণ্ট না জনসাধারণ। ভাল কাজ ক'রেও তাঁরা কোন প্রশংসা পাচ্ছেন না।

মাউণ্টব্যাটেন এবং ইস্‌মে উভয়েই নেহরু এবং জিন্নাকে বিশেষভাবেই এই অনুরোধ অনেকবার করেছেন যে, ব্রিটিশ অফিসারদের কাজের প্রশংসা ক'রে নেহরু

এবং জিন্না দুজনেই যেন বিবৃতি দেন। প্রত্যুত্তরে জিন্না পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, গত ১৩ই আগস্ট করাচীতে ভোজসভায় তিনি ব্রিটিশের সম্পর্কে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাতেই যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে, তার বেশি কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এ ব্যাপারও একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। সমস্যাকে আরও কঠিন এবং জটিল করে তুলেছে বিশিষ্ট ভারতীয় লিবারেল নেতা পণ্ডিত কুঞ্জরুর একটি বিবৃতি। কুঞ্জরু বলেছেন যে, যদি ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারেরা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কে নিরপেক্ষ মনোভাব রক্ষা ক'রে কাজ করতেন, তবে পূর্ব পাঞ্জাবের হাঙ্গামা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হতো। কুঞ্জরু একেবারে একটি ঘটনার কথা প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ ক'রে ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, গত আগস্ট মাসের শেষে 'শেখপুরা হত্যাকাণ্ডে' যে এতগুলি মানুষের প্রাণ গেল, তার জন্য দায়ী হলেন ভারতীয় বাহিনীর জনৈক ব্রিটিশ অফিসার। এই অফিসার ইচ্ছা ক'রেই হত্যাকাণ্ড নিবারণের চেষ্টা করেননি।

কুঞ্জরুর বিবৃতি দেখে মাউণ্টব্যাটেন তখুনি টেলিফোনে নেহরুকে জানালেন যে, এই ভয়ানক অভিযোগের সবই মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং অবমাননাকর। যদি অবিলম্বে এই অভিযোগের প্রতিবাদ ও খণ্ডন না করা হয়, তবে ভারতীয় বাহিনীতে কাজ করা ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষে অসহনীয় এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে।

নেহরু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে অতি শীঘ্র একটি বিবৃতি দেবেন। গান্ধী আপত্তি ক'রে বললেন, নেহরুর বিবৃতি নয়, কুঞ্জরুর বিবৃতি চাই। স্বয়ং কুঞ্জরুই যদি একটি বিবৃতি দিয়ে এ অভিযোগ প্রত্যাহার করেন, তবেই সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

এ প্রস্তাবে ইস্‌মে সন্তুষ্ট হলেন না। ইস্‌মে বললেন, অভিযোগ প্রত্যাহার ক'রে কুঞ্জরু যদি একটি বিবৃতি দেন, তবে তাতে শুধু ভারতীয় জনমতের সন্দেহ মিটে যাবে। ইস্‌মের মতে, এটা ভারতীয় জনমতের দাবী মেটাবার প্রশ্ন নয়, এটা ব্রিটিশ জনমতের দাবী মেটাবার প্রশ্ন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে নেহরুরই উচিত এই অভিযোগের প্রতিবাদ করা। নেহরুরই এখন একটি বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা ক'রে দেওয়া কর্তব্য যে, বিশ্বস্তসূত্রে এবং প্রামাণ্যভাবে প্রাপ্ত বিবরণে জানা গিয়েছে যে, শেখপুরা হত্যাকাণ্ডের জন্য যে অফিসার 'অপরাধী' প্রমাণিত হয়েছেন, তিনি ব্রিটিশ নন।

এই ঘটনা থেকে একটি শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে, ভারত-ব্রিটিশ শুভেচ্ছা নামক বস্তুটি এখনো কি অবস্থায় রয়েছে। এ শুভেচ্ছা এখনও পরিণত মহীরুহের মতো দৃঢ় হয়নি, বরং চারাগাছের মতোই ক্ষীণ ও দুর্বল এবং একটুতেই হেলে পড়ে। তবে একটা কথা এই যে, নেহরু এই শুভেচ্ছার ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং বৃদ্ধি করার জন্যও সর্বদাই চেষ্টা করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : দিল্লীতে এখনো যথেষ্ট উত্তেজনার ভাব বর্তমান। যেন একটা মানসিক ব্যাধির প্রকোপে অভিভূত হয়ে রয়েছে দিল্লী। মনের দিক দিয়ে জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। মাউণ্টব্যাটেনও এই সমস্যার কথাই চিন্তা করছিলেন—মনোভাব কোন্ উপায়ে পরিবর্তন করা যায়? একটি লাউড স্পীকার বসানো ভ্যান শহরে ঘুরে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর আবেদন ক'রে ফিরছিল। এই ভ্যানের উপরেও জনতার আক্রমণ

হয়েছে। এই হলো এখন দিল্লীর 'মনের অবস্থা'। সুতরাং সমস্যাকে প্রায় একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বলা যায়। তবে কি এখন মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে?

নেহরু বললেন—'আমি ভারতীয় জনতার মনস্তত্ত্ব জানি। হাঙ্গামার উস্কানি দিচ্ছে যেসব চাঁই-নেতা, তাঁদেরই গ্রেপ্তার ক'রে ফেলা হলো প্রথম কাজ।'

দিল্লীর পুলিশ কমিশনার বললেন—"হাঙ্গামার নেতারা সাধারণ গুণ্ডাশ্রেণীর লোক নয়। কেরানী, ডাক্তার এবং সরকারী কর্মচারী এই শ্রেণীর লোকেরাই হাঙ্গামার প্রধান প্ররোচনাদাতা ও পরিচালক। আমার মনে হয়, দিল্লীর জনসাধারণই এই-ভাবে মারামারি ক'রে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবার সিদ্ধান্ত করেছে।"

নেহরু বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন—"আমরা জানি, জনসাধারণকে উদ্দেশ ক'রে এক একটা 'অর্ডার' ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু কারা এইসব অর্ডার ঘোষণা করছেন? তাঁদের খবর রাখেন কি?"

নেহরু পুলিশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করলেন, গোয়েন্দা বিভাগ কি ঠিকমতো কাজ করছে?

নেহরুও এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, শুধু পুলিশের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করা বা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর নয়। জনসাধারণকেই তাদের নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধী সত্য ও অহিংসার সাধনাকেই ঈশ্বরের আরাধনা বলে ব্যাখ্যা করার পর অন্য এক প্রসঙ্গে এসে এমন এক উক্তি ক'রে ফেলেছেন, যার ফলে উত্তেজনা ও বিরোধের ভাব উৎসাহিত হয়েছে বলেই আমি মনে করছি। নানা কথার মধ্যে পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন। যে অর্থে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তা না হয়ে তাঁর উক্তির অন্য একটা অর্থ হয়ে উঠেছে। গান্ধী বলেছেন—"পাকিস্থান যদি তাঁদের আচরণের সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ত্রুটিগুলিকে সর্বদাই অস্বীকার করতে থাকেন এবং নিজেদের ত্রুটিগুলিকে সর্বদাই সামান্য ও লঘু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকেন, তবে ভারত গভর্নমেণ্টকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতে হবে।"

গান্ধীর উক্তি একটা নতুন উদ্দীপনার মতো এই উত্তেজিত মানসিক পরিবেশ আরও তপ্ত ক'রে তুলেছে। সংবাদপত্রে উগ্র জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণার সাড়া পড়ে গিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, আগামী কাল পৃথিবীর প্রত্যেক সংবাদপত্রে গান্ধীর এই উক্তি বড় বড় শিরোনামায় শোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গত কাল মহাত্মা গান্ধীর কাছে গিয়েছিলাম। কিছুদিন থেকে মহাত্মার প্রার্থনাসভার ভাষণ রেকর্ড ক'রে বেতারে প্রচার করা হচ্ছিল। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রোতাদের পক্ষ থেকে বহু অভিযোগ এসেছে যে, বেতারে প্রচারিত মহাত্মার ভাষণ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রার্থনাসভায় গান্ধীর বক্তৃতা রেকর্ড করতে গিয়ে সভার নানারকম গোলমালের শব্দও রেকর্ড করা হয়ে যায়, তার ফলে বেতারে প্রচারিত সেই রেকর্ড থেকে শ্রোতারা গান্ধীর কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে শুনতেই পান না। মাউণ্টব্যাটেনের অভিমত, গান্ধী স্বয়ং যদি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর স্টুডিওতে এসে একটা বক্তৃতা দেন, তবে খুবই ভাল হয়। গান্ধী তাঁর প্রতিদিনের প্রার্থনাসভার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশে যেসব কথা বলছেন, সেসব কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। চার দিকের উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাব প্রশমিত ক'রে জনসাধারণের মনে শান্তির আগ্রহ জাগাতে হলে গান্ধীর বক্তৃতা ভাল-ভাবে প্রচার করা কর্তব্য। এর জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধেই আলোচনার জন্য আমি বিড়লা ভবনে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

এর মধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। শুক্রবারের প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধী ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের সম্ভাবনার উল্লেখ ক'রে যে কথাগুলি বলেছেন, তার প্রতি গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। এ উক্তির অর্থ কি? কি বলতে চান গান্ধী? মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর এ বিষয়ে একটা আলোচনাও হয়ে গিয়েছে।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও ভবনে গিয়ে বক্তৃতা 'পাঠ' করার প্রস্তাব উত্থাপন করতেই গান্ধী বললেন,—'স্টুডিওতে গিয়ে তৈরী বক্তৃতা পাঠ করা আমার কাছে একটা থিয়েটারী ব্যাপারের মতো লাগে। বক্তৃতার সময় আমার চোখের সামনে 'জীবন্ত' শ্রোতার দল থাকা দরকার। সংখ্যায় পাঁচজন হোক বা পাঁচ লক্ষ হোক, শ্রোতার দল সম্মুখে থাকলে তবেই আমি আমার মনের ভাব অবাধে প্রকাশ ক'রে বক্তৃতা করতে পারি।'

গান্ধী আরও একটি যুক্তি দেখালেন। আগে থেকেই বক্তৃতা 'লিখে' রাখার অভ্যাস তাঁর নেই এবং এই রীতিও তিনি পছন্দ করেন না। সভাস্থলে জনতার সম্মুখে বসে তাঁর মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব কথা আসে, সেইসব কথাই তিনি বক্তৃতায় বলতে অভ্যস্ত।

আমি বললাম—আপাতত শুধু একটি বেতার-বক্তৃতা দিতে আপনি সম্মত হবেন, আমি এই অনুরোধ করছি। অবশ্য যদি মাঝে মাঝে বেতার-বক্তৃতা দেন, তবে আপনার বক্তব্য আরও ভালভাবে এবং বেশি ক'রে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গান্ধী বললেন যে, তিনি এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন এবং অন্তত দু-তিন দিনের আগে কোন কথা দিতে পারবেন না।

গান্ধীর সঙ্গে যতক্ষণ আলোচনা হলো, ততক্ষণের মধ্যে গান্ধীর আচরণের এমন কোন প্রমাণ পেলাম না যে, তাঁর শুক্রবারের প্রার্থনাসভার ভাষণের সেই 'যুদ্ধ' উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে চারদিকে যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছে, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছেন।

গতকালই তিনি আবার তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে এই 'যুদ্ধ' উক্তির উল্লেখ করলেন। দুশ্চিন্তিত মাউণ্টব্যাটেনকে আগেই গান্ধী জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর এই উক্তিকে লোকে খুবই ভুল বুঝেছে। যাতে লোকের পক্ষে ভুল বোঝবার কোন অবকাশ না থাকে, তারই জন্যে গান্ধী শুক্রবারের উক্তিকে আর একটু বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

গান্ধী বললেন,—কোন ঘটনার সম্ভাবনার বা আশঙ্কার কথা বলার অর্থ, সেই ঘটনাকে সমর্থন করা নয়। যে যে কারণে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ দেখা দিতে পারে, সেই কারণগুলির উল্লেখ করলে যুদ্ধের অনুমোদন করা হয় না, বরং যুদ্ধের পথ এড়িয়ে যাবার জন্যই আবেদন করা হয়।

ভাষণের শেষ দিকে গান্ধী বললেন—"ভারত জানে, পৃথিবীরও জানা উচিত, আমার জীবনের যতটুকু শক্তি আছে, তার প্রত্যেক বিন্দু দিয়ে আমি এই চেষ্টাই

ক'রে আসছি যে, এ ভ্রাতৃহত্যা ক্ষান্ত হোক এবং এ বিদ্বেষ যেন যুদ্ধে পরিণতি লাভ না করে।"

গান্ধীর এই উক্তিই সত্য, এটাই যথার্থ গান্ধী-বাণী। গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত বিরাট যে তাঁর মুখের একটা কথারই প্রবল সম্মোহন শক্তি আছে। গান্ধীর সামান্য একটা উক্তিকেও সাধক মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো সত্য বলে লোকে বিশ্বাস করে। সেই কারণেই, তাঁর কোন কথার অর্থ ভুল বুঝলে সে ভুলও সহজেই প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে।

কমনওয়েলথ দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারী স্যার আর্চিবল্ড কার্টার এখন গভর্নমেণ্ট হাউসের অতিথি হয়ে রয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ভূখণ্ড ভ্রমণে বের হয়েছেন, দিল্লী থেকেই তিনি তাঁর প্রাচ্যভ্রমণের শেষ পর্ব সমাপ্ত ক'রে দেশে ফিরবেন।

একটা ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি। স্যার আর্চিবল্ডের সঙ্গে ইস্‌মেও ইংলণ্ডে ফিরবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তীকালের ভারতের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে 'ঘরোয়া'ভাবে একটা বিবরণ তিনি দেবেন।

মাউণ্টব্যাটেনেরও ধারণা, ইস্‌মের এখন একবার ইংলণ্ডে গিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় ঘটনাবলীর একটা বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতার সঙ্কটপূর্ণ প্রথম ছয় মাসের বিবরণ এবং ভারতীয় অবস্থার রাজনৈতিক তাৎপর্য লণ্ডন যদি ঠিক ঠিক বুঝতে ও জানতে চান, তবে ইস্‌মের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া উচিত।

একটা বিশেষ কারণও আছে, যার জন্যে এই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ভারতের নতুন গভর্নমেণ্ট এবং দিল্লীতে অবস্থিত ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের মধ্যে এখনও সম্পর্ক বড় তিক্ত হয়ে রয়েছে। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিযোগ পোষণ করছেন। এই অবস্থায় লণ্ডনের পত্রিকাগুলি যদি ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি তৃতীয় পক্ষের অভিমত জানবার সুযোগ পান, তবে তাঁদের বিশেষ উপকারই হবে। ব্রিটিশ সংবাদদাতা ও ভারত গভর্নমেণ্টের মধ্যে এই তিক্ততা দূর ক'রে একটা পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছি এবং মাউণ্টব্যাটেনও এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

গত শুক্রবার গভর্নমেণ্ট হাউসে ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের এক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছিল। বৈঠকে নেহরু এবং প্যাটেলও উপস্থিত হলেন। মাউণ্টব্যাটেন এ আলোচনায় সভাপতিত্ব করলেন। দুই পক্ষই তাঁদের বহু অভিযোগের দীর্ঘ এক তালিকা বর্ণনা করলেন। দুই পক্ষই মন খুলে এবং স্পষ্ট ক'রে অনেক সোজা কথা বলে দিলেন। যাই হোক, এত সোজা কথা সত্ত্বেও দু'পক্ষের সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হবার দুর্ভাগ্য হতে রক্ষা পেল এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহের ভাবও অনেকখানি দূর হলো।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : জুনাগড় সঙ্কটের রূপ একটা বিপজ্জনক দাবা খেলার ব্যাপারের মতোই দেখাচ্ছে। জুনাগড় এবং জুনাগড়ের সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলি যেন এই দাবার ছক, তার মধ্যে ঘুঁটি চেলে চলেছেন করাচী ও দিল্লী। লিয়াকৎ শেষবার যখন দিল্লী এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ইস্‌মেও আলোচনা করেছিলেন। লিয়াকতের কথা থেকে ইস্‌মে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, কাশ্মীরে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দরাদরির সুবিধা লাভের আশাতেই পাকিস্থান জুনাগড়কে নিয়ে

এই সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। ইস্‌মের এই ধারণা লিয়াকতেরই অতি অর্থপূর্ণ একটি মন্তব্যে আরও নিঃসংশয়ভাবে সমর্থিত হয়েছে। সেই সময় মাউণ্টব্যাটেনের কাছে কথাপ্রসঙ্গে লিয়াকৎ হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন—'আচ্ছা, তাই হোক। ভারত জুনাগড়ে আরও এগিয়ে এসে একবার আক্রমণ করুক। তারপর দেখুক কি পরিণাম হয়।'

জুনাগড় সমস্যা সম্পর্কে ভারতের দিক থেকে সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এইটুকু মাত্র হয়েছে যে, ভি পি জুনাগড়ে গিয়েছিলেন এবং দশ দিন সেখানে থেকে ফিরে এসেছেন। এর সুফল অতি সামান্যই হয়েছে। জুনাগড়ের দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ভি পি। নবাবের সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ দেওয়ান বললেন যে, নবাবের শরীর অসুস্থ।

জুনাগড়ের মধ্যেই বাবরিয়াবাড় নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য রয়েছে, নৃপতি হলেন হিন্দু। আর একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যও আছে জুনাগড়ের মধ্যে, নাম মাংরোল, নৃপতি হলেন জনৈক মুসলমান শেখ। বাবরিয়াবাড়ের হিন্দু রাজা আগেই যথারীতি ভারতের রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন, কিন্তু মাংরোলের শেখ করেননি। জুনাগড়ের কাছেই অন্য একটি দেশীয় রাজ্যে ভি পি রয়েছেন, এই সংবাদ পেয়ে মাংরোলের শেখ কোন মতে তাঁর রাজ্য থেকে বের হয়ে এসে ভি পি'র সঙ্গে দেখা করলেন এবং আলোচনার পর ভারতের রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করলেন। জুনাগড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যই, বাবরিয়াবাড় এবং মাংরোল যথা-রীতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। ভি পি দিল্লীতে ফিরে এলেন এবং মাংরোলের শেখও তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কিন্তু রাজ্যে ফিরে গিয়ে মাংরোলের শেখ এমন বাধা ও ঘটনার চাপে পড়লেন, যার ফলে তিনি রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। চুক্তি প্রত্যাহার ক'রে সরকারীভাবে ভারত গভর্নমেণ্টকে এক পত্র দিয়ে মাংরোলের শেখ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছা করেন না। গত ২২শে তারিখে ভারত গভর্ন-মেণ্ট মাংরোলের শেখের এই প্রত্যাহার-পত্র পেয়েছেন। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই প্রত্যাহারপত্র স্বীকার করা যায় না। যে অবস্থার চাপে পড়ে শেখ এই পত্র দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে এই পত্রকে শেখের প্রকৃত ইচ্ছার পরিচায়ক পত্র বলে মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, সম্ভবপরও নয়।

মাংরোলের শেখের উপর এই চাপ দেবার ব্যাপারটি জুনাগড়েরই কীর্তি। ভীত মাংরোলকে বিনা রক্তপাতেই জয় ক'রে ফেলেছেন জুনাগড়। কিন্তু বাবরিয়াবাড় ভয় পাননি। স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রত্যাহার করতে রাজি হননি বাবরিয়াবাড়ের হিন্দু রাজা। জুনাগড়ের গভর্নমেণ্ট বাবরিয়াবাড় দখলের জন্য সৈন্য পাঠালেন। জুনা-গড়ের সৈন্য এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাবরিয়াবাড় রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করেছে।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন প্যাটেল। এ ঘটনা তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে, বাবরিয়াবাড়ে সৈন্য প্রেরণ ক'রে জুনাগড় যে আচরণের প্রমাণ দিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণরূপে পররাজ্য আক্রমণের 'যুদ্ধকার্য' ছাড়া আর কিছু নয়। প্যাটেল বললেন, বাবরিয়াবাড় থেকে জুনাগড়ী ফৌজ সরিয়ে দেবার জন্য ভারতের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্যাটেল আরও দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়ে বললেন যে, এই সব গায়ের-জোরের উপদ্রবগুলিকে যদি গায়ের-জোরের মার দিয়েই ঠাণ্ডা ক'রে দেবার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : জুনাগড় সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেলের এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠবার আরও যে একটা কারণ আছে, সেটাও উপেক্ষা করা যায় না। কাশ্মীরী নেহরুর কাছে কাশ্মীর যেমন 'হৃদয়ে'র জিনিস, গুজরাটী প্যাটেলের কাছে জুনাগড়ও তেমনি। জুনাগড় প্যাটেলেরই প্রদেশাঞ্চল গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের অংশ। কিন্তু তাই বলে কি মনে করতে হবে যে বর্তমান ভারতের এই দুই শক্তিশালী নেতা প্রাদেশিক অনুরাগের কারণেই কাশ্মীর ও জুনাগড়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত আগ্রহশীল ও কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন? এ আগ্রহকে এক-কথায় নিতান্ত প্রাদেশিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া কোন সমালোচকের পক্ষে হয়তো খুবই সহজ কাজ। কিন্তু ইওরোপীয় ধারণার মাপকাঠিতে ভারতীয় 'নেশন' তত্ত্ব বিচার করলে ভুল হবে। ইওরোপীয় ঐতিহ্যে দেখা যায় যে, শুধু ভৌগোলিক ঐক্য এবং অধিবাসীর ভাষা-ধর্ম-সংস্কারগত ঐক্যের ভিত্তিতেই নেশন গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতীয় 'নেশন' তত্ত্ব এতটা সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জীবনতত্ত্ব বলতে যে বৃহৎ ঐক্যের তত্ত্ব বোঝায়, ভারতীয় নেশন তত্ত্বের সংজ্ঞা ও পরিধি বস্তুত তার চেয়েও ব্যাপক এবং বৃহৎ।

মাউণ্টব্যাটেন গতকাল নেহরুকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। জুনাগড়ের সম্পর্কে সামরিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও 'আয়োজন' করা এবং সত্য সত্যই সামরিক ব্যবস্থা 'প্রয়োগ' করা—এই দুই আচরণের মধ্যে তাৎপর্যের যে পার্থক্য আছে, সেই সম্বন্ধেই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য নেহরুর কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। একথা বিশেষ জোর দিয়েই মাউণ্টব্যাটেন উল্লেখ করেছেন যে, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তবে শুধু যে দুইটি ডোমিনিয়নের নৈতিক মর্যাদা বিনষ্ট হবে তা নয়, দুই ডোমিনিয়নের পক্ষে রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে উঠবে।

এ উপদেশ দিতে পারেন মাউণ্টব্যাটেন এবং ভারত গভর্নমেণ্ট মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই এ উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন, কারণ মাউণ্টব্যাটেন হলেন নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের তিন প্রধান সেনাপতিও ভারত গভর্নমেণ্টকে উপদেশ দিয়ে বসলেন। স্থল, জল ও বিমান—তিন সামরিক বাহিনীর তিন প্রধান সেনাপতিই হলেন ব্রিটিশ। মাউণ্টব্যাটেন যে উপদেশ ভারত গভর্নমেণ্টকে দিয়েছেন, তিন প্রধান সেনাপতিও সেই ধরনের উপদেশ দিলেন। শুধু সামরিক বিষয়েই গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দেবার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার সেনাপতিদের আছে। কিন্তু এ অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে তাঁরা ভারত গভর্নমেণ্টকে জুনাগড় সম্পর্কে রাজনৈতিক উপদেশ দিয়ে বসলেন। ফল এই হলো যে, সর্দার প্যাটেলের মন আরও তিক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

যাতে এরকম কর্তব্য-বিভ্রাট ভবিষ্যতে আর না ঘটে, তার জন্য নতুন ক'রে একটা ব্যবস্থা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ভারত মন্ত্রিসভারই একটি 'দেশরক্ষা কমিটি' গঠন করা হলো। এই কমিটির সঙ্গে কয়েকটি সহকারী কমিটিও কাজ করবেন—তিনজন সামরিক কর্মবিভাগীয় অধ্যক্ষকে নিয়ে একটি সহকারী কমিটি। তা ছাড়া পরিকল্পনা, সংবাদ সরবরাহের সহকারী কমিটি ইত্যাদি। সামরিক বিভাগীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও একটি বড় রকমের পরিবর্তন ও নতুনত্বের প্রস্তাব করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিন প্রধান সেনাপতিকেই তিন প্রধান বাহিনীবিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চীফ অব স্টাফ) হতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে কর্মাধ্যক্ষের পদে কাউকে নিযুক্ত করা হবে না।

নেহর্ ও প্যাটেল উভয়েই এই পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। আগামীকাল মন্ত্রি-সভার বৈঠকে যাতে উত্থাপন করা যায়, তার জন্য আজকের মধ্যেই এই ব্যবস্থার গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা খসড়া রচনা করার ভার ইস্‌মের উপর দেওয়া হলো।

জ্নাগড় সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টকে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনেরই পরামর্শ দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। সামরিক ব্যবস্থার 'আয়োজন' অবশ্য চলতেই থাকবে, কিন্তু এ ব্যবস্থা মাত্র জ্নাগড়ের চারদিকে সেই সব রাজ্যগ্লির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপার নিয়ে কোন গোলমাল ও বিরোধের ঘটনা দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, এইভাবে কাথিয়াবাড়ে যে সব সৈন্যদল পাঠাচ্ছেন ভারত গভর্নমেণ্ট, সেই সব সৈন্যদলের সামরিক উদ্দেশ্য, সংখ্যাবল ও অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ের যথার্থ বিবরণ লিয়াকৎ আলিকে জানিয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত, ভারত গভর্ন-মেণ্টকে স্স্পষ্টভাষায় এই নীতি ঘোষণা করতে হবে যে, যে-সব রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপার নিয়ে সমস্যার স্ঠি হয়েছে, সেই সব রাজ্যের প্রজাসাধারণের সিদ্ধান্তকেই রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারে চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে ভারত গভর্নমেণ্ট স্বীকার ক'রে নেবেন।

প্র্ব পাঞ্জাবের গভর্নর ত্রিবেদীর সঙ্গে আজ এক দীর্ঘ আলোচনায় আমাদের অনেকখানি সময় কেটে গেল। ত্রিবেদীর আচরণে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও উৎসাহের দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে। প্র্ব পাঞ্জাবের প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি 'বিশেষ ক্ষমতা' আগেই গ্রহণ ক'রে রেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে দিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সব কাজই করিয়ে নিতে পেরেছেন। তবে একথা সত্য যে, ত্রিবেদীর পরামর্শের সাহায্য না পেলে প্র্ব পাঞ্জাবের প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট এই ছয় মাসের বিপ্ল ঘটনার আঘাত সহ্য ক'রে টিকে থাকতে পারতেন কি না সন্দেহ।

ভারত-পাকিস্থানের সীমানা অঞ্চলের খালগ্লির নিরাপত্তার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হলো। ১৫ই আগস্টের পর থেকে দ্ই ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত স্থিতাবস্থা চুক্তি অন্সারে খালগ্লির সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে ব্যবস্থা কাজের দিক দিয়ে পালিত হচ্ছে না। খালের প্রহরী ও কর্মচারীদের উপর পাকিস্থানের দিক থেকে গ্লী বর্ষণ করা হয়েছে।

এই গ্লী বর্ষণের ঘটনা সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। এই ঘটনার জন্য দায়ী কে? পাকিস্থানী সৈন্য?

ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল লকহার্ট বললেন, সীমানার ওপারে পাকি-স্থানী বাহিনী সর্বদা সতর্ক হয়ে রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, অবিলম্বে প্র্ব পাঞ্জাবের দিক থেকে তাদের উপর একটা আক্রমণ আরম্ভ হবে।

ত্রিবেদী বললেন—আমি সর্বদাই এই আশঙ্কা করছি যে, পশ্চিম পাঞ্জাবের দিক থেকেই আমার অঞ্চলের উপর যে কোন সময় একটা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যাবে।

যাই হোক, উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের ভাব স্ঠি করাই এখন প্রয়োজন। প্রস্তাব করা হলো যে, সপ্তাহে দ্'বার ক'রে দ্ই প্রদেশের (প্র্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব) গভর্নর, প্রধান মন্ত্রী এবং আঞ্চলিক কম্যাণ্ডারদের বৈঠক হবে।

'ট্রেণ-পরিস্থিতি' সম্পর্কেও আলোচনা হলো। এই বিশেষ শ্রেণীর হাঙ্গামার প্রধান কেন্দ্র এখন অম্তসর-ল্ধিয়ানার মধ্যেই অবস্থিত। মেন লাইন দিয়ে এখন ট্রেণ চলাচল একরকমের বন্ধই হয়ে গিয়েছে। কোন কোন শিখ রাজ্য ত্রিবেদীকে আরও অস্বিধার মধ্যে ফেলছেন। কাপ্রথালা শরণার্থীদের একটা বড় দলকে

জায়গা না দিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, এবং এ কাজ করবার আগে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে একটা সংবাদ পর্যন্ত দেননি। ফলে, উপযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থার অভাবে শরণার্থীদের এই দলের বহু লোককে অনশনে মরতে হয়েছে। ফরিদকোট থেকেও ঠিক এই রকম নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার যখন আলোচনা শুরু হলো, তখন ত্রিবেদী শরণার্থীদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন। ত্রিবেদী বললেন, শিখ ও মুসলমান শরণার্থীর বিভিন্ন দলগুলি পথে যখন পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে চলে যায় তখন তাদের মধ্যে আজকাল বন্ধুভাবেই কথাবার্তার বিনিময় হয়। উভয় শ্রেণীর শরণার্থীই নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা তুলে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে।

পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের অফিসার মিঃ থাপার এই বৈঠকে আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি হাঙ্গামায় হতাহতের সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং বিশেষভাবে এই বিষয়েই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা নির্ণয়ের বিষয়ে সূত্র হিসাবে সব চেয়ে বেশি অবিশ্বাস্য হলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। শরণার্থীরাই আক্রমণকারীরা নিষ্ঠুরতার প্রধান লক্ষ্য হয়েছে এবং আঘাতের বেশির ভাগই শরণার্থীদের উপরেই পড়েছে। এরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ঠিকই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এদের প্রদত্ত বিবরণে হতাহতের যে সংখ্যা উল্লিখিত হয়, সেটা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রদত্ত বিবরণের সত্যতা যেখানেই পরীক্ষা ও অনুসন্ধান ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই প্রমাণিত হয়েছে যে, হতাহতের প্রকৃত সংখ্যার একশত গুণেরও বেশি বাড়িয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবরণ দিয়েছে। মিঃ থাপার বললেন যে, সমগ্র হাঙ্গামা-অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা একজনের বেশি হতাহত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

শতকরা একজনও হতাহত হয়ে থাকলে খুবই শোচনীয় ব্যাপার হয়েছে বলতে হবে। হতাহতের প্রকৃত সংখ্যাকে যদি মিঃ থাপারের হিসাবের দু'গুণ ক'রেও ধরে নিই, অর্থাৎ শতকরা দু'জনও যদি হতাহত হয়ে থাকে, তবুও দেখা যাবে যে মিঃ চার্চিলের হিসাবের অর্ধেকও হতাহত হয়নি। চার্চিল সম্প্রতি বলেছেন যে, পাঞ্জাবের হাঙ্গামায় পাঁচ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। এটা ইংলণ্ডে অবস্থিত মিঃ চার্চিলের আশঙ্কানুযায়ী হিসাব হতে পারে; কিন্তু এখানে অবস্থিত আমাদের সংগৃহীত হিসাবের সঙ্গে সে হিসাবের কোন মিল নেই।

ত্রিবেদীর কাছ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনলাম। সেই সঙ্গে তিনি কতকগুলি তথ্যও শোনালেন। যথা :

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসেই হাঙ্গামা প্রথম দেখা দেয় রাওয়ালপিণ্ডি এবং মুলতানে এবং সেই সময়েই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখদের দেশবর্জনের পালা বেশ প্রবলভাবেই আরম্ভ হয়ে যায়। দেশবর্জনের পালা এইভাবে চলতে চলতে ঠিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আর এক রূপ গ্রহণ করে। লাহোর শহরের অবস্থা সরকারী আইন ও শৃঙ্খলার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং ১৪ই আগস্টের মধ্যেই লাহোর শহরের শতাংশের একাংশ ভস্মীভূত হয়। ১৫ই আগস্টে লাহোরের শতাংশের বার ভাগ পুড়তে আরম্ভ করে। তারপর এই আগুনের ঝড় অমৃতসরের উপর এসে পড়ল।

দূর সিমলাকে রাজধানী ক'রে পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকার্য এই সময় পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না, তাই জলন্ধরকেই রাজধানী করা হলো। ত্রিবেদী প্রথম যে নীতি অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেটা হলো বাস্তুত্যাগ তথা দেশবর্জন বন্ধ করার নীতি। ১৫ই আগস্ট থেকে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত তিনি প্রদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ ক'রে সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা এইভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করলেন যে, লোকে যেন দেশ ছেড়ে চলে না যায়। ২৮শে আগস্ট তারিখে পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থার যে উন্নতি দেখা গেল তাতে তিনি বুঝলেন যে অবস্থা এখন যথোচিতভাবেই আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারা গিয়েছে। মুসলমান অধিবাসীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করার মতো অশান্তির জোর আর দেখা দিতে পারবে না।

এর পরেই পশ্চিম পাঞ্জাবের সেই শোচনীয় ঘটনা—'শেখপুরা হত্যাকাণ্ড'। কত সংখ্যক হিন্দু ও শিখ নিহত হয়, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের হিসাব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর মুডি বলেছেন, তিন শত জন নিহত হয়েছে। কিন্তু সামরিক দপ্তর বলেছেন, কম ক'রেও সাত-আট শত নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্করভাবেই দেখা দিল অমৃতসরে। তার-পরেই ত্রিবেদী বুঝলেন যে, দুই পাঞ্জাবের মধ্যে অধিবাসী বিনিময় অপরিহার্য এবং অবশ্যম্ভাবী। সেই দিন থেকে তিনি অধিবাসী-বিনিময়ের নীতি অনুযায়ীই তাঁর গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের কাজ করবার জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : দেশরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রী, দেশরক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং দপ্তরহীন মন্ত্রী—এই পাঁচ মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত 'অস্থায়ী দেশরক্ষা কমিটি'। জল, স্থল ও নৌ—তিন বাহিনীর তিন প্রধান সেনাপতিই এখন নিজ নিজ বিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেছেন। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসাবেই তাঁরা দেশরক্ষা কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন, মাউণ্টব্যাটেন হয়েছেন কমিটির সভাপতি। গভর্নর-জেনারেল বলে নয়, ব্যক্তিগতভাবে যোগ্য বলেই মাউণ্টব্যাটেনকে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। গভর্নমেণ্টের মতে—'সামরিক বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের অত্যুচ্চ যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা লক্ষ্য ক'রে তাঁকেই সভাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হলো।'

এই দেশরক্ষা কমিটি সম্বন্ধে পাকিস্থানের মনে নানা সন্দেহ দেখা দেবে এবং কমিটির উদ্দেশ্যকেও পাকিস্থান ভুল বুঝবেন—এ আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে। এই কমিটিকে ভারতের যুদ্ধপ্রস্তুতির একটা বড় প্রমাণ হিসাবে প্রচার করা পাকিস্থানের পক্ষে এখন বেশ সহজ কাজ হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এই কমিটি গঠিত হওয়াতে সংঘর্ষবিরোধী মনোভাবেরই জয় প্রমাণিত হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেনের উপদেশে পরিচালিত কমিটি এই উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে অবশ্যই সংযতভাবে এবং ধীরবুদ্ধি নিয়ে সকল পন্থা নির্ণয় ও বিবেচনা করতে পারবেন।

আজ একটি খবর শুনে জরুরী কমিটির মন বিষাদে ও বেদনায় ভরে উঠেছে। দিল্লীর সফদারজঙ্গ হাসপাতালের উপর নির্বোধ ও নিষ্ঠুর একটা আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। দিল্লী শহরে অবশ্য নতুন ক'রে কোথাও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়নি। দিল্লীর বাইরে তিনটি গ্রামের অধিবাসীদের একটা দল এসে এই কাণ্ড ক'রে চলে গিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরকে এখন সেবা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করার এক বিরাট দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। আক্রান্ত

সফদারজঙ্গ হাসপাতালের ঘটনা বর্ণনা করতে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, প্রধান মন্ত্রী এত চেষ্টা ক'রে যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছেন, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া সেই শান্তিপ্রয়াসের বিরুদ্ধেই নিদারুণ আঘাত হয়ে উঠবে।

নেহরুর ধারণা, মোটামুটিভাবে চারদিকে এখন শান্তির ভাবই ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে। নেহরু বললেন যে, তিনি হৌজখাসে গিয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা ক'রে এসেছেন। সেখানে প্রায় পাঁচিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। মুসলমানেরা এই জনতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করছিল। নেহরু বললেন, দিল্লী শহরের অধিকাংশ লোক এখন শান্তি চায়, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবসানই তারা কামনা করছে। সত্যি সত্যি শান্তি চায় না, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। নেহরুর মতে, সমগ্র দিল্লী শহরে এখন এইরকম নিরেট শান্তিবিরোধী লোক পাঁচশতের বেশি নয়।

আজকাল মানচিত্র কক্ষে গিয়ে আশার প্রমাণ পেয়ে থাকি। মানচিত্রে চিহ্নিত অশান্তির সঙ্কেত-পতাকাগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, অশান্তির প্রাবল্য এবং ব্যাপ্তি এখন ক্রমেই হ্রাস পেয়ে আসছে। যুক্তপ্রদেশ থেকেও উত্তেজনার সংবাদ আমরা প্রায়ই পাচ্ছিলাম এবং প্রতিদিনই আশঙ্কা করছিলাম যে, মানচিত্রের সঙ্কেত-পতাকা লক্ষ্ণৌ কাণপুর ইত্যাদি শহর থেকে হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জ্ঞাপন ক'রে অশান্তির শোচনীয় ব্যাপ্তির পরিচয় ফুটিয়ে তুলবে।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট শরণার্থীদের দলগুলিকে যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা অঞ্চলেই রেখেছেন, ভিতরের দিকে অগ্রসর হতে দেননি। এই দুঃখের মধ্যে বিশেষ একটি সৌভাগ্যের ব্যাপারও লক্ষ্য করেছি যেটা নিতান্তই দৈবের অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে রোগ ও অনশন-মৃত্যু যে ভয়ানক রূপ নিয়ে ব্যাপকভাবে দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেরকম কিছু দেখা দিল না। দৈবের অনুগ্রহ বটে, কিন্তু গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও এই সম্ভাবিত অভিশাপ দূরে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মানুষের পক্ষে যতটা করা সাধ্য, স্বাস্থ্যবিভাগ সেটা ভালভাবেই করেছেন।

দুই ডোমিনিয়নের বিরোধে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে আচ্ছন্ন এই অবস্থার মধ্যেও এমন ঘটনাও দেখতে পাচ্ছি যে, পীড়িতের সেবার ক্ষেত্রে বিরোধের বদলে সহযোগিতাই বড় হয়ে উঠেছে। ভারতে শরণার্থীদের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কলেরা ও বসন্তরোগের প্রতিষেধক টিকা দিয়েছেন গভর্নমেণ্ট। শুধু তাই নয়, ভারত গভর্নমেণ্ট বিমানযোগে বহু পরিমাণে কলেরা ভ্যাক্সিন পাকিস্থানেও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লণ্ডনের অভিমত

নয়াদিল্লী, বুধবার, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : আমরা আর দু'দিন পরই ইংলণ্ড যাচ্ছি। তাই প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও বিবরণ যথাসাধ্য সংগ্রহ ক'রে নথীপত্র তৈরী ক'রে রাখছি।

আওরঙ্গজেব রোডে সর্দার প্যাটেলের ভবনে আজ গিয়েছিলাম, এবং প্যাটেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আজ জানবার মতো কতকগুলো বিষয় জানতে পারলাম।

সংবাদপত্র-সমস্যা সম্পর্কেই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হলো। গভর্নমেণ্ট হাউসে ব্রিটিশ-সংবাদদাতাদের সঙ্গে সেদিন একটা 'আশাজনক' আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও সর্দার ও তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের মন এখনও বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সংবাদদাতারা যেভাবে যেসব সংবাদ প্রচার করেছেন, সেটা সহ্য করা বা ভুলে থাকা সর্দারের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। শঙ্কর আমাকে এমন কথাও জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার ক'রে কংগ্রেস যে এত বড় একটা রাজনৈতিক ঝুঁকি নিল, তার প্রতিদানে ব্রিটিশ বুঝি এইরকমই ব্যবহার করবেন?

প্রত্যুত্তরে আমি শঙ্করকে বললাম—তিনটি বিষয়ে সর্দার প্যাটেল যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাস সর্দারের কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর, ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের ভবিষ্যৎ—এই তিনটি বিষয়ের বিবেচনায় ও ব্যবস্থাকার্যে সর্দার যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন, সেটা অত্যুচ্চ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই প্রমাণ।

সর্দারের ভবন থেকে আমি এই ধারণা নিয়েই ফিরে এলাম যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রত্যক্ষ সুবিধা সম্বন্ধে সর্দার যথেষ্ট সচেতন আছেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার করায় ভারতের যে একটা লাভ সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে, সে সম্বন্ধে সর্দারের ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট। সর্দার বিশ্বাস করেন, যদি বিশ্বযুদ্ধের ভিতর দিয়েই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়, তবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিণাম পশ্চিমের শক্তিসমূহের পরিণামের সঙ্গেই যোগসূত্রে গ্রথিত হতে বাধ্য হবে। এই কারণেই সর্দার মনে করেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেট্রাস স্বীকার ক'রে ভারত পশ্চিমের শক্তিসমূহের শুভেচ্ছার ভাগী হতে পেরেছে, অথচ সন্ধি-সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোন রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্দার কখনো ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নেহরুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সব দায়িত্ব নেহরুর। নেহরু মনে করেন, বিশ্বের শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার চক্র থেকে বাইরে থাকাই ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক। নেহরু আশা করেন, ভারত এইভাবে শক্তিদ্বন্দ্বের বাইরে থাকলে এশিয়াতে একটা 'নিরপেক্ষ ব্লক' গড়ে উঠতে পারবে। এই নিরপেক্ষ ব্লক সম্মিলিত রাষ্ট্র সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় বিশ্বের সকল বিরোধের ব্যাপারে মধ্যস্থতার কাজ করতে পারবে।

শঙ্কর বললেন, গতকাল সর্দার প্যাটেল অমৃতসরে গিয়ে একটা বড় সাফল্য লাভ করেছেন। শিখ নেতাদের বৃহত্তম সম্মেলনে সর্দার বক্তৃতা করেছেন। শিখদের প্রায় প্রত্যেক জাঠাদার উপস্থিত ছিলেন। সকলকে শান্ত ও সংযত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন প্যাটেল এবং তাঁর আবেদন শিখ সম্মেলন ভালভাবেই গ্রহণ করেছেন।

যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য লিয়াকৎ দিল্লী এসেছেন। সকালেই বৈঠক হয়ে গিয়েছে। শুনলাম, বৈঠকের আলোচনায় বিরোধিতার ভাবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার যে বৈঠক হলো, সে বৈঠকে শুধু উপস্থিত ছিলেন নেহরু ও লিয়াকৎ, এবং স্টাফের মধ্যে আমি ও ভের্নন। কিন্তু এ বৈঠকের পরিবেশও অপ্রসন্ন ছিল, বিরোধের ভাব একেবারে কেটে যায়নি। ফিকে সবুজ রঙের জামা গায়ে দিয়ে বসেছিলেন লিয়াকৎ। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি খুবই অসুস্থ।

নেহরুর সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করলেন লিয়াকৎ। আম্বালা থেকে মুসলমানদের চলে যাবার ব্যাপার নিয়েই এই তর্ক। চুপ ক'রে আমরা শুনছিলাম। আমাদের ইচ্ছা, এ প্রসঙ্গের বদলে এখন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হোক। কিন্তু আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

এই উত্তেজনাপূর্ণ তর্কের মূল কারণ হলো পাকিস্থান গভর্নমেণ্টেরই একটি আচরণ। পশ্চিম পাঞ্জাবে রাভি নদীর ব্রিজ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট, যার ফলে অমুসলমান শরণার্থীর দলগুলি পথে আটক হয়ে পড়ে আছে এবং ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। সকালে পরিষদের বৈঠকে আলোচনার সময় প্যাটেল তাঁর সাধ্যমতো সকল যুক্তি দিয়ে লিয়াকৎকে ব্রিজ খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সব অনুরোধ বৃথা হয়েছে। ব্রিজ খুলে দিতে রাজি হননি লিয়াকৎ।

মাউণ্টব্যাটেন শেষে এক ঘরোয়া বৈঠকে লিয়াকতের কাছে শেষবারের মতো আবেদন জানালেন—ব্রিজ খুলে দেওয়া হোক।

লিয়াকতের উত্তর শুনে মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণা হলো যে, দিল্লী থেকে চলে যাবার আগে লিয়াকৎ ব্রিজ খুলে দেবার সিদ্ধান্তই জানিয়ে দিয়ে যাবেন।

জুনাগড় সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা এবং কথা-কাটাকাটিও হয়েছে। নেহরু জুনাগড়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে রাজি ছিলেন না। লিয়াকৎও জুনাগড় সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। লিয়াকতের মনোভাব হলো—'আমি কেন জুনাগড়ের কথা তুলবো? আমরা কোন অন্যায় করিনি। যদি জুনাগড় নিয়ে ভারতের মনে কোন দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে, তবে ভারতই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করুক'।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন শেষ পর্যন্ত লিয়াকৎকে দিয়েই জুনাগড় প্রসঙ্গ উত্থাপন করালেন। মাংরোল ও বাবরিয়াবাড়ের ঘটনা সম্পর্কেই তর্ক আরম্ভ হলো। মাউণ্ট-ব্যাটেন এবং নেহরু উভয়েই বললেন যে, ব্রিটিশের অধিরাজক ক্ষমতা অপসারিত হবার পর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্পূর্ণ অধিকার এই দুই দেশীয় রাজ্যের রয়েছে। নেহরু লিয়াকৎকে এই অনুরোধ করলেন যে, জুনাগড়ী ফৌজ বাবরিয়াবাড় থেকে সরিয়ে নেবার জন্য পাক-গভর্নমেণ্ট যেন অবিলম্বে জুনাগড়কে নির্দেশ দান করেন।

নেহরু ঠিক যেসময় এই কথাগুলি বলছেন, ঠিক তখনই একটি টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রামের সংবাদ—জুনাগড়ের ফৌজ মাংরোল রাজ্যেও প্রবেশ করেছে।

নেহরু লিয়াকৎকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট ঐ দু'টি রাজ্যে ভারতীয় সৈন্য পাঠাবেন না, যতক্ষণ না কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ দুই রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির বৈধতার প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা ক'রে দেন। কিন্তু সর্ত এই যে, ঐ দুই রাজ্য থেকে জুনাগড়ী ফৌজ অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : কয়েকদিন আগে ডেলি টেলিগ্রাফ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করেছেন। সংবাদে বলা হয়েছে যে, অকিনলেক সম্প্রতি করাচীতে একটি বিবৃতিতে শিখদের সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে এই কথা বলেছেন যে, "পাঞ্জাবের শিখদের এবং শিখ-রাজ্যগুলির শিখদের যদি ভালভাবে নিরস্ত্র করা হয়, তবেই পাঞ্জাবের শরণার্থীদের দলগুলি দু'দিকেই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় চলে যেতে পারবে।"

এ সংবাদে প্যাটেল ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং হবারই কথা। এবিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্যাটেল আলোচনাও করেছেন। অনুমানের এবং চিঠিপত্র লেখালেখির বহর আর বাড়িয়ে না তোলার জন্যই মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে, আমি সরাসরি অকিনলেকের সঙ্গে দেখা ক'রে জেনে আসবো, সত্যিই অকিনলেক এরকমের কোন বিবৃতি দিয়েছেন কিনা। যদি সম্ভবপর হয়, তবে অকিনলেকের কাছ থেকে তাঁর একটি প্রতিবাদ-পত্রও আদায় ক'রে নিতে হবে।

আজ বিকালেই সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অকিনলেকের ভবনে গিয়েছিলাম। একটা পরিত্যক্ত ও জনশূন্য ভবনের মতোই মনে হচ্ছিল ভারতের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতির এই আবাসিক অট্টালিকাটিকে; কোথাও কোন সাড়াশব্দ ছিল না। গত ছয় মাস ধরে ভারত রাষ্ট্রের উপর দিয়ে যে বিপুল ঘটনার প্রবাহ ধাবিত হয়ে চলেছে, তার ফলে সমগ্র গভর্নমেণ্ট হাউস চিন্তায়, কর্মে ও ব্যস্ততায় প্রতি মুহূর্তে অস্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু সুস্থির এবং পরম শান্ত হয়ে রয়েছে এই সেনাপতি-ভবনটি, ভারতের নতুন জীবনের কর্মধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের ভবনটিকে তাই অতীত ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষীর মতো মনে হচ্ছিল। শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, অতীতে কত বড় ক্ষমতার গৌরবে মণ্ডিত ছিল এ ভবন।

ডেলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টটি পড়লেন অকিনলেক। তার পরেই বললেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিন্নার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে এ ধরনের উক্তি তিনি করেছেন বলে তাঁর একেবারেই মনে পড়ছে না। অন্য কোন ব্যক্তির কাছেও তিনি এ ধরনের কোন কথা বলেননি। ডেলি টেলিগ্রাফের কোন সংবাদদাতাকে তিনি চেনেনও না, কারও সঙ্গে দেখাও হয়নি।

বাগানে বসে অকিনলেকের সঙ্গে চা পান করলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি একটি প্রতিবাদপত্রও লিখে দিলেন।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অকিনলেককে দিন দিন নানা রকম বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর অভিজ্ঞতা, মর্যাদা এবং সততা ভারতীয় বাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে বিভক্ত করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যে রাজনৈতিক বিরোধের ফলে দেশ খণ্ডন করতে হয়েছে, সে বিরোধ স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের সম্পদ ভাগাভাগি করার ব্যাপারে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অকিনলেকের জন্যই সে বিরোধ সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করার ব্যাপারের মধ্যে

আসতে পারেনি, এবং অশোভন দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরই মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, সমালোচনার চাপে পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের যেরকম বিব্রত হতে হয়েছিল, সুপ্রীম কম্যাণ্ডেরও সেই দশা হতে চলেছে।

এটা অকিনলেক এবং তাঁর স্টাফের বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ যে, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা হতে উদ্ভূত এই প্রবল মানসিক উত্তেজনায় বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে তিনি সৈন্য-বাহিনী বিভক্ত করার কাজ সুষ্ঠুভাবেই ক'রে এসেছেন এবং তাঁর এই কাজ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন সমালোচনা বা বাদ-বিসম্বাদ হতে দেখা যায়নি। ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যান্ড স্থাপনের সময় থেকেই অকিনলেকের রীতি-নীতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি, তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভিমতকে কিভাবে চেপে দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মসম্মত কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারেন। আজ তাঁকে যে কাজ করতে হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পক্ষে সেটা সবচেয়ে বেশি দুঃখপূর্ণ একটা কাজ। তিনি আজ সেই ভারতীয় বাহিনীকে দুই সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দু খণ্ড করার ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন, যে বাহিনী ভারতের সকল সম্প্রদায়ের অখণ্ড আনুগত্যের দ্বারাই যুক্ত ছিল।

করাচী, শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : গত কাল গান্ধীর ৭৮তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে গত কাল সরকারী সার্কুলারে গান্ধীর নাম 'মহাত্মা গান্ধী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী সার্কুলারে এই প্রথম 'মহাত্মা গান্ধী' কথাটি ব্যবহৃত হলো। এর আগে গান্ধীর নামের আগে অর্থহীন 'মিঃ' শব্দটি ব্যবহার করা হতো।

আজই মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমরা দিল্লী থেকে বিমানযোগে করাচী এসে পৌঁছেছি। আগামী কাল আবার এই করাচী ছেড়ে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। করাচীতে এসেই ইস্‌মে জিন্নার সঙ্গে দেখা করার জন্য চলে গেলেন। আজ রাত্রিটা ইস্‌মে জিন্নার অতিথি হয়েই গভর্নমেণ্ট হাউসে থাকবেন। আমরা রইলাম করাচীর প্যালেস হোটেলে।

করাচী, শনিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : করাচী ছেড়ে বিমানপথে অনেক দূর চলে এসেছি। আমাদের বিমান এখন পারস্যের উত্তপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছে। করাচী থেকে স্যার আর্চিবল্ড কার্টার আমাদের সহযাত্রী হয়েছেন।

ইস্‌মের কাছ থেকে জিন্নার খবর শুনলাম। জিন্নার মনের ভাব এখন খুবই দুর্বোধ্য। শুধু এইটুকু বুঝতে পারা যায় যে, তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এ ধারণা তাঁর মনে এখন একটা বিশ্বাসের মতোই দৃঢ় হয়ে গিয়েছে যে, ভারতীয় নেতাদের প্রকৃত লক্ষ্য হলো সদ্যোজাত শিশু-পাকিস্থানকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মেরে ফেলা। জিন্না বলেছেন, গান্ধী কোন দিনই দেশ খণ্ডন স্বীকার করেননি এবং এখন ধর্মোপদেশের আড়ালে সদাসর্বদা প্রচারকার্য ক'রে চারদিকে 'হিন্দু বিষ' ছড়াচ্ছেন। জিন্নার মতে, নেহরু অবশ্য কথাবার্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, অন্তত শুনে তাই মনে হয়, কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের উপরে নেহরুর কোন প্রভাব নেই। জিন্না বললেন, প্যাটেলই হলেন ভারত গভর্নমেণ্টের আসল প্রভু। আসল ডিক্টেটর প্যাটেলেরই প্রভাবে এবং নেতৃত্বে ভারত গভর্নমেণ্ট চলছেন। প্যাটেল আড়ালে আড়ালে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে একটা 'অপবিত্র মৈত্রীচুক্তি' ক'রে ফেলেছেন। কংগ্রেস যদি প্যাটেলের ইচ্ছানুযায়ী মুসলিম-বিরোধী পরিকল্পনা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে রাজি না হয়,

তবে প্যাটেল কংগ্রেসকেই পরাভূত ক'রে এবং ভেঙে দিয়ে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

জিন্নার এই সব কথা থেকে এইটুকুই বোঝা গেল যে, তিনি বাইরের পৃথিবী এবং তাঁর অনুগামীদেরও সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নিভৃতে একাকী পড়ে রয়েছেন। নিতান্তই অসুখী মানুষ জিন্না। এই নিভৃতে একাকী পড়ে থেকে শুধু অপরের প্রতি কতগুলি বিদ্বেষ মনের মধ্যে সৃষ্টি ক'রে তিনি নিজের মনের ভয়গুলিকেই তাড়াবার চেষ্টা করছেন।

লণ্ডন, বুধবার, ৮ই অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : দিল্লীর ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের সঙ্গে ভারত গভর্নমেন্টের যে তিক্ততা ও বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট আমি ফ্র্যান্সিস উইলিয়াম্‌সের কাছে আজ দাখিল করেছি। রিপোর্টে আমি লিখেছি :

"ভারত গভর্নমেন্টের ক্ষোভের ও অভিযোগের আসল বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ সংবাদদাতারা পৃথিবীর কাছে ভারত সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ এবং ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করছেন। ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের শতকরা নব্বই জন দিল্লীতেই ঠাঁই নিয়েছেন, অথচ এ'দের দায়িত্ব হলো দুই রাষ্ট্রের সংবাদই পরিবেশন করা। কিন্তু অধিকাংশই দিল্লীতে ঠাঁই নিয়ে শুধু দিল্লীর ও পূর্ব পাঞ্জাবের হাঙ্গামার খবর সংগ্রহ করছেন এবং বিদেশের সংবাদপত্রে সেগুলি প্রচার করছেন। পাকিস্থান সম্পর্কে এ'রা যেসব সংবাদ পরিবেশন করেন, সেগুলিও দিল্লীতে বসেই এ'রা সংগ্রহ করেন। পাকিস্থানে গিয়ে পাকিস্থানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে এ'রা তথ্য সংগ্রহ করেন না। দিল্লীর ব্রিটিশ সংবাদদাতারাও পাল্টা অভিযোগ করছেন যে, ১৫ই আগস্টের পর থেকে ভারত গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেননি এবং সরকারী সূত্র হতে তাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছেন না। ভারত গভর্নমেন্ট এটা স্বীকার করতে চাইছেন না যে, ইচ্ছামতো সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতা সংবাদদাতাদের থাকা উচিত। সরকারী কর্মচারীরা ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের খুবই অবিশ্বাস করেন এবং গভর্নমেণ্ট এই মনোভাব দূর করার জন্যও কোন চেষ্টা করেননি।"

লণ্ডন, শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৪৭ : লণ্ডনের বিভিন্ন মহলের অভিমত আমি এপর্যন্ত যা জানতে পেরেছি, সেই সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আজ একটি রিপোর্ট পাঠালাম।

"ক্লেমেণ্ট ডেভিস তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেভিস বললেন—'১৫ই আগস্ট' বস্তুত একটি অলৌকিক সাফল্য ও কৃতিত্বের উদাহরণ যার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর জন্য আমাদের মর্যাদা কোন দিক দিয়ে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতে আমাদের 'সাম্রাজ্যবাদের' কথা তুলে রুশিয়া এবং আমেরিকা এতদিন ধরে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রচার ক'রে আসছে সে অভিযোগের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হলো। অন্য কোন বিশেষ যুক্তির অজুহাতে অনেক চেষ্টা করলেও রুশিয়া ও আমেরিকা আমাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ আর দাঁড় করাতে পারবে না। ডেভিসের মতে, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা বরং এই সত্যই আরও স্পষ্ট ক'রে প্রমাণিত করেছে যে, আমরা কতখানি সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে এতদিন ভারতে শাসনের কাজ চালিয়ে

আসছিলাম। চার্চিল বলেছেন—'আমি যে বলেছিলাম, এরকম হবেই হবে।' ডেভিস বললেন, চার্চিল এই ধরনের শ্লাঘাপূর্ণ উক্তি ক'রে যা বলতে চেয়েছেন, সেটা নিতান্ত নিন্দনীয় এবং যুক্তিশূন্য। ভারত থেকে এসে আমরা ভালই করেছি। নইলে বিশ্বজনমত এবং ব্রিটিশ জনমতও আমাদের বিরোধী হয়ে উঠত। তা ছাড়া, ভারতে আরও কিছুদিন থাকবার চেষ্টা করলে এই সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের সব প্রতিক্রিয়া, সমস্যা ও দায়িত্ব আমাদের উপরেই এসে চাপতো।

"ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি যা বলেছেন, সেটা ডেভিসেরই অভিমতের সঙ্গেই মোটামুটি মিলে যায়। ওরেলের মতে, চার্চিল অত্যন্ত অবাস্তব মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ওরেল বললেন, ভারতে আমাদের অধিকার আরও কিছুদিন রাখতে হলে পাঁচ লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে গঠিত একটা দখলদার বাহিনী গঠনের প্রয়োজন হতো। তা ছাড়া রুশীয় পদ্ধতিতে বর্তমান ভারতের সমগ্র জাতীয়তাবাদী নেতাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবারও প্রয়োজন হতো। এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় ভারতকে আমাদের অধীনে রাখা আর সম্ভবপর হতো না।"

লণ্ডন, বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : আগামী শনিবার আমরা লণ্ডন ছেড়ে আবার দিল্লী ফিরে যাব। আজ মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আর একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম।

"একটা বিষয় বুঝতে ফ্লীট স্ট্রীটের বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। যে কংগ্রেস এতদিন ধরে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পুষ্ট হয়েছেন, সেই কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছেন, এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না ফ্লীট স্ট্রীট। ফ্লীট স্ট্রীটের চিন্তায় বরং এই বিশ্বাসের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায় যে, ভারতের তুলনায় পাকিস্থানই ব্রিটিশের সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত হতে চাইবেন। ব্রিটিশের সঙ্গে পাকিস্থানের ঘনিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী।

"পাকিস্থান সম্পর্কে ফ্লীট স্ট্রীটের মনে এক দিকে এই বিশ্বাস এবং অপর দিকে একটা অবিশ্বাসের ভাবও রয়েছে। এ অবিশ্বাস ঠিক পাকিস্থানের সম্পর্কে নয়; জিন্নার সম্পর্কে। জিন্নার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে। নেহরুর মর্যাদা অবশ্য দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গভর্নমেণ্ট মহল নেহরুর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন। প্যাটেলের সম্পর্কে কোন ধারণা নেই এবং আলোচনাও নেই, কারণ প্যাটেলের নাম এ'দের কাছে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অজ্ঞাত।

"নোয়েল-বেকার বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন—ভারত গভর্নমেণ্ট কি দিল্লী থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা এখনো চিন্তা করে দেখছেন না? তাঁর মতে, বর্তমানে দিল্লীতে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করার কতগুলি সুবিধা অবশ্য আছে, কিন্তু তিনি স্বচক্ষে যা দেখে এসেছেন এবং রিপোর্টে যেসব ঘটনার কথা পাঠ করেছেন, তাতে দিল্লীকে রাজধানী ক'রে রাখবার যৌক্তিকতা আর নেই। ভারতীয় ভূখণ্ডের যে স্থানে এখন রাজধানী দিল্লী অবস্থিত, সেই স্থানটিই সুবিধার নয়। প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক দিয়ে দিল্লী খুবই দুর্বল। বাইরের দিক থেকে কোন আক্রমণ দেখা দিলে, তার প্রকোপে দিল্লীর সহজে কাবু হয়ে পড়বারই সম্ভাবনা বেশি। রাজনীতির দিক দিয়েও কেন্দ্র হিসাবে বর্তমান দিল্লী সুবিধাজনক নয়।

ডোমিনিয়নের মধ্যভাগ হতে অনেক দূরে ও এক পার্শ্বে অবস্থিত দিল্লী রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়েও দুর্বল।

"ভারত খণ্ডন সম্পর্কেও নোয়েল-বেকার আলোচনা করলেন। তিনি বললেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবস্থা বিবেচনা করলে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, ভারত খণ্ডনের প্রয়োজন ছিল। চল্লিশ কোটি অধিবাসী নিয়ে একটি ভূখণ্ডকে কোন একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধীনে রাখবার ব্যবস্থা করলে একটা মাত্রাছাড়া ব্যাপার হয়ে উঠতো। এতবড় একটা দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কোন উদ্যোগ ও নীতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও প্রতিপালিত করা সম্ভবপর নয়। নোয়েল-বেকারের ধারণা, ব্রিটিশের সাহায্য ও প্রভাব এখন ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে যদি প্রয়োগ করতে হয়, তবে একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়েই করতে হবে।

"নোয়েল-বেকার জানতে চাইলেন, ভারতে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ কি রকম? কাজের দিক দিয়ে বামপন্থীরা কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন? আমি বললাম, বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ ক'রে বামপন্থীরা জন-প্রিয়তার ক্ষেত্রে আপাতত পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। জিন্নার জয়লাভে বড় লাভ হয়েছে হিন্দু মহাসভার। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নিজেকে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার একটা বড় সুযোগ হিন্দু মহাসভা এখন পেয়েছে।

"নোয়েল-বেকার জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখন কিভাবে দুই নতুন ডোমিনিয়নের কাছে শুভেচ্ছার প্রমাণ দিতে পারেন? আমি উত্তর দিলাম যে, হিজ ম্যাজেস্টি'র গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণার প্রয়োজন হয়েছে। এই ঘোষণায় বলতে হবে যে, দুই নতুন ডোমিনিয়নের গভর্নমেণ্ট অতি দুরূহ ও জটিল শাসন-কার্যের গুরুভার বহন করতে গিয়ে যে অসুবিধা সহ্য করছেন, সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট খুব ভাল ক'রেই উপলব্ধি করছেন। এ ছাড়া দুই 'প্রতিবেশী-ডোমিনিয়ন' কথাটির উপর বেশি জোর দিয়ে ঘোষণায় দুই ডোমিনিয়নের সুসম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকটাও উল্লেখ করতে হবে। ঘোষণার বাকি অংশে আর একটি নীতি সুস্পষ্ট ক'রে দিতে হবে যে, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে কারও সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব নেই, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, দুই ডোমিনিয়নের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একটা 'নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য' রক্ষা ক'রে চলছেন।

"তিনি প্যাটেলের বিষয়েও আমাকে প্রশ্ন করলেন। শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার যে ধারণা হয়েছে, আমি তাই জানিয়ে দিলাম। আমার আর একটি ধারণার কথাও বললাম। প্যাটেলই বর্তমানে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত নিয়ন্তা ও পরিচালক এবং কংগ্রেসের প্রতিই তাঁর আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। কংগ্রেস দলের প্রতি ও দলের ভবিষ্যতের প্রতিই তিনি তাঁর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সব সময়েই উপলব্ধি করেন। কংগ্রেসের সঙ্ঘশক্তি ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা ও লক্ষণ অবশ্য কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে, কারণ এখন আর ব্রিটিশ-বিরোধী আবেদনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ নেই। কিন্তু কোন একটা পক্ষের বিরুদ্ধে আবেদন জাগ্রত ক'রে না রাখতে পারলে কংগ্রেসের সংহতি রক্ষা করা কঠিন হবেই বলে প্যাটেল মনে করেন। একটা উপায় ছিল, দেশীয় রাজন্যদের বিরুদ্ধে জনমত আন্দোলিত করা। কিন্তু সে উপায়ও নেই, কারণ প্যাটেল নিজেই রাজন্য-সমস্যার

সমাধান এমনভাবে ক'রে দিয়েছেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়ে তোলার কোন ভিত্তি আর নেই। এই অবস্থায় সম্ভবত বাধ্য হয়েই প্যাটেল মুসলিম-বিরোধী আন্দোলন জাগ্রত করতে চেয়েছেন। মুসলমানদেরই বিরুদ্ধতা করা হয়তো তাঁর এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এইটুকু অন্তত মনে করা যেতে পারে যে, হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যাতে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলতে না পারে, তারই জন্য প্যাটেল এ পন্থা গ্রহণ করেছেন।

"ক্রীপস্ বলেছেন, নেহরু ও প্যাটেলের সম্পর্কটা ঠিক দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পর্ক নয়। প্রধান নেতা ও তাঁরই সহকারী প্রধান নেতার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, প্যাটেল ও নেহরুর মধ্যে সেই সম্পর্কই বর্তমান।"

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : ইস্মের অনুরোধে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদক জন বিভান'কে আজ নিমন্ত্রণ করেছিলাম। দিন পনর আগে 'পুনঃ-পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিভান মাউণ্টব্যাটেনের কর্ম-পন্থা, কাজ ও নীতির সব কিছুর বিরুদ্ধেই আক্রমণ করেছেন। বিভান লিখেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন যেভাবে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তাকে এক কথায় বলা যায়—'ভেঙ্গে দিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া'। গার্ডিয়ানের অভিযোগ, দুই নতুন ডোমিনিয়নের দুই গভর্নমেণ্টকে নিয়ে একটা যুক্ত শাসন-পরিষদ কেন গঠন করা হলো না? ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কিছুকাল একটি যুক্ত শাসন-পরিষদ যদি কাজ করতেন, তাহলে এ ধরনের হাঙ্গামা ও বিরোধ কখনই দেখা দিত না। মাউণ্টব্যাটেন যা করেছেন, সেটা বস্তুত একটা জুয়াখেলার মতো ব্যাপার। ভবিষ্যৎ না বুঝে, পরিণাম বিবেচনা না ক'রে এবং আন্দাজের উপর কাজ ক'রে সমস্ত কিছু একটা অনিশ্চিত অদৃষ্টের হাতে ফেলে দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি দেশ খণ্ডন ক'রে ফেলতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যাবে এবং খণ্ডিত দেশের দুই অংশের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লেই কংগ্রেস ও লীগ আর বিবাদ এবং বিরোধিতা করবার সুযোগ বা অবসর পাবে না। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের এই জুয়ার চাল ব্যর্থ হয়েছে।"

গার্ডিয়ানের এই তীব্র অভিযোগের প্রত্যেকটির উত্তর দিলেন ইস্মে এবং সম্পাদক বিভানও শুনলেন। ইস্মে বললেন—আগের থেকে শত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা ক'রে রাখলেও পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরণ পরিহার করা সম্ভবপর হতো না। পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণেই করা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হলো না। ইস্মে বললেন, একটি পাঞ্জাবী প্রবাদ আছে যে, যদি এক থেকে এগার পর্যন্ত গুণতে পারা যায়, তবে আর কাউকে আঘাত করা যায় না। কিন্তু একটু গুণে দেখবার মতো ধৈর্যও ভারতীয় জনসাধারণের ছিল না। হিসাব ক'রে বুঝতে আর ধৈর্য ধরতে জনসাধারণ একেবারেই রাজি ছিলেন না। এই অবস্থায় যে ব্যবস্থা করা কর্তব্য ছিল, তাই করা হয়েছে।

গার্ডিয়ান-সম্পাদক অভিযোগ করলেন, ভারতে প্রশাসনের কাজের জন্য যেসব নতুন ব্যবস্থা মাউণ্টব্যাটেন উদ্ভাবন করেছেন, তার মধ্যে দূরদর্শিতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। ভবিষ্যতে কি অবস্থা দেখা দিতে পারে, সেই দিক বিবেচনা ক'রে এসব ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়নি।

ইস্মে বললেন, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করলেও সব সময় ভবিষ্যৎটা ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখা দেয় না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তো ভবিষ্যৎ

বুঝে ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু কখনো ধারণা করতে পারেননি যে, 'ডানকার্ক' দেখা দেবে এবং সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছবার পথ আর পাওয়া যাবে না।

একটা উপমা দিয়ে সমস্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন ইস্‌মে। বললেন,—"১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের ভারত ছিল মাঝসমুদ্রে আগুন-লাগা জাহাজের মতো অবস্থায় এবং জাহাজের ভিতরে বারুদের স্তূপ। সুতরাং আমাদের কর্তব্য ছিল, বারুদের স্তূপ স্পর্শ করার আগেই এই আগুনকে নিভিয়ে ফেলা। আমরা যা করেছি, তা করা ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের ছিল না।"

করাচী-নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : এগার ঘণ্টা আকাশে পাড়ি দিয়ে আমাদের ল্যাঙ্কেস্টার করাচী এসে পৌঁছেছে। আজই দিল্লী রওনা হয়ে যাব।

জিন্নার মিলিটারী সেক্রেটারি বিল বির্নি এসে আমাদের সঙ্গে বিমান ময়দানেই দেখা করলেন। বির্নি বললেন, জিন্না আজকাল প্রায়ই একটা কথা বলেন যে, ১৫ই আগস্টের পর 'অবস্থা' অন্য রকমের হয়ে গিয়েছে। জিন্নার মিলিটারী সেক্রেটারি, দেহরক্ষী ও পার্শ্বচর অফিসারদের বিশেষ কোন কাজ নেই, কারণ জিন্না খুব কমই তাঁদের সে সুযোগ দিচ্ছেন। গভর্নমেণ্ট হাউসের বাইরে খুব কমই বের হন জিন্না। মিলিটারী সেক্রেটারি এবং পার্শ্বচর অফিসারেরা শুধু হাউসের দেয়াল রং করা আর ইলেকট্রিক তার বসাবার কাজ তদারক ক'রে মিস্তিরি ও কারিগরদের খাটাচ্ছেন।

একটি ঘটনার বিবরণ শুনলাম বির্নির কাছ থেকে। ক'দিন আগেই জিন্নার প্রাণনাশের একটা চেষ্টা হয়েছিল। দু'জন লোক আধা-মুখোস পরে এবং চাঁদ মার্কা টুপি মাথায় দিয়ে গভর্নমেণ্ট হাউসের বাইরের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকছিল। হাউসের পুলিশ প্রহরী হাঁক দিতেই তারা রিভলবার তুলে পুলিশকে ভয় দেখিয়ে বলে—নিজের কাজ কর, এদিকে নজর দিও না। গুলী মেরে প্রহরীকে তারা আহত করেছিল, কিন্তু প্রহরীও মাটিতে পড়ে যাবার আগেই হুইসিল বাজিয়ে দিয়েছিল।

জটিল কাশ্মীর নাটক

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : পালম বিমান বন্দরে যখন আমরা নামলাম তখন বেলা প্রায় একটা। শরীরটা খুবই ক্লান্ত বোধ করছিলাম। দেখলাম, ভের্নন আমাদের অপেক্ষায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই ভের্নন আমাদের এক নতুন ঘটনার বার্তা শুনিয়ে দিলেন। আজ ভোরবেলা থেকে ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে ছুটে চলেছে। স্থলপথে পায়ে হেঁটে নয়, আকাশপথে বিমানযোগে উড়ে চলেছে ভারতীয় সৈন্য। যাক্, এ বার্তা শোনার পর আরও তিন ঘণ্টার উপর সময় যখন পার হয়েছে, যখন বিছানায় আশ্রয় নেবার জন্য মাত্র পা বাড়িয়েছি, তখন আহ্বান এল মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে—এখনি আসুন। রীস এসে বললেন, কাশ্মীরের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত কি অবস্থায় এসে পেঁাছেছে, সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন আপনাকে কতগুলি তথ্য জানিয়ে রাখতে চান।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, ঘটনা গুরুতর হয়ে উঠেছে এবং খারাপের দিকে চলেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয়দের একটা বড় রকমের অভিযান কাশ্মীরের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে হানাদার উপজাতীয়দের দল। এই অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য এ পর্যন্ত প্রথম শিখ ব্যাটালিয়ানের মাত্র তিন শো তিরিশ জন সৈন্য বিমানে পাঠানো হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন চাইছিলেন, আমি যেন আগামীকাল সকাল থেকেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আরম্ভ করি। কিন্তু তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, এ কাজে নামবার আগে সমস্যা ও সংকটের প্রধান বিষয়গুলি আমার পক্ষে খুব ভাল ক'রে জেনে রাখা প্রয়োজন। যখন আমি লণ্ডন থেকে রওনা হয়েছিলাম, তখন কাশ্মীরের ঘটনা যে অবস্থায় ছিল, এই ক'দিনের মধ্যে তার রূপ ভিন্ন রকম হয়ে গিয়েছে। এর আগে আমি শুধু এই পর্যন্ত শুনেছিলাম যে, পাকিস্থান ও কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কের সূত্র ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট—কাশ্মীরবাসীর পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কতগুলি সামগ্রী কাশ্মীরকে সরবরাহ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে পাকিস্থান। আরও শুনেছিলাম, পাকিস্থানের দিক থেকে কাশ্মীর সীমান্তের উপর ছোটখাট আক্রমণের ব্যাপার চলছে, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট। পাকিস্থান গভর্নমেণ্টও ঠিক এই ধরনের পাল্টা অভিযোগ করেছিলেন কাশ্মীরের বিরুদ্ধে এবং প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঘটনার আর কোন নতুন পরিণতি সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিল না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের তিন দিন আগে, ভারত অথবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করার শেষ তারিখের তিন দিন আগে কাশ্মীর মহারাজার গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, কাশ্মীর আপাতত ভারত ও পাকিস্থান উভয়ের সঙ্গেই স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

এর পর ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে এটা বোঝা গিয়েছিল

যে, কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য কাশ্মীর মহারাজাকে কোন রকম অনুরোধ করতে ভারত সরকারের আগ্রহ নেই। অনুরোধ বা অনুরোধের চেষ্টাও ভারত সরকার করেননি। সে সময় দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার ছিল প্যাটেলের উপর। প্যাটেল ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত হবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের সম্পর্কে প্যাটেলও তাঁর অভ্যস্ত নীতির ব্যতিক্রম করেছিলেন। এমন কোন কাজ করতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল, যে কাজের এই অর্থ দাঁড় করাতে পারা যাবে যে, তিনি ভারতভুক্ত হবার জন্য কাশ্মীরের উপর চাপ দিচ্ছেন। বরং তিনি এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, যদি নেহাৎই কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগদান করে তবে ভারত তাতে কাশ্মীরকে ভুল বুঝবে না, বা তাতে কোন অন্যায় ব্যাপার হয়েছে বলে মনে করবে না।

কিন্তু মহারাজা তাঁর মতি স্থির করতেই পারছিলেন না এবং সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তই করছিলেন না, বরং এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর মনের এই সিদ্ধান্তহীন অবস্থা এবং স্পষ্ট ক'রে একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছবার অনিচ্ছাই যে বর্তমানের এই সংকটের একটা মস্ত বড় কারণ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। মহারাজা যদি দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছতেন, তা হলে কাশ্মীর রাজ্যকে তিনি এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কোন সিদ্ধান্তে পেঁাছবার এই অক্ষমতার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে, এইভাবে শুধু বিলম্ব করা, তথা দীর্ঘসূত্রতা করার ফলেই ঘটনার পরিণাম সাংঘাতিক হয়ে উঠবার আশঙ্কা ছিল। তবু দেখা যাচ্ছিল যে, যেমন কাশ্মীরের মহারাজা তেমনি হায়দরাবাদের নিজাম, বৃহৎ কোন সংকটপূর্ণ অবস্থাকে প্রতিরোধ করার আর কোন পন্থা জানেন না, জানেন শুধু সিদ্ধান্ত করার দায়িত্ব এড়িয়ে কালক্ষেপ করা। তাঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধির ভাণ্ডারে এই দীর্ঘসূত্রতার কৌশলাস্ত্র ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না।

কিন্তু আজ হতে যে ব্যাপার আরম্ভ হলো, তার রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিণাম কোন্ দিকে এবং কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, সেটা খুবই গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের মনের ধারণায় কোন অস্পষ্টতা অবশ্য ছিল না, তিনি ঘটনার গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য সকল দুরূহতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এ সময় ভারত সরকারের মাথার উপর প্রচণ্ড সমস্যার বোঝা চেপে রয়েছে। পাঞ্জাব ও জুনাগড়ের ঘটনা নিয়ে ভারত সরকারের চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ততার অন্ত নেই। এই অবস্থায় এবং অবস্থা দেখে আমার বেশ দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, এ সময়ে মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতি তাঁর গভর্নমেণ্টকে বহু বিপজ্জনক পথভ্রান্তি ও পতনের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করছে, যদিও শুধু পরামর্শ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন দায়িত্বের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে ভারত গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা এখন তাঁর নেই।

কাশ্মীর আক্রান্ত। আকস্মিক এবং অভাবিত সংকট! প্রয়োজন অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং উত্তেজনা পরিহার ক'রে অত্যন্ত সংযতচিত্তে সমগ্র অবস্থাটিকে বিবেচনা করা। অসাধারণ কর্মোৎসাহের মানুষ মাউণ্টব্যাটেন, অত্যন্ত ধীর চিন্তা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার যে প্রতিভা তাঁর মধ্যে রয়েছে, ভারতের এই সংকটের মুহূর্তে সে প্রতিভা অবশ্যই কাজে লাগতে পারে।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে শুনলাম যে, গত শুক্রবার রাত্রিকালে নেহরু সর্ব-প্রথম এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করেছেন। শ্যাম দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য

আহূত এক ভোজসভায় নেহরু বললেন, রাওয়ালপিণ্ডির সড়ক ধরে উপজাতীয়দের দল সামরিক মোটরযানে বাহিত হয়ে কাশ্মীরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্য বাধা দেবার জন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না। সব দিক দিয়ে ঘটনা একটা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির লক্ষণ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

২৫শে অক্টোবর শনিবার মাউণ্টব্যাটেন দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেনারেল লকহার্ট পাকিস্থানী বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে প্রদত্ত একটি টেলিগ্রাম পড়ে শোনালেন। পাকিস্থানের দপ্তর জানিয়েছেন, পাঁচ হাজার উপজাতীয় মুজাফরাবাদ ও ডোমেল আক্রমণ করেছে এবং দখলও ক'রে নিয়েছে। আরও বহু সংখ্যক উপজাতীয় আক্রমণে যোগদানের জন্য আসছে বলে পাকিস্থান ধারণা করছেন, টেলিগ্রামে এই কথাও জানিয়েছেন পাকিস্থান। বিবরণ ও বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, উপজাতীয়রা ইতিমধ্যেই রাজধানী শ্রীনগর থেকে ৩৫ মাইলের কাছাকাছি স্থানে পেঁৗছে গিয়েছে।

দেশরক্ষা কমিটি আলোচনা করলেন, কাশ্মীর গভর্নমেণ্টকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাবার কথা। শ্রীনগরের অধিবাসীরা যাতে হানাদারদের আক্রমণ ঠেকিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাতে পারে, তারই জন্য অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো উচিত। এর পর আলোচিত হলো সৈন্য প্রেরণের কথা। কাশ্মীরের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করা যায় কি না এবং সৈন্য প্রেরণে কি সমস্যা আছে, মাউণ্টব্যাটেন সেই প্রসঙ্গ তুললেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কাশ্মীর যদি আগে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার স্বীকৃতি ঘোষণা না করে তবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণে বিপদ আছে। তিনি আরও বললেন, কাশ্মীর এখন যদি ভারতভুক্তির স্বীকৃতি ঘোষণাও করে, তবুও সেই ঘোষণাকে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্তের ঘোষণা বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কাশ্মীরকে অস্থায়িভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হলো, এই নীতি নিয়েই কাশ্মীরের ভারতভুক্তির স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে গণভোট গ্রহণ ক'রে কাশ্মীর-বাসীর ইচ্ছা চূড়ান্তভাবে যাচাই করা হবে, কাশ্মীর কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। ২৫শে তারিখের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা অবশ্য হলো না, কিন্তু সিদ্ধান্ত হলো যে, ভি পি এখনি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে বিমানযোগে শ্রীনগর রওনা হয়ে যাবেন এবং জেনে আসবেন প্রকৃত অবস্থাটা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে।

পরের দিনই ভি পি যেসব সংবাদ নিয়ে ফিরে এসে কমিটিকে জানালেন, সে সংবাদে নৈরাশ্য এবং দুশ্চিন্তাই বেড়ে উঠল। ভি পি বললেন যে, মহারাজা এই দ্রুত ঘটনার ইঙ্গিত দেখে বড় বিচলিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং নিজেকে অত্যন্ত অসহায়ও বোধ করছেন। এই ধরনের ঘটনাকে অবিলম্বে প্রতিরোধ করার জন্য একটা যে দায়িত্ব ও করণীয় কিছু আছে এবং করা উচিত, শেষ পর্যন্ত সেটা উপলব্ধি করেছেন মহারাজা। মহারাজা বুঝেছেন, ভারত থেকে যদি অবিলম্বে সাহায্য না আসে, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর, যখন আরও বেলা হলো এবং দিন প্রায় ফুরোতে চলল, তখন ভি পি মহারাজাকে বুঝিয়ে বললেন, মহারাজার পক্ষে আর শ্রীনগরে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। হানাদারেরা যখন বরমুলো পর্যন্ত পেঁৗছে গিয়েছে, তখন রাজধানীতে এভাবে বসে থাকা মহারাজার পক্ষে একটা বুদ্ধিহীন দুঃসাহসের কাজ মাত্র, কোন অর্থ হয় না। ভি পি'র এই অনুরোধের পর মহারাজা পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগর ছেড়ে রওনা হলেন। রওনা হবার আগে ভারতভুক্তির স্বীকৃতি-

পত্রে স্বাক্ষরদান ক'রে মহারাজা ভি পি'র হাতে তুলে দিলেন। মহারাজার স্বাক্ষরিত সেই স্বীকৃতিপত্র কমিটির কাছে সমর্পণ করলেন ভি পি।

শ্রীনগরের পক্ষে আত্মরক্ষা করার মতো সামরিক ব্যবস্থাই বা কি দশায় আছে, ভি পি সে বিষয়ও কমিটিকে জানালেন। ভি পি বললেন, শ্রীনগরে যে সামান্য-সংখ্যক সৈন্য আছে, হানাদারদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার মতো সেটা কিছুই নয়। মাত্র এক স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ার সৈন্য শ্রীনগরে ছিল। খুবই উদ্বিগ্ন হবার মতো সংবাদ। এ সংবাদ শোনার পর কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতি ভারত সরকারের গ্রহণ করা উচিত এবং রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হওয়া মাত্রই এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিতে হবে।

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে যে নীতি ও পন্থা অনুসরণের কথা বললেন, তার একটা বৃহত্তর তাৎপর্যও ছিল। মাউণ্ট-ব্যাটেনই বিষয়টা আমার কাছে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন। কাশ্মীরের সমস্যাকে পূর্বে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতেন, তার কিছুটা পরিবর্তন এখন তিনি করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন হয়েছেন এবং কি পরিবর্তন হলো, তাও তিনি আমাকে বোঝালেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ভারতের শাসন-ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করার আগে থেকেই তিনি কাশ্মীর মহারাজাকে একটি বিষয় বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। গত জুন মাসে মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই তিনি মহারাজাকে এই অনুরোধ ক'রে এসেছেন যে, ভারত অথবা পাকিস্থান, এই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যারই অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা মহারাজার হোক না কেন, মহারাজা যেন রাষ্ট্রভুক্তির কোন সিদ্ধান্ত করার আগে কাশ্মীরের লোকের ইচ্ছাটা একবার জেনে নেন। জনমত যাচাই করবার জন্য গণভোট এবং নির্বাচন ইত্যাদি যেসব পন্থা আছে, তার যে-কোন একটির সাহায্যে মহারাজা প্রজার অভিমত জেনে নিতে পারেন। যদি গণভোট অথবা কোন নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভবপর না হয়, তবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের জনসভা আহ্বান ক'রে প্রকৃত লোকমত জানা যেতে পারে। মহারাজাকে এইটুকু বোঝাবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সাধ্যমতো সব চেষ্টাই করেছিলেন। এটা হলো অতীতের কথা। বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন দেখলেন, অবস্থা ভিন্ন রকমের রূপ গ্রহণ করেছে। গত দুদিন ধরে দিল্লীর মনে যে ব্যাপার চলছিল, তা লক্ষ্য করছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। কাশ্মীর যদি ভারতের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়, তবে কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করতে হবে, গভর্নমেণ্ট এই অভিমত দৃঢ়ভাবেই প্রকাশ করছিলেন। গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ সম্বন্ধে সেনাপতিদের আপত্তি এবং মাউণ্টব্যাটেনের আপত্তিও উপেক্ষা করতে তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন। দিল্লীর মনের এই অবস্থা দেখেই মাউণ্টব্যাটেন ভারতে কাশ্মীরের রাষ্ট্রভুক্তির স্বীকৃতি গ্রহণ করা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করলেন।

তিনি ভেবে দেখলেন যে, একটা স্বতন্ত্র রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করলে চরম অবিবেচনার কাজ করা হবে। কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণে আমাদের কোন অধিকার নেই, যেমন পাকিস্থানেরও নেই। যদি আমরা সৈন্য প্রেরণ করতে পারি, তবে পাকিস্থানও কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করতে পারেন। ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং

যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন চাইলেন, যদি ভারত গভর্নমেণ্ট কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই থাকেন, তবে তার আগে একটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না দেখে নিতে হবে, যে ব্যবস্থা এক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। সে ব্যবস্থা হলো, কাশ্মীর মহারাজার কাছ থেকে ভারতভুক্তির স্বীকৃতি পাওয়া। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন ভাবছিলেন, মহারাজার ভারত-ভুক্তির সিদ্ধান্ত শুধু পাওয়া আর গ্রহণ ক'রে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে মনে না হয় যে, ভারত সরকার কাশ্মীরকে পাওয়ার জন্যই মহারাজার স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে নিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা ছিল যে, যদি মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতিকে ভারত গভর্নমেণ্ট ঐভাবে একটা দাবী আদায়ের মতো ব্যাপার না ক'রে তুলে গ্রহণ করেন, তাহলে শুধু তারই জন্য যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরে সরে যেতে পারবে।

মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতি এসেছে এবং মহারাজাকে এখন আনুষ্ঠানিক-ভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, ভারত সরকার মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতি মেনে নিলেন। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর গভর্নমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে মহারাজাকে তিনি যে পত্র দেবেন, তাতে একটি বিষয় তিনি যোগ ক'রে দিতে চান। বিষয়টি হলো, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত ভারত সরকার মেনে নিলেন, কিন্তু একটি সর্তে। ভবিষ্যতে যখন এবং যেই মাত্র কাশ্মীরে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, কাশ্মীর শান্তি ফিরে পাবে, তার পরেই অবিলম্বে গণভোট আহ্বান ক'রে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জেনে নিতে হবে। মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ দেশরক্ষা কমিটির সকলেরই মনঃপূত হলো, সকলেই সমর্থন করলেন। গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে নেহরুও মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন, মাউণ্টব্যাটেন যেন গণভোটের সর্ত উল্লেখ ক'রে মহারাজাকে প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দেন যে, ঐ সর্তে তাঁর ভারতভুক্তির স্বীকৃতি ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেছেন।

কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর মহারাজা জনসমর্থিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে চেষ্টা করলেন, তার প্রথম দৃষ্টান্ত হলো শেখ আবদুল্লার কারামুক্তি। কাশ্মীর রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হলো কাশ্মীরের 'জাতীয় সম্মেলন'। শেখ আবদুল্লা হলেন জাতীয় সম্মেলনের নেতা। শুনতে পাচ্ছি, মহারাজা অস্থায়িভাবে যে জনসমর্থিত শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করছেন, সেই শাসনপরিষদের প্রধানের পদে তিনি শেখ আবদুল্লাকেই নিয়োগ করছেন।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ বিধিসংগত, এতে কোন সন্দেহেরই স্থান নেই। বিশেষভাবে এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রেই জিন্না নিজের ফাঁদে নিজেরই পা জড়িয়ে ফেলেছেন। কারণ, তিনি জুনাগড়ের রাষ্ট্রভুক্তির প্রশ্নে এই নীতির উপর তাঁর দাবী দাঁড় করিয়ে-ছিলেন যে, রাজ্যের রাজা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তাই হবে আইনসংগত সিদ্ধান্ত। জিন্নার বক্তব্য হলো, রাষ্ট্রভুক্তি ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই হলো আইনসম্মত ইচ্ছা। প্রজা যদি আপত্তি করে, তাহলে কিছু যায় আসে না। রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে।

শেষ রাত্রি, ঘড়ির কাঁটা জানিয়ে দিচ্ছে, চারটা বাজে। আমার উপর বোধ হয় করুণা হলো মাউণ্টব্যাটেনের, তাই এতক্ষণে ছুটি পেলাম। যদি না পেতাম, তবে আমি বোধ হয় তাঁর সামনেই মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

দিনগুলি যে কিরকম অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সবই যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে, একটুও দেরি সইছে না। বহু সংবাদপত্রের বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা ও বিবৃতিদান নিয়মিত চলছে। এর উপর, আর একরকমের একটা কাজের ভার এসে ঘাড়ে চাপলো। গভর্নমেণ্ট আজ পর্যন্ত কি কি কাজ করতে পেরেছেন, সে সম্বন্ধে একটা সরকারী বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরু। আমাকেও সে আলোচনায় যোগ দিতে হলো। এই সময় এ ধরনের আলোচনা একটা কেতাবী আলোচনার মতোই লাগছিল। নেহরুর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। কি ভয়ানক শুকনো ও জীর্ণ শীর্ণ চেহারা হয়ে গিয়েছে নেহরুর।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় মনোভাবের রকম দেখে মাউণ্টব্যাটেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, এইজন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে স্টেটস্‌ম্যান ভারত সরকারকে নিন্দা করেছেন, কেন কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য ঢোকান হলো। স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক আইয়ান স্টীফেনস্‌কে ডেকে পাঠাবার জন্য আমাকে বললেন মাউণ্টব্যাটেন, সম্পাদক যেন এখনি একবার এসে দেখা ক'রে যান।

মাত্র এক ঘণ্টা প্রায় পার হয়েছে, স্টীফেনস উপস্থিত হলেন। মাউণ্টব্যাটেন প্রথমেই বললেন—'ভাঁওতার জোরে একটা জাতিকে গড়ে তোলা যায় না।'

মাউণ্টব্যাটেন বলতেই থাকেন—"বিজেতার মতো গর্বিতভাবে শোভাযাত্রা ক'রে কাশ্মীরে প্রবেশ করার আশা নিয়ে জিন্না আবোটাবাদে বসে আছেন। জিন্নার মনে ব্যর্থতাবোধ প্রবল হয়ে উঠছে। প্রথম হলো, জুনাগড়ের ব্যাপারে, তারপর গত কাল হায়দরাবাদে যে ঘটনা হয়ে গিয়েছে, সেই ব্যাপারে। হায়দরাবাদের যে প্রতিনিধি দল দিল্লী আসছিলেন ভারত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, হঠাৎ তাঁদের বাধা দিয়ে দিল্লী-যাত্রা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

"কিন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত যে পন্থা গ্রহণ করেছে, তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনাটাই ভিন্ন ধরনের। ঘটনার সূচনাতেই ভারত গভর্নমেণ্ট ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, কাশ্মীরে গণভোটের সাহায্যে নির্ণীত অভিমতই ভারত স্বীকার ক'রে নেবেন। যদি ভারত কাশ্মীরের জন্য সামরিক সাহায্য নিয়ে উপস্থিত না হতো, তবে শ্রীনগরে একটা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান ক'রে ছাড়তো উপজাতীয় হানাদারের দল, সেই সঙ্গে শ্রীনগরের প্রায় দুশো জন ব্রিটিশ নরনারীকেও হানাদারের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করতে হতো। এ পরিণাম একেবারে অবধারিত ছিল, যদি ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরের সঙ্কটের চরম মুহূর্তে পৌঁছে না যেত। কাশ্মীর রক্ষার জন্য ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটা সম্পূর্ণভাবেই বৈধ ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ মহারাজা ভারতভুক্তির স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করার পর ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে উপস্থিত হয়েছে।"

এই সব কথা বলার পর মাউণ্টব্যাটেন স্টীফেনস্‌কে আরও কতগুলি ঘটনার কথা জানিয়ে দিলেন : অকিনলেক জিন্নাকে শেষ পর্যন্ত একটা বিষয় বোঝাতে পেরেছেন। অকিনলেকের কথাতেই জিন্না মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আগামীকালই লাহোরে উপস্থিত হয়ে কাশ্মীর সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে জিন্নার এই প্রস্তাব অবশ্যই ঘটনার একটা

উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ডুন ক্যাম্বেল এবং অ্যাণ্ড্রু মেলর সংবাদ জানতে চাইতেই আমি জানিয়ে দিলাম। এর মধ্যে যে একটা আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সে কথাও বললাম। কিন্তু জিন্নার এই আমন্ত্রণের পিছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে, সে-বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারিনি। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অকিনলেক যে চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টারই বা কতখানি সার্থকতা আছে, সে সম্বন্ধেও আমি কিছু বলতে পারিনি।

আজকের দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর্ব যখন প্রায় মাঝামাঝি অবস্থা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, সেই সময় লাহোর থেকে অকিনলেক মাউণ্টব্যাটেনকে টেলিফোন করলেন। অকিনলেক জানালেন, তিনি জিন্নাকে রাজি করাতে পেরেছেন। কাশ্মীরে পাকিস্থানী সৈন্য পাঠাবার যে নির্দেশ গতরাত্রিতে জিন্না দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ আজ বাতিল ক'রে দিয়েছেন জিন্না। পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মেসেরভি এখন ছুটিতে আছেন, তাই অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রেসি জিন্নার নির্দেশ পেয়েছিলেন কাশ্মীরে পাকিস্থানী সৈন্য প্রেরণের জন্য। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারির বাড়িতে জিন্না তখন ছিলেন এবং গভর্নরের এই মিলিটারী সেক্রেটারিই জিন্নার নির্দেশ জেনারেল গ্রেসিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন।

গ্রেসি জিন্নাকে জানালেন, সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের অনুমোদন ছাড়া তিনি সৈন্য-বাহিনীকে কাশ্মীরে যাবার কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। গ্রেসির কাছ থেকে সংবাদ এবং জরুরী অনুরোধ অকিনলেকের কাছে পৌঁছানো মাত্র, আর কালক্ষেপ না ক'রে আজ সকালেই অকিনলেক বিমানযোগে চলে গেলেন এবং গিয়েই জিন্নাকে বোঝালেন। অকিনলেক জিন্নাকে বললেন, কাশ্মীর যখন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন মহারাজার অনুরোধ অনুসারে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করার সম্পূর্ণ অধিকার ভারত সরকারের আছে।

যাই হোক জিন্নার কাছ থেকে অকিনলেক বিদায় নেবার আগেই জিন্না কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ বাতিল ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয় জিন্না এরই মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুকে লাহোরে যাবার আমন্ত্রণও জানিয়ে ফেলেছেন।

ডিনারে বসেছি। ভের্নন আসতে অনেক দেরি করছেন। কয়েক ঘণ্টা টেলিফোনে অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকার পর ভের্নন এলেন ডিনারে। এসেই বললেন—সব শেষ। পরিকল্পনা যা করা হয়েছিল, তার সবই ভেস্তে গেল। কারণ, নেহরু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, লাহোরে যেতে পারবেন না।

আজ রাত্রে ফিল্ম দেখার পর মাউণ্টব্যাটেন ডেকে পাঠালেন আমাকে, রোনিকে এবং ভের্ননকে, আজকের সারাদিনের ঘটনা সম্বন্ধে আলাপ করবার জন্য। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, আজ সকালে দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে লাহোর যাবার প্রস্তাব তিনি বেশ জোর দিয়েই সমর্থন করেছেন। কমিটি তাঁর প্রস্তাবে 'না' করতে পারেননি। মাউণ্টব্যাটেনের কথার বিরুদ্ধে একটি কথাও তুলতে কমিটির সদস্যদের সাহস হয়নি। কিন্তু তিনি এরই মধ্যে জানতে পেরেছেন যে, আজ বিকালে মন্ত্রিসভার যে বৈঠক হয়ে গিয়েছে, তাতে লাহোর যাবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপত্তি উঠেছে।

নেহরুকে লাহোরে যেতে দিতে মন্ত্রিসভার প্রবল আপত্তি ছিল। লাহোর যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যও নেহরুর উপর অনুরোধের চাপও খুব প্রবল

হয়ে উঠেছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের শেষে ঘরে ফেরার পর নেহরু বস্তুত সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তারপর শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নেহরুর এই অসুস্থতা যে সত্যিকারের অসুস্থতা, এ সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের মনে কোন সন্দেহ নেই। তবু নেহরু এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেনকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি কয়েকদিন পরে লাহোরে যাবেন, এখন লাহোর যাবার ব্যাপার স্থগিত রাখা হোক। এই কথা জানিয়ে জিন্নাকে পত্র দেবার জন্য নেহরু মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনও ঠিক করেছেন যে, তিনি কাল সকালে টেলিফোনে জিন্নাকে নেহরুর শরীরের অবস্থা ও অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেবেন। নেহরুর অসুস্থতা সম্পর্কে যে সব খবর মাউণ্টব্যাটেন নিজে জানতে পেরেছেন তারই বিবরণ জিন্নাকে জানিয়ে তিনি জিন্নাকেই দিল্লীতে আসবার জন্য অনুরোধ করবেন।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট লাহোরের নাম শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শুধু লাহোর স্থানটাকেই যে তাঁরা অপছন্দ করছিলেন তা নয়। তাঁরা লাহোরের আমন্ত্রণের সময়টাকেও পছন্দ করছিলেন না। এ সময়ে নেহরুর লাহোর যাওয়া গভর্নমেণ্ট আঁদৌ সমর্থন করতে পারছিলেন না। চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাত্রা যেমন হিটলারী মরজি তোষণের ব্যাপার বলে লোকে ধারণা করেছিল, নেহরুর লাহোর যাত্রার প্রস্তাবকেও এরই মধ্যে অনেকে সেই রকম ব্যাপার মনে করতে আরম্ভ করেছেন। কাশ্মীরের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এখানে লোকের মনে এখন একটা ভাবাবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠবার আশঙ্কা রয়েছে। বেপরোয়া সংঘর্ষে লেগে যাবার জন্য ভাবাবেগ ও উৎসাহের প্রাবল্য জেগে উঠতে পারে, এই বিপদের সম্ভাবনা আমরা অনুমান করতে পারছি এবং এটাও বুঝতে পারছি যে, এই ভাবাবেগ প্রশমিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা গভর্নমেণ্ট হাউসে অবস্থিত আমাদের এই ক্ষুদ্র দলটিরই কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্য করতে হলে আগে যা করতে হবে, রোনি সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। ঠিকই বলেছেন রোনি, আগে এই সমস্যার সব কিছু তলিয়ে বুঝে নিতে হবে। যদি আগে এটা না ক'রে নিতে পারি, তবে আমাদের কোন কথারই কোন মূল্য হবে না। কাউকে আমাদের অভিমত দিয়ে প্রভাবিত করারও কোন শক্তি আমাদের হবে না।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন আজ সকালে নেহরুকে দেখতে গিয়েছিলেন। প্যাটেলও গিয়েছিলেন। লাহোরে যাওয়া উচিত কি না, সে বিষয় নিয়ে মনখোলা আলোচনা হলো। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি একাই যেতে রাজি আছেন। ঘটনা যখন দুটি দেশের ভবিষ্যৎকে একটা বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে দেবার সব লক্ষণ নিয়ে দেখা দিয়েছে, যখন দুটি দেশকে একটা ভয়ানক পরিণাম হতে রক্ষা করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার কথাটাকেই বড় ক'রে দেখতে ইচ্ছা করেন না। এ রকম কোন আত্মাভিমান বা অহমিকা তাঁর নেই। মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যদি একা লাহোর যেতে চান, তবে তাঁকে যেতে দিতে মন্ত্রিসভা রাজি হবেন কি না?

প্যাটেল বললেন—নেহরু যাবেন না, আপনাকেও যেতে হবে না।

প্যাটেল জানিয়ে দিলেন যে, যেমন তিনি নিজে, তেমনি মন্ত্রিসভাও মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে কাউকেই লাহোরে যেতে দিতে একেবারেই রাজি নন।

মাউণ্টব্যাটেন জানালেন, লিয়াকৎও অসুস্থ হয়েছেন। যাই হোক, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের আর একটা বৈঠক এ সপ্তাহেই হবার কথা আছে। যদি নেহরু এবং তিনি এ সময় ঐ যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকের জন্যই লাহোরে যান, তা'হলেও সেটা ভারতের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচায়ক হবে।

নেহরু রাজি হলেন এবং মাউণ্টব্যাটেন গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এসেই জিন্নাকে টেলিফোন করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে সংবাদ শুনে খুশি হলেন জিন্না। বিস্ময়ের ব্যাপার, এর মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই ডুন ক্যাম্বেল আমাকে টেলিফোনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি যে, মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন, এটা সত্য কি?

আজ গান্ধীর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন নব্বই মিনিটকাল আলাপ করলেন। গত কাল মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য যে ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন, তার মধ্যে প্রায় চার্চিলীয় ধরনের ভাষা ও সুর ফুটে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন : 'পরিণাম ভগবানের হাতে, মানুষ শুধু কাজ করতে পারে এবং কাজের জন্য প্রাণ দিতে পারে। থার্মোপাইলি রক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক স্পার্টান সৈন্য যেভাবে নিঃশেষে প্রাণ দিয়েছিল, সেই রকম কাশ্মীর রক্ষার জন্য প্রেরিত অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য যদি রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবুও আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়বে না। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর পক্ষের মুসলিম, শিখ ও হিন্দুরা যদি তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্রে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুবরণ করেন, তবুও আমি কাঁদব না। এ ঘটনা সমস্ত ভারতের চোখের সামনে এক নতুন গৌরবের আদর্শ হয়ে উঠবে। কাশ্মীর এইভাবে বীরের মতো দেশরক্ষার আদর্শ দেখাতে পারলে, সে আদর্শ এই উপ-মহাদেশের সকলের হৃদয় স্পর্শ করবে। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক বা শিখ হোক, প্রত্যেকেই ভুলে যাবে যে তারা কোনদিন পরস্পরের কাছে শত্রু হয়ে উঠেছিল।'

কাশ্মীর রক্ষার জন্য যে সামরিক প্রয়াস সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে, তারই কথা ভাবছিলাম। সামরিক আয়োজনের এখন যা অবস্থা এবং অল্পদিনের মধ্যে যে অবস্থা দেখা দেবে, সেটা অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই বুঝতে পারছি। সোমবারে কাশ্মীরে প্রেরিত প্রথম সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার প্রথম সংঘর্ষেই মারা গিয়েছেন। ভারতীয় ফৌজ কিছুটা পিছিয়ে এসেছে। শ্রীনগর থেকে মাত্র সাড়ে চার মাইল পশ্চিমে জোর যুদ্ধ চলছে।

লক্ষ্য করছি, হায়দরাবাদও যেন সময় বুঝে সুর বদলাতে আরম্ভ করেছে। কাশ্মীর সঙ্কটের নতুন অবস্থা লক্ষ্য ক'রে হায়দরাবাদও হঠাৎ নতুন রাস্তা ধরার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির এবং কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের প্রথম সংবাদ প্রচারিত হবার পর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হায়দরাবাদ থেকেও একটা নতুন নাটকীয় ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তির পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য নিজাম সরকারের এক প্রতিনিধিদল দিল্লীর উদ্দেশে হায়দরাবাদ থেকে মাত্র রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের ইত্তেহাদী দলের ইঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এক জনতা ঐ প্রতিনিধি দলকে আটক ক'রে ফেলেছে। এই অদ্ভুত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনো আমরা পাইনি। কিন্তু এটা খুবই স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারছি যে, নিজাম ভুল করছেন। এতকাল নিজাম যে কতগুলি বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগ ক'রে এসেছেন, সেগুলিকে তিনি

এখনো বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্যই তিনি দিন দিন আরও বেশি ক'রে চরমপন্থী ইত্তেহাদীদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়ছেন।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : আর একটা দিন বেশ ঘুমিয়ে নিয়েছি। রীস তাঁর ডিনার সেরে আমার কাছে একবার দেখা দিয়ে গেলেন। রীস বললেন, কাশ্মীরের খবর সঠিক এবং বিস্তারিতভাবে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের উপযুক্ত ব্যবস্থাই এখনো হয়নি। রীসের ধারণা, উপজাতীয় হানাদারেরা যদি তাদের লুঠ করার স্বভাবগত প্রবৃত্তি ও উৎসাহের ঝোঁকেই ছুটে চলবার সুযোগ পেত, তবে এতক্ষণে তারা শ্রীনগর পৌঁছে যেত। কিন্তু 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র কতিপয় প্রাক্তন মুসলমান অফিসারের নেতৃত্বে হানাদারেরা অভিযান চালিয়েছে। তাই মনে হয়, সামরিক পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে একটু ভেবেচিন্তে অগ্রসর হচ্ছে হানাদারের দল।

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাব সমর্থন করা হলো যে, লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে নেহরু উপস্থিত থাকবেন। এ সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষণাও করা হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই নেহরুর কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন সংবাদ পেলেন যে, ডাক্তার নেহরুকে লাহোরে যেতে দিতে-রাজি হচ্ছেন না। ডাক্তারের মতে, নেহরুর শারীরিক অবস্থা এখন সাধারণ রকমেরও ভাল হয়ে ওঠেনি। সুতরাং নেহরু জানিয়েছেন, মাউণ্টব্যাটেনকে একাই লাহোর যেতে হবে।

এরই মধ্যে আর একটা যে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, নেহরু সেটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হয়েও উঠেছিল। ব্যাপার হলো, জিন্নার একটি বিবৃতি। জিন্না এরই মধ্যে এক বিবৃতিতে ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, যেহেতু 'প্রতারণা ও গায়ের জোরে' কাশ্মীরের ভারতভুক্তির স্বীকৃতি ভারত আদায় করেছে, সেই হেতু কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে তিনি বৈধ ব্যাপার বলে মেনে নিতে পারবেন না। নেহরুকে লাহোরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে জিন্না যে ধরনের ভারতবিরোধী তীব্র মন্তব্য ও অভিযোগ প্রচার করলেন, তাতে নেহরুর মনও বেঁকে বসল। নেহরুর মতে এ সবই হলো জিন্নার অভ্যস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র সেই পুঁজি, কূটকৌশলে চাপ দেবার রীতি, সময় বুঝে যেটা তিনি প্রয়োগ ক'রে থাকেন। যেখানে এ ধরনের চালবাজি, সেখানে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আলোচনা নিতান্তই অসম্ভব।

জিন্নার বিবৃতি নেহরুর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সে বিবৃতিতে জিন্না এমন আর একটি কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন, যা শুনে নেহরুর মনে লাহোরের আমন্ত্রণ রক্ষা করার ইচ্ছা আর পোষণ ক'রে রাখবার কোন যুক্তিই রইল না। জিন্না বলেছেন, প্রথমে কাশ্মীরের মুসলমানদেরই উপর আক্রমণ চালাবার জন্য কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু ডোগ্‌রা সৈন্যদের লাগানো হয়েছে, এমন কি কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু সৈন্য সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্থানের মুসলমানদের গ্রামগুলিকেও আক্রমণ করেছে। এইভাবে কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যন্তরে ও কাশ্মীর সীমান্তের মুসলমানদের উপর রাজ্যের হিন্দু সৈনিকেরা অত্যাচার করেছে বলেই সীমান্ত অঞ্চলের পাঠানেরা উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কাশ্মীরের উপর হানা দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক কথা ছিল জিন্নার বিবৃতিতে। এসব শোনবার পর নেহরুর মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, সেটা বুঝতে পারছি। এখন স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাউণ্টব্যাটেন যদি লাহোর যান তো একাই যাবেন, নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না।

এখন 'কাশ্মীর'ই হলো প্রধান সংবাদ। এই অবস্থায় জুনাগড়ের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলিত জনমতের তলায় থিতিয়ে পড়ছে। সংবাদ হিসাবে জুনাগড় এখন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে।

জুনাগড়ের ঘটনা কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি, বরং কাশ্মীরের নাটক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে জুনাগড়েও ঘটনার গতি নতুন পথে ঘুরে যেতে আরম্ভ করেছে। নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে জুনাগড়।

গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করেছেন, আগামী কাল মাংরোল ও বাবরিয়াবাড়ের শাসন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করবেন। আমরা যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন মাউণ্টব্যাটেন এদিকে সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক সূত্রে ভারত ও পাকিস্থানের সঙ্গে আলোচনা ক'রে একটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছেন। কাশ্মীরের নতুন ও বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে এখন জুনাগড়ও যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক জটিলতার পটভূমিকা আরও বিস্তৃত ক'রে তুলেছে।

কিন্তু পাকিস্থানের জুনাগড়-নীতি তাঁদের কাশ্মীর-নীতির সমর্থনে কাজে আসবে না। জুনাগড়ের ক্ষেত্রে 'নবাবের ইচ্ছা'কেই রাষ্ট্রভুক্তির নির্ণায়ক চূড়ান্ত এবং আইনসম্মত সিদ্ধান্ত বলে পাকিস্থান ঘোষণা করছেন। অথচ কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 'মহারাজার ইচ্ছা'কে অনুরূপ আইনসম্মত সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতে পাকিস্থান রাজি নন। জুনাগড়-নবাবের রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্তকে যাঁরা বিশুদ্ধ 'আইনসঙ্গত' ব্যাপার বলছেন, তাঁরাই কাশ্মীর-মহারাজার রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্তকে 'জুয়াচুরি ও জবর-দস্তি'র ব্যাপার বলছেন।

প্রচার-মূল্যের দিক দিয়ে জুনাগড় এখন ভারতের পক্ষেই বেশি লাভজনক। জুনাগড়ের ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হলে বিশ্বের জনমত ভারতেরই অনুকূল হবে, কিন্তু জুনাগড় অধিকার ক'রে ফেললে বিশ্বজনমত ভারতের ততখানি অনুকূল হবে কি না সন্দেহ।

কিন্তু ঠিক এই প্রশ্নেই প্যাটেল ভিন্ন মত পোষণ করেন। জুনাগড় ঘটনার প্রচার-মূল্যের প্রতি তাঁর লোভ নেই। প্রচারের সুবিধা বা লাভের জন্য জুনাগড়কে তিনি এ অবস্থায় রাখতে ইচ্ছা করেন না। প্যাটেলই ভারতের প্রচার-মন্ত্রী এবং দেশীয় রাজ্য-মন্ত্রী—দুই দপ্তরের পরিচালক তিনিই। জুনাগড় সম্পর্কে এখন 'দেশীয় রাজ্য-মন্ত্রী' হিসাবেই প্যাটেল তাঁর প্রথম কর্তব্য পালন করতে চান, প্রচার-মন্ত্রী হিসাবে পরে।

এটা স্বীকার করতেই হয় যে, পাকিস্থানের পরামর্শে চালিত জুনাগড় যে সব কাণ্ড করেছেন, তাতে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে একটা অসহনীয় অবস্থাই সৃষ্টি করেছে। দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠা ভারতের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মাংরোল ও বাবরিয়াবাড় থেকে জুনাগড়ী ফৌজ সরিয়ে নেবার জন্য নেহরু গত পয়লা অক্টোবরে লিয়াকৎকে যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই অনুরোধের পরে পত্রযোগে কম ক'রেও আরও তিনবার পাক-গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। তিন সপ্তাহ পার হবার পর একটা উত্তর এল পাকিস্থানের কাছ থেকে, তাতে লিয়াকৎ জানিয়েছেন যে, আগের চিঠিগুলি তাঁরা পাননি। লিয়াকৎ জানিয়েছেন, মাংরোল এবং বাবরিয়াবাড় থেকে ফৌজ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জুনাগড়কে তিনি নির্দেশ কিছু দিন আগেই দিয়েছেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ফৌজ সরানো হলো না। মাংরোল ও বাবরিয়াবাড়ে জুনাগড়ী ফৌজ এখনো রয়েছে।

এর মধ্যে গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের একটা বৈঠক হয়েছিল। সে বৈঠকে আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে লিয়াকৎ নেহরুকে জানিয়েছিলেন যে, জুনাগড়ে গণভোটের দ্বারা রাষ্ট্রভুক্তি নির্ধারণ করবার নীতি স্বীকার করতে তিনি রাজি আছেন। নেহরু প্রস্তাব করলেন যে, ভি পি মেনন লাহোরে এসে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ক'রে যাবেন। লিয়াকৎ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। লিয়াকৎ বললেন, লাহোরে নয়, করাচীতে গিয়ে আলোচনা করতে হবে।

গত ২১শে তারিখে দেশরক্ষা পরিষদ মাংরোল ও বাবরিয়াবাড় অধিকার করবার নীতি সমর্থন করেছেন। পরিষদের এই বৈঠকের দু'দিন পরে একটা পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হলো, কিভাবে মাংরোল ও বাবরিয়াবাড় অধিকার করা হবে। ঠিক এর দু'দিন পরে এবং কাশ্মীর বিস্ফোরণের মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা আগে ভারত গভর্নমেণ্ট এই পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করলেন।

আর কোন উপায় না পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব করলেন যে, মাংরোল এবং বাবরিয়াবাড় অধিকারের জন্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের উপর কাজের ভার দেওয়া হোক। এই বিশেষ পুলিশ বিভাগটি ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ইংলণ্ড-রাজের প্রতিনিধি ভাইসরয়েরই খাস বিভাগ ছিল। বিভাগটি এখনো পূর্বের মতোই সাধারণ পুলিশ ও মিলিটারী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে এই বিভাগের সাহায্য এখনো গ্রহণ করা চলতে পারে।

ভারতের দেশরক্ষা কমিটির বৈঠক আজকেই হয়েছে এবং বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেনের ঐ প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্যাটেল কিছুতেই রাজি হলেন না। প্যাটেল অত্যন্ত শক্তভাবেই এই অভিমত জানিয়ে দিলেন যে, মাংরোল ও বাবরিয়াবাড় অধিকারের ভার ভারতীয় বাহিনীর উপরেই ন্যস্ত করা হবে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২রা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : দিল্লী থেকে মোটরে ক'রে সিমলা গিয়েছিলাম। পরিবারের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসেছি। পথে অনেক দৃশ্যই দেখলাম এবং তার মধ্যে এমন অনেক কিছু দেখলাম যা সারাজীবনের স্মৃতিতে হয়তো একটা দাগ হয়ে থাকবে।

একমাত্র কার্নাল ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে নতুন কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদ পাইনি। চারদিকে শান্তি আছে বলেই বোধ হচ্ছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট কার্নাল শহর থেকে মোটর লরীতে ক'রে মুসলমানদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ দৃশ্য দেখলাম। মুসলমান মেয়েরা শহরের প্রাচীরের গা ঘেঁসে বসে আছে। এই দৃশ্যের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের মোটরকার। মোটরকারের রেডিওতে তখন সুরশিল্পী বাখের প্রিলিউড প্রমত্ত ছন্দে ও হর্ষে সুস্বর ছড়াচ্ছে। শুনতে অতি অদ্ভুত লাগছে। কোন্ দৃশ্যের মাঝখানে কিসের সঙ্গীত! মানুষের বেদনা কি সীমাহীন হয়ে উঠল? হয়েছে বোধ হয়, কিন্তু মানুষের সহ্য করার শক্তিও কি সীমাহীন হতে পারে? আমার মনের সম্মুখে এক নতুন অনুভবের জগৎ যেন হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। শুনছি, সে জগতে যেন জীবনের প্রচণ্ড দুঃখ এবং মহিমা একই বেদনার রাগিণীতে বেজে চলেছে।

গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এসেই দেখলাম, একটা ভোজের ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের নিমন্ত্রণ। ভোজে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বিকানীরের মহারাজাও অতিথি হয়ে এসেছেন। বিকানীরের মহারাজা তাঁর রাজ্যে পাঁচ লক্ষের উপর শরণার্থীর সেবাকার্যের জন্য কি কি ব্যবস্থা

করেছেন, তারই পরিচয়ের দৃশ্য তোলা কতকগুলি ফিল্ম সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সুন্দর রঙীন ফটোগ্রাফী। ফিল্ম দেখাবার সময় মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের দৃশ্য-বস্তুর বিবরণও বর্ণনা ক'রে শোনালেন। মহারাজা বললেন, বিকানীর রাজ্যের ভিতর দিয়েই প্রায় পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তু গিয়েছে। কিভাবে এই বিরাট-সংখ্যক উদ্বাস্তু শরণার্থী-দের পথ-চলার দুঃখ ও ক্লেশ লাঘব করার জন্য রাজ্যের গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করেছেন, তারই বিবরণ। বহুদূর বিস্তৃত মরু অঞ্চলের উপর দিয়ে ভ্রাম্যমাণ হাজারে হাজারে শরণার্থী নরনারীর প্রাত্যহিক সাহায্য ও রক্ষাব্যবস্থা করবার দায়িত্ব হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে দেখা দেওয়াতে রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর দিয়ে খুব চাপ গিয়েছে। যতখানি সাধ্য তার সবই করেছেন রাজ্য সরকার। শরণার্থীদের রক্ষাব্যবস্থার সমস্ত উদ্যোগকার্য যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে, দেড় শতের বেশি মুসলমানের প্রাণহানি হয়নি।

মাউণ্টব্যাটেনের মন বেশ প্রফুল্ল। তিনি বললেন, লাহোরে জিন্নার সঙ্গে তাঁর সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় খুশি হয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন এবং জিন্না দু'জনেই মন খুলে নিজের নিজের বক্তব্য বলেছেন। কোন কথা মনের মধ্যে চাপা না রেখে এতটা খোলাখুলিভাবে আলোচনা সম্ভবপর হতো না, যদি দুই গভর্নমেণ্টের দুই প্রধান মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকতেন। জিন্না প্রথমেই অভিযোগ করলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টকে না জানিয়ে অন্যায় করেছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের ইচ্ছার কথা আগে একবার পাকিস্থান গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করার জন্যও জানান উচিত ছিল। মাউণ্টব্যাটেন উত্তরে বললেন, যে বৈঠকে কাশ্মীরের সাহায্যে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই বৈঠক থেকে চলে যাবার পর প্রথম যে কাজ নেহরু করেছেন, সেটা হলো লিয়াকৎকে টেলিগ্রামে ভারত গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা।

এর পরে জিন্না আবার তাঁর বিবৃতির কথাই উত্থাপন করলেন। বিবৃতিতে তিনি যা বলেছেন, তাই আবার জোর দিয়ে বললেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আইন-সম্মত নয়। প্রতারণার জোরে, অস্ত্রের জোরে কাশ্মীরকে ভারত গ্রাস করেছে, ইত্যাদি।

জিন্না জানালেন, পাকিস্থান কখনই কাশ্মীরের এই ভারতভুক্তি বৈধ ব্যাপার বলে স্বীকার ক'রে নেবে না।

মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্নার আলোচনা এর পর একই যুক্তি ও বক্তব্যের চক্রে শুধু আবর্তিত হতে থাকে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, হ্যাঁ, জবরদস্তি এবং অস্ত্রবলের হিংসাই কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সে জবরদস্তি ও অস্ত্রবলের হিংসা এসেছে উপজাতীয়দের কাছ থেকে। উপজাতীয়দের এই অপরাধের জন্য দায়ী পাকিস্থান, ভারত নয়।

এর উত্তরে জিন্না বলেন যে, তাঁর মতে ভারতই অস্ত্রবলে জবরদস্তির অপরাধে অপরাধী, কারণ ভারতই কাশ্মীরে সৈন্য পাঠিয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেনও প্রত্যুত্তরে বলেন, অস্ত্রবলে অত্যাচার ও হিংসার কাজ একমাত্র উপজাতীয়েরাই করেছে। যেখানে উপজাতীয় হানাদার ঢুকেছে, সেখানেই হিংস্রব্যাপার ঘটেছে।

এইভাবেই দুজনে তাঁদের বক্তব্যের জের টেনে চললেন। এর পর জিন্না আর তাঁর রাগ চাপা রাখতে পারলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তিগুলিকে নিতান্ত এক-রোখা বিবেচনাহীনতার প্রমাণ বলেই তিনি মনে করলেন এবং সেকথা বলেই ফেললেন।

শ্রীনগরে ভারত গভর্নমেণ্ট এরই মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্যবল উপস্থিত করতে পেরেছেন, তার শক্তি ও সামর্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে আভাস দিলেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীনগরে ভারত গভর্নমেণ্ট কতখানি সামরিক সংহতি ও সৈন্য সন্নিবেশ ক'রে ফেলতে পারবেন, সে সম্বন্ধেও জিন্নাকে কিছু কিছু আভাস দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিনি জিন্নাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, উপজাতীয় হানাদারেরা যতই সংখ্যাবৃদ্ধি আর শক্তিবৃদ্ধি ক'রে যত বেশি সুসংহত হয়ে উঠুক না কেন, এখন তাদের পক্ষে শ্রীনগরে প্রবেশ করার কোনই আশা নেই। সে সুযোগ অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

একথা শুনে জিন্না চিন্তা করলেন, এবং শেষে প্রস্তাব করলেন—তা'হলে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, দুই পক্ষই অবিলম্বে এবং একই সময়ে তাদের নিজ নিজ সৈন্য কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

মাউণ্টব্যাটেন এইবার চেপে ধরলেন জিন্নাকে—উপজাতীয় হানাদারদের আপনি সরিয়ে আনবেন কি ক'রে? হানাদারদের সঙ্গে পাক-গভর্নমেণ্টের কি সম্পর্ক? তারা আপনার গভর্নমেণ্টের নির্দেশ শুনবেই বা কেন?

মাউণ্টব্যাটেন যখন এইভাবে প্রশ্ন ক'রে জিন্নাকে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে বললেন, তখন জিন্না সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা অনুরোধ ক'রে বসলেন। জিন্না বললেন,—'আপনি যদি ঐ ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন, তবে আমিও আমার দিকের সব ব্যাপার বন্ধ ক'রে দেব।'

অর্থাৎ, কাশ্মীরে যারা আক্রমণ চালিয়েছে, সেই উপজাতীয়দের উপর পাকিস্থানের কোন প্রভাব নেই, এ অভিযান বন্ধ করার কোন ক্ষমতা পাকিস্থানের নেই—এই যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্থান যে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, সেটা পাকিস্থান বন্ধ করবেন। আলোচনার ক্ষেত্রেও ঐ প্রচারমূলক যুক্তিগুলিকে পাকিস্থান খুব বেশি উত্থাপন করবেন না। জিন্না যা বলতে চাইছেন, তার এই হলো অর্থ।

প্রশ্ন ক'রে জিন্নার মনের কথা যতটুকু জানতে পেরেছিলেন, তাতে মাউণ্টব্যাটেন এই বুঝলেন যে, কাশ্মীরের গণভোটের সম্বন্ধে জিন্নার মনে কতগুলি কঠিন দ্বিধা ও প্রশ্ন আছে। যতক্ষণ ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে থাকবে এবং শেখ আবদুল্লা থাকবেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের প্রধান পরিচালক হয়ে, ততক্ষণ কাশ্মীরের মুসলমান নির্ভয়চিত্তে পাকিস্থানে যোগ দেবার পক্ষে ভোট দিতে পারবে না, জিন্নার এই বিশ্বাস।

মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিচালনায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক।

জিন্না আপত্তি ক'রে বললেন—না, তার বদলে দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেলেরই সম্মিলিতভাবে মিলে গণভোটের ব্যবস্থা ও উদ্যোগ পরিচালনা করা উচিত।

মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন যে, নিজের রাষ্ট্রে গভর্নর-জেনারেল জিন্নার যতটা ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার আছে, ভারত রাষ্ট্রে গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের ততটা ক্ষমতা ও অধিকার নেই। নিয়মতন্ত্র অনুসারে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর মন্ত্রিসভা তথা গভর্নমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে কাজ ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না।

জিন্নার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত দৈবের উপর ভরসা ক'রেই তিনি বসে আছেন। বার বার সেই একই কথা তিনি আবৃত্তি ক'রে

চলেছেন, ভারতের হাতে কিভাবে কত নিগ্রহ পাকিস্থানকে ভুগতে হচ্ছে, এই এক-ঘেয়ে এক নির্যাতনের কাহিনী। তিনি যে জাতি তৈরী করলেন, সেই জাতিকে ভারত ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই সংশয় জিন্নার সমস্ত চিন্তা ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। ভারতের যে কোন ব্যক্তিকে অথবা ভারত সরকারের যে কোন নীতিকে এই সংশয়ের চোখ ছাড়া অন্য কোন চোখে, স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে বা বুঝতে পারছেন না জিন্না। মাউণ্টব্যাটেন এবং ইস্‌মে যতক্ষণ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করলেন, প্রত্যেক প্রসঙ্গে তাঁরা দু'জনেই জিন্নাকে বার বার এই সংশয় দূর করার জন্য বললেন।

মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার মনের এই সংশয় দূর করতে বিশেষ কিছু সফল হয়েছেন বলে মনে হয় না। যাই হোক, আলোচনার পর যখন জিন্নার কাছ থেকে বিদায় নিলেন মাউণ্টব্যাটেন, তখন সে দৃশ্যটা বন্ধুবিদায়ের দৃশ্যের মতোই লাগছিল দেখতে, অন্তত উপরে উপরে।

মাউণ্টব্যাটেন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, ২৭শে অক্টোবর তারিখে ভারত হতে শ্রীনগরে ভারতীয় সৈন্য যেভাবে বিমানবাহিত হয়ে এবং যে সময়ের মধ্যে কাশ্মীরে গিয়ে সৈন্যবিন্যাস ক'রে ফেলেছে, সামরিক ইতিহাসে সে ঘটনার তুলনা বিরল। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, আমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের অভিজ্ঞতায় আমি অনেক সামরিক দক্ষতার উদাহরণ দেখেছি। কিন্তু বিমানবাহিত ভারতীয় সৈন্যের কাশ্মীরের ভূমিতে অবতরণ ও রক্ষাযুদ্ধের উদ্যোগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের সামরিক কীর্তিকে দক্ষতায় ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই ব্যাপার দেখেই জিন্না চমকে উঠেছেন। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর রক্ষার উদ্যোগে এমন অত্যদ্ভুত দক্ষতা ও সাফল্যের প্রমাণ দেবে, এটা জিন্নার কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত ও অকল্পনীয় ছিল। এই ঘটনাই জিন্নার মনের সব হিসাব আর পরি-কল্পনাকে এলোমেলো ক'রে দিয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেনের মনে একটা আশার ভাব ছিল এবং তিনি বিশ্বাসও করতেন যে, মতভেদের কারণে জিন্নার ও তাঁর মধ্যে যে মনের ব্যবধান ঘটেছে, সেটা ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনায় স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারা গিয়েছে যে, ব্যবধান কমেনি, বরং আরও বড় হয়ে উঠেছে। মতভেদ তীব্রতর হয়ে মতবিরোধে পরিণত হয়েছে। জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যে সাক্ষাৎ আলোচনা সেদিন হয়ে গেল, তাতেও এই ব্যবধানের কিছুই কমেনি। মাউণ্টব্যাটেনের সম্বন্ধে জিন্না কতগুলি ধারণা ক'রে বসে আছেন, এবং এই ধারণাগুলি দিয়েই তিনি মাউণ্টব্যাটেনের সব কাজ ও মনোভাবের তাৎপর্য বিচার করছেন। জিন্না এখনো মনে করছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজের প্রতিভূস্বরূপ রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার মাউণ্ট-ব্যাটেনের হাতে এখনো রয়ে গিয়েছে। এই ধারণা থেকেই জিন্নার মনে স্বাভাবিকভাবেই আর একটি ধারণা সম্ভবত হয়েছে যে, কাশ্মীর মহারাজার ভারতভুক্তির স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন মহারাজাকে যে পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্রের আসল রচয়িতা স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন। জিন্নার ধারণা, মাউণ্টব্যাটেনই প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের সব কাজ ও কাজের চেষ্টার পথ দেখাচ্ছেন, ভারতের সব রাজনৈতিক উদ্যোগের পিছনে মাউণ্টব্যাটেনের হাত রয়েছে। ভারত হতে বিমানবাহিত ভারতীয় সৈন্য যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে শ্রীনগরে অবতরণ করেছে, সেই সামরিক কৃতিত্বের পিছনেও রয়েছে মাউণ্টব্যাটেনেরই পরিচালন প্রতিভা। মাউণ্টব্যাটেনই এইভাবে ভারতের সব

রাজনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টাকে প্রেরণা দিয়ে পাকিস্থানের স্বার্থ ও আশাভরসাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিচ্ছেন, সম্ভবত এই ধারণায় জিন্নার মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

এটা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, জিন্না সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের প্রস্তাব যেদিন দুই পক্ষ স্বীকার ক'রে নিলেন, সেই দিন থেকে ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের সব চেষ্টার মধ্যে এই একটি মূল ইচ্ছা কাজ করেছে যে, নিকটভবিষ্যতে যে দু'টি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, সে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যেন পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে ও উন্নততর হয়। ব্যক্তিগত খ্যাতি-অখ্যাতির ব্যাপারে জিন্নার মন নির্বিকার বা উদাসীন নয়। ব্যক্তিগত সুনামের মূল্যকে জিন্নাও উপেক্ষা করেন না। সুতরাং এটা ভাবতে অদ্ভুত লাগে, নিজের ব্যক্তিগত সুনাম রক্ষায় মাউণ্টব্যাটেনের মনে কোন আগ্রহ নেই, এমন ধারণাকেও জিন্না কেমন ক'রে মনের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন। ৩রা জুনের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে গিয়ে যদি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিদ্বেষ ও বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে ব্যাপারকে মাউণ্টব্যাটেন যে তাঁরই ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও অখ্যাতির বিষয় বলে মনে করবেন, একথা জিন্নার মনে হয় না কেন?

কাশ্মীরের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য ক'রেই জিন্নার মনে এই ধারণা বিশেষ দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং তাতেই তিনি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কাশ্মীরের কথা ছেড়ে দিয়েও জিন্না সম্ভবত এ ধারণা করতে পারেননি যে, বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেত্রে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের কাজ ও মনোভাবের উপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, সে ক্ষমতা হলো অন্য ধরনের ক্ষমতা। ভারতের কোন সমস্যার ব্যাপারে ভারত যেন হঠাৎ কিছু ক'রে না বসে, পরামর্শ দিয়ে এই প্রয়োজনের উপযোগী শান্ত মনোভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা মাউণ্টব্যাটেনের আছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বা মতামতের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে মীমাংসায় উপনীত হতে ভারতকে সাহায্য করার ক্ষমতা মাউণ্টব্যাটেনের আছে। কিন্তু আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে জিন্নার মনের ধারণা ভিন্ন রকমের। গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা কতখানি থাকা উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণার পরিচয় তখনই পাওয়া গিয়েছে, যখন তিনি স্বাধীনতা আইনের নির্দেশের সাহায্য নিয়ে অবিলম্বে 'বিশেষ ক্ষমতা'র অধিকারী হতে দ্বিধা করলেন না।

মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না, দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেল, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যদিও পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এখনো রয়েছে, কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে তার কোন সার্থকতা দেখা যাচ্ছে না, কারণ জিন্না এখন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কূটপন্থার সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন।* জিন্নার মনে সন্দেহ ও সংশয় যেমন গভীরতর হয়ে উঠেছে, তেমনি তিনি মনকে

* মাউণ্টব্যাটেনের উপর জিন্নার শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ সম্প্রতি আমি পেয়েছি। জিন্নারই বন্ধুস্থানীয় হন, এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকেই আমি সম্প্রতি সে কথা জানতে পেরেছি! এ'র কাছ থেকে জানলাম, মৃত্যুর পূর্বে জিন্না বলেছিলেন—'জীবনে আমি এপর্যন্ত যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই ব্যক্তিত্ব আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনকে যেদিন আমি প্রথম দেখলাম, মনে হলো আমি একটা স্বর্গীয় জ্যোতি দেখছি।' জিন্না একথাও বলতেন যে, যতদিন মাউণ্টব্যাটেন ভারতে ছিলেন, সে সময়ের কোন একটি মুহূর্তেও তিনি মাউণ্টব্যাটেনের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেননি।

কঠোরতর ক'রে উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা খ‍ুঁজছেন। কিন্তু জিন্নার এই ধরনের মন, মনের সংশয় ও বিচারব‍ুদ্ধির রহস্য অথবা তাৎপর্য বোঝবার সাধ্যি মাউণ্টব্যাটেনের নেই।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৩রা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : কাশ্মীর-সঙ্কটের সংবাদই এখন লোকের চিন্তা অধিকার ক'রে রয়েছে। হায়দরাবাদ সম্পর্কে কৌত‍ূহল চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তার জন্য হায়দরাবাদের ঘটনা অবশ্য থেমে যায়নি। গত কালই হায়দরাবাদী ডেলিগেশন দিল্লী এসে পেঁাছেছেন। স্বাধীনতা দিবসের আড়াই মাস পরেও হায়দরাবাদ থেকে শ‍ুধ‍ু ডেলিগেশন আসছে। ভারত-নিজাম মতভেদের সমস্যা যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থায় রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন আরও বেশি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, এবার যে ডেলিগেশন এসেছে, তার সব সদস্যই নতুন। তিনটি নতুন ম‍ুখ দেখতে পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। ডেলিগেশনের এই তিন-সদস্যের নেতা হয়ে এসেছেন মোইন নওয়াজ জঙ্গ, যিনি হলেন ইত্তেহাদ দলেরই একজন জবরদস্ত নেতা।

এর মধ্যে ইস‍্মে ও আমি যখন লণ্ডনে গিয়েছিলাম, সেই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন একটা সমাধানের স‍ূত্র রচনার জন্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের দাবী হলো 'রাষ্ট্রভুক্তি', এবং নিজামের দাবী হলো 'সম্পর্ক-স্থাপন'। এই দ‍ুই প্রস্তাবিত দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় কি না, তার জন্য একটা ফরম‍ুলা উদ্ভাবনের প্রয়াস করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। পার্চমেণ্টের মস্ত বড় একটা শীটের উপর হাতে-লেখা অক্ষরে প‍ুরনো কালের কেতাবী বাক্যরীতির ঘটা স‍ৃষ্টি ক'রে একটা চুক্তিপত্র রচনা করেছিলেন নিজামের ডেলিগেশন। এ হেন চুক্তিপত্রকেও স‍ুপারিশ করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন, কারণ এ চুক্তিপত্রের মধ্যে এমন ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল যেগ‍ুলি সর্দার প্যাটেলের কাছে বস্তুত রাষ্ট্রভুক্তির ব্যবস্থা বলেই মনে হবে, এবং 'অতিরিক্ত মহামান্য' নিজামও মনে করবেন যে তিনি ভারতের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা-সম্মত 'সম্পর্ক' মাত্র স্থাপন করছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের আর একটা বিশ্বাস ছিল যে, যতদিন মঙ্কটন নিজামের উপদেষ্টা হয়ে হায়দরাবাদে রয়েছেন, ততদিন চেষ্টা করলে নিজামকে আধ‍ুনিক য‍ুগের রীতি-নীতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভবপর হবে। তাই তিনি ভি পি'কে একবার হায়দরাবাদ পাঠাতে ইচ্ছা করলেন, যাতে ভি পি সেখানে উপস্থিত থেকে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। অনেক চেষ্টা ক'রে এ প্রস্তাবে নিজামের সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু ঠিক যেদিন ভি পি'র হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে যাবার কথা, সেই দিনই নিজামের কাছ থেকে ভারত গভর্ন-মেণ্টের দপ্তরে বার্তা এসে পেঁাছলো—প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, নিজাম। নিজামের বক্তব্য, ভি পি এই সময় হায়দরাবাদে এলে বিক্ষোভ দেখা দেবে।

যে ভাষায় নিজাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্যাটেল যে ভাষায় এই প্রত্যাখ্যানের উত্তর নিজামকে জানিয়েছেন, দ‍ুই-ই এমন মাত্রাছাড়া রকমের হয়েছে যে, দ‍ু'পক্ষই অপমান বোধ না ক'রে পারবেন না এবং আলোচনার সমাধি এখানেই হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

অবস্থা ঠিক যখন এতদ‍ূর এসে গড়ালো, তখন মাউণ্টব্যাটেন আবার মঙ্কটনকে দিল্লী আসবার জন্য পত্র দিলেন। দিল্লীতে এসে মঙ্কটন ১০ই অক্টোবর তারিখে ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে এক স্থিতাবস্থা চুক্তির প্রস্তাব করলেন। এই স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ হবে এক বৎসর। এই চুক্তির বলে নিজামের 'অতিরিক্ত মহামান্য'

মর্যাদা ও গদির গৌরব প্রতীকী অর্থে অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং রাজনৈতিক অর্থে ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদ রাজ্যে সেই সুবিধাগুলিই পেতে থাকবেন, একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে হায়দরাবাদ ভারতের রাষ্ট্রভুক্ত হলে যে সুবিধাগুলি ভারত গভর্নমেণ্ট পেতেন। মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে, মঙ্কটনের এই ফরমুলা অনুযায়ী স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা করবার সময়সীমা আর একটু বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এর আগে ভারত গভর্নমেণ্ট দু'মাসের সময় মঞ্জুর করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধ রক্ষা করলেন গভর্নমেণ্ট।

কিন্তু এর পরেই আবার আরম্ভ হলো অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং দুঃসহ এক দরাদরির পালা। আলোচনার সমাধি হবার উপক্রম আবার দেখা দিল। কিন্তু ২২শে অক্টোবর তারিখে সর্তের নানারকম রদবদল করার পরে স্থিতাবস্থা চুক্তির একটা খসড়া তৈরী হলো। ভি পি মেনন এবং নিজামের ডেলিগেশন, উভয় পক্ষই এই খসড়া চুক্তি অনুমোদন করলেন।

ডেলিগেশন সেই সন্ধ্যাতেই হায়দরাবাদে ফিরে গিয়ে নিজামের কাছে খসড়া চুক্তিপত্রটি দাখিল করলেন। চুক্তিপত্রের দিকে নিজাম একবার চোখ তুলে তাকালেনও না, শুধু এই ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তিনি এই দলিল তাঁর শাসনকর্ম পরিষদের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

নিজামের পরিষদ ডেলিগেশনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে চুক্তিপত্রের প্রত্যেকটি নির্দেশ তিনদিন ধরে পরীক্ষা ক'রে এবং বুঝে বুঝে, তার পরে ২৫শে অক্টোবর তারিখে একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছলেন। পরিষদের ছয়জন সদস্য স্থিতাবস্থা চুক্তির পক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে ভোট দিলেন। আর কোন রদবদল না ক'রে এবং আর দেরি না ক'রে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করার জন্যই নিজামকে অনুরোধ করলেন পরিষদ।

ডেলিগেশনও নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ভোটের ফলাফল জানিয়ে দিলেন। নিজামও চুক্তিপত্রে সম্মতি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পরের দিন নিজাম এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দু'টি আনুষঙ্গিক পত্র রচনা করলেন। একটি পত্রে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হায়দরাবাদ কখনই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর একটি পত্রে এই মন্তব্য করলেন যে, ভারত যদি ভবিষ্যতে কখনো কমনওয়েলথের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, তবে এ চুক্তি রক্ষা করা বা মেনে চলবার জন্য তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

সন্ধ্যাবেলা ডেলিগেশন নিজামের কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত দলিল চাইলেন, কারণ পরের দিন সকালেই তাঁদের দিল্লী রওনা হতে হবে। কিন্তু নিজাম চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করলেন না। তিনি বললেন—আজকের রাতটা কেটে যাক, তারপর সই করব। কেন তিনি রাত্রিবেলা সই করবেন না, তার কোন যুক্তিও দেখালেন না নিজাম।

তখনো ভোর হয়নি, রাত্রিশেষে ঠিক তিনটার সময় হায়দরাবাদ শহরের প্রায় বিশ হাজার লোকের একটা ভিড় পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি অট্টালিকাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। ছত্তারীর নবাব, মঙ্কটন এবং স্যার সুলতান আহমদের বাসভবনের চারদিকে শেষরাত্রির অন্ধকারে বিরাট জনতার ব্যূহ রচিত হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে এক একটা লাউড স্পীকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিল, কোন হাঙ্গামা ও গোলমাল কেউ করো না। শুধু নজর রাখ, ডেলিগেশনের তিন সদস্য যেন ঘর থেকে বের হতে না পারে।

কোথাও পুলিশের কোন চিহ্ন ছিল না এবং পুলিশ শেষ পর্যন্ত দেখাও দিল না। সকাল পাঁচ ঘটিকার সময় ছত্তারী কোন মতে সামরিক কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সংবাদ পাঠাতে সমর্থ হলেন। তারপর সামরিক বিভাগের লোকজন এসে ডেলিগেশনের তিন সদস্য এবং লেডি মঙ্কটনকে উদ্ধার ক'রে এবং পাহারা দিয়ে জনৈক হায়দরাবাদী সামরিক অফিসারের গৃহে নিরাপদে নিয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় স্বয়ং নিজাম এক নির্দেশবাণী লিখে ডেলিগেশনের তিন সদস্যকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন অন্তত কিছুদিনের মতো কেউ যেন আর দিল্লী না যান। মাউণ্টব্যাটেনকে এক টেলিগ্রামে নিজাম জানিয়ে দিলেন যে, একটা 'অপ্রত্যাশিত অবস্থা' দেখা দেওয়ায় ডেলিগেশন এখন আর দিল্লী যেতে পারলেন না। "আমি বিশ্বাস করি, গভর্নর-জেনারেল কিছু মনে করবেন না।" নিজাম একথাও জানালেন যে, আগামী বৃহস্পতিবার অথবা বড় জোর শুক্রবার ডেলিগেশন অবশ্যই দিল্লীতে উপস্থিত হবেন।

নিজামের টেলিগ্রাম পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং বিশ্বাসও করেছিলেন যে আর কয়েকদিন পরে হায়দরাবাদী ডেলিগেশন চুক্তির সুসংবাদ নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হবেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে ডেলিগেশন তখন হায়দরাবাদের এক সামরিক অফিসারের গৃহে আত্মনিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

২৭শে তারিখে নিজাম ডেলিগেশনকে ডেকে পাঠালেন। নিজাম ডেলিগেশনকে সুস্পষ্টভাবেই বললেন যে, পরিষদের সিদ্ধান্ত তিনি সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করেন। অবস্থার সব দিক একটু বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্যই তিনি চুক্তিপত্র সই করতে দেরি করছেন। এই কারণেই ডেলিগেশনকে এখনই দিল্লী না গিয়ে কয়েকদিন হায়দরাবাদেই থাকতে তিনি বলেছেন। রেজভি ও তার ইত্তেহাদ দলের খুব নিন্দা করলেন নিজাম। নিজাম বললেন, ডেলিগেশনের দিল্লী যাত্রা বন্ধ করার জন্য তাঁদের ঘরের ভিতর আটক ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে যে কাণ্ড সেদিন হয়ে গেল, তার জন্য রেজভিই দায়ী। ওটা রেজভিরই কীর্তি। নিজাম জানালেন, তিনি রেজভিকে এই চুক্তি সমর্থন করতে বাধ্য করবেন।

পরের দিন সকালবেলায় ডেলিগেশন আর একবার নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সময় রেজভিকেও সেখানে ডেকে পাঠালেন নিজাম। আলোচনাও হলো। কিন্তু দেখা গেল যে, রেজভিকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করা দূরে থাক নিজামই রেজভির কথার প্রভাবে মত পরিবর্তন ক'রে বসলেন। রেজভি বললেন, এই চুক্তির অর্থ হায়দরাবাদের মৃত্যু। এ চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করার অর্থ হায়দরাবাদকে হত্যা করা।

রেজভি বললেন, এখন একেবারে নতুন ক'রে ভারতের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করতে হবে, নতুন রকমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। ভারত গভর্নমেণ্ট এখন অন্যদিকে নানারকম হাঙ্গামায়, সমস্যায় ও ঘটনায় বিব্রত। এই হলো হায়দরাবাদের পক্ষে উপযুক্ত সময়। রেজভি প্রস্তাব করলেন যে, বর্তমান ডেলিগেশনকে দিয়ে কাজ হবে না, এ'দের বাদ দিয়ে নতুন তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে নতুন ডেলিগেশন গঠন করতে হবে। রেজভি আরও স্পষ্ট ক'রে তাঁর প্রস্তাবের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন। রেজভি দাবী করলেন—পরিষদের যে তিনজন সদস্য চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, সেই তিনজন সদস্যকে নিয়েই নতুন ডেলিগেশন গঠন করতে হবে।

মঙ্কটন, ছত্তারী এবং আহমদ—তিনজনেই নিজামকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এরকম কোন ব্যাপার হলে ফল খুবই খারাপ হবে। এভাবে নতুন ডেলিগেশন গঠন করা কাজের দিক দিয়েও একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও খেয়ালী ব্যাপারমাত্র হবে।

কিন্তু তিনজনেরই সব অনুরোধ এবং যুক্তি বিফল হলো। জয়ী হলো রেজভির প্রস্তাব। ছত্তারী, মঙ্কটন ও আহমদ পদত্যাগ করলেন।

৩০শে অক্টোবরে মঙ্কটন রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডনের উদ্দেশে এবং স্যার সুলতান আহমদ দিল্লীর উদ্দেশে। রওনা হবার আগে নিজামের সঙ্গে দুজনেরই সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিদায় নেবার সময় স্যার সুলতান তাঁর প্রাক্তন প্রভু নিজামকে একটি কথা বলে দিলেন—'আপনি যে ব্যাপার করলেন, তাতে আপনার টাকারও শেষ হবে, আপনিও শেষ হবেন।'

নিজাম এক টেলিগ্রাম ক'রে মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, 'রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন' ঘটায় পুরনো ডেলিগেশন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে নতুন তিন প্রতিনিধিকে নিয়ে এক নতুন ডেলিগেশন গঠন করা হয়েছে। মোইন নওয়াজ জঙ্গ এই নতুন ডেলিগেশনের চেয়ারম্যান। ছত্তারীর বদলে মীর লায়েক আলি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। মোইন নওয়াজ হলেন মীর লায়েক আলির ভগ্নীপতি। মীর লায়েক আলি গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্থানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন।

হায়দরাবাদের ঘটনাবলীর প্রকৃতি ও পদ্ধতি লক্ষ্য করলে এ সন্দেহ না হয়ে পারে না যে, হায়দরাবাদ পাকিস্থানের পক্ষভুক্ত হবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। লাহোরের বৈঠকে জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যখন দেখা হলো, তখন মাউণ্ট-ব্যাটেন খোলাখুলিভাবেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। জিন্না বললেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এবং পরে হায়দরাবাদের সঙ্গে করাচীর একটা 'সাধারণ যোগা-যোগ' বরাবরই ছিল এবং রয়েছে। কিন্তু জিন্না খুবই জোর দিয়েই বললেন যে, নিজাম কেন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন সেটা নিজামই জানেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। জিন্না বললেন, কোন রকম চুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে নিজামের সঙ্গে কোন আলোচনা তাঁর হয়নি।

হায়দরাবাদের নতুন 'রাজনৈতিক অবস্থার' এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই অবস্থারই মুখপাত্র হয়ে গতকাল নতুন হায়দরাবাদী ডেলিগেশন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দিল্লী পৌঁছেছেন।

একটা বড়রকমের সংকল্পের কথা ঘোষণা ক'রে মোইন নওয়াজ আলোচনা আরম্ভ করলেন। মোইন বললেন—নিজামের ইচ্ছা, হায়দরাবাদ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। ভারত ও পাকিস্থান দুই ডোমিনিয়নের সঙ্গেই এই স্বাধীন হায়দরাবাদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলবে। হায়দরাবাদ যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবেন সেটা অবশ্য মোটামুটি ভারতের বৈদেশিক নীতির অনুরূপ হবে এবং এবিষয়ে ভারতের সঙ্গে একটা মিল রাখতেই নিজাম ইচ্ছা করেন।

মোইন নওয়াজ ও তাঁর ডেলিগেশনের সঙ্গে আলোচনায় অত্যন্ত শক্ত মনোভাব গ্রহণ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। বাজে কথার কোন প্রশ্রয়ই তিনি দিলেন না। মাউণ্ট-ব্যাটেন বললেন, বিগত কয়েক বৎসর ধরে বহু আন্তর্জাতিক আলোচনায় তিনি যোগদান করেছেন এবং বহু সমস্যাপূর্ণ ও জটিল রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। কিন্তু হায়দরাবাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা

দেখলেন, সেরকম অদ্ভুত ব্যাপার তিনি আজ পর্যন্ত কোথাও হতে দেখেননি। খেয়াল ও মরজি অনুসারে যখন যা ইচ্ছা তাই করবার এরকম চেষ্টার উদাহরণ বিরল। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিবেচনা ও পরীক্ষা ক'রে যে প্রস্তাব এর আগেই একপক্ষ চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই প্রস্তাব নিয়েই হায়দরাবাদ আবার 'আলোচনার' জন্য উপস্থিত হয়েছেন—নিতান্তই বিসদৃশ ও বিচিত্র ব্যাপার।

মাউণ্টব্যাটেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিজামের এই 'ডিগবাজির' আগে, পূর্বের ডেলিগেশন দিল্লীতে এসে আলোচনা ক'রে স্থিতাবস্থা চুক্তির যে চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন এবং যে খসড়া নিজামের পরিষদ অনুমোদন করেছেন, একমাত্র সেই খসড়াই ভারত গভর্নমেণ্ট এখন অনুমোদন করতে রাজি আছেন। নিজাম যদি তাঁর নিজেরই গৃহীত সিদ্ধান্ত বার বার অস্বীকার করতে থাকেন, তা'হলে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার পরিসমাপ্তি চূড়ান্তভাবেই হয়ে যাবে। আলোচনার সুযোগ ও পদ্ধতি ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্য স্বয়ং নিজামই দায়ী হবেন এবং পৃথিবীর কাছে নিজামের এই আচরণের কাহিনী ভারত পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দেবেন।

আজ হিজ হাইনেস অব বিকানীরের সঙ্গে খানাপিনা হলো। জবররকমের খানার উপসংহার করা হলো আশি বছরের পুরনো ব্র্যাণ্ডি দিয়ে। মহারাজা বললেন, তাঁর পিতা মহাশয় পঞ্চাশ বছর ধরে এই ব্র্যাণ্ডি পুষে রেখেছিলেন। রাষ্ট্রভুক্তির উদ্যোগে মহারাজা কিভাবে কতটুকু চেষ্টা করেছিলেন, তারই বৃত্তান্ত শোনালেন। তিনি বললেন, এই বছরেরই ৭ই, ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই দিল্লীতে, তাঁর এই বিকানীর হাউসে বসেই নেহরুর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল এবং এই আলোচনার মধ্যেই রাষ্ট্রভুক্তির নীতি প্রথম রূপ গ্রহণ করে। ভোপাল তখন গোপনে অন্য রকমের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য নানা চেষ্টা করছিলেন।

বিকানীর আমাকে বললেন, এবিষয়ে তাঁর কোনই সন্দেহ নেই যে, দেশীয় রাজ্য-গুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হলে নতুন ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে শক্তিশালী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক শাসকের মর্যাদা গ্রহণ ক'রে দেশীয় রাজন্যদের সন্তুষ্ট থাকা অবশ্যই কর্তব্য। তিনি বললেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে নিয়েই একটা সমস্যায় পড়তে হবে। এই নতুন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কিভাবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে একটা সঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে রাখা যেতে পারে, সেটাই সমস্যা।

মাউণ্টব্যাটেনের অনেক প্রশংসা করলেন বিকানীর,—'মাউণ্টব্যাটেন আমার ছেলে-বেলার বন্ধু। যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনা এবং সমস্যার মধ্যে সমাধানের পথ আবিষ্কারের বিশেষ ক্ষমতা আছে মাউণ্টব্যাটেনের।' তাছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব। বিকানীর বললেন, মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই সংকট জয় করতে পেরেছেন।

একটা কথা উল্লেখ না ক'রে পারি না, বিকানীরের মহারাজার সহজ বাস্তববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর দেওয়ান পানিক্করের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা। যে সময় ভারতের অন্যান্য সব রাজন্য তাঁদের অনৈক্য মতভেদ ও উদ্‌ভ্রান্তির জন্য কোন সিদ্ধান্তেই পোঁছতে না পেরে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনছিলেন, সেই সময় বিকানীরের মহারাজা ও পানিক্করের বিবেচনা এবং চেষ্টার ফলেই পুরাতন ও নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা সংযোগের সূত্র আবিষ্কৃত হতে পেরেছিল।

নেহরু বেতারে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় একটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিচালনায় কাশ্মীরে গণ-

ভোট গ্রহণ করা যেতে পারে, একথা নেহরু বলেছেন। এই প্রস্তাবই মাউণ্টব্যাটেন গত শনিবারে জিন্নার কাছে উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটির মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত অভিনবত্ব ছিল না এবং প্রস্তাবটি সর্বদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু জিন্না তবুও যে গণভোটের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন, তার কারণ এই নয় যে, তিনি গণভোট গ্রহণের ব্যাপারটাই পছন্দ করেন না। তাঁর আপত্তি ছিল কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থিতির বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য—ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে রয়েছে, এই অবস্থার মধ্যে গণভোট গৃহীত হলে সে গণভোট কখনই স্বচ্ছন্দ হবে না, এবং পক্ষপাতিত্বের দোষ থেকেও মুক্ত থাকতে পারবে না।

প্যাটেল এবং নেহরু দু'জনেরই মনে সম্ভবত এই ধারণা হয়েছে যে, শীতকালে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। যে কারণেই হোক, গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে, এই ধারণা তাঁদের হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পন্থাটিকে যেভাবে বিবেচনা করার ব্যাপার চলছে, তার মধ্যে একটা অবাস্তবতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, প্রশ্নটাকে যেন সকলে নিজেদের মনের ইচ্ছামতো একটু সহজ ক'রে নিয়েই বিচার করছেন। কাশ্মীরের মতো বিস্তৃত এক ভূখণ্ড যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, এবং যেখানে যুদ্ধ চলছে, সেখানে সমস্যা সমাধানের জন্য এমন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিতে কোন কাজ হতে পারে না, যে-ব্যবস্থা অতি দ্রুত ও অবিলম্বে না হয়ে দূরবর্তী ভবিষ্যতেই শুধু সম্ভবপর হতে পারে। মাউণ্টব্যাটেন ভাবছিলেন, দূর ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত করা হবে, এমন কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার সময় এটাও চিন্তা ক'রে দেখতে হবে যে, তত দিনে যুদ্ধ ও যুদ্ধের গতি কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থা ও ঘটনাকে কোন্ জটিলতার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। মাউণ্টব্যাটেন এই সামরিক পরিস্থিতির দিকটাই ভাবছিলেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের একটা বৈঠক শীঘ্রই হবে এবং সে বৈঠকে লিয়াকৎও যোগদান করবেন। লক্ষ্য ক'রে আসছি, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের এক একটা বৈঠকের ঠিক প্রাক্কালে লিয়াকৎ তাঁর প্রতিপক্ষের উদ্দেশে এক একটা ভর্ৎসনা-বাণী ঘোষণা ক'রে থাকেন। এবারও তাই করলেন। এখন তিনি অসুস্থতার জন্য শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তবু এই অবস্থাতেই একটা বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি কুখ্যাত অমৃতসর সন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন*। লিয়াকৎ বলেছেন, কাশ্মীর রাজ্যের উপর মহারাজার অধিকার রীতিবিরুদ্ধ ও আইনবিরুদ্ধ। এই কারণেই কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য রাজ্যের বাইরের এক দল লোকের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লিয়াকৎ তাঁর বিবৃতিতে একথাও বললেন যে, যাঁরা কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের এই অভিযানকে 'উপজাতীয় আক্রমণ' আখ্যা দিচ্ছেন, তাঁরা একটা মিথ্যা ইতিহাস নতুন ক'রে রচনার চেষ্টা করছেন। আরও অভিযোগ করেছেন লিয়াকৎ—কাশ্মীরের কাপুরুষ মহারাজা ভারত গভর্নমেণ্টের সশস্ত্র সাহায্য নিয়ে কাশ্মীরী জনসাধারণের ভাগ্যের বিরুদ্ধে জালিয়াতী করেছেন। নেহরুর অসুস্থতার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন লিয়াকৎ, অর্থাৎ নেহরু লাহোরে না যাবার জন্যই

* ১৮৪৬ সালে এই সন্ধি অনুযায়ী লর্ড হার্ডিঞ্জ কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজার পূর্বপুরুষ গোলাব সিংকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দান করেন।

অজুহাত হিসাবে একটা অসুস্থতার খবর রটনা করেছেন। ভাবছি, এই ধরনের ভাষা কি 'বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা'র অনুকূল ভাষা?

প্যাটেল এবং বলদেব সম্প্রতি কাশ্মীরের যুদ্ধাঞ্চল থেকে ফিরেছেন। উভয়েই কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে দেশরক্ষা কমিটির কাছে উদ্বেগজনক বিবরণ প্রদান করলেন। কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, সবার আগে বরমূলা পুনরধিকার করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করতে হবে। উপজাতীয় হানাদারের দল তাদের প্রথম অভিযানের বেগে এগিয়ে এসে বরমূলা অধিকার ক'রে নিয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশপথে বরমূলা অবস্থিত। বরমূলাতে কিছুসংখ্যক ইওরোপীয় নরনারী হতাহত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক ব্রিটিশ প্রজারও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেলি এক্সপ্রেসের সিডনি স্মিথের পাত্তা নেই। এঁরা কোথাও আটক হয়ে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। কমিটি উপলব্ধি করেছেন, বরমূলা পুনরধিকার ক'রে ফেলতে পারলে উপত্যকার অভ্যন্তরে উপ-জাতীয়েরা সহজে আর ছড়িয়ে পড়বার পথ পাবে না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : জরুরি কমিটির বৈঠক। শান্তি-রক্ষায় পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা এবং সমালোচনা হলো। গোপালস্বামী এবং নিয়োগী, উভয়েই পূর্ব পাঞ্জাবের যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না। আর একটি বিষয় আলোচিত হলো —উদ্বাস্তু গরু-মহিষের সমস্যা। গুরগাঁও জেলা থেকে যেসব অধিবাসী ঘর ছেড়ে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে, তারা কতসংখ্যক গরু-মহিষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? কমিটির সদস্যেরা প্রস্তাব করলেন—প্রতি দশ ব্যক্তির এক একটি পরিবার একটি ক'রে গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—অতএব এই ব্যবস্থাই হলো যে, পরিবারে পাঁচজন লোক থাকলে আধখানা গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

গভর্নর-জেনারেলের বডিগার্ড দলের দ্বিতীয় কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁকে আজ আমরা সম্বর্ধনা জানিয়ে বিদায় দিলাম। সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করা হচ্ছে, তাই যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াকুব খাঁ করাচীর গভর্নমেণ্ট হাউসে চলে যাবেন বডিগার্ড দলের মুসলমান সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে রীস এবং ইস্‌মেও যোগদান করলেন। ইয়াকুব, রীস, ইস্‌মে ও আমি—মাত্র এই চারজনে মিলে বিদায়ভোজের টেবিলে গল্প করলাম।

ইস্‌মে বললেন, ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ আপত্তি করছেন যে নেহরুর কখনই লাহোরে যাওয়া উচিত নয়। নেহরুর লাহোর যাবার প্রস্তাবকে নেতারা চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাবার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন। ইস্‌মে বললেন— ভারতীয় নেতাদের আমার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে, রুজভেল্টও ইয়াল্টা গিয়েছিলেন।

জিন্নার নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। জিন্না বস্তুত তাঁর শেষ বয়সে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠাও বেশি দিনের ঘটনা নয়। ইস্‌মে বললেন, ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল উইলিংডনের সময়েও তিনি ভারতে কাজ করেছিলেন। সেই সময় জিন্নাকে কেউ প্রথম শ্রেণীর নেতা বলে মনে করতো না, কারণ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় নেতাহিসাবে গুরুত্বলাভ করার মতো

কোন প্রতিপত্তি এবং প্রভাবও সেসময় জিন্নার ছিল না। তখন কেউ ধারণাও করতে পারেননি যে, এই জিন্নাই ভবিষ্যতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা হয়ে উঠবেন।

ইস্‌মের কথা শুনে আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল। গতবার লণ্ডনে যখন ছিলাম তখন লেডি রীডিং-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিশ বছর আগের জিন্নার অবস্থার সম্পর্কে লেডি রীডিং সংক্ষেপে কয়েকটি কথার মধ্যে যে পরিচয়চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেটা এখনো আমার স্মরণে আছে। লেডি রীডিং বললেন—'আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন জিন্না শিকারসন্ধানী চিতাবাঘের মতো চারদিকে শুধু ছুটোছুটি ক'রেই ফিরতেন।'

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে এখানে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক হলো। জিন্না ও লিয়াকৎকে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন, কিন্তু দুজনের একজনও এলেন না। পাকিস্থানের পক্ষ থেকে এসেছেন যানবাহন মন্ত্রী নিশ্‌তার এবং গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারি জেনারেল মহম্মদ আলি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরু ও নিশ্‌তার একটি কক্ষে বসে 'রাজনৈতিকভাবে' এবং ভি পি মেনন ও মহম্মদ আলি আর এক কক্ষে বসে 'সরকারীভাবে' সমস্যার আলোচনা করলেন।

আলোচনার মতো সাধারণ বিষয়ক্ষেত্র অনেকগুলি পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যবস্থার কথা উঠতেই দুপক্ষের অভিমত পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠল। কাশ্মীর থেকে উভয় পক্ষেরই সৈন্য অপসারণ করা কর্তব্য, এবিষয়ে মতান্তর দেখা দিল না; কিন্তু কিভাবে অপসারণ করতে হবে? এখানেই যত মতভেদ। পাকিস্থান চাইছেন—দুই পক্ষই একই সময়ে নিজের নিজের সৈন্য দু'দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। ভারতের পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবেই দাবী করা হয়েছে—কাশ্মীর থেকে সমস্ত হানাদার অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত সৈন্য অপসারণ করতে পারবেন না।

ভারতবাসীর এই দাবীর জোরের পিছনে এখন একটা মনের জোরও দেখা দিয়েছে, কারণ কাশ্মীর থেকে এই সংবাদ এসে গিয়েছে যে, বরমুলা পুনরধিকার করা হয়ে গিয়েছে। গত মঙ্গলবার ভারতীয় বাহিনীকে বরমুলার দিকে সৈন্যচালনার যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে নির্দেশ সার্থক হয়েছে।

আগামীকাল মাউণ্টব্যাটেনের লণ্ডন রওনা হবার কথা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই যেতে পারবেন মাউণ্টব্যাটেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

জুনাগড় সমস্যা নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি ক'রেই চলেছে। গত সোমবারেই দেশরক্ষা কমিটির কাছে রিপোর্ট এসে গিয়েছে যে, ভারতীয় সৈন্য পয়লা নবেম্বর তারিখে মাংরোল এবং বাবরিয়াবাড়ে প্রবেশ করেছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই এ দুই রাজ্য পুনরধিকার করা হয়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্যাটেল জুনাগড় রাজ্য অধিকার করার প্রস্তাব আর উত্থাপন করবেন না। অন্যান্য বৃহত্তর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জুনাগড় অধিকার করার প্রস্তাব স্থগিত রাখতে প্যাটেল এখন খুশিমনেই রাজি হবেন বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

কিন্তু আজই বেলা একটার সময় জুনাগড়ের দেওয়ানের কাছ থেকে একটা অনুরোধ-পত্র উপস্থিত হলো। দেওয়ান লিখেছেন—জুনাগড় রাজ্য একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে পড়তে চলেছে। এই পরিণাম থেকে জুনাগড় রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য জুনাগড়ের সমগ্র দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্টকে গ্রহণ

করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যতদিন না জুনাগড়ের রাষ্ট্রভুক্তি সম্পর্কিত সকল জটিল প্রশ্নের একটা সঙ্গত সমাধান হয়ে যায়, ততদিন ভারত গভর্নমেণ্টকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

লিয়াকৎকেও একটি ভিন্ন পত্রে দেওয়ান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাজ্যের জনমত, রাজ্যের শাসন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এবং স্বয়ং নবাবের অভিমতে সমর্থিত হয়েই ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে এই প্রস্তাব তথা অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। দেওয়ান যে সময় ভারত সরকারের কাছে এই অনুরোধ-পত্র লিখেছেন, তার সামান্য কিছুক্ষণ আগেই নবাব জুনাগড় রাজ্য ছেড়ে বিমানযোগে করাচী চলে গিয়েছেন।

দেওয়ানের প্রস্তাবে সম্মত হতে এক মুহূর্তও দেরি করেননি ভারত গভর্নমেণ্ট। জুনাগড়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল ভার গ্রহণের জন্য তখনি রাজকোটের আঞ্চলিক কমিশনারের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

জুনাগড়ের সম্পর্কে এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, তার কোন খবরই মাউণ্টব্যাটেন জানতে পারেননি। সন্ধ্যা হবার পর মাউণ্টব্যাটেনকে জানানো হলো। এরকম ব্যাপার এই প্রথম হলো। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কিত কোন বড় রকমের কাজ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে গভর্নমেণ্ট কখনো করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, প্যাটেল এবং ভি পি-র ইচ্ছা অনুসারেই জুনাগড় সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ চাওয়া হয়নি। প্যাটেল ও ভি পি সম্ভবত মনে করেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে মাউণ্টব্যাটেন বিব্রত বোধ করবেন। তাই তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না ক'রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে আর একটা উদ্বেগজনক সংবাদ এসেছে হায়দরাবাদ থেকে। নিজামের প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের শুভেচ্ছার যেটুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, নিজাম যেন সেটুকুও নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার জন্য বেপরোয়া ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। চারদিন ধরে আলোচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন নিজামের নতুন ডেলিগেশনকে রাজি করাতে পেরেছিলেন যে, ডেলিগেশন এইবার হায়দরাবাদে ফিরে গিয়ে পূর্ব-রচিত স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন রদবদল না ক'রে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করবার জন্যই নিজামকে অনুরোধ করবেন। গত কাল ডেলিগেশন দিল্লী ছেড়ে হায়দরাবাদ চলে গিয়েছেন। এর পরেও নিজাম আবার সময় চাইছেন। মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনে যাচ্ছেন, এই ঘটনাকেই একটা যুক্তি তথা যুক্তির অজুহাত ক'রে নিজাম জানিয়েছেন যে—আগামী ২৫শে নবেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক, তার আগে তিনি চুক্তিপত্রে সই করতে পারবেন না।

ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিলেন যে, নিজামের এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু সর্ত এই যে, এই মাস শেষ হবার আগেই নিজামকে ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেই হবে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৯ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন চললেন লণ্ডন। রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেনকে উপস্থিত থাকতেই হবে। এ সময় লণ্ডন যেতে তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। এতগুলি সমস্যা অতি জটিল অবস্থায় পিছনে রেখে সাময়িকভাবেও এখন লণ্ডন যেতে তাঁর মন চাইছিল না। কিন্তু রাজকুমারী এলিজাবেথ আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে হলেন

মাউণ্টব্যাটেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তা ছাড়া, বর ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শুধু তাই নয়, ফিলিপ গত আঠার বছর ধরে ইংলণ্ডে মাউণ্টব্যাটেনেরই সঙ্গে ঘরের ছেলের মতো রয়েছেন। সুতরাং, এ বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকাও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

খুব সকালে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পালম বিমানবন্দরে উপস্থিত হলাম। বিমান ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনকে দেখে মনে হলো না যে, লণ্ডন যেতে তিনি একটুও উৎসাহ বোধ করছেন।

সকাল দশটার সময় রাজগোপালাচারীর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। মাউণ্টব্যাটেনের অনুপস্থিতির সময় রাজগোপালাচারীই গভর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত থাকবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকেই কংগ্রেসের এই রাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ নেতা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ করছেন। কাউন্সিল চেম্বারে অন্যান্য সকল মন্ত্রীর সম্মুখে ভারতের প্রথম (অস্থায়ী) ভারতীয় গভর্নর-জেনারেলের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান পালিত হলো।

কিছুদিন আগে শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী ষণ্মুখম্ চেট্টির কথা মনে পড়ছে। গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে গভর্নমেণ্ট হাউসের এক মধ্যাহ্নভোজের আসরে উপস্থিত পাঁচজন অতিথির মধ্যে ষণ্মুখম্ চেট্টি, পাক হাই কমিশনার জাহিদ হোসেন এবং বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী খেরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। জাহিদ হোসেন বড় ছটফটে স্বভাবের মানুষ, একটুতেই ঘাবড়ে যান এবং দিল্লীতে তিনি নিরাপদে থাকতে পারবেন কি না, এই সন্দেহেই তাঁর মন তখন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। খেরের সঙ্গে এর আগে বোম্বাইয়ে আলাপ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেদিনের ভোজসভাতেও খেরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় রাজনীতির এই নতুন ও পরিবর্তিত অধ্যায়ে খের ভারতের অন্যতম 'শক্তিশালী' ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন।

ষণ্মুখম্ চেট্টির পাশেই আমি বসেছিলাম। চেট্টি ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত রয়েছেন, অনেকে এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে নেহরু গভর্নমেণ্টের অর্থ-নীতিক আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে, চেট্টিকে অর্থ-মন্ত্রীর পদ প্রদান ক'রে নেহরু শিল্পপতি, ধনিক এবং বিদেশী মূলধনের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করেছেন। বিশেষজ্ঞের মতো নিজের ধারণার নির্ভুলতা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে চেট্টি কথা বলে থাকেন। কিন্তু খেরের চরিত্রে যে রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও শক্তির প্রমাণ পেলাম, চেট্টির মধ্যে তার কোন প্রমাণ পেলাম না।

চেট্টি তাঁর একটি আশা এই ভোজের আসরে কথায় কথায় ব্যক্ত করলেন। চেট্টি আশা করছেন যে, মাথাই এবং ভাবাকে নিয়ে তিনি এমন একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করবেন, যেটা বস্তুত মন্ত্রিসভার 'প্রধান মস্তিষ্ক' হয়ে উঠতে পারবে। কংগ্রেসের অর্থনীতিক আদর্শের এবং কংগ্রেসের চাপ দূরে সরিয়ে রেখে এ'রা তিনজন তাঁদের ইচ্ছামতো নীতি অবাধে অনুসরণ করতে পারবেন।

চেট্টি যেভাবে যতটা আশা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, আমার পক্ষে ততটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর হয়নি। এতটা প্রাধান্য লাভ করতে এ'রা পারবেন কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার ধারণা, নতুন ভারতের নতুন রাজ-

নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে এঁরা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে বেশি বা উচ্চতর কোন প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হবেন না।

এর পর চেট্টি শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে নানারকম আলোচনা করলেন। চেট্টির কাছেই শুনলাম, ভারতে শপথ গ্রহণ করা লোকের পক্ষে একটা যা-তা ব্যাপার নয়। চেট্টি বললেন—স্বর্গে যাবার পর নিজের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেবার মতো পার্থিব নথি-পত্র হয়তো হাতের কাছে না'ও থাকতে পারে। তখন কি হবে? এই বিষয়টা চিন্তা ক'রেই শপথ গ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। চেট্টি আরও তথ্য জানালেন। সাধারণত তিনটি বস্তু স্পর্শ ক'রে শপথ গ্রহণ করা হয়। গরুর লেজ, কর্পূর দীপের শিখা এবং সন্তানের মস্তক। চেট্টি বললেন—অবশ্য এমন হৃদয়হীন লোকও আছে, যে ছেলের মাথার টুপির নীচে চাপাটি লুকিয়ে রেখে, তারপর টুপির উপর থেকে মাথা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করে।

আজ স্বচক্ষে জনৈক ভারতীয়ের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখলাম। সাদা ধুতি পরিহিত এবং চোখে কালো চশমা, ভারতের 'সি-আর' মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হিন্দু পদ্ধতিতে হাতজোড় ক'রে তিনি সকলকে নমস্কার জানালেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি ব্যানার্জি রাজকীয় অনুমোদনবাণী পাঠ করলেন—"আমাদের বিশ্বস্ত ও অতিপ্রিয় চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীকে অভিনন্দিত ক'রে......।" এর পর প্রধান বিচারপতি কানিয়া শপথবাণী নিবেদন করলেন। দেখলাম, এই শপথবাণীতে 'শপথ' কথাটাই বাদ দেওয়া হয়েছে। চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী তাঁর দায়িত্ব 'স্বীকার ও সমর্থন' ক'রে গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেল। অতি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, কিন্তু কী বৃহৎ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্য আমরা চোখের সম্মুখে আজ দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত নাটকীয় নিয়তির মতো একটা পরিবর্তন। এক কংগ্রেস-যোদ্ধা, যিনি সারা জীবন ধরে ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটাবার জন্য চেষ্টা করেছেন, তিনি আজ সত্য সত্যই রাষ্ট্রের প্রধানের পদ গ্রহণ করছেন। কংগ্রেস-যোদ্ধার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও মনে হচ্ছে, কারণ এই নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্যে একটা পরিহাসের দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশরাজের যে সব প্রথা ও উপাধি উচ্ছেদ করার জন্য কংগ্রেসযোদ্ধা সারাজীবন ধরে আন্দোলন করেছেন, আজ তিনি ব্রিটিশরাজের প্রচলিত সেই সব প্রথা ও উপাধির ঠাট স্বীকার ক'রে নিয়েই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করছেন।

অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল রাজগোপালাচারীর প্রথম ভোজসভায় উপস্থিত হলাম। এই ভোজসভায় তিনি গভর্নর-জেনারেলের স্টাফকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রাজগোপালাচারীর কন্যা শ্রীমতী নামগিরি সভাস্বামিনীরূপে অতিথিদের সম্বর্ধনা জানালেন। এ ডি সি তথা পার্শ্বচর অফিসারেরা বাইরের অতিথিদের রীতি অনু-যায়ী আপ্যায়িত করলেন। আমরা স্টাফের লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ালাম গভর্নর-জেনারেলকে পরিচয় প্রদানের জন্য। মহিলা অতিথিরা সকলেই যথারীতি হাঁটু ভেঙে ও শরীর ঝুঁকিয়ে সৌজন্যের ভঙ্গী প্রদর্শন করলেন। সি-আর অনুরোধ করলেন—'থাক থাক, আমার জন্য এ সব কিছু করতে হবে না।'

ভোজপর্ব হয়ে যাবার পর সি-আর আমাকে ও ভের্ননকে ডেকে পাঠালেন। আমরা আশা করেছিলাম, সাধারণ লৌকিকতা ও সৌজন্য হিসাবে সি-আর কয়েকটা সাধারণ আলাপী কথাবার্তা বলে আমাদের বিদায় দেবেন। কিন্তু তা হয়নি, বরং

অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং আমরা তাঁর মনের পরিচয়ও অনেকখানি পেয়ে গেলাম। আলোচনার শেষে আমাদের মনে এই ধারণা খুবই দৃঢ় হয়ে গেল যে, মাউণ্টব্যাটেন বিদায় নেবার পর তাঁর জায়গায় বসবার মতো আদর্শ যোগ্য ব্যক্তি একজন আছেন। তিনি রাজগোপালাচারী।

মাউণ্টব্যাটেন ও রাজগোপালাচারী—ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদের দু'জনেই যোগ্য অধিকারী। কিন্তু চিন্তারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'জনের মধ্যে কত পার্থক্য! প্রবল কর্মশক্তি ও উৎসাহের মানুষ মাউণ্টব্যাটেন। এগিয়ে যেয়ে সমস্যার ও ঘটনার সম্মুখীন হতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। সমস্যাকে তিনি আঘাত করেন বাইরের দিক থেকে। তীব্র ও অকুণ্ঠ উদ্যমের সঙ্গে তিনি সমস্যার বাহিরটাই ভেঙে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছুক। রাজগোপালাচারী এর বিপরীত। প্রবীণ সি-আর অন্তর্দৃষ্টিকুশল মানুষ। তিনি আসলে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল মনীষী। সমস্যার ভিতরে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি অভ্যস্ত। সমস্যার গভীরে নিহিত মূল কারণগুলির উচ্ছেদসাধন ক'রে সমস্যার সমাধান করতে তিনি ইচ্ছুক।

নয়াদিল্লী, ১০ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : লণ্ডন থেকে আমার ভারতে ফেরবার পর এই ক'দিনের মধ্যেই ভারতের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের কয়েকটি প্রধান সমস্যা ও বৃহৎ ঘটনার রূপ কতদূর ও কি অবস্থায় এসে এখন দাঁড়িয়েছে, তারই পরিচয় বর্ণনা ক'রে 'পাবলিক রিলেশন্স'এর কাজের জন্য একটি বক্তব্য রচনার কাজ এইমাত্র সমাপ্ত করলাম। বক্তব্যে আমি প্রধানত যেসব বিষয়ের উল্লেখ ক'রে যা বলেছি তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় :

"কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের সমস্যা যেভাবে জটিল হয়ে উঠেছে, তাতে সমাধানের জন্য একটা পন্থার নির্দেশ দান করা সহজ ব্যাপার নয়। কাশ্মীরে এখন যুদ্ধের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষভাবেই কঠিন হয়ে উঠেছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, মাউণ্টব্যাটেন গত জুন মাসে যখন কাশ্মীর গিয়েছিলেন, তখন তিনি মহারাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, দুই ডোমিনিয়নের যে কোন একটিতে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই যোগদান ক'রে ফেলা কাশ্মীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য কোন ডোমিনিয়নে যোগদানের পূর্বে কাশ্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছা ও অভিমত আগে জেনে নিয়ে তারপর জনসাধারণেরই ঈপ্সিত ডোমিনিয়নে কাশ্মীরের যোগদান করা উচিত, এই নীতি গ্রহণের জন্যই মহারাজাকে মাউণ্টব্যাটেন অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

"তা ছাড়া, মহারাজাকে আর একটি বিষয় জানিয়ে দেবার জন্য প্যাটেল মাউণ্ট-ব্যাটেনকে বলে দিয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই যদি মহারাজা পাকিস্থানেই যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন, এবং পাকিস্থানের গণ-পরিষদেও যোগদান করনে, তবে মহারাজার আচরণকে ভারতের প্রতি অসৌহার্দ্যের আচরণ বলে ভারত মনে করবে না। মাউণ্টব্যাটেন মহারাজাকে এই কথা বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে,—'আপনার মাত্র একটি কাজের ফলেই আপনি কাশ্মীরের উপর বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে আনবেন, এবং সেই কাজটি হলো কোন কিছুই না ক'রে বসে থাকা।' মহারাজার দ্বিধা এবং কাশ্মীরে উপজাতীয় হানাদারের আক্রমণ নিবারণ করতে পাকিস্থানের অক্ষমতা অথবা অনিচ্ছা, প্রধানত এই দুইটি ব্যাপারই হলো কাশ্মীর সঙ্কটের প্রধান দুই কারণ, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, পূর্ণ সামরিক অভিযান চালিয়ে উপজাতীয় হানাদারেরা রাজধানী শ্রীনগরের

প্রবেশদ্বারে এসে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত মহারাজা মন স্থির করতে সক্ষম হননি, এবং ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্তও করতে পারেননি।

"ভারত সরকারের আচরণ যে সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে, এবিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। কাশ্মীরে সামরিক সাহায্য প্রেরণের আগেই ভারত সরকার কাশ্মীরের ভারতভুক্তির স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন। কাশ্মীর আইনত ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারত কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করেননি। তা ছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। মহারাজার পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়নি, কিন্তু ভারত সরকার নিজে থেকেই এই নীতি ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তিকে একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবেই গণ্য করা হলো, যতদিন না কাশ্মীরবাসী গণভোটের দ্বারা তাঁদের রাষ্ট্রভুক্তির চূড়ান্ত ও পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, এবং জিন্নাও যে নীতি ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঐ দুই ঘোষিত নীতি অনুসারেই সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হয়েছে। কিন্তু আইনসঙ্গত হয়েও তারপর কি হলো? ঘটনার দিকে তাকিয়ে বলা যায়, কাশ্মীর আইনসম্মতভাবে ভারতভুক্ত হবার পরেও এমন একটা বিপর্যয়ের সূচনা দেখা দিয়েছিল, যার দুর্মোচনীয় ক্ষতি থেকে কখনো সেরে ওঠা সম্ভবপর হতো কি না সন্দেহ। এই বৃহৎ বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটতে চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটেনি, একটুর জন্য এড়িয়ে যেতে পারা গিয়েছে।

"এই কাণ্ডটি করতে চেয়েছিলেন জিন্না। ২৭শে অক্টোবরের মধ্যরাত্রে তিনি এই বিপর্যয়ের নাটক আরম্ভের সঙ্কেতধ্বনি জানালেন। পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি গ্রেসিকে নির্দেশ দিলেন গভর্নর-জেনারেল জিন্না, পাকিস্থানী ফৌজ নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য। কিন্তু গ্রেসি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এবিষয়ে আগে অকিনলেকের পরামর্শ চাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। অকিনলেক গিয়ে এই ব্যাপারের মধ্যে পড়ে জিন্নাকে নিবৃত্ত হতে বললেন। জিন্না চুপ ক'রে রইলেন, ভাবলেন অনেকক্ষণ, এবং সম্ভবত সমগ্র বিষয়টাকে নতুন ক'রে চিন্তা ক'রে দেখতে সক্ষম হলেন। তার পরেই কাশ্মীর আক্রমণের নির্দেশ প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। এইভাবেই সেদিন দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ থেকে দুই ডোমিনিয়নের অদৃষ্ট রক্ষা পেয়ে গেল।

"হায়দরাবাদের নিজামও যেন সময় নিয়ে খেলা করছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাশ্মীরের ঘটনা কোন্ দিকে যায়, বসে বসে এইটুকুই তিনি লক্ষ্য করছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত তিনি করছেন না, কারণ কাশ্মীরের পরিণাম কোথায় গড়ায় দেখে নিয়ে, তারপর একটা সিদ্ধান্ত করবেন বলে তিনি সঙ্কল্প করেছেন। ঔপন্যাসিকের কল্পনার রাজ্য সেই রুরিটানিয়ার মতো হায়দরাবাদ রাজ্যও ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার নামে যেন একটা অদ্ভুত রসিকতার অভিনয় ক'রে চলেছেন। যে ইত্তেহাদ দলটিকে নিজাম পূর্বে খুবই উৎসাহিত করেছেন, সেই ইত্তেহাদ এখন তাঁকেই গ্রাস করবার রাহু হয়ে উঠেছে। ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন ক'রে একটা ব্যবস্থার মধ্যে আসবার পথে হায়দরাবাদকে যে বিরোধী দল বাধা দিচ্ছে, তাদের প্রতিরোধ করার মতো রাজনৈতিক শক্তি ও ইচ্ছার শক্তি নিজামের হবে কি? এক-কথায়, এই প্রশ্নটির মধ্যেই বস্তুত হায়দরাবাদ সমস্যার পরিচয় নিহিত রয়েছে।

আমার বিশ্বাস, যদি হায়দরাবাদ সমস্যা সমাধান ক'রে ফেলতে পারা যায়, তা'হলে সংকট পরিহারের পথে একটা বড় বাধাকে আমরা ডিঙিয়ে যেতে সক্ষম হব।

"লাহোরে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পয়লা নবেম্বরে জিন্নার যে আলোচনা হয়েছিল, তাতে জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলেন যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তির স্বীকৃতি তিনি গ্রহণ করতে প্রথমে রাজি হননি। তিনি এটা চাননি, যে, জুনাগড় পাকিস্থানে যোগদান করুক। কিন্তু জুনাগড়ের নবাব এবং দেওয়ান বার বার আবেদন করতে থাকায় তিনি অগত্যা জুনাগড়ের পাকিস্থান-ভুক্তির ঘোষণা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জিন্না তো এই কথা বললেন, কিন্তু মাত্র এক মাস আগে লিয়াকৎ আলি যখন দিল্লীতে আলোচনায় এসেছিলেন, তখন জুনাগড় প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে জিন্নার এই উক্তির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। জুনাগড় সম্পর্কে এসব ব্যাপার যে হয়েছে, তারও কোন আভাস পর্যন্ত তিনি দেননি। জুনাগড় নবাবের পাকিস্থানভুক্তির ঘোষণা স্বীকার ক'রে নেবার পক্ষে জিন্না তাঁর যে ইচ্ছা আর যে ব্যাখ্যাই উপস্থিত করুন না কেন, এই কাজের দ্বারা জিন্না ঘটনাক্ষেত্রে একটা অনিবার্য ও তীব্র প্রতিক্রিয়াকেই আহ্বান করলেন। প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

"জুনাগড় নবাবের পাকিস্থানভুক্তির সিদ্ধান্ত পাকিস্থান স্বীকার ক'রে নেওয়ার প্রত্যুত্তরে প্যাটেল যা করলেন, তাতে ভারতের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মনে উদ্দীপনা জেগে থাকলেও, বিশ্বের অভিমতকে ভারতের অনুকূলে পাওয়া সম্ভবপর হবে না বলেই মনে হয়। যাঁরা সন্দেহ করতেই ভালবাসেন এবং পরের ভাল যাঁদের চোখেই পড়ে না, এমন লোকের পক্ষে অবশ্য ভারত সরকারের জুনাগড় অধিকারের ব্যাপারকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দার উপাদানরূপে ব্যবহার করা সহজ হবে। ইওরোপীয় ভূখণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে পররাজ্য অধিকারের কতগুলি ঘটনার সঙ্গে তাঁরা জুনাগড় অধিকারের ঘটনারও তুলনা হয়তো করবেন। কিন্তু জুনাগড়ে যা ঘটেছে তার মধ্যে আইনবিরোধী কোন ব্যাপারই ঘটেনি। একটি বিষয় স্মরণে রাখা উচিত যে, জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রীই ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, নবাব যখন রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছেন তখন ভারত সরকারই এসে যেন রাজ্যের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

"জুনাগড়ের ঘটনা সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের একটি অভিমত লক্ষ্য করা উচিত। জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রী জুনাগড়ের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ভারত সরকারকে যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই অনুরোধ জুনাগড়ের রাষ্ট্রভুক্তির প্রশ্নকে দুই ডোমিনিয়নের কারও অনুকূল অথবা প্রতিকূল ক'রে তুলছে না, ভারত গভর্ন-মেণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া নেহরু জুনাগড়ঘটিত সমস্ত সমস্যার সমগ্র বিষয়টিকেই পাকিস্থানের সঙ্গে খুব শীঘ্রই আলোচনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে পাকিস্থানের কাছে প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু পাকিস্থান উত্তরে বলেছেন, আগে জুনাগড়ে নবাব-সরকারকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হোক, তারপর এবিষয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রত্যুত্তরে ভারত গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানকে বলেছেন, জুনাগড়ের নবাব-সরকারই তো শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য জুনাগড়ে আনাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এইভাবে ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন এবং উত্তর ও প্রত্যুত্তরের যে পালা চলেছে তার ফলে খুঁটিনাটি নানা প্রসঙ্গের একটা ধাঁধা ও শুধু প্রচারকার্যের একটা জাল সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সুতরাং

খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ঐ ধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যেতে না হয়, অথবা এই জালে জড়িয়ে পড়তে না হয়।

"আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার সব দিক বিবেচনা ক'রে যদি ঘটনাকে সমগ্র-ভাবে বিচার করা হয় এবং ঘটনার রূপ বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করা হয়, তা'হলে এই সত্য ধরা পড়ে যায় যে, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং জুনাগড় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি বস্তুত একই সমস্যা। কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড়, এই তিন রাজ্যের যে কোন একটি রাজ্যের ঘটনার প্রকোপ ও প্রতিক্রিয়া তিন রাজ্যেরই ঘটনার ও সমস্যার উপর পড়ছে। তিন রাজ্যেরই সমস্যা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে যদি একটি রাজ্যেরও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে দুই ডোমিনিয়নের মতের মিল ঘটাবার মতো কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, তবে অন্য দুই রাজ্যের সমস্যা সমাধানের দুরূহতা বা জটিলতা হ্রাস পাবে। দেশীয় রাজ্য-গুলির রাষ্ট্রভুক্তির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে অবিচলিতভাবেই তাঁদের কর্তব্য যথা-সময়ে ক'রে ফেলেছেন। ব্যতিক্রম হলো মাত্র ঐ তিনটি রাজ্য—কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং জুনাগড়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই যে তিনটি রাজ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে তিনটি রাজ্যেরই বিপুলসংখ্যক ও অধিকাংশ প্রজা যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক, রাজা সেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক নন। রাজা এক সম্প্রদায়ের লোক, প্রজা আর এক সম্প্রদায়ের লোক। দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রভুক্ত করার নীতিকে যদি কার্যে পরিণত করার এবং তার গুরুত্ব দেশীয় রাজ্যগুলিকে বোঝাবার প্রচেষ্টা মাউণ্টব্যাটেন ও প্যাটেল যথাসময়ে আরম্ভ না করতেন, তবে একটা পুরাপুরি অরাজক অবস্থা যে দেখা দিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি কোন্ রূপ লাভ করেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ায় এরই মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা চমৎকৃত হবার মতোই। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে দেশীয় রাজ্যগুলি বস্তুত ব্রিটিশ-ভারতের অংশ ছিল না। এখন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে যে অবস্থা ঘটেছে, তার আর একটা নতুন তাৎপর্যও বুঝতে পারা যাচ্ছে। পাকিস্থান সৃষ্টি হবার ফলে ভারতের যে পরিমাণ ভূখণ্ড এবং যতসংখ্যক প্রজা ভারতের বহির্ভুক্ত হয়েছে, ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ভূখণ্ড ও বেশি সংখ্যক প্রজা। পাকিস্থান হওয়ায় শাসন-অঞ্চল ও প্রজাসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত ইউনিয়ন যা হারিয়েছে, পেয়েছে তার চেয়ে বেশি।

"সম্প্রতি বর্মার স্বাধীনতা এবং পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টে গভর্নমেণ্ট পক্ষের ঘোষণার উপর যে বিতর্ক হয়েছে, সে বিতর্কে মিঃ চার্চিলও যোগ দিয়ে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি যত সব পুরনো অবিশ্বাস ও সংশয়গুলিকেই আবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। দুটি কারণে আমার মনে হয়েছে যে, মিঃ চার্চিলের উক্তিকে বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কোন্ তথ্যের জোরে তিনি এই উক্তি করেছেন, তা তাঁর কাছ থেকে জানবার দাবী করা উচিত। প্রথম কারণ হলো, মিঃ চার্চিল যেসব সংখ্যাতথ্যের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সত্য এবং নির্ভুল নয়। প্রকৃত সংখ্যাতথ্য নির্ণয়ের চেষ্টায় যদিও আমরা এখানে বস্তুত একটা দুরূহতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি, তবুও আমরা যেসব তথ্য এপর্যন্ত সংগ্রহ

করেছি তার মধ্যে এমন কোন তথ্যের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, যার দ্বারা মিঃ চার্চিলের হিসাব সমর্থন করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় প্রাণহানির পরিমাণ বোঝাতে গিয়ে তিনি অক্লেশে মস্ত বড় অঙ্ক দিয়ে তৈরী যে হিসাব উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি তাঁর নিছক অনুমানটাকেই অত্যধিক পরিস্ফীত ক'রে তুলেছেন। দ্বিতীয় কারণ ডোমিনিয়নের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি ভুল কথা বলেছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি এই উক্তি করেছেন যে, ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র অর্থে পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্র বোঝায় না বরং পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে কিছু কম মর্যাদার রাষ্ট্র বোঝায়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত, অবিলম্বে মিঃ চার্চিলের এই উক্তিকে প্রতিবাদ করা ও খণ্ডন করা। ডোমিনিয়নের যে সংজ্ঞা মিঃ চার্চিলের উক্তিতে ফুটে উঠেছে, সেটা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নয় এবং আইনগত তত্ত্ব হিসাবেও সত্য নয়, এই কথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণা করা উচিত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বলা উচিত যে, মিঃ চার্চিলের উক্তি গভর্নমেণ্টের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

"ভারতে ফিরে আসার পর আমার নিজের একটা ধারণা পূর্বের তুলনায় আরও দৃঢ় হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট তাড়াতাড়ি কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্পর্ক পরিহারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না বলেই আমার মনে হয়েছে। কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্পর্ক ছেড়ে দেওয়া বা না-দেওয়ার বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলবেন না, যদি বিষয়টিকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অনিশ্চিত ক'রে রাখবার একটা উপযুক্ত কারণ তাঁরা দেখতে পান। আমি কিছুকাল থেকেই বুঝতে পেরেছি যে, জিন্নার পলিসির একটা প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতের এই কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্পর্কের প্রশ্নটিকেই সকল আলোচনার মধ্যে টেনে আনা। জিন্নার উদ্দেশ্য হলো, যদি সম্ভব হয় তো উত্যক্ত ক'রে ভারতকে কমনওয়েলথের সম্পর্ক ছাড়তে বাধ্য করতে হবে। ভারতকে কমনওয়েলথ থেকে তাড়াতে পারলে পাকিস্থান এই উপমহাদেশের 'উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড' হয়ে উঠতে পারবে, জিন্না এই আশা করছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন আত্মীয়তার সম্পর্কে হলেন ইংলণ্ড-নৃপতির ভ্রাতা। ইংলণ্ড-নৃপতির ভ্রাতা যতদিন গভর্নর-জেনারেল হয়ে দিল্লীতে রয়েছেন, ততদিন ভারতকে কমনওয়েলথ থেকে বিতাড়ন করার কাজে জিন্নাকে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে এবং কাজটাও বেশ কঠিন ঠেকছে।

"যাই হোক, দিন দিন আমাদের কাছে নানারকম প্রমাণ এসে জমা হয়ে উঠছে, যা থেকে বুঝতে পারছি যে, মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে করাচী থেকে প্রচারকার্যের একটা বড়রকমের কামানবাজি আরম্ভ হবে। প্রথম অগ্নিবর্ষণ এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছে। আজকের তারিখের পাকিস্থান টাইমস্‌ মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনই কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য-পরিচালনার প্রত্যক্ষ কম্যাণ্ড গ্রহণ করেছেন। রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনে যাবেন, এতেই প্রমাণিত হবে যে, পাকিস্থানের এই উদ্ভট অভিযোগ কত বড় মিথ্যা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, একটা মিথ্যাকেও যে লোকে সত্য বলে মনে ক'রে ফেলে, এই শোচনীয় সত্যের বাস্তবতাটুকু মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না, বরং থেকেই যাচ্ছে। যে মিথ্যা যত বেশি প্রচণ্ড হয়, সে মিথ্যা তত বেশি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে বেশিসংখ্যক লোকের কাছে। এই অবাঞ্ছিত সত্যটি বাস্তবে সত্য বলেই, মিথ্যাকে প্রতিবাদ ও খণ্ডন করার চেষ্টায় প্রায়ই এই ফল দাঁড়ায় যে, প্রকৃত সত্য সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"

অবস্থার উন্নতি ও অবনতি

সিমলা, বৃহস্পতিবার, ২০শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নর-জেনারেল রাজগোপালাচারীর অনুমতি নিয়ে সিমলাতে এসেছি। আমার পরিবারের সকলেই সিমলাতে রয়েছে। এখানে এসেও কোন বিশ্রাম নেই। দিল্লী থেকে আমার সেক্রেটারি থলি ভর্তি ক'রে কাগজপত্র পাঠিয়েই চলেছেন। তা ছাড়া টেলিফোনেও প্রতিদিন দিল্লী থেকে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

কয়েকদিন ধরে নিয়মিতভাবে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করবার সুযোগ পাইনি। আজ সংবাদপত্রের স্তূপের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম ১২ই নবেম্বর তারিখে ডন পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি শিরোনামা—'আক্রান্ত জুনাগড়'। ডন লিখেছেন—'জুনাগড়ের দেওয়ান এবং ভারত গভর্নমেণ্ট যে ব্যবস্থাই গ্রহণ ক'রে থাকুক না কেন, জুনাগড় নিয়মতন্ত্র অনুসারে পাকিস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের নির্দেশ অনুসারে জুনাগড়ের এই পাকিস্থান-ভুক্তি সর্বতোভাবে বৈধ সঙ্গত ও অপরিবর্তনীয়।'

কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে ডন কি বলেন? যে আইনের উল্লেখ করেছেন ডন, সেই আইন অনুসারে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকেও তো 'বৈধ সঙ্গত ও অপরিবর্তনীয়' বলতে হয়? কিন্তু এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন ডন।

আমার নিজের নোট বইয়ে লিখিত তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিতেই বিশেষ অর্থপূর্ণ একটি তথ্যের উল্লেখ চোখে পড়ল। কাশ্মীর যখন রাষ্ট্রভুক্তির কোন সিদ্ধান্তই করেননি, সেই সময়ের ডন পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি অংশ। ২৪শে আগস্ট তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ডন লিখেছেন—"কাশ্মীরের মহারাজাকে এইবার স্পষ্ট ক'রে বলে দেবার সময় এসে গিয়েছে যে, তাঁকে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলতেই হবে এবং সে সিদ্ধান্ত হবে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত।...যদি কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগদান না করেন, তবে যতদূর ভয়াবহ ও সাংঘাতিক অশান্তি হতে পারে তাই হবে। এ অশান্তি হবেই হবে, ঠেকিয়ে রাখা আদৌ সম্ভবপর হবে না।"

কাশ্মীরের সামরিক পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে আরও কিছুটা উন্নত এবং অনুকূল হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী উরি শহরও অধিকার ক'রে নিয়েছে। সামরিক ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে উরি শহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শীত এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরিপথগুলি বরফে ঢাকা পড়ে বন্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কাজেই কাশ্মীরে সামরিক সংঘর্ষও কিছুটা মন্দীভূত হয়ে আসবে বলে মনে হয়। আর একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, উপজাতীয় হানাদারের দল এখন উৎসাহহীন হয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্যই উৎসুক হয়ে উঠেছে। যারা 'ধর্মযুদ্ধ' করতে এসেছিল তারা লুণ্ঠনকার্যেই উৎসাহ দেখিয়েছে বেশি এবং লুণ্ঠনকার্যের শেষে ধর্মযুদ্ধের উৎসাহ আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, এই ঘটনায় কাশ্মীরের মুসলমানদের মনে যে অতি গভীর ও ব্যাপক একটা চিন্তার আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

গত সপ্তাহেই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্ভাবিত চুক্তির যে খসড়া রচিত হয়েছিল, সে খসড়া বিবেচনা করার পর লিয়াকৎ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এই

বিবৃতির দ্বারা মীমাংসার সম্ভাবনাকে কতখানি সাহায্য করা হয়েছে সেটা বিবৃতির ভাষা, মন্তব্য ও বক্তব্য থেকেই ধারণা করা যেতে পারে। লিয়াকৎ বলেছেন—'কুইসলিং শেখ আবদুল্লা, কংগ্রেসের দীর্ঘকালের দালাল আবদুল্লা নিজের ব্যক্তিগত প্রাধান্য এবং স্বার্থের জন্য কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রাণ, সম্মান ও স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে ফিরছে।'

নেহরু ও আবদুল্লা দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কও দীর্ঘকালের। সুতরাং লিয়াকতের এই উক্তি নেহরুর মন কতখানি ক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষের মনে ও সম্মানে আঘাত দেবার মতো উক্তি এর চেয়ে বেশি খারাপ আর হতে পারে না।

মাউণ্টব্যাটেন এখন লণ্ডনে রয়েছেন, তাই লিয়াকৎ এই সময়ে একটি কথা মাউণ্টব্যাটেনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেছেন। লিয়াকৎ এই বিবৃতিতে বলেছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে মাউণ্টব্যাটেন এর আগেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে কেন? লিয়াকৎ একটা 'ভিতরের কথা' উদ্‌ঘাটন ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছেন। ভিতরের কথাটি হলো—মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুতি। পয়লা নবেম্বরের লাহোর বৈঠকে জিন্না যেসব 'সর্ত' উত্থাপন করেছিলেন, সেই সব সর্তই মেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন নাকি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সর্তগুলি হলো—দুই গভর্নমেণ্টই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন, ভারতীয় সৈন্য এবং অভিযানকারী উপজাতীয়েরা একই সময়ে কাশ্মীর থেকে সরে যাবে, দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর-জেনারেল সম্মিলিতভাবে কাশ্মীর রাজ্যের শাসনকার্য আপাতত পরিচালনা করবেন, এবং তাঁদেরই সম্মিলিত পরিচালনায় ও পর্যবেক্ষণে কাশ্মীরের গণভোট গৃহীত হবে।

লিয়াকৎ এই যে তথ্য তাঁর বিবৃতিতে উদ্‌ঘাটন ক'রে দিয়েছেন, সেটা তথ্যই নয়। কারণ, সেই সময়েই জিন্নার এই 'সর্তাবলী' মাউণ্টব্যাটেন ভারত গভর্নমেণ্টকে জানিয়েছিলেন এবং ভারত গভর্নমেণ্টও সে সর্তাবলী প্রত্যাখ্যান ক'রে অবিলম্বে করাচীতে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যানই করা হয়েছিল, কোন প্রতিশ্রুতি কেউ দেয়নি। অথচ লিয়াকৎ তাঁর বিবৃতিতে তথ্য 'উদ্‌ঘাটন' করেছেন।

সিমলা, বুধবার, ২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অনুগ্রহে আজ কয়েকটি সুসংবাদ শুনলাম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন একটি দিনের মধ্যে এতগুলি ভাল খবর একসঙ্গে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। চারদিকের লক্ষণ দেখে এই ধারণা হচ্ছে যে, উপমহাদেশের শান্তি ছিন্নভিন্ন করবার জন্য যে ঝড় দেখা দিয়েছে, সে ঝড়ের রূপ যতখানি খারাপ হয়ে উঠবার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। এইবার ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকবে। মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন থেকে দিল্লীতে ফিরেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কণ্ঠে শুনলাম—নেহরু শেখ আবদুল্লারই একটা বিপজ্জনক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছেন। আবদুল্লা বলেছেন যে, গণভোটের আর প্রয়োজন নেই। নেহরু এক বিবৃতিতে বিশেষ জোর দিয়ে এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে সর্তে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্বীকার করা হয়েছে, ভারত গভর্নমেণ্ট সেই সর্ত অবশ্যই পালন করবেন। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পরিচালিত ব্যবস্থায় গণভোট গ্রহণ ক'রে কাশ্মীরী জনসাধারণের ইচ্ছা নির্ণয় করা হবে। কশ্মীর থেকে একই সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব নেহরু অবশ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নেহর্ বলেছেন, এ প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ পাকিস্থানের নিছক একটা কূট-কৌশলকে সমর্থন করা। আর একটি ভাল খবর হলো—লিয়াকৎ আগামীকাল দিল্লীতে আসছেন, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য। কাশ্মীরের উপর আক্রমণ আরম্ভ হবার পর দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ হবে। তৃতীয় সুসংবাদ, করাচী ঘোষণা করেছেন যে, নিখিল ভারত মুলিস লীগ ভেঙে দেওয়া হলো। এখন 'নিখিল পাকিস্থান মুসলিম লীগ' শুধু পাকিস্থানের মধ্যেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবেন। খুব প্রশংসনীয় ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের চার কোটি মুসলমানের মন একটা ধাঁধা থেকে মুক্তি লাভ করবে। দুদিকে আনুগত্য রক্ষা করার একটা কঠিন মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ভারতীয় মুসলমানেরা রক্ষা পেল।

সিমলা, শনিবার, ২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : ভাল খবর। শেষ পর্যন্ত নিজাম স্থিতাবস্থা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। প্যাটেল একটি বিবৃতিতে মাউণ্টব্যাটেনের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন।

স্থিতাবস্থা চুক্তিতে নিজামের সম্মতি পেতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঝঞ্ঝাট ভুগতে হয়েছে। গত মঙ্গলবারেও নিজামের ডেলিগেশন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করতে এসে চুক্তিপত্রের সামান্য এক একটা কথা, একটা কমা বা দাঁড়ি ইত্যাদি তুচ্ছ বস্তু রদবদল করার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও বাগাড়ম্বর করেছেন। চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু তাঁরা বদলাতে পেরেছেন, এইরকম একটা আত্মশ্লাঘা ও বাহাদুরী করবার একটা প্রমাণ যাতে নিজামের কাছে গিয়ে দেখাতে পারেন, তারই জন্য কমা-দাঁড়ি ইত্যাদি রদবদলের জন্য এঁদের এত আগ্রহ। হায়দরাবাদে গিয়ে বলা যাবে যে, ভারত গভর্নমেণ্টকে চুক্তিপত্রের সর্ত রদবদল করতে তাঁরা বাধ্য করেছেন, এই হলো ডেলিগেশনের মনের ইচ্ছা। মাউণ্টব্যাটেনও ডেলিগেশনের এই সাধের ইচ্ছাটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে মাউণ্টব্যাটেনও এই জেদ ধরলেন যে, একটিও শব্দ, অক্ষর বা কমা-দাঁড়ি পরিবর্তন করা হবে না। চুক্তিপত্রের সঙ্গে নিজাম যে দু'টি আনুষঙ্গিক পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্রে উল্লিখিত অনুরোধ অবশ্য মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু এখানেও নিজামের পররাষ্ট্রনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেন না মাউণ্টব্যাটেন। সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার নিজামের থাকবে না।

এই সময় ইত্তেহাদী নেতা কাশিম রেজভিও দিল্লীতে ছিলেন। রেজভি এখন মাত্র এইটুকু অহঙ্কার করতে পারবেন যে, তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে নিযুক্ত নতুন ডেলিগেশনের দ্বারা স্থিতাবস্থা চুক্তি নিষ্পন্নের কাজ করানো হয়েছে। আসল কথা হলো, উপায়ান্তর না দেখে রেজভি এবং নতুন ডেলিগেশন কোন মতে নিজেদের মুখ রক্ষা করেছেন মাত্র। কিন্তু এভাবে নিজেদের মুখ রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না, যদি প্যাটেলের মনের ভাব অন্য রকমের হতো। নিজামের উপর প্যাটেলের কেন জানি একটা বিশ্বাস আছে। প্যাটেলের ধারণা, নিজামের মনে কোন খারাপ অভিপ্রায় নেই। যাই হোক স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখন অন্তত একটা বৎসরের সময় পাওয়া যাবে, যার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করবার এবং মন নরম করবার সুযোগ সকলেই পাবেন।

আরও কয়েকটি সুসংবাদ। একে একে ভাল লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে নেহরু যে ঘোষণা করেছেন, তাতে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ

লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা এখন অনেক সহজ হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের মূঢ়তা বর্জনের জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। গোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করেছেন যে, ভারত-পাকিস্থান আলোচনারই একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথম দফায় দুই গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারিদের মধ্যে আলোচনা হবে। তারপর আলোচনা হবে দুই গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে। প্যাটেলও একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, লিয়াকতের সঙ্গে তাঁর 'সৌহার্দ্যপূর্ণ' আলোচনা হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণের জন্য লিয়াকৎ জিন্নার কাছে গিয়েছেন। যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক যথারীতি চলতেই থাকবে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে।

সিমলা, সোমবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আর একটি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর খুব সম্ভবত নানারকম অভিমতের আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ভারতীয় নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে, কাশ্মীরকে যদি ভারত ইউনিয়নের ভিতর রাখতে হয়, তবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমানকে ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে উপযুক্ত স্থান ক'রে দিতে হবে এবং তুষ্টও করতে হবে। শেখ আবদুল্লা তাই গণভোটের প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর সমর্থন স্পষ্টতরভাবে ঘোষণা করেছেন। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, কাশ্মীরের ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে গান্ধী-নেহরু-আবদুল্লা একমত হয়ে এবং এক নীতি নিয়ে দাঁড়াবে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন হিন্দু মহাসভা। তা ছাড়া, কংগ্রেসের মধ্যেও দুই মনোভাবের একটা সংঘর্ষ বেধে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা কাশ্মীরবাসীকে ভারতীয় জাতির অংশরূপে গ্রহণ করতেই উৎসাহিত হবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীদের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধেই দাঁড়াবার ইচ্ছা করছেন। যাঁরা 'হিন্দু রাষ্ট্র' চাইছেন, তাঁরা কাশ্মীরকে চান না। কংগ্রেসীদেরও এক শ্রেণীর মনের ইচ্ছা যে, কাশ্মীর ভারতের বাইরেই থাকুক। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সেটা লক্ষ্য ক'রে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক অংশ অন্তত এখনকার মতো চুপ হয়ে গিয়েছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে, মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এটা কংগ্রেস একেবারেই ইচ্ছা করেন না। যে-সব মুসলমান চলে গিয়েছে, তারা আবার নিজের ঘরে ফিরে আসুক, এই নীতি এবং ইচ্ছাও কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঘোষিত হয়েছে।

হিন্দু মহাসভা সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। অনুমান করতে পারছি, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে খুব শীঘ্রই একটা সংঘর্ষ বেধে উঠবে এবং এই দুই পরস্পরবিরোধী নীতির জয়-পরাজয়ের একটা মীমাংসাও হয়ে যাবে।

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পাদিত স্থিতাবস্থা চুক্তির সুফলেরও একটা প্রমাণ দেখতে পাওয়া গেল। হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন নিজাম।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সিমলা থেকে সপরিবারে দিল্লী ফিরে এসেছি এবং সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছি গভর্নমেণ্ট হাউসেরই বৃহত্তর

পরিধির মধ্যে অবস্থিত সেই কম্প্‌ট্রোলার হাউসে, যেখানে এর আগে র‍্যাডক্লিফ বাস করতেন এবং আরও আগে ১৯৪২ সালে ভারতের অতিথি চিয়াং কাইশেক ও মাদাম কাইশেক কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

অকিনলেকের সুপ্রীম কম্যাণ্ড আর নেই। আমি গতবার লণ্ডনে থাকার সময়েই এদিকে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দুই ডোমিনিয়নের অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনা হয়ে গিয়েছে। দুই ডোমিনিয়নের কেউই সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে আর পছন্দ করছিলেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ঠিক হয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সুপ্রীম কম্যাণ্ড থাকবে। কিন্তু দুই ডোমিনিয়নই সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সম্পর্কে যেসব অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করছিলেন, তাতে বোঝা গিয়েছিল যে, এতখানি বিরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের আর থেকে কোন লাভ নেই। কাজেই গত ৩০শে নবেম্বর তারিখেই সুপ্রীম কম্যাণ্ডের অবসান হয়ে গিয়েছে।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সৈনিকের আর কোন দায়িত্ব রইল না। অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর সকল ব্রিটিশ অফিসারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এখন যদি কোন ব্রিটিশ সৈনিক ভারতীয় বাহিনীতে কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে নতুন ক'রে ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা কন্‌ট্রাক্ট বা 'ঠিকা' ক'রে নিয়ে থাকতে হবে। যাঁরা থাকতে চাইবেন না, তাঁদেরও কোন বাধা নেই। তাঁরা চলে যাবেন। ভারতীয় বাহিনীর চার হাজার ব্রিটিশ অফিসারকে এই নতুন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যাঁরা ভারতীয় বাহিনীতে এখনো কাজ করতে চান, তাঁরা কোন্‌ সর্তে কাজ করবেন, সে সম্বন্ধে লণ্ডনের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের আলোচনাও হয়েছে। অকিনলেক এর আগে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকালের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক। তাঁর যুক্তি এই ছিল যে, মাত্র ১লা অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ অফিসারেরা কর্মচ্যুতির নোটিশ পেয়েছেন, কিন্তু আইনত নোটিশের মেয়াদও তিন মাস হওয়া উচিত। সেই হিসাবে ৩১শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে ব্রিটিশ সৈনিকের অভিভাবক সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে কখনই ভেঙে দেওয়া চলতে পারে না।

অকিনলেকের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন প্যাটেল। তাঁর দাবী, অবিলম্বে সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে ভেঙে দিতে হবে। প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছিলেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান দপ্তর দিল্লীতে থাকায় ভারতীয় বাহিনীকে নানা রকম বাধা ও অসুবিধা ভুগতে হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনীকে ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধা দিচ্ছেন সুপ্রীম কম্যাণ্ড। আরও সাংঘাতিক অভিযোগ করেছিলেন প্যাটেল। তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে এমন কথাও বলেছিলেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ড বস্তুত পাকিস্থানেরই একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে দিল্লীতে কাজ করছেন।

অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্যাটেলের এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এই সংশয় নিতান্ত অন্যায়। অকিনলেকের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্যাটেল তাঁর মত পরিবর্তন করেননি, এবং তাঁর দাবীও প্রত্যাহার করেননি।

পাকিস্থান গভর্নমেণ্টও খোলাখুলিভাবে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগের যুক্তি ছিল প্যাটেলের যুক্তির ঠিক বিপরীত। পাকিস্থান বলেছিলেন, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কোন স্বাধীনতা নেই।

অকিনলেক ও তাঁর সুপ্রীম কম্যাণ্ড বস্তুত ভারতীয় বাহিনীরই ইচ্ছা, অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করছেন।

অথচ গত অক্টোবরের মাঝামাঝি লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে অকিনলেকই যখন প্রস্তাব করেছিলেন যে, ৩০শে নবেম্বর তারিখে সুপ্রীম কম্যাণ্ড ভেঙে দেওয়া হোক তখন লিয়াকৎ আলিই প্রবলভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনকে লিয়াকৎ জানিয়ে দিলেন যে, একজন ব্রিটিশ সুপ্রীম কম্যাণ্ডার থাকলে পাকিস্থানেরই পক্ষে সুবিধার বিষয়। 'বিভক্ত' সামরিক উপকরণের পাকিস্থানী অংশ তখনো ভারত থেকে পাকিস্থানে প্রেরণের কাজ চলছে। দুই ডোমিনিয়নের দুই প্রধান সেনাপতির দ্বারা সম্মিলিতভাবে পাকিস্থানে সামরিক উপকরণ প্রেরণকার্যের ব্যবস্থা অবশ্যই পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে জনৈক ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে এ কাজ পরিচালিত হতে থাকলে পাকিস্থান আরও ভালভাবে তাঁদের প্রাপ্য অংশ পেতে পারবেন। এই ছিল তখন লিয়াকতের অভিমত।

মাউণ্টব্যাটেন একথাও লিয়াকৎকে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সেনাপতি অকিনলেকের এখন এইটুকু মাত্রই ক্ষমতা আছে যে, পাকিস্থানের প্রাপ্য অংশ পাকিস্থানে প্রেরণের পরিকল্পনা শুধু তিনি করতে পারেন। ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভালভাবে সামরিক উপকরণ প্রেরণের কাজ নির্ভর করে ভারত গভর্ন-মেণ্টের উপর। কারণ উপকরণ প্রেরণের ব্যবস্থা করা ভারত গভর্নমেণ্টেরই দায়িত্ব।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এ কথা শোনার পরেও লিয়াকৎ মত পরিবর্তন করেননি এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকাল আরও বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি দাবী করলেন। ভারত চাইছিলেন ৩০শে নবেম্বর তারিখে অবশ্যই সুপ্রীম কম্যাণ্ড ভেঙে দিতে হবে এবং লিয়াকৎ চাইছিলেন, ৩০শে নবেম্বরের পরেও সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনের কাছ থেকেই পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে ৩০শে নবেম্বর তারিখেই ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যাই হোক, আর কোন যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। সুপ্রীম কম্যাণ্ডের শেষ হয়ে গিয়েছে। অকিনলেক মুক্ত হয়েছেন।

গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের যে বৈঠক হয়ে গিয়েছে, সে বৈঠকের আলোচনা থেকে একটা ভাল ফল লাভ করা গিয়েছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সুপ্রীম কম্যাণ্ড যদিও উঠে গেল, কিন্তু যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ থাকবে এবং যথারীতি নিয়মিত বৈঠকও হতে থাকবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন যে, তিনি আর এই পরিষদের চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন না। মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য হলো—পাকিস্থানের মনে যখন এ সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, ভারতের স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁর মনে বিশেষ একটা ঝোঁক রয়েছে, তখন তাঁর পক্ষে চেয়ারম্যান হয়ে থাকা আর উচিত হবে না।

কিন্তু পরিষদের শুধু ভারতীয় সদস্যেরা নয়, পাকিস্থানী সদস্যেরাও মাউণ্টব্যাটেনের এই সংকল্পে আপত্তি জ্ঞাপন ক'রে তাঁকে চেয়ারম্যানের পদে থাকবার জন্য খুব জোর পীড়াপীড়ি করলেন। অনেক দ্বিধার পর মাউণ্টব্যাটেন সম্মত হলেন।

জরুরি কমিটির শেষ বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। এর পর আর জরুরি কমিটি নয়, জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব গভর্নমেণ্টই এবার থেকে প্রত্যক্ষভাবে

বিবেচনা ও পালন করবেন। সব দায়িত্বের মধ্যে দুরূহতম হলো শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব।

এক্ষেত্রেও গভর্নমেণ্টের চিন্তায় দুটি নীতির সংঘাতে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের অভিমতে এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অভিমতে মিল দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বলছেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরেই সকল শরণার্থীর জায়গা হতে পারে না। পরিবার পিছু দশ একর জমি দিলে যত সংখ্যক লোকের জমি পূর্ব পাঞ্জাবে দেওয়া যেতে পারে, ঠিক তত সংখ্যক শরণার্থীই পূর্ব পাঞ্জাবে আশ্রিত হবে। বাকি সকলকে ভারতের অন্য প্রদেশে বা রাজ্যে জমি ও থাকবার জায়গা দিতে হবে।

অপর দিকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরেই জায়গা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট বলছেন, ভারতে পরিবার পিছু জমির পরিমাণ গড়পড়তা দুই একর মাত্র অথবা তারও কম। তা ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যত সংখ্যক মুসলমান চলে গিয়েছে, তার চেয়ে কম সংখ্যক অমুসলমান পাকিস্থান থেকে এসেছে। সুতরাং পূর্ব পাঞ্জাবে জায়গা হবে না কেন? ভারত গভর্নমেণ্ট পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরেই সকল শরণার্থীর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে চান। ভারত গভর্নমেণ্ট আর একটা বিষয়েও অবশ্য সচেতন আছেন। পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরে সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে জায়গা দিলে বস্তুত বিরাট সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে এক জায়গায় জমা করা হবে। আরও একটা স্মরণীয় বিষয় এই যে, এই নীতির ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শিখদের আনুপাতিক জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যাবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : কাশ্মীরের ঘটনা গত পনর দিনের মধ্যে নাটকীয় গতিতে দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তরের ভিতর দিয়ে অতি দ্রুত যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সে অবস্থার স্বরূপ ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্য যতটা পারছি নথিপত্র ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করছি; তা ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গেও অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রে নিয়েছি। কাশ্মীরের ঘটনা নিয়ে গত পনর দিনের আলোচনায় যে পরিমাণ কূটনীতিক প্রয়াস করতে হয়েছে, সেটা প্রায় বৎসরকালীন কোন কূটনীতিক প্রয়াসের সমান। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে, সে বিরোধ মিটিয়ে দেবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে চেষ্টা করেছেন। বলতে পারি, মাউণ্টব্যাটেন বস্তুত এক অসাধারণ শক্তিমান যোদ্ধার মতোই প্রবল চেষ্টা করেছেন। ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য হলো কাশ্মীর। একটা রাজ্য হিসাবে এ রাজ্যের গুরুত্ব যতই থাকুক না কেন, চল্লিশ কোটি অধিবাসী নিয়ে এক বিরাট উপ-মহাদেশের মধ্যে কাশ্মীর চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর একটা রাজ্য মাত্র। অথচ এই ধরনেরই একটি রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের জেদ যে একগুঁয়েমির উন্মত্ততা জাগিয়ে তুলছে, তার ফলে সমগ্র উপ-মহাদেশই দুই পক্ষের একটা সংঘর্ষক্ষেত্রে পরিণত হবে, এই আশঙ্কা অমূলক নয় বলেই মাউণ্টব্যাটেন এই উপ-মহাদেশকে ঐ অবাঞ্ছিত পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

ইস্‌মেও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। গত নবেম্বর মাসে এবং তার পর গত সপ্তাহে দিল্লীতে নেহরু এবং লিয়াকতের মধ্যে যে 'সৌহার্দ্যপূর্ণ'

আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে ইস্‌মে যা করেছেন, তাতে শান্তি স্থাপনের পক্ষেই বেশ কিছুটা কাজ হয়েছে। নেহরু ও লিয়াকৎ, এই দুই নেতার মধ্যে একটা সাক্ষাৎ ঘটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে অবশ্য মাউণ্টব্যাটেনকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কারণ সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্বে লিয়াকৎ নেহরুর কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে এমনসব কথা বললেন, যার ফলে নেহরু অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। লিয়াকৎ এই টেলিগ্রামে আবার শেখ আবদুল্লাকে 'কুইসলিং' আখ্যা দিলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত মুসলমানকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন, এই অভিযোগও লিয়াকৎ তাঁর টেলিগ্রামে উল্লেখ করলেন। তা ছাড়া পূর্বে একবার যে দাবী করেছিলেন, সেই দাবীও আবার নতুন ক'রে করলেন—কাশ্মীরে অবিলম্বে একটা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সরকার স্থাপন করতে হবে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নেহরু সে শ্রেণীর মানুষ নন, যাঁরা কারও সম্পর্কে একটা সঙ্গত কারণেও একবার বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ হলে আর তার মুখ দেখতেই চান না। কারও সম্পর্কে নেহরুর মন ক্ষুব্ধ হলেও সে ক্ষোভকে তিনি তুচ্ছ একটা অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে উঠতে দিতে চান না। মাউণ্টব্যাটেন দুই প্রধান মন্ত্রীকেই অনুরোধ করলেন যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর কাশ্মীরে যে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই বিষয়ে দুজনে যেন মুখোমুখি বসে আলোচনা করেন। অনুরোধের ফল হলো, এবং দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনাও হলো।

নেহরুর পক্ষ থেকে যা যা বলবার ছিল, তারই একটা প্রাথমিক অথচ দীর্ঘ বর্ণনা শোনালেন নেহরু। লিয়াকৎ সবে মাত্র অসুখ থেকে উঠেছেন, তাই তাঁর শরীরটাও খুব দুর্বল ছিল এবং তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নেহরুর বক্তব্য শেষ হবার পর লিয়াকৎ শুধু প্রাসঙ্গিক কতকগুলি প্রশ্ন করলেন নেহরুকে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা প্রস্তাবও করলেন। নেহরু কথা দিলেন যে, তিনি লিয়াকতের এই প্রশ্ন ও প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করবেন।

কোন আলোচনার ব্যাপারে বিষয়বস্তু-নিয়ামক প্রধান সূত্র তথা ফরমুলা রচনায় ইস্‌মের বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে। লিয়াকৎ যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেছেন, সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ আরও পরিচ্ছন্নভাবে একটা প্রামাণ্য রূপ দিয়ে লিপিবদ্ধ করলেন ইস্‌মে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন ভারতের ভি পি মেনন এবং পাকিস্থানের মহম্মদ আলি (বিভাগ পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য)। আগামী দুই দিন আবার আরও যে সব আলোচনা হবে, সেই আলোচনার প্রধান ভিত্তি হবে এই প্রস্তাবগুলি।

সংক্ষেপে প্রস্তাবগুলি হলো এই : বিদ্রোহী 'আজাদ কাশ্মীর'কে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য পাকিস্থান তাঁর সকল প্রভাব প্রয়োগ করবেন। তা ছাড়া উপজাতীয়েরা এবং অন্যান্য যে সকল 'আক্রমণকারী' কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে, যত শীঘ্র সম্ভব কাশ্মীর রাজ্য থেকে তাদের ফিরে যাবার জন্য এবং যাতে আর নতুন ক'রে পাকিস্থানের দিক থেকে কেউ আক্রমণের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের ভিতরে প্রবেশ না করে, তার জন্য পাকিস্থান তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করবেন। ভারত তার সৈন্যের অধিকাংশ কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। শুধু ভারতীয় সৈন্যের অল্পসংখ্যক কয়েকটি দল কাশ্মীরে থেকে যাবে, যেটা হলো সম্ভাব্য কোন হাঙ্গামা দমনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন এবং যা না থাকলেই নয়। কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র-পুঞ্জকে একটি কমিশন প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রেরিত

কমিশন ভারত, পাকিস্থান ও কাশ্মীরকে সেই সব ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করবেন, যে ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দভাবে এবং সততার সঙ্গে গণভোট নিষ্পন্ন হতে পারবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আর যে কতগুলি কাজ করবার প্রস্তাব হয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। যথা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং বাস্তুত্যাগীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা।

নেহরু-লিয়াকৎ আলোচনার মধ্যে ইস্‌মেও উপস্থিত থেকে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। আলোচনার শেষ দিকে এসে দুই প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য দুই প্রসঙ্গে এসে দাঁড়াল। তাতে বোঝা গেল যে, একটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। যদিও নেহরু ও লিয়াকৎ এখনো কোন প্রস্তাব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে একমত হননি, তবুও নেহরু প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিরই নানা দিক সমালোচনা ক'রে তাঁর আপত্তির কথাগুলি জানালেন। আর লিয়াকৎ চাইলেন, কাশ্মীর থেকে দুই পক্ষকেই সব সৈন্য সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই হলো লিয়াকতের প্রথম সর্ত। দ্বিতীয় সর্ত—গণভোটের আগে কাশ্মীরে একটি নিরপেক্ষ সরকার স্থাপন করতে হবে। তৃতীয় সর্ত—গণভোট যাতে নিরপেক্ষ হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। দিল্লীতে এসে লিয়াকৎ যে তিনটি সর্ত দাবী করলেন, তার মধ্যে তৃতীয় সর্তটিই পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে। আর আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে প্রথম সর্তটি। দেখা গেল যে, লিয়াকৎ তাঁর পূর্বতন বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মূলনীতিরও কিছুটা বর্জন করতে সম্মত হচ্ছেন। আলোচনার আসর থেকে চলে আসবার আগে ইস্‌মে এই বিশ্বাস নিয়ে এলেন যে, শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত একটা ফরমুলা পাওয়া গিয়েছে, যা কাজে লাগানো যাবে এবং কাজও হবে। রাজনৈতিক এবং শাসনিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজের প্রয়োজনে সত্যি সত্যি প্রয়োগ করা যেতে পারে, এরকম ফরমূলা এত দিনের মধ্যে এই প্রথম রচনা করতে পারা গেল। চলে আসবার আগে আলোচনার আসরে যে পরিবেশ দেখে এলেন ইস্‌মে, তাতে তিনি বেশ আশান্বিত হয়ে উঠলেন। মনে হলো, এতদিনে একটা সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি পাওয়া গেল। কিন্তু মন যাদের বিরূপ হয়ে আছে, তাদের সংশয়মুক্ত ও তুষ্ট করার কাজ মর্মান্তিকই বটে।

দু'দিন আগে, এবং মহম্মদ আলি বিমানযোগে করাচী যাত্রা করার মাত্র দু'ঘণ্টা পরেই মাউণ্টব্যাটেনকে একটা আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করতে হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বলেছেন যে, আজ পর্যন্ত এমন কোন কোন আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়েছে, যেখানে তিনি চরম মনঃপীড়া মাত্র লাভ করেছেন। দু'দিন আগে দেশরক্ষা কমিটির যে আলোচনাসভা হয়ে গেল, সে সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে ঐ ধরনের মনঃপীড়াই শুধু পেতে হয়েছে।

দেশরক্ষা কমিটির এই বৈঠকে উপস্থিত হলেন প্যাটেল এবং বলদেব সিং। এর আগে তাঁরা কমিটির বৈঠকে আর একবার এসেছিলেন। নিতান্ত এক দুঃখকর বার্তার দূতের মতো তাঁরা উপস্থিত হলেন। কাশ্মীরের রণাঙ্গন থেকে সবেমাত্র তাঁরা ফিরেছেন। যেসব সংবাদ ও তথ্য তাঁরা নিয়ে ফিরেছেন এবং ওদিকে নেহরুর কাছেও ভিন্ন সূত্রে যেসব সংবাদ এসে পৌঁছে গিয়েছে, তার ফলে মন্ত্রিসভার মনোভাব কঠিন হয়ে উঠেছে। অবিলম্বে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা সমর্থন করতে আর রাজি হচ্ছেন না এবং আপাতত পাকিস্থানের সঙ্গে আর কোন আলোচনা চালিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মন্ত্রিসভা মনে করেন না। প্রধানত তিনটি কারণে তাঁরা এরকম ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রথম কারণ হলো, সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে,

পশ্চিম পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক আক্রমণকারী ও উপজাতীয়ের সমাবেশ হয়েছে কাশ্মীরের উপর হানা দেবার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় কারণ, লিয়াকৎ দিল্লী থেকে লাহোরে পৌঁছবার পরমুহূর্তেই কাশ্মীরের উপর নতুন ক'রে আক্রমণ চালাবার জন্য তাঁর যতদূর সাধ্য সব চেষ্টা করেছেন, এই অভিযোগ। তৃতীয় কারণ, নির্মম অত্যাচারের, অমুসলমানদের নিঃশেষে হত্যা করার এবং কাশ্মীরী মেয়েদের বিক্রী করার অজস্র বীভৎস ঘটনার কাহিনী তাঁরা শুনেছেন এবং এখনো ঐ ধরনের ঘটনার সংবাদ অনবরত তাঁদের কাছে আসছে। সম্ভবত এই তৃতীয় কারণটিই তাঁদের মনের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে বেজেছে এবং তাঁদের মনের ভাবও দুঃসহ বেদনাকর উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে উঠেছে।

নেহরু ও লিয়াকতের মধ্যে আর একবার সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন একটা উপায় খুঁজে বের করলেন। লিয়াকতের কাছে তিনি এই সুবুদ্ধির প্রস্তাবটি ক'রে পাঠালেন যে, লিয়াকৎ যেন নেহরুর সঙ্গে আবার আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে এবং সেই সঙ্গে আলোচনার তারিখটিও একেবারে সুনির্দিষ্ট ক'রে নেহরুকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দেন। লিয়াকৎ তাই করলেন এবং একথাও নেহরুকে জানালেন যে, দুই গভর্নমেণ্টের দুই প্রতিনিধির মধ্যে বরাবর সাক্ষাৎ হওয়া এবং মুখোমুখি বসে আলোচনা করবার রীতিটা চালিয়ে যাওয়াই রক্তারক্তির ব্যাপার বন্ধ করবার একমাত্র পন্থা। লিয়াকতের এই কথাগুলির মধ্যে যে সদিচ্ছার ভাব ফুটে উঠেছে, সেইটুকু লক্ষ্য ক'রে নেহরু তৎক্ষণাৎ লিয়াকতের অনুরোধে সাড়া দিলেন। গত সোমবার যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের যে বৈঠক হবার কথা ছিল, সেই বৈঠকে যোগদানের জন্য নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে লাহোরে উপস্থিত হলেন।

বিকাল তিনটার সময় আরম্ভ হলো কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং শেষ হলো গিয়ে মধ্য রাত্রিতে। মাঝে মাত্র একবার ডিনারের জন্য কিছুটা সময় ছাড়া এই পুরোপুরি সাত ঘণ্টাকালের মধ্যে আলোচনায় কোন ছেদ পড়েনি। মোটামুটি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই এই আলোচনা চলতে পেরেছে যদিও মাঝে মাঝে কিছু কিছু কড়া কথারও বিস্ফোরণ ঘটেছে।

দু'জনের ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী অভিমত ও দাবীগুলিকে একটা সামঞ্জস্যের সূত্রের মধ্যে আনবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন চেষ্টা করলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি মতো যত উপায় তাঁর জানা ছিল, সব উপায়েই তিনি চেষ্টা করলেন এবং শেষে শুধু এইটুকুই উপলব্ধি করলেন যে, চেষ্টা ক'রে আর কোন ফল হবে না। আলোচনা সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। ভিতর ও বাহিরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের চাপ এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তার প্রকোপের মধ্যে থেকে কোন আলোচনা সার্থক-ভাবে আর চলতে পারে না। মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন, এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বশক্তি আছে এমন কোন একটি তৃতীয় পক্ষ যদি দুই পক্ষের সম্মতি ও সমর্থনে নিযুক্ত হয়ে কিছু করার চেষ্টা না করে, তবে এই নিরেট অচল-অবস্থা কখনো সচল হতে পারবে না।

এই অবস্থা দেখে এবং প্রয়োজন হয়েছে বুঝে মাউণ্টব্যাটেন এইবার তাঁর একটি প্রস্তাব আলোচনার মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। প্রস্তাবটি হলো, দুই পক্ষের এই বিরোধের মীমাংসায় এখন রাষ্ট্রপুঞ্জকেই এসে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করতে বলা উচিত। লিয়াকৎ এই প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন। লিয়াকৎ বললেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি এই বিরোধে মীমাংসার পন্থা নির্ণয় ও আলোচনায় তৃতীয় পক্ষের

স্থান গ্রহণ করেন, তবে হানাদারদের থামতে বলার ও থামবার জন্য যে ব্যবস্থা করা দরকার, সেটা তাঁর পক্ষে করা সহজ হবে। জিন্না অবশ্য আগে যে কথা বলেছিলেন, তাতে বোঝা গিয়েছিল যে, করাচী থেকে নির্দেশ দেওয়ামাত্রই হানাদারেরা সে নির্দেশ শুনবে এবং আক্রমণ থামাবে। কিন্তু এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে লিয়াকৎ যা বললেন, তাতে জিন্নার ঐ উক্তি সমর্থিত হয় না। নেহরু জানতে চাইলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের কোন্ ধারা অনুসারে এই বিরোধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জকে তৃতীয় পক্ষ হয়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা যেতে পারে? এরকম কোন ধারা আছে কি?

মাঝ রাত্রিও পার হতে চলেছিল। তাই মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, এবিষয়ে আরও ভাল ক'রে জানবার এবং বিবেচনার প্রয়োজন আছে। এখনি স্পষ্ট ক'রে কিছু বলা যাচ্ছে না। নেহরু উদাসভাবে মাথা নাড়লেন। সমাপ্ত হলো আলোচনা-সভা। আলোচনা ব্যর্থ হলো, শুধু সম্মুখে রইল নতুন একটা পরিকল্পনার ইঙ্গিত।

দিল্লীতে ফিরে আসার পর মাউণ্টব্যাটেন গান্ধী এবং ভি পি মেননের সঙ্গে দেখা করেছেন। গান্ধী এবং মেনন দু'জনেই রাষ্ট্রপুঞ্জকে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় আমন্ত্রণ করবার প্রস্তাবের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। আজ এবিষয়ে নেহরুর সঙ্গে আর একবার আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। দেখা গেল যে, লাহোর বৈঠকে ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে নেহরুর মনোভাবে যে বিরুদ্ধতা ছিল, এখন সেটা কিছুটা কমেছে।

আজ রাত্রে বিভিন্ন দেশের কূটনীতি বিভাগের লোকদের জন্য একটা ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিনারের পর গভর্নমেণ্ট হাউসের সিনেমা-কক্ষে রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ উৎসবের ছবিও দেখানো হলো। আর দেখানো হলো কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের একটি ফিল্ম। ফিল্মটি সুদৃশ্য হয়েছে বলা যায় না এবং প্রপেগ্যাণ্ডার দিক থেকেও সুবিধার হয়নি। এই ফিল্মে এক সুদীর্ঘ ও জাঁকালো শটে তোলা একটি দৃশ্যে নানা ধরনের নরাধম গোছের চেহারার অনেকগুলি লোককে দেখলাম। এদের বলা হয়েছে—'ধৃত উপজাতীয় হানাদার।' ফিল্মের এই ধৃত উপজাতীয় হানাদার দলের মধ্যে একটি চেনা মুখও দেখলাম, শান্ত ও ভদ্র চেহারার এক সাংবাদিকের মুখ। বন্দী উপজাতীয় হানাদারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, টাইমস্ পত্রিকার এরিক ব্রিটার।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল: দিগ্বলয়ে আবার কৃষ্ণমেঘ দেখা দিয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিসর্গে এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, আকাশের একদিক সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং অপরদিকে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। সূর্য অস্তগত হবার আগেই মাথার উপর ঝড়ের আক্রোশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

ভারতের রাজনীতির আকাশেও এই দৃশ্যই দেখা দিয়েছে। মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, ঝড় আসছে, যদিও এখনো সূর্যের আলো নিভে যায়নি। গভর্নমেণ্ট হাউসে বসে আমরা একে একে যেসব খবর পাচ্ছি, তাতে এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঘটনার গতি হঠাৎ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর-সঙ্কট এখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হবার জন্য দ্রুতগতিতে নতুন বিরোধের পথে এগিয়ে চলেছে।

প্যাটেল একটি কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। পাকিস্থান যদি কাশ্মীরের হানাদারদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ না করে, তবে পাকিস্থানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা ও চুক্তি ভারত গভর্নমেণ্ট প্রতিপালন করবেন না। অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী পাকিস্থানকে এখন প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা ভারত

গভর্নমেণ্টের প্রদান করার কথা। পাকিস্থানের এই পাওনা এখন ভারত যদি মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করেন, তবে পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হবে। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিণামের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এ প্রস্তাবের আর্থিক তাৎপর্যও যে খুবই সাংঘাতিক। পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারে এখন মাত্র দুই কোটি টাকা 'রিজার্ভ' আছে, তা ছাড়া আছে বহু পরিমাণ জরুরী ঋণের দায়। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই মাত্র একটি যুক্তি দেখানো হবে যে—"কেন পাকিস্থানকে টাকা দেব, যে টাকা দিয়ে পাকিস্থান অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করবে আমাদেরই সৈনিকদের মারবার জন্য?" অনুমান করছি, মন্ত্রিসভার বৈঠকেও যখন প্যাটেলের এই প্রস্তাব উত্থাপিত হবে, তখন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি খুব সম্ভব উত্থাপিত হবে না।

ভারতীয় নেতারা তাঁদের নিজ নিজ সন্ধানসূত্রে ক্রমশ খুব বেশি ক'রেই প্রমাণ পেতে আরম্ভ করেছেন যে, উপজাতীয় হানাদারদের এই কাশ্মীর অভিযানের পিছনে পাকিস্থানেরই অভিসন্ধি ও সমর্থন কাজ করছে। প্রধানত এই কারণেই পাকিস্থান সম্বন্ধে ভারতীয় মনোভাব কঠোর হয়ে উঠছে। অনেকে কাশ্মীরের ঘটনাবলীকে বৃহত্তর পাকিস্থানী চক্রান্তের একটা দিক অথবা অংশ বলে মনে করছেন। এ'দের ধারণা, পাকিস্থান কাশ্মীরের উপর হানাদারী উপদ্রব সৃষ্টি ক'রে ভারতীয় বাহিনীকে কাশ্মীরের মধ্যে টেনে আনবার মতলব করেছে। কাশ্মীরের ভিতরে ভারতীয় বাহিনীকে এই কৌশলে ব্যস্ত ক'রে রাখবার পর পাকিস্থান হায়দরাবাদের ভিতরে উপদ্রব সৃষ্টি করবে, তার পর এদিকে পাঞ্জাব সীমানা পার হয়ে সোজা মার্চ ক'রে একেবারে দিল্লীতে এসে ঢুকবে।

এই গবেষণার তুলনায় একটু কম উদ্ভট আর একটা অভিমত প্রচারিত হতে আরম্ভ করেছে, যদিও অভিমতটা কম বিপজ্জনক নয়। পাকিস্থান যদি হানাদার-দের কাশ্মীর-প্রবেশে বাধা দিতে না পারে, তবে হানাদারদের নিবৃত্ত করা ভারতেরই কর্তব্য। হানাদারদের কাশ্মীর-প্রবেশ বন্ধ করতে হলে ভারতীয় বাহিনীর পাকি-স্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পাকিস্থান যদি বাধা দেয়? এ প্রশ্নের উত্তর এক শ্রেণীর আলোচনাকারী খুব সহজেই দিয়ে দিচ্ছেন। উত্তর হলো—তা'হলে যুদ্ধ হবে। জাল যুদ্ধের চেয়ে খাঁটি যুদ্ধই ভাল।

সরকারী মহলের মনে আর একটা আশঙ্কা জেগেছে। কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শিখ-সমস্যা আবার কোন্ রূপ গ্রহণ ক'রে বসে তার কোন ঠিক নেই। কাশ্মীরের বিরোধ ও সংঘর্ষ যত বেশি দিন চলতে থাকবে, শিখদের সামলে রাখা ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে ততই কঠিন হয়ে উঠবে। আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, এই সময় যদি লিয়াকতকেই দিল্লীতে আনিয়ে একটা সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন না করানো যায়, তবে অবস্থা অতিদ্রুত এবং বিপজ্জনকভাবে আরো খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেই। এটাও অবশ্য বুঝতে পারছি যে, শান্তির অনুকূল কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব যদি লিয়াকৎ উত্থাপন করেন তবে তাঁর দেশ ও সহকর্মীদের পক্ষে সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া খুবই কঠিন হবে।

উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ পরিভ্রমণ ক'রে দিল্লীতে ফিরেছেন প্যাটেল। অক্লান্ত-কর্মা ভি পি'র সহযোগিতায় প্যাটেল ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির আর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের উনচল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য এর আগেই রাষ্ট্রভুক্ত হয়েছিল। নিতান্ত রাষ্ট্রভুক্ত অবস্থা

থেকে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্যাটেল আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসে একেবারে ভারতের সাধারণ শাসিত অঞ্চলের অঙ্গীভূত ক'রে ফেলেছেন। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি উড়িষ্যা প্রদেশের এবং ছত্রিশগড়ের রাজ্যগুলি মধ্যপ্রদেশের সাধারণ শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। প্রায় সত্তর লক্ষ প্রজার উপর শাসনকার্য পরিচালনা করবার কোন কর্তৃত্ব উনচল্লিশটি দেশীয় রাজার হাতে আর রইল না, সব কর্তৃত্ব প্রাদেশিক ও ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্টের হাতে চলে গেল। রাজাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উপাধি এবং সম্পত্তির বংশানুক্রমিক অধিকার অবশ্য ক্ষুণ্ণ করা হলো না।

এই প্রসঙ্গে সাইমন কমিশনের একটি প্রস্তাবের কথা মনে পড়ছে। কমিশনের একটি সাব-কমিটি, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন সাইমনের এক জুনিয়র সহকর্মী—অখ্যাত ও অজ্ঞাত এটলি। সেই সাব-কমিটিই প্রথম সুপারিশ করেছিলেন যে, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিকে উড়িষ্যা প্রদেশেরই সাধারণ শাসিত অঞ্চলে পরিণত ক'রে ফেলা উচিত।

মাউণ্টব্যাটেন পরিবারও বোম্বাই এবং জয়পুর পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। আগামী গ্রীষ্মে ভারত থেকে বিদায় নেবার আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ ও প্রধান দেশীয়-রাজ্যে একবার পরিভ্রমণ ক'রে আসতে হবে। এর অর্থ হলো, পূর্বে প্রত্যেক ভাইসরয় পাঁচ বছরের মধ্যে যে পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করতেন, মাউণ্টব্যাটেনকে পাঁচ মাসের মধ্যে তাই করতে হবে।

আজ মাউণ্টব্যাটেনের জামাতা জন ব্র্যাবোর্ণ এবং বড় মেয়ে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যাবোর্ণ এখানে এসেছেন এবং তিন মাস থাকবেন। জনের পিতা বোম্বাই ও বাংলার গভর্নর হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ছয় মাসের জন্য ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মহলে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। অকালে মৃত্যু না হলে তিনিই ভারতের স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল হতেন। প্রাচ্য প্রদেশের পরিবেশের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের অনুরাগের ইতিহাসও মিশে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ড নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৫ সালে পূর্ব-এশিয়াতে যখন ছিলেন তখনই জন ও প্যাট্রিসিয়ার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জন ও প্যাট্রিসিয়ার পিতা-মাতাও এই ভারতেই ১৯২২ সালে বিবাহের অঙ্গীকারসূত্রে মিলিত হয়েছিলেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : বি বি সি'র রবার্ট স্টিমসনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আজ কতকগুলি নতুন কথা জানতে পারলাম। স্টিমসন পনর দিন করাচীতে থেকে আজ ফিরেছেন। জিন্নার সঙ্গে স্টিমসন দেখা করেছিলেন। পাকিস্থান কমনওয়েলথে থাকবে কি না থাকবে, এবিষয়ে জিন্না অনেক কথা স্টিমসনকে বলেছেন। জিন্না অভিযাগ করেছেন যে, পাকিস্থানকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অবহেলা করছেন।

স্টিমসনের অন্যান্য কথা থেকে আমি এবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম যে, পাকিস্থানের সংবাদপত্রে এখন যে তুমুল মাউণ্টব্যাটেন-বিরোধী প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছে, তার মূল প্রেরণাদাতা ও উদ্যোক্তা হলেন স্বয়ং জিন্না। কোন বিশেষ একটি তথ্য বা ঘটনাকে উল্লেখ ক'রে নয়; মাউণ্টব্যাটেনকেই ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য ক'রে এই প্রচার অভিযান চালিত হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল, সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন অত্যন্ত হিন্দুভক্ত এবং মুসলিমবিরোধী—এই হলো পাকিস্থানের প্রচারিত সকল বক্তব্যের মূল সূত্র। মাউণ্টব্যাটেন মাত্র একটি ডোমিনিয়নেরই গভর্নর-জেনারেল।

এই অবস্থায় কোন্ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করলে, মাউণ্টব্যাটেনকে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি অপ্রস্তুত করা যায়, সেটা জিন্না বুঝেছেন এবং ঠিক সেই অভিযোগ ক'রেই প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন।

অবশ্য পাকিস্থানের অন্যান্য দায়িত্বশীল মহলে ভিতরে ভিতরে এ সত্য স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হওয়ায় ভারত-পাকিস্থান বিরোধ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু জিন্নার আচরণ দেখে ধারণা করতে হয় যে, তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে পাকিস্থানের বিরোধী বলেই একটা দৃঢ় ধারণা ক'রে বসে আছেন। জিন্নার বিশ্বাস, ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত মাউণ্ট-ব্যাটেন পাকিস্থানের ক্ষতি ক'রে চলেছেন। বিশেষ ক'রে কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক খারাপ ক'রে দেবার চেষ্টা করছেন মাউণ্টব্যাটেন। এই অভিযোগের সমর্থনে একটা প্রমাণও পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রায়ই উল্লেখ করা হচ্ছে। সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতের সমগ্র অঞ্চলের শতাংশের মাত্র তিন অংশ সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় উপদ্রুত হয়েছে। পাকিস্থানের মতে, এই উক্তি হলো মাউণ্টব্যাটেনের মুসলিমবিদ্বেষ ও হিন্দুপ্রীতির একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

শনিবার দিন ভারত মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করবেন। কাশ্মীরের উপর আক্রমণে রত উপজাতীয় হানাদারদের সাহায্য করেছে এবং করছে পাকিস্থান, আবেদনে এই অভিযোগ করা হবে। গত সোমবার থেকে লিয়াকৎ আলি এবং মহম্মদ আলি দিল্লীতে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে, আজ এবং কাল। কিন্তু আলোচনা থেকে এমন নতুন কোন ফল পাওয়া যায়নি, যার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে তাঁদের ঐ কঠিন সিদ্ধান্ত বাতিল করা বা স্থগিত রাখা সম্ভবপর হতে পারে। কোন্ পক্ষ কত হত্যাকাণ্ড করেছে, তারই হিসাব ও পাল্টা হিসাব নিয়ে দুই পক্ষেরই তর্কে ও প্রতিবাদে আলোচনার বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোন রাষ্ট্রের সম্পর্কে অভিযোগ করতে হলে আগে অভিযুক্ত রাষ্ট্রকেই একটি অভিযোগপত্র দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দেবার নিয়ম আছে। নেহরু আজ লিয়াকতের হাতে সেই অভিযোগপত্রটি দিয়ে দিয়েছেন। লিয়াকৎ কথা দিয়েছেন যে, তিনিও এই অভিযোগপত্রের উত্তর যথানিয়মে জানিয়ে দেবেন।

এইখানে শেষ হলো কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনীতিক ও কূটনীতিক সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : এ সপ্তাহের প্রথম দিকে লিয়াকৎ দিল্লীতে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নেহরুর আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আলোচনা বিফল হয়েছে। কাশ্মীর এবং পাকিস্থানের পাওনা টাকা, এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে বিরোধের সমস্যা এখন আরও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে কাশ্মীর ভারতীয় সৈন্যদেরই বেশী অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করেছে। মাউণ্টব্যাটেন পূর্বেই এবিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক ক'রে দিয়ে-ছিলেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে কতগুলি বিশেষ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হবে। মাউণ্টব্যাটেন একথাও বলেছিলেন যে, কাশ্মীরে এমন বিশেষ কতগুলি বাধা ও অসুবিধা আছে যার জন্য ভারতীয় বাহিনী তার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবার অথবা ইচ্ছামতো অগ্রসর হবার সুযোগ পাবে না। মাউণ্ট-

ব্যাটেনের অনুমান সত্য হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ফিনল্যাণ্ডে রুশ বাহিনীকে যে ধরনের অসুবিধায় বিব্রত হতে হয়েছিল, ভারতীয় বাহিনীকেও কাশ্মীরে সেই ধরনের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। ফিনল্যাণ্ডে রুশ বাহিনী অস্ত্রবলে ও জনবলে যদিও প্রতিপক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ছিল, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের পার্বত্য অধিত্যকার প্রকৃতি এবং গঠন এমনই যে, সেখানে রুশ বাহিনীকে অনেক অসুবিধায় বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল। কাশ্মীরেও ভারতীয় বাহিনীকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সামরিক বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি ভারত গভর্নমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, ভারতীয় বাহিনীর আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। ভারতীয় বাহিনী যতদূর অগ্রসর হয়ে এখন যে স্থানে পৌঁছেছে, সেই স্থান পর্যন্ত সংযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাই এখন খুব দুরূহ হয়ে উঠেছে। মাউণ্টব্যাটেনের অভিমত, অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনীর সংযোগ-পথের দূরত্ব আর বৃদ্ধি ক'রে লাভ নেই। সবচেয়ে অগ্রবর্তী গ্যারিসনগুলি এরই মধ্যে বেকায়দায় পড়েছে এবং নানা অসুবিধায় উপদ্রুত হচ্ছে। পুঞ্চের গ্যারিসনের সঙ্গে শেষ সরবরাহ কেন্দ্রের সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু বিমানযোগে পুঞ্চ শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। ঝানগড়ে অবস্থিত দুটি পদাতিক কোম্পানি প্রায় ছয় হাজার সংখ্যক বিপক্ষ সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ফলে ভারতীয় পদাতিকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশি হয়েছে। ঝানগড়ের গ্যারিসনের সাহায্যের জন্য যে নতুন সৈন্যদল এগিয়ে গিয়েছিল, তারাও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সবচেয়ে সাংঘাতিক সংবাদ হলো, উরির কাছে শত্রুপক্ষের বিরাট ও প্রচণ্ড সৈন্য সমাবেশের সংবাদ। ভারতীয় বাহিনীর একটি দলের বর্তমান লক্ষ্য হলো কাশ্মীরের সীমান্তে অবস্থিত ডোমেল। ডোমেল অভিমুখী ভারতীয় সৈন্য এখন উরি অধিকার ক'রে রয়েছে। উরি ছাড়িয়ে ভারতীয় সৈন্য আর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু শত্রুপক্ষের আক্রমণে এখন যদি ভারতীয় বাহিনীকে উরি ছেড়ে দিয়ে পিছনে হঠে আসতে হয়, তবে নতুন ক'রে বরমুলা, শ্রীনগর, ও সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে পূর্বের মতোই আবার অগ্রগামী শত্রুর আক্রমণের প্রকোপে সহজেই পড়তে হবে।

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, উরি যদি ভারতীয় বাহিনীর অধিকারচ্যুত হয়, তবে ভারত গভর্নমেণ্টেরই অভিমতের উপর তার একটা নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারী মহলে এই ধারণাই দৃঢ়তর হবে যে, হানাদারদের ঘায়েল করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল পন্থা হলো হানাদারদের মূল ঘাটিগুলি আক্রমণ করা। হানাদারদের সব ঘাটি এবং 'প্রেরণা-কেন্দ্র' পশ্চিম পাঞ্জাবেই অবস্থিত। সুতরাং হানাদারদের ঘাটি আক্রমণ করার অর্থ পাকিস্থানের অভ্যন্তরে সৈন্য চালনা করা। এর অর্থ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ।

আজ সকাল সাড়ে এগারটার সময় মাউণ্টব্যাটেন এক ঘরোয়া বৈঠকে রোণি, ভের্নন ও আমাকে ডাকলেন। ভি পি'ও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বড়দিন উপলক্ষে নেহরুকে একটি পত্র দেবেন মাউণ্টব্যাটেন। সেই পত্রেরই একটা খসড়া আমাদের এ বৈঠকে আলোচিত হবে। এই পত্রে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমি আর একটি প্যারা এই পত্রে যুক্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব করলাম। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারত যদি যুদ্ধে

লিপ্ত হয়, তবে নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির স্বাধীনতা এবং ভারতের সামাজিক প্রগতি সাধনের সকল ভরসা কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে, একটি নতুন প্যারাতে তাই উল্লেখ করা হলো। ভি পি বললেন, এ বিষয় উল্লেখ করলে পত্রের তাৎপর্য আরও উন্নত হবে। মাউণ্টব্যাটেন এই নতুন প্যারা পত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হলেন।

আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আজ যে পত্র নেহরুকে মাউণ্টব্যাটেন পাঠিয়ে দিলেন, সে পত্রের মূল বক্তব্য ভবিষ্যতের ঘটনার পরীক্ষায় সত্য ও যথার্থ বলেই প্রমাণিত হবে। নেহরুকে আজ এমন একটি সমস্যার ভিতর পথ খুঁজতে হচ্ছে, যে সমস্যার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার আবেগও জড়িয়ে রয়েছে। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, কাশ্মীরী আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বন্ধুত্বও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। সুতরাং কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে কোন মনোভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় কাশ্মীরের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের টান তুচ্ছ করা অথবা বিস্মৃত হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসেই আমি আমার মাতার কাছে লিখিত একটি পত্রে লিখেছিলাম :

"নৈতিক সত্য উপলব্ধি করবার মতো মন এবং সত্যের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করার মতো আত্মিক শক্তি নেহরুর যথেষ্ট আছে। এই কারণেই তিনি প্রতিদিনের নানা রকম সরকারী দায়িত্ব ও শাসনকার্যের সঙ্কটেও তাঁর বিচারশক্তিকে তুচ্ছ সুবিধা ও মিথ্যার ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন। এমনকি, নিজের মনের ইচ্ছা ও অভিরুচির আবেগ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সদসৎ বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।"

কাশ্মীরের কথা চিন্তা করতে গিয়ে নেহরু তাঁর মনের ভিতর যে বেদনা অনুভব করছেন, তার প্রমাণ বেশি স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেন আজ মন্তব্য করলেন যে, নেহরুর সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা দুশ্চিন্তা আছে। মাউণ্টব্যাটেনের আশঙ্কা, নিছক ঘটনা ও অবস্থার চাপে পড়ে নেহরু তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে হয়তো এমন এক মানসিক অবস্থা লাভ করবেন, যখন তিনি সত্য সত্যই অন্যের তোয়াজ ও তোষামোদে প্রভাবিত হয়ে পড়বেন। এইখানেই বিপদ। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এটা যে কত বড় এবং কি রকমের বিপদ, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। এই কারণেই তিনি আগামী এপ্রিলের পরে আরও কিছুকাল গভর্নর-জেনারেল হয়ে থাকবার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারছেন না। বরং আবার সমুদ্রের সার্ভিস নিয়ে কোন নিম্নতর পদে ফিরে যাওয়াই ভাল।

প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন—নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ভারতে থাকতে হবে। এর অর্থ, আর এক বছর ভারতে থাকা। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন, আর এক বছর ভারতে থাকলে তাঁর পক্ষে একটা মস্ত ভুল করা হবে। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করেন, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকা ভারতেরই পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন যদি নতুন সংবিধানের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন, তবে তাঁকেই বস্তুত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রাষ্ট্রিক রূপের আর একটা বৃহৎ পরিবর্তনের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ ক'রে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল এক ভারতীয় প্রেসিডেণ্টকে প্রজাতন্ত্র ভারতের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দেখে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলে এই ধারণাই প্রচারিত হবে যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের প্রজাতান্ত্রিকতারই সমর্থন করছেন। তার ফলে ভারতের মনে কমন-

ওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার আগ্রহও কমে যাবে। সুতরাং এপ্রিল মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র চলে যাওয়াই ভাল। তাহলে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ব্যাপারেই পরিণত হতে পারবে—ভারতীয় গভর্নর-জেনারেলের বদলে ভারতীয় প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব। এই পরিবর্তনই হবে স্বাভাবিক, সহজ ও স্বচ্ছন্দ পরিবর্তন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ আগে নেহরুর কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের চিঠির উত্তর এসেছে। চিঠির উত্তর বটে, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের প্রত্যেকটি বক্তব্য বিবেচনা ক'রে নেহরু যে তাঁর পক্ষের বক্তব্য এ চিঠিতে জ্ঞাপন করেছেন, তা নয়। বোঝা যায়, গতকাল রাত অনেক হয়ে যাবার পর তিনি এই উত্তর লিখেছেন। নেহরু তাঁর চিঠিতে এই ত্রুটি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর মনের একই কথা অনেক সময় বড় বেশি ক'রে এবং বার বার বলে থাকেন এবং কখনো বা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতেই পারেন না। নেহরুর এই উক্তি সত্ত্বেও তাঁর চিঠির তাৎপর্য আমরা খুবই স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম, কাশ্মীর সম্বন্ধে এখনো তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কাশ্মীর আপাতত যে সমস্যা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যাকে প্রতিরোধ করার কথাই তিনি চিন্তা করছেন। যাই হোক, এটাও বোঝা গেল যে, লিয়াকৎ আলির কাছ থেকে ভারতীয় অভিযোগপত্রের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষায় না থেকে তিনি কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছেন।

লিয়াকৎ আলির উত্তর আসবার আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এটা অবশ্য খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের মতে, আর এক দিক দিয়ে এটা ভালই হলো। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে এখন যত বেশি সময় পার ক'রে দেওয়া যায় ততই ভাল। বড়দিনের এই সপ্তাহে কাশ্মীরকে কেন্দ্র ক'রে দুই পক্ষের মনের ভাব যে রকম উত্তেজিত হয়েছে, ত'তে এখন অন্যদিকে মন দেবার দরকার হলে সমস্যা আরও খারাপ পরিণাম থেকে আপাতত রক্ষা পেয়ে যাবে। এখন বৃহত্তর বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখার একমাত্র পন্থা হলো, কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টাকেই ঠেকিয়ে রাখা। কাজেই আলোচনায় ও বিবেচনায় এখন কিছুটা সময় কাটিয়ে দেবার সুযোগ যদি পাওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা কল্যাণকর হবে বলেই মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও একটা কাজ করেছেন। তিনি এটলিকে টেলিগ্রাম করেছেন। টেলিগ্রাম করার আগে তিনি অবশ্য নেহরুকে জানিয়েছেন এবং নেহরুর সম্মতিও আদায় ক'রে নিয়েছেন। এটলির কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, এটলি যেন দুই ডোমিনিয়নের দুই প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অবিলম্বে বিমানযোগে চলে আসেন।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য খুব বেশি ভরসা করতে পারছেন না যে, তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে এটলি এ সময় এখানে আসতে সম্মত হবেন। এই সংকটে যথাকর্তব্য পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন যতটা সচেতন হয়েছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে অন্তত ততটুকু সচেতন করার জন্যই এই অনুরোধ করবার প্রয়োজন ছিল। মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকেও এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, নেহরু যেন নিজেও ভিন্নভাবে এটলির সঙ্গে পত্রযোগে আলোচনা করেন।

মাউণ্টব্যাটেন আজ গোয়ালিয়র চলে গেলেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে পুরাতন ১৯৪৭, কিন্তু রেখে যাচ্ছে একটা অনিশ্চয়ের আশঙ্কা। সাধারণভাবে ভারত-পাকিস্থানের সম্পর্ক এবং বিশেষভাবে কাশ্মীর, এই দু'য়ের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তিত হবার মতো সব লক্ষণ বর্তমান ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ১৯৪৭ সাল। যে বিপুল কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়ে বিগত নয়টি মাস আমাদের চলতে হয়েছে, তার লাভ-লোকসানের পরিমাণ খতিয়ে হিসেব করা খুবই দুরূহ। যে অবস্থা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং অচিরেই দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে, এখন সেই অবস্থার চিন্তাটাই আমাদের মন ও মনোযোগের সবখানি গ্রাস ক'রে রয়েছে।

১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে সঙ্কট কোন্ রূপ গ্রহণ করবে, তা স্পষ্ট ক'রে অনুমান করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সঙ্কটের অন্তত একটা দিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আর একটি কারণে। এটলির মনোভাব। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে এটলিকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ ও চেষ্টা করার জন্য যে অনুরোধ করা হয়েছিল, সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে অসম্মতি জানিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেনও অনুমান করেছিলেন যে, এটলি ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন। এটলি জানিয়েছেন যে, কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে কিছু করার মতো তাঁর কোন সুস্পষ্ট কর্তব্যের ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করেন না। সাধারণভাবে 'কনসিলিয়েটর' বা আপোষকারী বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে বেশি কোন দায়িত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে এটলি রাজি নন। এ বিরোধে মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্র-পুঞ্জের যথাবিহিত সংস্থাগুলিকেই তিনি বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। যাই হোক, এটলি নেহরুকে অত্যন্ত সুলিখিত একটি পত্র দিয়েছেন এবং সেই পত্রে নেহরুকে একটু বুঝে চলবার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন।

এটলির উত্তর পাওয়ার পর গভর্নমেণ্ট আর লিয়াকতের উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন না। অবিলম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করবার সিদ্ধান্ত করেছেন গভর্নমেণ্ট।

মাউণ্টব্যাটেন এখন রয়েছেন গোয়ালিয়রে। এদিকে গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে প্রেরণ করার আবেদনপত্রের বক্তব্য রচনা ক'রে ফেলেছেন। আবেদনপত্রের সকল বক্তব্য এবং ভাষা মাত্রাসম্মতই হয়েছে, শুধু একটি ছাড়া, যেটা দুশ্চিন্তার কারণ না ঘটিয়ে পারে না।

আবেদনপত্রে অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে একটি বাক্যে এই মনোভাবও প্রকাশ করা হয়েছে যে, অবস্থা বুঝে যদি প্রয়োজন মনে হয়, তবে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সম্পূর্ণ অধিকার গভর্নমেণ্টের আছে বলেই গভর্নমেণ্ট মনে করেন। মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন, নিরাপত্তা পরিষদের মনে এই ধরনের কথার প্রতিক্রিয়া খুব খারাপই হবে। আবেদনপত্রের বক্তব্যে কোন রকম শাসানির কথা, এমনকি শাসানির ইঙ্গিত মাত্র থাকলেও নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টিকে ভাল চক্ষে দেখবেন না।

সামরিক ব্যবস্থা হিসাবে ভারত পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিতর সৈন্য চালনা বা অভিযান করলে সে ঘটনার তাৎপর্য কি হয়ে উঠবে, তার সকল দিক মাউণ্টব্যাটেন তাঁর যথাসাধ্য নেহরুকে বুঝিয়েছেন। একদিকে সমস্ত সমস্যাটা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিবেচনার অধীন হয়ে রইল, আর এক দিকে ভারত পাকিস্থানের উপর সামরিক অভিযান চালিয়ে দিলেন, এই অবস্থা হলে তার ফল কি দাঁড়াবে? এর ফলে ভারত সম্বন্ধে বিশ্বের জনমতে যে বিরুদ্ধ ধারণা প্রবল হয়ে উঠবে, সেটা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকরই হবে। তা ছাড়া আর একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধেও

মাউণ্টব্যাটেন বললেন। ভারত ও পাকিস্থানে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হলে ভারত ও পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার তখনি চলে যেতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হবে। এভাবে ব্রিটিশ অফিসারেরা হঠাৎ চলে গেলে অবশ্য ক্ষতিটা ভারতের তুলনায় পাকিস্থানেরই বেশি হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই হবে।

যাই হোক, আমার মনে হয়, নেহরু একটি বিষয়ে বিশেষভাবেই সচেতন আছেন যে, এই অবস্থা ঘটলে ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের সকল চেষ্টার ইতিহাস সেই মুহূর্তে সমাপ্ত হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে অভিযোগ-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারত। অভিযোগ সম্বন্ধে যথাবিধি যে বিজ্ঞপ্তি-পত্র নেহরু লিয়াকৎকে দিয়েছিলেন, তার প্রত্যুত্তরও চলে এসেছে লিয়াকতের কাছ থেকে, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের অভিযোগ চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

লিয়াকতের প্রত্যুত্তর হলো ভারতের বিরুদ্ধে কতগুলি পাল্টা অভিযোগের এক সুদীর্ঘ তালিকা। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ ছাড়া আরও বহু প্রসঙ্গ এই পাল্টা অভিযোগের তালিকায় লিয়াকৎ টেনে এনেছেন। ইচ্ছা ক'রেই এবং একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ ব্যাপার করেছেন। ভারত দেশ খণ্ডনের ঘটনাটাকেই স্বীকার করতে আর সত্য বলে মেনে নিতে পারছেন না এবং পাকিস্থানকে ধ্বংস করার সঙ্কল্প করেছেন—এই ধরনের একটা ঢালা অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে উত্থাপন ক'রে বহু বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা করা হয়েছে। লিয়াকৎ চেয়েছেন, একেবারে জুনাগড় থেকে শুরু ক'রে জাতিহত্যা পর্যন্ত সকল ঘটনার বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে এবং মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হবে, যা'তে 'বাকি সব বিরোধীয় বিষয়গুলির একটা নিষ্পত্তি করা' সম্ভবপর হয়।

কাশ্মীরকে নিয়ে এইবার একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারের পালা শুরু হতে চলেছে। এরই মধ্যে এমন একটা ঘটনার সংবাদ আমাদের মনে কিছুটা আশার ভাব সঞ্চার করেছে, যেটা কাশ্মীরেরই ঘটনা, অথচ ঘটনার ঐ নতুন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের অধ্যায় থেকে স্বতন্ত্র। কাশ্মীরের সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, উরির উপর আক্রমণের প্রচেষ্টা আর হয়নি, এবং ভারতীয় সৈন্যও সে অঞ্চলে বিপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ করেনি। মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, উরি অঞ্চলের এই শান্ত অবস্থার হয়তো এমন প্রভাব হবে যার ফলে বড় রকমের সংঘর্ষ আর দেখা দেবে না।

দেখা যাক্, ইস্‌মে এতদিন ধরে যে 'মটো' বা নীতি-বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন, আমিও নতুন বছরে সেই মটো গ্রহণ করলাম—'ধৈর্য ধরা এবং সব কিছুকে মাত্রার মধ্যে রাখা।' বেশ বুঝতে পারছি, আগামী বছরে এই দু'টি দায়িত্ব পালনের দুর্ভোগ গত বছরের বরাদ্দের চেয়ে বেশি ক'রেই আমরা পেয়ে যাব।

প্রায়শ্চিত্তের কথা

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজকের সারা দিনটা বর্মার স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের নানা উৎসবের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। বর্মী রাষ্ট্রদূতের ভবনে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর সমস্ত স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন ও বর্মী রাষ্ট্রদূতের দুটি বক্তৃতা ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকি সময় বর্মী সঙ্গীতে ও নৃত্যেই অতিবাহিত হলো। তারপর দরবার কক্ষের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন বর্মার ঐতিহাসিক সিংহাসন (ভারতে আনীত রাজা থিব'র সিংহাসন) বর্মী রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যর্পণ করলেন।

বর্মার সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ছে। আউং সান ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রায় সকলকেই গত জুলাই মাসে হত্যা করায় নতুন বর্মা রাষ্ট্রকে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভেই সাংঘাতিক এক আঘাত পেতে হয়েছিল। এ আঘাত সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রকে বিনষ্ট ক'রে দেবার মতোই আঘাত। কিন্তু বর্মার জাতীয়তাবাদী শক্তি এ আঘাতে পরাভূত ও বিচলিত হয়নি এবং বর্মা তার আত্ম-শক্তিতেও বিশ্বাস হারায়নি। দেশের অভ্যন্তরে এরকম বিপদের আক্রমণ সত্ত্বেও বর্মা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সূত্র ছিন্ন করবার দাবীই জানিয়ে এসেছে। বর্মা রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে।

'রিপাব্লিক' হবার জন্য বর্মার মনে এ আগ্রহ এত প্রবলভাবে দেখা দিল কেন? আমার ধারণা, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবেই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে বর্মা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। ১৯৪৬ সালে ভারতের কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, ভারতকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বর্মী নেতারা কল্পনা করতেও পারেননি যে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামই যে কংগ্রেসের চিরকালের ইতিহাস, সে কংগ্রেস সংগ্রামে জয়লাভ করার প্রথম মুহূর্তে স্বেচ্ছায় ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার ক'রে নেবেন। দিল্লীতে বর্মী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমি বুঝেছি যে, এ বিষয়ে তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমনওয়েলথেরই গঠন পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়া সম্পর্কে যে রীতি-নীতি এতদিন প্রচলিত ছিল, সেগুলিও উদারতর হতে চলেছে। কমনওয়েলথের ঐতিহ্যগত রূপ বদলে যাচ্ছে, এদিকে ভারতও ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করেছেন—বর্মী নেতারা এখন তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা ক'রে মনে মনে যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের মনের ইচ্ছাটা কি? কাশ্মীর সম্পর্কে কি করতে চাইছেন মাউণ্টব্যাটেন? সংবাদপত্রে খুব জোর জল্পনা ও গবেষণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কিছুদিন আগে অনেকেই জানতে পেরেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকে কিছুদিন থেকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য কি?

ডেলি হেরল্ড একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, এ কাহিনী ডেলি হেরল্ডের দিল্লী

সংবাদদাতা এণ্ড্রু মেলরের রচিত কাহিনী নয়। এ কাহিনী লণ্ডনেই উদ্ভূত। ডেলি হেরল্ড লিখেছেন, মাউণ্টব্যাটেন এখন কাশ্মীর বিভক্ত করার জন্য জেদ ধরেছেন এবং এই বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন ভারত গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতে ও পাকিস্থানে যদি সংঘর্ষ বাধে, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন।

ডেলি হেরল্ডের এই কাহিনী পাঠ করার পর আমি নেহরুর প্রাইভেট সেক্রেটারি আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করলাম। নেহরু বলেছেন যে, তিনি অবিলম্বে প্রতিবাদ ক'রে একটি বিবৃতি দেবেন। নেহরু মন্তব্য করেছেন, এ কাহিনী 'ষোলআনা কল্পনার চেয়েও বেশি কাল্পনিক।'

আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান পত্রিকায়। সংবাদের সূত্র হলো লণ্ডন। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, মাউণ্টব্যাটেন 'কমনওয়েলথেরই প্রকৃতি ও গঠন বদলে দেবার জন্য গোপনে একটা পরিকল্পনা রচনা করছেন, যার ফলে ভারত ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন না হয়েও কমনওয়েলথে থাকতে পারবেন।' এটা সত্য যে, এই ধরনের কোন পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন মাউণ্টব্যাটেনের চিন্তায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকান সংবাদপত্রে মাউণ্টব্যাটেনকে যেভাবে 'গোপন পরিকল্পনার রচয়িতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা আদৌ সত্য নয়। এর মধ্যে 'গোপনতার' কিছু নেই এবং মাউণ্টব্যাটেন 'রচয়িতা'র ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

দিল্লী থেকে যদি এই সব জল্পনামূলক সংবাদ প্রচারিত হতো, তবে আমার পক্ষে সে সংবাদ খণ্ডন করার চেষ্টাও সম্ভবপর হতো। কিন্তু জল্পনা করছেন বিদেশের সংবাদপত্রগুলি। আমি এখানে বসে কি ক'রে এই বাস্তব সত্যটুকু তাঁদের বোধগম্য ক'রে তুলতে পারি যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর-জেনারেল ছাড়া আর কিছুই নন? কি ক'রে এ'দের বোঝাই যে, এখানে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার 'ক্ষমতা' মাউণ্টব্যাটেনের নেই?

ভারত গভর্নমেণ্টই বা এ ধরনের বৈদেশিক কাগজের জল্পনা-কল্পনা প্রতিরোধে কি করতে পারেন? তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির জল্পনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। নেহরু ইতোমধ্যেই একটি ঘটনায় খুবই বিড়ম্বিত হয়েছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবেন, এ সিদ্ধান্ত গভর্নমেণ্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করবার আগেই ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মন্ত্রিসভার ভিতর থেকেই এই সংবাদ বের হয়ে না পড়লে অন্য কোন সূত্রে এ সংবাদ কখনই প্রকাশিত হবার উপায় ছিল না।

আজ সন্ধ্যায় জানতে পেলাম, ভারতের প্রতিনিধি হয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় বক্তব্য রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাপিত করার জন্য গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কাশ্মীরনেতা শেখ আবদুল্লা লেকসাকসেসে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাচ্ছেন কর্ণেল কাউল।

কর্ণের কাউল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে অকপটভাবেই আমার মনের কয়েকটি কথা জানিয়ে দিলাম। শেখ আবদুল্লা সম্পর্কে আমার এই আশঙ্কা আছে যে, তিনি তাঁর উত্তপ্ত মনোভাব এবং জ্বালা-উদ্‌গীরক ব্যক্তিত্বের দ্বারা হয়তো আন্তর্জাতিক মহলে খুব সহজেই কাশ্মীর-প্রশ্নের একেবারে ভরা-ডুবি ঘটিয়ে ছাড়বেন। আর একটা অসুবিধা, ভারতের পক্ষ সমর্থন করার জন্য যিনি যাচ্ছেন, সেই গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের নামটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিক মহলে খুবই অপরিচিত। সুতরাং, কাউলকে দু'টি লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করতে হবে।

অজ্ঞাত ও অখ্যাত গোপালস্বামী সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা তথা সুনাম গড়ে তুলতে হবে প্রচারকার্যের দ্বারা; অপরদিকে আবদুল্লাকে সাম্‌লে রাখতে হবে, যাতে তিনি বেশি বাড়াবাড়ি না ক'রে ফেলেন। শ্রীনগরে এতদিন ধরে আবদুল্লা যে ধরনের সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান ক'রে যে-ধরনের কথা বলছিলেন, সেসব ধরন ও কথা লেকসাকসেসে কোনই কাজে লাগবে না। কাউলকে আমি সতর্ক ক'রে দিলাম যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদে উত্থাপিত ভারতের অভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কোন ব্যাপারই যেন না হয়। সুতরাং লেকসাকসেসে গিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি এবং কাশ্মীর নেতা, দু'জনের কেউই যেন সাত-তাড়াতাড়ি কোন সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান না করেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : প্যাটেলের সম্মতি নিয়েই মাউণ্টব্যাটেন আজ দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গভর্নমেণ্ট হাউসেই একটি সভায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুটি আসর করা হয়েছিল। একটি আসরে সমবেত হয়েছিলেন বড় বড় রাজ্যের রাজন্যেরা, আর একটি আসরে ছোট ছোট রাজ্যের নৃপতিবর্গ। দেশীয় রাজন্যেরা খুবই উৎসাহহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন ও স্বাধীন ভারতে তাঁদের শুধু ক্ষমতাহীন নয়, একেবারে কর্ম-হীনও ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এই শোচনীয় উৎসাহহীনতার মূল অবশ্য তাঁদের নিজেদেরই মনের ভিতর রয়েছে। নতুন ভারতের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যোগ্য কাজ খুঁজে নেবার আগ্রহ তাঁদের আচরণে একেবারেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো, রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন, যার ফলে রাজন্যেরা তাঁদের উপযুক্ত একটা কর্মক্ষেত্র লাভ করতে পারবেন। মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন, রাজন্যদেরই সুবিধার জন্য এখন একটা 'প্রিভিলেজ কমিটি' গঠন করবার প্রয়োজন হয়েছে, যার দ্বারা তাঁদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কতগুলি সুবিধার অধিকার ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত, নির্ণীত ও পরিচালিত হতে পারবে।

রাজন্যেরা সকলেই চুপ ক'রে মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য শুনছিলেন। একমাত্র আলোয়ার হঠাৎ ঝগড়াটে স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'দরকার নেই। আমরা যদি নরকে থাকতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের স্বর্গে থাকতে বাধ্য করা উচিত নয়।'

মাউণ্টব্যাটেন তবুও ধৈর্য ধরে রাজন্যদের বুঝিয়ে চললেন। প্রিভিলেজ কমিটি এবং রাজন্যদের যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদ, কূটনীতিক দৌত্যকার্য এবং ভারতের বৈদেশিক দূতাবাসের সার্ভিস একটা বিরাট কর্মক্ষেত্ররূপে পড়ে রয়েছে, যেখানে রাজন্যেরা এবং রাজন্যদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানেরা যোগ্য কর্তব্য গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁদের যেসব সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, সেটা রাজন্যদেরও চিন্তা ক'রে দেখবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন অনুরোধ করলেন।

আলোয়ার আবার বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন—এটা এমন কি সুবিধা বা অনুগ্রহের প্রস্তাব? কূটনীতিক সার্ভিসের পদ প্রদান করলে রাজন্যদের এমন কিছু সুবিধার অধিকার প্রদান করা হয় না। আমার প্রশ্ন, মেনন যদি দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারি হতে পারেন, তবে বিকানীর কেন সেই পদের অধিকারী হতে পারবেন না?

মাউণ্টব্যাটেন তীক্ষ্ণস্বরে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'আমি এখানে বসে সুবিধা

ও অনুগ্রহ বণ্টন করছি না। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা কাণ্ডজ্ঞান আপনাদের মনে উদ্রেক করবার চেষ্টা করছি।'

রাজন্যদের কাণ্ডজ্ঞানের একটা লক্ষণ সম্মেলনের শেষে দেখতে পেলাম। ভোপাল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতো ভি পি মেননের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। দৃশ্যটা অভিনব বটে। রাজন্যেরা সাধারণ মানুষকে কখনই আলিঙ্গন দান করেন না। রাজন্যদের আলিঙ্গন শুধু রাজন্যদেরই জন্য সংরক্ষিত। সেই রীতির একটা ব্যতিক্রম দেখবার সৌভাগ্য আজ প্রথম লাভ করলাম।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গতবার যখন লণ্ডন গিয়েছিলাম তখন সেখানে 'ফ্লীট স্ট্রীট লেটার' পত্রিকার সম্পাদক প্যাট্রিক মেটল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কাশ্মীর ঘটনার গোড়ার ব্যাপারগুলি বুঝবার জন্য তিনি কতগুলি প্রশ্ন ক'রে আমাকে এক পত্র দিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—"এই বিরোধ কি কয়েক মাস ধরে, কিংবা কয়েক বছর ধরেই চলবে? ভারত গভর্নমেণ্ট কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে গিয়ে তাঁদের কিছু লাভ হবে? কিংবা, যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যকে এমন একটা বেগতিক অবস্থায় পড়তে হয়েছে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট হতাশ হয়ে এবং আর কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছেন?"

উত্তরে জানিয়েছি—"আমি এখানে থেকে এই বিরোধের তাৎপর্য যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাই থেকে বলতে পারি যে, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে কাশ্মীরই হলো সকল বিরোধের চরম এবং বৃহত্তম বিরোধ। বিরোধের একটা মৌলিক মীমাংসা যদি এখানে করা সম্ভবপর হয়, তবে আর সব বিরোধের মীমাংসা আপনা হতেই হয়ে যাবে। কাশ্মীরের যে অঞ্চলে যুদ্ধ হচ্ছে সে অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ভারত তার নিজের ইচ্ছামতো বা সুবিধামতো একটা যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়নি। এই যুদ্ধাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে ভারতের অনেক অসুবিধা রয়েছে। অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ভাঙা-চোরা খারাপ রাস্তা অতিক্রম ক'রে তবে এই যুদ্ধাঞ্চলে পৌছানো যায়। এই অবস্থায় এবং এই ধরনের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে পূর্ণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবার মতো সৈন্য সমাবেশ করা খুবই দুরূহ। সুতরাং সামরিক ঘটনা হিসাবে বিচার করলে এই ধারণাই হয় যে, এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলবে। কিন্তু মূলত কাশ্মীর হলো একটি রাজনৈতিক সমস্যা। অস্ত্রসম্বরণ ক'রে যুদ্ধবিরতি ঘটাবার জন্য দুই পক্ষ যে পরিমাণ আগ্রহ ও কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারবে, তারই উপর নির্ভর করছে যুদ্ধ কতদিন চলবে বা না চলবে। এই দিক দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা কতকটা ইন্দোনেশিয়ার সমস্যার মতো।

"ভারত তাঁর সামরিক সাফল্য সম্বন্ধে হতাশ হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছেন, এমন ধারণাকে একটা ভুল ধারণা বলেই আমি মনে করি। বরং ভারত মনে করেন যে, যথেষ্ট নীতিসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত যুক্তি তাঁদের দাবীর পক্ষে আছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে তাঁদের দাবীর বিষয়গুলি উপস্থিত করা যায়। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে যেটা আমার মনে হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভেবে দেখবার অনিচ্ছা। কেউ ভেবে দেখছেন না, যদি বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে তার ফলে কি ক্ষতি হবে? দ্বিতীয়, কাশ্মীর নিয়ে দুই ডোমিনিয়নে যুদ্ধ যদি বাধে তবে তার ফলে সমগ্র উপ-মহাদেশকেই যে পৃথিবীর শক্তিমান

রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কূটচক্রের মধ্যে পড়তে হবে, এই সম্ভাবনার দিকটাও কেউ চিন্তা ক'রে দেখছেন না।"

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ বিকালে দেশীয় রাজন্যদের কাছে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপনের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ করলেন। দেশীয় রাজ্যগুলির রাষ্ট্রভুক্তির অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেশীয় রাজন্যেরা বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি যে, এর পরে আরও আছে। প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের নৃপতি ও প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন একটা নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বৃহত্তর রাষ্ট্রিক অঞ্চলের শাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত হলে রাজন্যদের পক্ষে এবং দেশ ও জাতির পক্ষে কতখানি সুবিধার বিষয় হবে, মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই আর এক নতুন পরিবর্তন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনলেন রাজন্যেরা। ইতিহাসের নজির দেখালেন মাউণ্টব্যাটেন। জার্মাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র জনপদ নেপোলিয়নের রাইন রাষ্ট্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং ইতিহাস সম্বন্ধে রাজন্যদের যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাই দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করতে রাজন্যদের অবশ্য খুবই বেগ পেতে হলো। যাই হোক, সম্মেলনের শেষে রাজন্যদের মুখের চেহারা থেকে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন প্রস্তাবে তাঁদের চোখের দৃষ্টি যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছে। যেন খুব কড়া আলোকের দিকে তাঁরা এতক্ষণ তাকিয়েছিলেন এবং সহ্য করতে না পেরে চোখ মিটমিট করছে। তবুও, অন্তত কয়েকজনকে দেখে বুঝলাম যে, তাঁদের যথোচিত দৃষ্টিশক্তি আছে এবং এ প্রস্তাবের সারবত্তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। গান্ধী অনশন ব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। 'আমরণ অনশন'; তাঁর দাবী যদি পূর্ণ না হয়, তবে অনশনও তিনি ভঙ্গ করবেন না এবং এর পরিণাম হলো গান্ধীর মৃত্যু। জিমখানা ক্লাবে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের একটা খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেই এই সংবাদ প্রথম শুনতে পেলাম। আজকেরই প্রার্থনাসভায় গান্ধী তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন। এর আগের ক'দিনে গান্ধীজীর ভাষণে এরকম কোন সঙ্কল্পের আভাস অথবা ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাই এ সংবাদ অত্যন্ত আকস্মিক একটা আঘাতের মতো আমাদের সকলের মনের উপর এসে লাগল। আমি বিস্মিত হয়েছি সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, ঠিক আজই সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে মাউণ্টব্যাটেনের পাঠকক্ষের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানালার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিলাম, মাউণ্টব্যাটেন ও গান্ধী বসে রয়েছেন। আমি তখন এইটুকু মাত্র শুনেছিলাম যে, প্রায় হঠাৎ, অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগে খবর দিয়ে গান্ধীকে গভর্নমেণ্ট হাউসে আনিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন; এ সাক্ষাতের যে বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকতে পারে, এ ধারণা আমার মনে তখন একেবারেই দেখা দেয়নি।

প্রার্থনাসভা সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। প্রার্থনাসভায় গান্ধী বলেছেন যে,—"এই অনশন ব্রত আমি তখনই ভঙ্গ করব যখন দেখব যে, সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরের কোন শাসনের বা ভয়ের চাপে নয়, সকলের

মনের ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন এই সৌহার্দ্যের ভাব একটা কর্তব্যবোধের মতো জাগ্রত হয়েছে দেখতে পাব, তখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারব। অন্য কারও পরামর্শে নয়, একমাত্র ঈশ্বরকেই আমার একমাত্র ও পরম উপদেষ্টা বিবেচনা ক'রে আমি এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করেছি।"

গান্ধী ঠিকই বলেছেন। আজ তাঁর মৌনব্রতের দিন। কারও সঙ্গে তিনি কথা বলেননি, তাই নেহরু এবং প্যাটেল, দু'জনের কেউই আজ গান্ধীর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যও আসেননি। ফলে, গান্ধীর এই সঙ্কল্পের কথা নেহরু কিংবা প্যাটেল আগে থেকে জানবার কোন সুযোগও পাননি।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে গান্ধী জানালেন যে, দিল্লীর এই বিরামহীন সাম্প্রদায়িক অশান্তির স্বরূপ দেখে তাঁর মন গভীর বেদনায় ডুবে রয়েছে। নিজেকে তিনি অত্যন্ত অসুখী বোধ করছেন। গান্ধীর ধারণা, সমাজের সকল স্তরে এই বিদ্বেষ এখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাঁর নিজের বিবেকসম্মত পন্থাতেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর আর কোন পথ নেই।

আলোচনার সময় গান্ধী হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা প্রদান বন্ধ ক'রে দেবার যে সিদ্ধান্ত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

মাউণ্টব্যাটেন কোন দ্বিধা না ক'রে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এ সিদ্ধান্তে শুধু যে মর্যাদাসম্মত রাজনীতিক আচরণের অভাবই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, রাজনীতিক বুদ্ধির অভাবও প্রমাণিত হয়েছে।

গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন, তিনি এ বিষয় নেহরু এবং প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একথাও গান্ধী জানালেন যে, তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে এটা জানিয়ে দিতে অবশ্য ভুলবেন না যে, এ প্রসঙ্গ তিনিই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এখানে উত্থাপন করেছিলেন, মাউণ্টব্যাটেন উত্থাপন করেননি।

আলোচনার পর মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, গান্ধীকে অনশনের সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। গান্ধীর বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত বদলে দেবার ক্ষমতা মাউণ্টব্যাটেনের নেই। শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন আর কোন দ্বিধা ও কুণ্ঠার ভাব না দেখিয়ে গান্ধীর এই সৎসাহসপূর্ণ সঙ্কল্পের প্রতি তাঁর সাগ্রহ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করলেন যে, গান্ধীর সঙ্কল্পিত এই ব্রত জনসাধারণের মনে সেই শুভবুদ্ধি ও সৎসাহস অবশ্যই জাগ্রত করবে, যেটা আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রমাণ পেয়ে গান্ধী চলে গেলেন। আগামীকাল মধ্যাহ্নের পূর্বেই সাড়ে এগারোটার সময় গান্ধীর অনশন আরম্ভ হবে। আরম্ভ হবে এক মহৎ সঙ্কল্পের অনুষ্ঠান।

জিমখানা ক্লাবের 'পার্টি'র অনুষ্ঠান খুব তাড়াতাড়ি সেরে দিয়ে সাংবাদিকেরা বের হয়ে গেলেন। প্রত্যেককে এখন রিপোর্ট সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। গান্ধীর এই অনশনের তাৎপর্য কি এবং এর পরিণামই বা কি হবে? প্রত্যেক সংবাদদাতার মনে এখন এই জিজ্ঞাসাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিকদের ধারণার মোটামুটি পরিচয় আপাতত যেটুকু পাওয়া গেল, তাতে বুঝলাম যে, গান্ধীর অনশনের সঙ্কল্প অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে বলে তাঁরা মনে

করছেন। কলকাতাতে গান্ধী জনসাধারণের মনের ভাব যতটা উন্নত ক'রে আসতে পেরেছেন, দিল্লীতেও সেই মানসিক সুস্থতা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে হলে এ ধরনের আমরণ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কম কঠোর ব্রতের দ্বারা করা সম্ভবপর হবে না। শিখদের মনোভাবের উপরেই ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে। হিন্দু এবং মুসলমানদের মনের উপর গান্ধীর আবেদন এ পর্যন্ত যে পরিমাণে ও যতটা সহজে সফলতা লাভ করেছে, শিখদের মনের উপর ততটা হয়নি।

গান্ধীর অনশনের প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের আলোচনাও খুব বেশি ক'রে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক কি ক্ষুণ্ণ হয়েছে? নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যেও কি মনের দিক দিয়ে এখন ভাল সম্পর্ক নেই? পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা প্রদান বন্ধ ক'রে দেবার প্রস্তাব গান্ধী সমর্থন করতে পারছেন না। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধী যে প্রবলভাবেই বাধা দেবেন, এটা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর ফলে গভর্নমেণ্টের মধ্যেই দুই অভিমতের দ্বন্দ্বও খুব সম্ভব এমনভাবে দেখা দেবে যে, মন্ত্রিসভার মধ্যেই দুরূহ এক সংকটের সূচনা হবে। গান্ধী এ সবই অনুমান করতে পারেন। তাই মনে হয়, তিনি জেনে-শুনেই প্যাটেলের সব বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে ব্যবধান কিছুদিন থেকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ব্যবধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই নেতার পিছনে তাঁদের নিজ নিজ সমর্থকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ভারতের রাজনীতির আকাশে নেহরু এবং প্যাটেলই হলেন দুই বৃহৎ ও প্রধান নক্ষত্র। এঁদের বিরোধে রাজনীতিক আকাশও দুই ভাগে বিভক্ত হতে চলেছে, কারণ সমগ্র রাজনৈতিক কর্মি-সমাজই বিভক্ত হয়ে দুই নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভারত রাষ্ট্রের দুই মহান্ ব্যক্তির এই অনৈক্য একমাত্র গান্ধীই দূরীভূত করতে সক্ষম। গান্ধীর ইচ্ছাও তাই। গান্ধী এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন আছেন যে, যদি তিনি নেহরু ও প্যাটেলের বিরোধ দূরীভূত ক'রে উভয়কে সৌহার্দ্যপূর্ণ মতৈক্যে যুক্ত করতে না পারেন, তবে শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই নয়, ভারত রাষ্ট্রই ভয়ানকভাবে বিপন্ন হবে।

বিকানীর, বুধবার, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গান্ধীর অনশন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের বিকানীর যাত্রা স্থগিত রাখা সম্ভবপর হয়নি। দিল্লীতে অনশনরত গান্ধীকে রেখে মাউণ্টব্যাটেনকে পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী বিকানীর আসতে হয়েছে। গভর্নর-জেনারেলকে এই সময় সরকারীভাবে বিকানীর পরিদর্শনে যেতে হবে, এ-সিদ্ধান্ত অনেকদিন আগেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরিদর্শনের তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, বিকানীরে এসে পূর্ব-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে একটা পরিবর্তন করতে হলো। গান্ধীর অনশনব্রতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ভোজসভার অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হলো।

গান্ধীর অনশনব্রতের কি বিপুল প্রভাব ও শক্তি আছে, তার পরিচয় পেতে হলে গান্ধীর উপবাসের সময় তাঁর সান্নিধ্যে থেকে চারদিকের ঘটনার আলোড়ন লক্ষ্য করতে হয়। জনসাধারণের মন অনুপ্রাণিত করবার এক দুর্লভ শিল্পের শিল্পী হলেন গান্ধী। গান্ধীর সমগ্র জীবনই হলো গণচিত্ত উদ্বোধিত করবার এক বিস্ময়কর প্রয়াসের সার্থক নিদর্শন। তিনি এমন এক একটি সরল ও সাধারণ বাণী

এবং আচরণের দ্বারা জনমনে আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস করেন, যার অর্থ সর্বসাধারণও অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। এ প্রতিভায় গান্ধীর সমকক্ষ আর কেউ নেই, এবং এবিষয়ে গান্ধী-রীতির সাফল্যও অতুলনীয়। গণচিত্ত অনুপ্রাণিত করাবার শিল্পে গান্ধীর মতো শক্তিশালী শিল্পীর কোন দ্বিতীয় উদাহরণ সর্বযুগের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দিল্লী থেকে আমাদের বিকানীর রওনা হয়ে যাবার সামান্য কিছুক্ষণ আগে প্যাটেল এবং নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা একসঙ্গে আসেননি। দুই নেতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে চলে গেলেন। দুই নেতাই গান্ধীর অনশন সম্পর্কে তাঁদের মনের ভাব মাউণ্টব্যাটেনের কাছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু দুই নেতার মনোভাবে কত পার্থক্য! চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে দুই নেতার মধ্যে কতখানি ব্যবধান দেখা দিয়েছে, তার পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া গেল গান্ধীর অনশন সম্বন্ধে তাঁদের দুই অভিমতের মধ্যে।

প্যাটেল অভিযোগ করলেন—এই সময় অনশন করা গান্ধীর উচিত হয়নি। গান্ধী অত্যন্ত শোচনীয় ও ভুল সময়ে অনশন আরম্ভ করেছেন। এই অনশনের দ্বারা গান্ধী যে পরিবর্তন ঘটানো যাবে বলে আশা করছেন, কার্যত ঠিক তার বিপরীত ফল হবে।

নেহরু খুশি হয়েছেন। গান্ধীর এই উদ্যম তিনি সপ্রশংসভাবে সমর্থন করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় নেহরু তাঁর মনের ভাব অকুণ্ঠভাবেই প্রকাশ করলেন।

বিকানীর, শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : এই ক'টা দিন বিকানীরে নানারকম আমোদের মধ্যেই কেটে গিয়েছে। মহারাজার শিকার-অঞ্চল গজনের ঘুরে এসেছি। কৃত্রিম মরূদ্যান দেখলাম। মরুভূমির বালু খুঁড়ে এক মাইল দীর্ঘ হ্রদ তৈরী করা হয়েছে, তা'ও দেখলাম। এ জায়গাটা হলো মহারাজার শিকারস্বর্গ। রাজা পঞ্চম জর্জ এখানে বেলেহাঁস শিকার করেছিলেন। দেখলাম লালগড় প্রাসাদ ও কার্ণি নিবাস দরবার। দেখলাম বল্লভ বাগিচা। এখানে মহারাজার একটি ছোট ক্লাবঘর আছে। জাহাজের কেবিনের মতো ক্লাবঘরের গড়ন, ঘরের জানালাগুলি জাহাজ-কেবিনের গবাক্ষের আকারে তৈরী এবং জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলেও জল দেখতে পাওয়া যায়; কারণ ক্লাবঘরটা একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারায় অবস্থিত। হ্রদের চারদিকে সারি সারি উইলো তরু বাতাসে চাপা-কান্নার মতো শব্দ ছড়াচ্ছে। ককটেল, বিলিয়ার্ড ও নৃত্যে মাঝ রাত্রি এখানেই পার ক'রে দিয়ে লালগড় প্রাসাদে ফিরে গেলাম। সকাল হলে বিকানীরের আর এক রূপ দেখলাম। বিকানীরের ঘোড়সওয়ার বাহিনী 'গঙ্গা রিসালা'। বিখ্যাত উট-সওয়ার বাহিনী 'বিকানীর ক্যামেল ব্যাটারি' এবং ডুঙ্গা লান্সার্স দলের কুচকাওয়াজ দেখলাম। দেখলাম বিকানীরের দুর্গ, নানারকম ঐতিহাসিক নিদর্শন-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে বহুসংখ্যক দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি ও উর্দু গ্রন্থ।

মধ্যাহ্নভোজনে যোগদানের জন্য যাবার আগে পানিক্করের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম। পানিক্কর এখনো বিকানীরের দেওয়ানের পদে কাজ করছেন। আলোচনায় গান্ধীর অনশন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই পানিক্কর বললেন যে, এর ফল ভালই হবে বলে তিনি আশা করছেন। পানিক্করের মতে—গান্ধীর

এই অনশনব্রত যে একদিক দিয়ে প্যাটেলের বিরুদ্ধেই গান্ধীর প্রতিবাদ, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

পানিক্কর বললেন, তিন মাস আগে গান্ধী যখন কলকাতা হতে দিল্লীতে ফিরে এলেন, তখনই গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের মতবিরোধ খুবই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। গান্ধী তখন বলেছিলেন—"বল্লভভাই, আমি চিরকালই মনে ক'রে এসেছি যে, তুমি ও আমি অভিন্ন। কিন্তু আজ দেখছি, আমরা আর এক নই, দুই হয়ে গিয়েছি।" বাপুর মুখে একথা শুনে প্যাটেলের দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

গান্ধী-প্যাটেল সম্পর্কের বিষয়টি পানিক্কর আরও ব্যাখ্যা ক'রে বললেন—প্যাটেল যদিও কংগ্রেস ও গভর্নমেন্টের সকল ব্যবস্থার প্রভুত্ব নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে গান্ধী এখনো ভারতের জনসাধারণের আসল প্রভু। প্যাটেল জানেন, তিনি ইচ্ছা অথবা চেষ্টা করলেও জনসাধারণের উপর মহাত্মার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত প্রভাব কোনমতেই খর্ব করতে পারবেন না। গান্ধী নেহরুকেই সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করবার সংকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন কিন্তু নেহরুকে শক্তিশালী করতে গিয়ে গান্ধী অবশ্য প্যাটেলকে ভেঙে দিতে ইচ্ছা করেন না। প্যাটেলকে শুধু সমর্থক ও সহকর্মী রূপেই নেহরুর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছেন গান্ধী।

গান্ধীর রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদর্শিতার অনেক প্রশংসা করলেন পানিক্কর। পানিক্কর বললেন—'প্রায় বিশ বছর আগে গান্ধীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করেছিলাম। তারপর মাত্র এই সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ও আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি। দেশীয় রাজ্যের নিয়মতন্ত্রের দ্রুত পরিবর্তন করবার জন্য গান্ধী যেভাবে তাঁর দাবী প্রচার করছেন, সেই সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে।'

পানিক্কর বললেন, তিনি গান্ধীর কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে এত তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা করাই উচিত। প্রতিবাদ ক'রে গান্ধী বললেন—'প্রগতি-বিরোধী ইচ্ছা এবং শক্তিগুলিকে দানা বাঁধবার মতো সুযোগ এবং সময় দিতে হবে, আপনি কি আমাকে তাই করতে অনুরোধ করছেন?'

পানিক্কর আমাকে বললেন, গান্ধীর এই উক্তির জবাব দেবার মতো কোন যুক্তি তাঁর ছিল না, এবং তিনি কোন জবাবও দেননি। পানিক্কর বললেন—গান্ধী খাঁটি সত্যি কথাই বলেছেন।

গান্ধীর সম্পর্কে পানিক্কর তাঁর ধারণার আরও অনেক পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ করলেন। পানিক্কর বললেন, গান্ধীর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা তিনি শ্রোতার মনের ভাষায় তাঁর নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারেন। প্রার্থনা-সভায় গান্ধী এমন সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন যে, সে ভাষার আবেদন সোজা শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে যায়। ব্যক্তিগত আলোচনা ও আলাপের সময় অবশ্য গান্ধী তাঁর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত যুক্তিকঠিন মাত্রার মধ্যে রেখে প্রয়োগ করেন। গান্ধীর এক অসাধারণ তথ্য-সংগ্রহ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন পানিক্কর। ভারতের সকল স্থান হতে গান্ধীর কাছে অজস্রসংখ্যক চিঠি প্রতিদিন এসে থাকে। এই চিঠিগুলিই হলো গান্ধীর তথ্য-দপ্তর। সমগ্র জাতির সুখ-দুঃখের সমস্যার এবং ঘটনার আধুনিকতম সংবাদ গান্ধী সব চেয়ে আগে পেয়ে থাকেন।

আজই বিকালে খবর পেলাম, ভারত গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্থানকে দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাকিস্থানের প্রতি ভারতের 'শুভেচ্ছাপূর্ণ মনোভাবের' একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবেই গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানকে এই টাকা দিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, গত তিন মাসের মধ্যে যত সংবাদ তিনি শুনেছেন, তার মধ্যে আজকের এই সংবাদই হলো সব চেয়ে ভাল সংবাদ। পানিক্কর অবশ্য আমার কাছে এই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন যে, এই সিদ্ধান্তের পর প্যাটেলের মনে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলা যায় না।

বিকানীর, শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পানিক্করের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পানিক্করকে যত বেশি ক'রে চেনবার ও বুঝবার সুযোগ পাচ্ছি, ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, চিন্তাশক্তি এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রাখর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অতি গভীর ও ব্যাপক এবং বর্তমানের ঘটনাবলীকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাসের অতীত ঘটনাবলী, শিক্ষা ও তত্ত্বের সাহায্যে বিচার করতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি নির্ণয় করতে এবং সে নীতিকে রূপদান করতে পারেন, বর্তমান ভারতে এইরকম প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন পাঁচ-ছয় জনের একজন হলেন পানিক্কর। আশা করা যায় যে, নতুন ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতির সংগঠনে পানিক্করের প্রভাবের পরিচয় একদিন পাওয়া যাবে। কিন্তু পানিক্করের শত্রুর অভাব নেই। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ রটনা ক'রে থাকেন। অনেকে বলেন, পানিক্কর শুধু নিজেকে 'বড়' ক'রে তুলবার তালে আছেন। ব্যক্তিগত পদ, প্রাধান্য এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তিনি মনে মনে পোষণ করছেন। কোন কাজ বিশ্বাস ক'রে পানিক্করের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এসব হলো হিংসুটে মনের অভিযোগ। বড় প্রতিভাকে এবং সে প্রতিভার মর্যাদাকে স্বীকার করতে কষ্ট হয়, এমন লোকের অভাব নেই। প্রতিভায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে যাঁরা দুর্বল, তাঁদের মনেই এই ধরনের প্রবল হিংসুটে ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই প্রতিভাবান ও যোগ্যতম কর্মীকে এই একটি অভিশাপে ভুগতে হয় যে, প্রতিভায়, যোগ্যতায় ও গুণে নিকৃষ্ট সহকর্মীর দল তাঁকে সহ্য করতে পারেন না। প্রতিভাহীন ও অযোগ্য সহকর্মীর বিদ্বেষে প্রতিভাশালী যোগ্য ব্যক্তির পদচ্যুত হবার ভয় সব সময়েই আছে।

পানিক্কর আমাকে বললেন, মাউণ্টব্যাটেনের এখন ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের সমস্যা সম্বন্ধেই বেশি চিন্তা করা উচিত। মাউণ্টব্যাটেন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের বিষয় নিয়েই এখন বেশি চিন্তা করছেন। একমাত্র ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিতর দিয়েই ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক ভালভাবে রক্ষা করা যাবে, এইভাবে চিন্তা না ক'রে বৃহত্তর এবং প্রকৃত বিষয়টির প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কি করতে হবে এবং কি করা উচিত? এই হলো প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই মাউণ্টব্যাটেনের এখন চিন্তা করা উচিত। পানিক্করের ইচ্ছা, ভারত থেকে যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেন যেন ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্করক্ষার মূলনীতিগুলি নির্ণয় ক'রে ফেলেন।

মাউণ্টব্যাটেনও পানিক্করকে অনুরোধ করেছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নেহরু যখন লণ্ডন যাবেন, তখন পানিক্করও যেন নেহরুর সঙ্গে যান। মাউণ্টব্যাটেনের

ইচ্ছা, এখন ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ নিয়ে চীনে না গিয়ে পানিক্করের পক্ষে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের উপদেষ্টা হয়েই কিছুকাল থাকা উচিত। [এই সময়ে চীনে চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্ট ছিল। পানিক্কর চিয়াংশাসিত চীনে নিযুক্ত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত] কিন্তু পানিক্কর এখন অন্তত বছর দুই ভারতের বাইরে গিয়ে কোন কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছেন। ভারতের ভিতরেই কোন কার্যপদে নিযুক্ত থাকলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। এই কারণে, এখন চীনে চলে যাওয়াই পানিক্করের ইচ্ছা।

আজ বিকানীরের লালগড় প্রাসাদে ডিনারে যোগদান করার পর আমাদের বিকানীর পর্বের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : দিল্লী ফিরে এসেছি। দিল্লী পেঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে অনশনরত গান্ধীকে দেখবার জন্য বিড়লা ভবনে চলে গেলেন।

অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন গান্ধী। সপরিবারে মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীর ঘরে প্রবেশ করতেই গান্ধী হেসে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন—'দেখা যাচ্ছে, আমার কাছে আপনাকে আনাবার উপায় হলো অনশন করা।'

গান্ধীর সঙ্গে অল্পক্ষণ আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিভাবে এবং কি হলে গান্ধী অনশন ভঙ্গ করতে পারেন, প্রধানত এই বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা হলো। গান্ধী বললেন যে, তিনি সর্ত হিসাবে সাতটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন। এই সাতটি ব্যবস্থার সবগুলিই হলো দিল্লী এবং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকারের অক্ষুণ্নতা রক্ষার ব্যবস্থা। এই সাতটি ব্যবস্থা সার্থক ও সফল করবার জন্য যথার্থ আন্তরিক উদ্যম আরম্ভ হয়েছে দেখতে পেলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন, নচেৎ নয়।

মহাত্মার প্রাণোৎসর্গ

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং মৌলানা আজাদের উদ্যোগে ও পরিচালনায় একটি শান্তি কমিটি স্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত তৎপরতা এবং উৎসাহের সঙ্গে এই কমিটি কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।

গান্ধীর অনশন আরম্ভ হবার পর একশো বাইশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। ক্ষীণদেহ ও বৃদ্ধ মহাত্মার শরীরের উপর অনশনের আঘাতও খুবই ক্ষতি ক'রে দিয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধের দেহের যেটুকু শক্তি ছিল, সেটুকুরও বেশির ভাগ ক্ষয় হয়ে এসেছে। কিন্তু সুসংবাদ এই যে, আজ সকালে প্রসাদ-আজাদ শান্তি কমিটি গান্ধীর কাছে এসে গান্ধীকে বোঝাতে পেরেছেন যে, দিল্লীর 'হৃদয় পরিবর্তন' হয়েছে।

অনশন ভঙ্গ করেছেন গান্ধী। গান্ধীর অনশন যে মুসলমানদের মনে বিশ্বাস ও আস্থার ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পেরেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর শিখের মনের ভাব যে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়নি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। এক দল শিখ কালো পতাকা হাতে নিয়ে বিড়লা ভবনের সম্মুখ দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল—'গান্ধীকে মরতে দাও।' শান্তি কমিটিতে অবশ্য শিখ সমাজের প্রতিনিধিও রয়েছেন এবং তাঁরা শান্তি কমিটির কাজে যথাবিহিত সহযোগিতাও করছেন।

আজকের সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় গান্ধী তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছেন যে, শান্তি কমিটির মারফৎ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা যদি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, তবে—"আমি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করব যে, তিনি যেন আমাকে পূর্ণ আয়ু (এক শত পঁচিশ বৎসর) দান করেন, এবং আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারি।"

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : মার্কিণ সাংবাদিক ভিনসেণ্ট শীয়ান একটা বিশেষ কাজে কিছুদিন হলো দিল্লীতে এসেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো—'আরও বেশি ক'রে ঐতিহাসিক খবর সংগ্রহ করা।' টাইম এণ্ড লাইফের বব নেভিলও এখন দিল্লীতে থেকে সংবাদদাতার কাজ করছেন। আজ এঁদের দুজনের সঙ্গেই এক মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম।

একটা নতুন কিছু বলার দিকে শীয়ানের বিশেষ ঝোঁক আছে। যে কোন ঘটনা সম্বন্ধে একটা নতুন অভিমত, তত্ত্ব ও কাহিনী উদ্ভাবন করতে তিনি অভ্যস্ত। গান্ধীর অনশন সম্বন্ধে শীয়ান তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। শীয়ান বললেন—'দিল্লীর প্রাকৃতিক আবহাওয়া এখন বদলেছে বলেই গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন। প্রত্যহ গায়ে রোদ লাগানো গান্ধীর অভ্যাস। কিন্তু এ ক'দিন দিল্লীতে রোদ ওঠেনি। এই রোদ না-ওঠার ব্যাপারটাই গান্ধী ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের বাণীর সাহায্যে তিনি বুঝে ফেলেছেন যে, এইবার অনশন ভঙ্গ করতে হবে।'

শীয়ান বললেন—'গান্ধী অবশ্য এটা সজ্ঞানে কখনই স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু এটাই হলো আসল ব্যাপার। মিস্টিক মানুষদের মন ও আচরণের সঙ্গে আবহাওয়া-তত্ত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গান্ধীর অনশন ভঙ্গের কয়েকদিন আগেই আমি এডগার স্নো'কে বলেছিলাম যে, শেষটায় এইরকমই ব্যাপার হবে।'

শীয়ান এবং নেভিল, দুজনেই বললেন যে, গান্ধীর অনশন সত্যিই একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে 'ধর্মের' একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। রুজভেল্টও কিভাবে রাজনীতির মধ্যে ধর্মগত ব্যাপার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, সে সম্বন্ধে নেভিলের কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম।

শীয়ান ও নেভিল, দুই মার্কিণ সাংবাদিক সম্প্রতি আরও কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হবার সুযোগ পেয়েছেন, যার ফলে তাঁরা দুজনেই নেহরুর সম্বন্ধেও একটা ধারণা লাভ করেছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে নেহরুই হলেন সব চেয়ে সহজ ও সরল স্বভাবের মানুষ, যাঁর আচরণে কোন গুরুগম্ভীর কাঠিন্যের ভাব দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মেশা যায়, এবং ঘরোয়াভাবে তাঁকে দেখা যায়। নেভিল তাঁর স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনার কথা বললেন। গান্ধীর অনশনের সময় বিড়লা ভবনের সম্মুখে রাস্তার উপর একটা লোক শুয়ে পড়ে রাস্তার লোক-চলাচল বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই ব্যক্তি বলে যে, সে হলো 'ভগবান কৃষ্ণের প্রেরিত', এবং কৃষ্ণের আদেশ জানিয়ে দেবার জন্যই সে এখানে এসেছে। এই সময় নেহরু উপস্থিত হলেন এবং লোকটাকে পথ থেকে সরে যাবার জন্য কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা, লোকটা পথের উপর শুয়েই রইল। নেহরু তৎক্ষণাৎ লোকটার দু'পা ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে পথের এক পাশে সরিয়ে দিলেন। পর মুহূর্তে হাতের ধুলো ঝেড়ে ফেলে নেহরু স্বচ্ছন্দে চলে গেলেন, যেন কোন ব্যাপারই হয়নি।

শীয়ান বললেন যে, তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রধান মন্ত্রীর ভবনে গিয়েছিলেন। গল্প করতে করতে নেহরু শীয়ানকে একটি চীনা অঙ্কিত-চিত্র দেখাবার জন্য তাঁর খাবার ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঘরে আলো ছিল না। সুইচ খুঁজবার জন্য দেয়াল হাতড়িয়ে অগ্রসর হতেই নেহরু হঠাৎ একটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েই সামলে নিলেন। নেহরু বললেন—'মেজের উপর কে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।' তার পরেই আলো জ্বাললেন নেহরু এবং এই ঘরের ভিতর যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ নেহরু গলার স্বর চেপে ফিস্‌ফিস্ ক'রে আমার সঙ্গে কথা বললেন। বুঝলাম, মেজের উপর ঘুমন্ত লোকটির ঘুম যেন ভেঙে না যায়, প্রধান মন্ত্রী তাই এত সাবধানে ও চাপা-স্বরে কথা বলছেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : এই অনশনে গান্ধী যেন তাঁর প্রাণ অগ্নিশুদ্ধ ক'রে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। ব্রতী গান্ধী এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ ঘটনায় চারদিকে বেশ একটা আনন্দের সাড়াই জেগে উঠেছিল। সে আনন্দ আজ হঠাৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল একটি ঘটনায়।

গান্ধীর প্রার্থনাসভায় আজ একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। অনশনের পর গান্ধী আজ এই প্রথম প্রার্থনাসভায় উপস্থিত হয়েছেন। এ বিস্ফোরণে সভার লোকজনের কারও প্রাণহানি হয়নি, কারণ নিকটের একটা প্রাচীরের গায়ের উপর দিয়েই বোমার আঘাত পার হয়ে গিয়েছে। বিস্ফোরণে শুধু প্রাচীরের সামান্য ক্ষতি

হয়েছে। কেউ জখম হয়নি, কেউ আতঙ্কিতও হয়নি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনেও গান্ধী তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ও অবিচলিতভাবে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে চললেন। একটা যে খারাপ ব্যাপার ঘটে গেল, এরকম কোন ধারণাই গান্ধীর মনে হয়নি এবং তাঁর আচরণেও এরকম কোন চিন্তার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ঘটনার সংবাদ শুনে লেডি মাউণ্টব্যাটেন তৎক্ষণাৎ গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। লেডি মাউণ্টব্যাটেনও দেখে বুঝলেন যে, গান্ধী এ ঘটনাকে একেবারে গ্রাহ্যই করেননি। সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্বিকার গান্ধী বসে রয়েছেন। লেডি মাউণ্টব্যাটেনের প্রশ্নের পর গান্ধী বললেন যে, নিকটে কোথাও নিশ্চয় সৈনিকদের যুদ্ধশিক্ষার মহড়া চলছে। ঘটনার প্রকৃত সংবাদ শোনার পর গান্ধী বললেন—আমার ধারণা হয়েছিল, সৈনিকদের এই মহড়াতে গোলাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এ শব্দ তারই বিস্ফোরণের শব্দ।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : এর মধ্যে একবার আগ্রা ঘুরে এসেছি, সঙ্গে ছিলেন নিউ স্টেটসম্যান এন্ড নেশন পত্রিকার সম্পাদক কিংসলি মার্টিন। মার্টিন নেহরুর বহুদিনের পরিচিত বন্ধু এবং এই প্রথম ভারতে এসে তিনি নেহরুরই অতিথি হয়েছেন।

দেখলাম আগ্রার তাজ। এর আগে বিমানযাত্রী হয়ে যাবার সময় আকাশের ঊর্ধ্বস্তর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে তাজ দেখবার সুযোগ একবার পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম ধবধবে সাদা চিনির খেলনার মতো ছোট্ট তাজ ঘোর সবুজের মধ্যে বসে রয়েছে। এবার তাজের দুটি নতুন রূপ দেখলাম। অপরাহ্নের রক্তিম আলোকে প্রলিপ্ত তাজ এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নাত শুভ্রদেহ তাজ। পূর্ণিমা রাত্রির তাজ একটা স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু তাজদেহের গঠনসুষমা দিনের আলোকেই দর্শকের চোখে একটা মধুরতার যাদু সৃষ্টি করে।

আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে দিল্লী ফিরেছেন। লেডি মাউণ্টব্যাটেন মাদ্রাজেই থেকে গিয়েছেন, কারণ সেখানে তাঁর অনেকগুলি কাজ ও অনুষ্ঠান এখনো বাকি রয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ সফরও মাউন্ট-ব্যাটেনের পক্ষে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। বহু বহু সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং পথের দু'পাশে কাতারে কাতারে জনতা এক ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেলকে দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

ছ'টা বাজতে তখন মাত্র দশ মিনিট বাকি, এ কী সংবাদ শুনতে পেলাম! এক দৌড়ে গিয়ে মাঁউণ্টব্যাটেনের ডেপুটি প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ নিকলসের ঘরে ঢুকলাম। নিকলস বললেন, গান্ধীকে হত্যা করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। গান্ধীর শরীরের তিন স্থানে গুলীর আঘাত লেগেছে।

আধ ঘণ্টা পরে মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ির ড্রাইভার পিয়ার্স বললেন—গান্ধী আর নেই, গান্ধী মারা গিয়েছেন।

পিয়ার্স তাঁর গাড়ির রেডিও থেকে এই সংবাদ শুনতে পেয়েছেন। পিয়ার্স বললেন, হিজ এক্সেলেন্সি এক্ষুনি বিড়লা হাউসে যাবেন।

মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ির কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের ভিতর থেকে মাউণ্টব্যাটেন বের হয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে ইসারায় জানালেন—আপনিও চলুন। মাউণ্টব্যাটেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠিন। বেশি

কথা বলছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন এবং যা বলছিলেন তার ভাষাও কেমন যেন কাটা কাটা ও খাপছাড়া।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এইমাত্র কলকাতা থেকে রাজগোপালাচারী টেলিফোন করেছিলেন। নেহরুর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজগোপালাচারী। মাত্র দু'দিন আগে অমৃতসরে এক জনসভায় নেহরু যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন দুটো লোককে সভার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়। লোকদুটোর সঙ্গে হাতবোমা ছিল।

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এইবার ভারতজীবনের সব চেয়ে বেশি ভয়ানক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হলো। নেহরু এইবার সম্পূর্ণভাবেই একা পড়ে গেলেন, অথচ এ ঘটনার সমগ্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার চাপ তাঁরই উপর এসে পড়বে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের সর্বত্র কি যে ভয়ানক ব্যাপার হয়ে যাবে, তা বলা যায় না। এখন সব কিছু নির্ভর করছে নেহরুর উপর। আর কয়েক ঘণ্টার মতো সমগ্র ভারতকে যদি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে নেহরু বলিষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারেন, তবেই মঙ্গল।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এখন সব চেয়ে বেশি এবং সবার আগের প্রয়োজন হলো, সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে নেহরুর একটি ঘোষণা। এবিষয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত হবে না। কিন্তু নেহরুরও যে চিন্তা করবার জন্য একটু সময় চাই। জাতিকে উদ্দেশ ক'রে নেহরু কি বলবেন, সেটা নেহরুকে একবার ভেবে নিতে হবে। কারণ, সমগ্র জাতি এখন নেহরুর কাছ থেকেই কয়েকটি কথা শোনার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। নেহরুও এখন যা বলবেন, জাতি তাই মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বিড়লা ভবনে পৌঁছলাম। ভবনের সম্মুখে ভিড় জমে উঠেছে। জনতা আমাদের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল—কে এরা? জনতার ভিতর দু'-একজন ছাড়া, এ অন্ধকারে মাউণ্টব্যাটেনকে কেউ চিনতে পারল না। জনতার মধ্যে ভয়ানক একটা উতলা ভাব ও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। জনতার পর জনতা স্রোতের মতো এসে বিড়লা ভবনের উপর যেন আছড়ে পড়ছে। বিড়লা ভবনের দেয়ালের গায়ে কয়েকটি জানালার দিকেই সমগ্র জনতার সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বিড়লা ভবনের নীচের তলায় একটি কক্ষের অভ্যন্তরে ভারতের সকল মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিষ্পলক তাঁদের চোখের দৃষ্টি। বেদনার আঘাতে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন তাঁরা।

আমরা এগিয়ে যেয়ে গান্ধীর শয়নকক্ষের ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম জন চল্লিশ ব্যক্তি এই ঘরের ভিতর রয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন নেহরু ও প্যাটেল। প্রত্যেকের চোখে জল। ঘরে ধূপের গন্ধ।

ঘরের এক কোণে গান্ধীর দেহ পড়ে রয়েছে। দশ-বারজন মহিলা গান্ধীর মৃতদেহের কাছে বসে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা গান্ধীর মাথার নীচে হাত দিয়ে গান্ধীর মুখ একটু উঁচু ক'রে তুলে ধরে রেখেছেন। বড় একটা কম্বলে গান্ধীর দেহ আবৃত। মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন আস্তে আস্তে স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন এবং কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

যেন পরম শান্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে গান্ধীর মুখ। ঐ মুখের উপর এখন আর সেই সাদা ইস্পাতের ফ্রেমের চশমাটি নেই, যে বহু-ব্যবহৃত পুরনো চশমাটি

গান্ধীর চোখ-মুখের প্রায় অঙ্গীভূত হয়েই গিয়েছিল। বাতাসে ধূপের গন্ধ, মেয়েদের করুণ কণ্ঠস্বরের কান্না ও প্রার্থনা, বৃদ্ধ মহাত্মার ক্ষুদ্র শীর্ণ ও নিষ্প্রাণ দেহ, অথচ ঘুমন্ত মানুষের মুখের মতো শান্ত একটি মুখ, এবং এতগুলি নীরব নরনারীর নিষ্পন্দ-দৃষ্টি—মনের সকল অনুভূতি মুহ্যমান ক'রে দেবার মতো এমন বেদনাভিভূত মুহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো দেখা দেয়নি। মনের এমন আবেগ-ব্যাকুল অবস্থাও আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ভবিষ্যতের কথা এবং ভাবতে গিয়ে শঙ্কিতও হয়ে উঠছিলাম। চিন্তাগুলি বিমূঢ় এবং দিশেহারার মতোই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের গভীরে এই সত্যও উপলব্ধি করছিলাম—এটা পরাভবের ঘটনা নয়, জয়ের ঘটনা। এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটির চিন্তা আশা ও আদর্শের শক্তিই জয়ী হয়েছে। যে শুদ্ধ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বৃদ্ধ নিঃশ্বাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আদর্শের সেবা করেছেন, সেই শুদ্ধতা ও নিষ্ঠা এমনই এক শক্তি সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেল যে, কোন হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ও বুলেট সে-শক্তিকে ছিন্ন করতে পারবে না।

গান্ধীর দেহের নিকটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আমাদের নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তারপর এ ঘর থেকে চলে গিয়ে বড় হলঘরের ভিতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা যত গভীর হচ্ছে, ভিড়ও ততই বেড়ে উঠছে। জানালার উপর শত শত মুখ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বন্ধ জানালাগুলির শার্শি অনবরত ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বাজছিল জনতার ব্যাকুল করাঘাতে। ভারত গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীরা অন্য একটি কক্ষে বসে রয়েছেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য হলঘর থেকে মাউণ্টব্যাটেন এইবার সেই কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

আমি চুপ ক'রে শুনছি। মাউণ্টব্যাটেন বলছেন—"গান্ধীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের সময় গান্ধী আমাকে বলেছিলেন যে, নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল করিয়ে দেওয়াই এখন তাঁর মনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছা।"

মাউণ্টব্যাটেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র নেহরু ও প্যাটেল দু'জনেই হঠাৎ উঠে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দু'জনেই পরস্পরকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিড়লা ভবনের কক্ষে সমবেত মন্ত্রীদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলোচনা ক'রেই বের হয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, প্যাটেলকেও রাজি করিয়েছি। আজ রাত্রে নেহরু ও প্যাটেল উভয়ে একই সময়ে বেতারে দেশবাসীর উদ্দেশে বলবেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, এই ব্যবস্থা করতে পেরে তিনি খুব বড় একটা 'সাফল্য' লাভ করতে পেরেছেন। বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে নেহরু ও প্যাটেলের এইভাবে 'একসঙ্গে' উদ্যোগী হবার প্রমাণ দেশবাসীর সমক্ষে প্রচারিত করা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাউণ্টব্যাটেন আবার বললেন, বর্তমান অবস্থার সকল ঘটনা ও প্রতিক্রিয়াকে নেহরু যদি অবিলম্বে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন, তবেই মঙ্গল। এ বিষয়ে নেহরুর সাফল্যের উপরেই ভবিষ্যতের সব কিছু নির্ভর করছে।

এখন দেশের সর্বত্র লোকের মনের ভাব এই শোকের আঘাত সত্ত্বেও এমন এক উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে যে, সামান্য একটি কথার ভুলে, অথবা একটি গুজবে এই উত্তেজনা দাবাগ্নির মতো জ্বলে উঠে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছুক্ষণ আগে বিড়লা ভবনের সম্মুখে যখন আমরা ছিলাম, তখনই ভিড়ের ভিতর থেকে একটা

গুজববাজ লোক মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এসে বলে উঠল—'একটা মুসলমান এই কাণ্ড করেছে।' মাউণ্টব্যাটেন এবং আমাদের মধ্যে কেউই তখনো জানতেন না যে, কে হত্যা করেছে গান্ধীকে। হত্যাকারীর নাম কি, কোন্ ধর্মের লোক—এসব তখনো কিছুই আমরা শুনিনি। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হত্যাকারী যদি মুসলমান হয়, তবে এ ঘটনার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ করবার ভরসা আর নেই, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ নিরোধ করাও কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। গুজববাজ লোকটার কথা শুনে মাউণ্টব্যাটেন একটা বেপরোয়া আন্দাজের জোরে তৎক্ষণাৎ ধমক দিলেন—বেকুব কোথাকার! হত্যাকারী যে একজন হিন্দু, এটুকুও এখনো শোননি?

কয়েক মিনিট পরে ভি পি মেননের কাছ থেকে আমি জানতে পেলাম যে, হত্যাকারী হলো জনৈক মারাঠা হিন্দু। গান্ধী যখন তাঁর প্রার্থনাসভার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখনই খুব নিকট স্থান থেকে হত্যাকারী তাঁর উপর তিনবার গুলী নিক্ষেপ করেছে। ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গেও আমি আলাপ করলাম। গান্ধীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই ডাক্তার গান্ধীকে ঔষধ দিয়ে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। ডাক্তার অভিযোগ করলেন যে, বিড়লা ভবনে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কিছুই ছিল না। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করলেন যে, ঔষধপত্র থাকলেও কিছু হতো না। গুলীবিদ্ধ হবার পর মাত্র কয়েক মুহূর্ত গান্ধী বেঁচেছিলেন। সামান্য একটু জল পান করতে পেরেছিলেন গান্ধী এবং তার পরেই চেতনা হারিয়ে ফেললেন। সে চেতনা আর ফিরে এল না।

গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থার কথা নিয়ে অনেক কথা উঠল এবং আলোচনা হলো। প্যারেলাল বললেন—গান্ধীর মরদেহ কোনরকম রাসায়নিক ব্যবস্থার দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর মতো রক্ষা করা উচিত হবে না, কারণ স্বয়ং গান্ধীই একাজ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। গান্ধী পূর্বেই তাঁর এই ইচ্ছা ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন বিশুদ্ধ হিন্দু প্রথা অনুযায়ী দাহ করা হয়।

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরু পরামর্শ ক'রে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আগামী কাল গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যে কল্পনাতীত জন-সমাগম হবে, তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা একা দিল্লীর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের শক্তিতে সম্ভবপর হবে না। দেশরক্ষা বিভাগের উপরেই কাজের ভার দেওয়া হলো। দিল্লীর এরিয়া কম্যাণ্ডার সকল বিভাগের সৈন্য নিয়ে অন্ত্যেষ্টির শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

মহাত্মাকে শেষবারের মতো দেখবার জন্য বিড়লা ভবনের উপর এই সন্ধ্যাতেই জনতার অভিযান প্রবল হয়ে উঠতে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জানালা-গুলি জনতার চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। নেহরুকে এই আশঙ্কার কথাও বললাম।

নেহরুর সে বিষণ্ণ ও বেদনাপীড়িত মূর্তির করুণতা বর্ণনা করা যায় না। অবসন্ন ও ক্লান্ত স্বরে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলাম, এই অবস্থার মধ্যেও তিনি কিভাবে নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছেন। নেহরু বললেন—সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গান্ধীর দেহ আজ রাত্রের মতো ঘরের বাইরে নিয়ে এসে একটা উঁচু স্থানে রাখা হবে, যার ফলে জনতা একটা লাইন ধরে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে এসে মহাত্মার শেষ 'দর্শন' লাভ ক'রে চলে যেতে পারবে।

বাইরের জনতা অস্থির হয়ে উঠছিল। মহাত্মার দর্শন লাভের জন্য জনতার চীৎকারও বাড়ছিল। নেহরু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে সোজা সেই জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেহরুর সঙ্গে যে কোন দেহরক্ষী নেই, একথা ভুলেও একবার মনে হলো না নেহরুর। জনতার সঙ্গে কথা বলে নেহরু আবার ফিরে এলেন।

রাত্রি আটটার সময় আমরা বিড়লা ভবন ছেড়ে গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এলাম। দেবদাস গান্ধী এবং মৌলানা আজাদকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন।

দেবদাস বললেন,—পাগলের কাণ্ড! পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—এটা যদি সত্যিই পাগলের কাণ্ড হতো, তবে আমি অন্তত বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করতাম না। কিন্তু এটা মোটেই পাগলের কাণ্ড নয়। যথেষ্ট পরিকল্পনা ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে এবং ব্যবস্থা ক'রেই যে এ কাণ্ড করা হয়েছে, তার প্রমাণ ও লক্ষণ খুব বেশি ক'রেই দেখতে পাচ্ছি।

মৌলানা আজাদ ইংরেজীতে কথা বলেন না, যদিও তিনি ইংরাজী বলতে পারেন। মৌলানা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মাউণ্টব্যাটেনের মন্তব্যই সমর্থন করলেন।

গভর্নমেণ্ট হাউসের এ ডি সি কক্ষে ফিরে এসে দেখতে পেলাম, ভি পি মেনন, কিংসলি মার্টিন এবং গর্ডন ওয়াকার বসে রয়েছেন। মাত্র গত কাল দিল্লী পেঁৗছেছেন গর্ডন ওয়াকার। ভাবতে আরও কষ্ট হচ্ছে যে, আমি আজই সকালে প্যারেলালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গান্ধীর সঙ্গে গর্ডন ওয়াকারের একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে গর্ডন ওয়াকার প্রস্তুত হয়েছিলেন। হঠাৎ জামসাহেব ঘরে ঢুকলেন। জামসাহেব বললেন, আজ সন্ধ্যা ছ'টার সময় গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল এবং শুধু এই উদ্দেশ্যেই তিনি আজ বিমানযোগে দিল্লীতে এসে পেঁৗছেছেন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : বিড়লা ভবন থেকে যমুনার রাজঘাট—ছয় মাইল দীর্ঘ পথ। জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সৈনিকেরা পথের স্থানে স্থানে ডিউটি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি উদ্বেগের ভার আমাদের চিন্তা থেকে নেমে গিয়েছে, কারণ হত্যাকারীর নাম ও পরিচয় জানতে পেরেছি। হত্যাকাণ্ডের পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এই তথ্য অতি দ্রুত ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, হত্যাকারী হলো হিন্দু মহাসভার জনৈক মারাঠা সদস্য, নাম গড়সে।

আজ আবার বিড়লা ভবনের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হলাম। গত রাত্রের জনতার তুলনায় অনেক বড় এক জনতার চাপে আমাদের পথ পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠল। দেখলাম, মহাত্মার শবাধার পুষ্প ও কংগ্রেস পতাকায় আবৃত করা হয়েছে। একটি গাড়ির উপর শবাধার রাখা হয়েছে। একদল ভারতীয় নৌ-সৈনিক গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। গভর্নর-জেনারেলের বডিগার্ড দল চলল আগে আগে। সঙ্গে সঙ্গে শবানুগামী জনতা, যার মধ্যে মন্ত্রী ও সেনাপতির দল ভারতের দীনতম সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে জায়গা নেবার চেষ্টা করছেন, যাতে মহাত্মার মুখ আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিতে পারা যায়। ভারতীয় মহাত্মার শবাধারের সঙ্গে, সম্মুখে ও পিছনে চলেছে সৈনিকের দল। তা ছাড়া, গান্ধীরই বহু সংগ্রামে যে সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে চিরকাল কাজ করেছে, সেই 'চার-আনা' কংগ্রেসীও হাজারে হাজারে চলেছেন।

আর একবার গান্ধীর মুখ দেখতে পেলাম এবং আগের মতোই আর একবার বিস্মিত হলাম সেই মুখের প্রশান্ত রূপ দেখে। ফুলের স্তবকের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন গান্ধী। তাঁর দেহের চারদিক ঘিরে বসে রয়েছেন গান্ধীর পুত্রেরা এবং নাতি-নাতনীর দল। প্যাটেলও বসেছেন গান্ধীর দেহের পাশে। বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট ও অবসন্ন একটি মূর্তি—উদাস ও শূন্য দৃষ্টি তুলে প্যাটেল লক্ষ্যহীনভাবে যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

গান্ধীর মৃত্যুতে প্যাটেলের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেল, সে কথা ছেড়ে দিই। এই ঘটনা প্যাটেলের মনের উপর যে বিশেষ আঘাত এবং খুবই কঠোর আঘাত দিয়েছে, সেই কথাই ভাবছি। এরকম হবার বিশেষ কতকগুলি কারণও রয়েছে। প্রথমত, গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের বনিবনা যে হচ্ছে না, এ খবর কিছুদিন থেকে প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, প্যাটেলই হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। সুতরাং গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য তিনিই সরকারীভাবে দায়ী। এটা অবশ্য সত্য যে, দশ দিন আগে প্রার্থনাসভায় বোমা বিস্ফোরিত হবার পরেও গান্ধী নিজেই বিশেষভাবে এবং সুস্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোন পুলিশ নিযুক্ত করতে হবে না। কিন্তু এটাও স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যাচ্ছে যে, দশদিনের আগের বোমা বিস্ফোরণ এবং গত-কালের আক্রমণ, উভয়ই একই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আর একটি শোচনীয় সত্য এই যে, দশদিন আগের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা লক্ষ্য ক'রেও পুলিশ এই দশদিনের মধ্যে অপরাধীদের সন্ধান ক'রে ধরে ফেলতে পারেনি। নেতাদের মধ্যে প্যাটেলের সঙ্গেই গান্ধীর শেষ দেখা ও আলাপ হয়েছে। সেদিন অপরাহ্ণে প্যাটেলেরই সঙ্গে কথা বলতে বলতে কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল গান্ধীর। প্যাটেলকে বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনাসভার কাছে যেই মাত্র এগিয়ে এলেন গান্ধী, তখনি হত্যাকারী তাঁর পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এ ঘটনায় প্যাটেলেরই মন সব চেয়ে বেশি যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নানারকম উদ্যোগে, ব্যবস্থায় ও আয়োজনে মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু তবুও ঘুরে-ফিরে কাজ করতে পারছেন, কিন্তু প্যাটেল যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। বিড়লা ভবন থেকে রাজঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাইল পথ শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চললেন প্যাটেল। প্যাটেলের বয়সও বাহাত্তর বছর পার হতে চলেছে এবং সেই বয়সের এক বৃদ্ধের পক্ষে এতটা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করাও কত কঠিন! কিন্তু প্যাটেল যেন ইচ্ছা ক'রেই এই ক্লেশ ও কষ্ট আজ গ্রহণ করতে চাইছেন।

এগারটা বেজে গিয়েছে, ধীরে ধীরে গান্ধীর শবাধার এগিয়ে চলেছে। জনতার শেষ নেই, সীমা নেই। গভর্নমেণ্ট হাউসের কাছে এসে আমরা এ দৃশ্য ভাল ক'রে দেখবার জন্য দরবার হলের গম্বুজের উপরে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখান থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে গান্ধীর শবাধার জনসমুদ্রের তরঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। আমাদের সম্মুখের এই সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত সড়কের নাম কিংস্‌ওয়ে। এই 'রাজার সড়ক' ধরে চলে যাচ্ছেন সেই গান্ধী, যিনি সত্যিই রাজা ছিলেন না। যাচ্ছেন সেই গান্ধী, যিনি এই পথ থেকে ব্রিটিশরাজকে সরিয়ে দিয়েছেন। ব্রিটিশরাজকে অপসারিত ক'রে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সব চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছেন, সেই মানুষটিই এই রাজার সড়কে প্রথম ও শেষ দর্শন দিয়ে চলে যাচ্ছেন। সেই মানুষটিই আজ তাঁর মৃত্যুতে যে বিরাট শ্রদ্ধার ঐশ্বর্য তাঁর

সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, সে শ্রদ্ধা এই রাজার সড়কে ভ্রমণকারী কোন ভাইসরয়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যমুনার ঘাটে পৌঁছলাম। গভর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সব সমেত আমরা বিশ জন এগিয়ে চললাম। আমাদের পিছনে পাঁচলক্ষ লোকের ভিড়। সম্মুখে ও পার্শ্বে, ভিড় যেন আকাশপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত বেদিকার উপর কাষ্ঠখণ্ডে সজ্জিত চিতার কাছাকাছি গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। পিছন থেকে পাঁচলক্ষ লোকের ভিড় আমাদের উপর প্রপাতের মতো এসে পড়ছে।

তবুও চিতামঞ্চ লক্ষ্য ক'রে চারদিক থেকে জনতার পর জনতা এগিয়ে আসতে আরম্ভ করল। এখন এই জায়গায় কম ক'রেও সাত লক্ষ লোক হবে। রাজনীতিক নেতা ও মেথর, গভর্নর ও চাষী নারী—প্রত্যেকেই ফুল দেবার জন্য ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

চিতামঞ্চে অগ্নিশিখা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাঁপিয়ে লক্ষকণ্ঠে একটি বিরাট ও গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হলো—গান্ধী অমর!

মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে আমরা সেখানেই ধুলোর উপর বসে পড়লাম। মাউণ্ট-ব্যাটেনও বসে পড়লেন। পিছনের বিরাট জনতাকে থামিয়ে রাখবার অথবা বসিয়ে দেবার জন্যই মাউণ্টব্যাটেন এই কাজটি করলেন। আর একটা কারণও ছিল। যদি মাউণ্টব্যাটেন এবং আমরা বসে না পড়তাম তবে পিছনের জনতার সম্মুখে এগিয়ে আসবার প্রবল উৎসাহের একটি ধাক্কায় আমরা জ্বলন্ত চিতার অগ্নিশিখার মধ্যে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হতাম।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ বিকালে বব স্টিমসন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেদিনের প্রার্থনাসভায় বব উপস্থিত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের মাত্র পঁচিশ মিনিট পরে স্টিমসন বি-বি-সির এক-ঘটিকার প্রোগ্রামে ঘটনার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ প্রথম প্রচার ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে সাংবাদিক দ্রুততার রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

বব বললেন, সেদিন তাঁর প্রার্থনাসভায় যাবার কোন কথা ছিল না। গান্ধীর প্রার্থনাসভা একবার স্বচক্ষে দেখবার বিশেষ ইচ্ছা হয়েছিল ভিনসেণ্ট শীয়ানের। শীয়ানকে যেতে দেখেববও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। শীয়ান এই নিদারুণ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু শীয়ান এত বেশি মর্মাহত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি আমেরিকাতে সংবাদ প্রেরণের জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারেননি।

বব বললেন যে, গান্ধীর হত্যাকারীকে যে ব্যক্তি প্রথম গিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল, তার নাম কেউ করছে না। প্রার্থনাসভায় উপস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অফিসের জনৈক কর্মচারীই হলেন এই 'অখ্যাত হিরো'। সবচেয়ে আগে তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন, কি ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেল। তিনিই সবার আগে এক লাফে উঠে এবং এগিয়ে গিয়ে হত্যাকারীকে চেপে ধরেছিলেন। বব বললেন, ঘটনার সময় কোন ব্যক্তিই সভা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি, এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েও ওঠেনি। সকলেই বৃদ্ধ মহাত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

নতুন ভারতের প্রথম গভর্নর-সম্মেলনও হয়ে গেল। সম্মেলনের দিন পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। মহাত্মার হত্যায় দেশের এই বেদনাভিভূত অবস্থায় সম্মেলনের আয়োজন করতেও কেউ বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিলেন না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন সম্মেলন আহ্বান করারই সিদ্ধান্ত করলেন।

গভর্নরেরা সকলেই সাম্প্রদায়িক হিংসা দমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। পশ্চিম-বঙ্গের গভর্নর রাজগোপালাচারী দেশের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে চালিত সকল রাজনৈতিক সঙ্ঘগুলিকে অবিলম্বে দমন করবার প্রস্তাব করলেন। রাজগোপালাচারী বিশেষভাবে হিন্দুমহাসভা ও হিন্দুমহাসভারই সংগ্রামতৎপর শাখা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে দমনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গান্ধীর মৃত্যুতে সারা পৃথিবীর মনে যে এত বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, এটা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। যতটা হবে বলে মনে করেছিলাম, বস্তুত তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান থেকে গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে যে পরিমাণ শ্রদ্ধার ও শোক-বেদনার বাণী আসছে, তা থেকে এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারছি যে, গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। গান্ধীজীবনের বাণী ও কর্মের পূর্ণ তাৎপর্য হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু এটা একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাঁর চরিত্রের মহিমা সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে।

কিংস্‌লি মার্টিন বললেন—গান্ধী মানবজাতির বিবেক জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। জড়বাদে এবং রাজনৈতিক শক্তির দ্বন্দ্বে মত্ত হয়ে পৃথিবীর যে বিশেষ ভাল কিছু হচ্ছে না, এটা আধুনিক কালের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। গান্ধী নতুন একটা পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি মানবজীবনের আত্মিক সত্যের ও মূল্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন। আমার মনে হয়, সম্ভবত এই পথই মানুষের পক্ষে বেশি কল্যাণকর পথ।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌ লিখেছেন—নিউ টেষ্টামেণ্টের বাণীমূর্তি ছিলেন গান্ধী। তিনি শত্রুকেও ভালবাসবার প্রয়াস ক'রে গিয়েছেন। তিনি এখন মানুষের সর্বকালের সম্পদ হয়ে গেলেন।

এটলি বেতারে ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্যে গান্ধীর নামে শ্রদ্ধা-ভাষণ প্রচার করেছেন। ট্রুম্যান বলেছেন—সমস্ত পৃথিবীর ক্ষতি হলো। স্মাট্‌স্‌ বলেছেন—'মানুষের রাজা' তিরোহিত হয়েছেন। জিন্না বলেছেন,—গান্ধী হিন্দু-সমাজের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও আস্থাভাজন নেতা ছিলেন এবং এ পর্যন্ত হিন্দু-সমাজ হতে যেসব অতি মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, গান্ধী তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জিন্নার উক্তির মধ্যে একটা ভুল রয়ে গিয়েছে। গান্ধী যদি সত্য সত্যই হিন্দু-সমাজেরই প্রত্যেকের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হতেন তবে এই শোচনীয় ঘটনা আজ পৃথিবীতে দেখা দিত না। গান্ধীর প্রতি হিন্দু-সমাজের শ্রদ্ধা ও আস্থা 'সর্বব্যাপী' হয়নি বলেই তাঁর প্রাণ হরণ করা হয়েছে।

গান্ধীমৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত ভারতের প্রত্যেক সংবাদপত্রের বিশেষ স্মরণ-সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, দেশের মানুষ এই ঘটনায় কি তীব্র আত্ম-গ্লানি, অনুশোচনা ও লজ্জা বোধ করছেন। প্রত্যেক ভারতীয় সংবাদপত্র যেসব গান্ধী-স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন তাদের অনেকগুলির মধ্যে উচ্চস্তরের সাংবাদিক রুচি ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার গান্ধী-স্মরণ-সংখ্যা। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' তিনটি পৃষ্ঠা পূর্ণ ক'রে গান্ধীর তিনটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করেছেন। প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্থানটি প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য রেখে তার মধ্যে বোল্ড টাইপে ক্ষুদ্র একটি প্যারাগ্রাফে অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে গান্ধীর উদ্দেশ্যে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' বলেছেন—"গান্ধী

তাঁর স্বজাতির মুক্তির জন্য বেঁচেছিলেন এবং স্বজাতির লোকই তাঁকে হত্যা করেছে। ক্রুশবিদ্ধ সেই মহামানবের প্রাণবলির মতো পৃথিবীর ইতিহাসে মহামানবের দ্বিতীয় প্রাণবলির ঘটনা একটি শুক্রবারেই ঘটেছে, সেই একই শুক্রবার, আজ থেকে এক হাজার নয় শত পনর বৎসর পূর্বে যেদিনে যীশুখৃষ্টের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল। পিতা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো।"

বিরামহীন দ্বন্দ্ব

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গভর্নমেণ্ট এখন যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ পেয়েছেন যে, শুধু মহাত্মাকে নয়, অন্যান্য বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদেরও প্রাণ-নাশের একটা গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। গান্ধীর প্রাণনাশ কোন ব্যক্তির আকস্মিক উত্তেজনার বশে অনুষ্ঠিত ব্যাপার নয়; সুপরিকল্পিত ব্যাপার। একই ষড়যন্ত্রকারীর দল গান্ধী এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, হিংসামূলক কর্মপন্থার সমর্থক কোন রাজনৈতিক দলকে আর দল হিসাবে থাকতে দেওয়া হবে না এবং সামরিক পদ্ধতিতে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আর স্বেচ্ছাসৈন্য গঠন করতেও দেওয়া হবে না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এই সঙ্ঘের বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আমি আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলের পত্রিকা 'দি অর্গানাইজার'-এ লিখিত অদ্ভুত একটি প্রবন্ধ পাঠ করলাম। এ প্রবন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার পরিচয় জানতে পেলে রোজেনবার্গের মনও নতুন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠত। আট বছর বয়সের শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর মনে এক 'নব্য-সংস্কৃতি'র বীজ বপনের পরিকল্পনার কথা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই এবং হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান হওয়া চাই—তা'হলেই যে-কোন ব্যক্তি এই নব্য-সংস্কৃতিবাদী সঙ্ঘের সদস্য হতে পারবে। প্রবন্ধের লেখক বলছেন—'আমাদের এই সঙ্ঘ এখন হিমালয়ের মতো বিরাট এবং সমুদ্রের মতো বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।' প্রবন্ধের লেখক এই সঙ্ঘের বিরাটত্বের পরিচয় আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, যদি সঙ্ঘের আর কোন নতুন শাখা স্থাপিত না'ও হয়, তবুও বর্তমানে যতগুলি শাখা আছে শুধু সেগুলিকেই মাত্র একবার ক'রে ঘুরে দেখতে হলে একজনের পঁচিশ বছর সময় লাগবে। প্রবন্ধলেখকের এই উক্তি অবশ্য অত্যুক্তি মাত্র। লেখক তাঁর সাধের কল্পনার কথাই বাগাড়ম্বর ক'রে প্রচার করেছেন। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দল এমন বিরাট একটা বস্তু মোটেই নয়। যাই হোক, গভর্নমেণ্ট এই সঙ্ঘকে শুধু 'নিষিদ্ধ' করেছেন। কিন্তু কোন সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা এক ব্যাপার এবং ভেঙে দেওয়া আর এক ব্যাপার।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গ্রোয়েডার্স ব্যাঙ্কিং গ্রুপ অব নিউ ইয়র্কের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নরবার্ট বোগড্যান দিল্লীতে এসেছেন। ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক শক্তি ও যোগ্যতা এবং আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বোগড্যান দুই দেশেই ঘুরছেন। করাচীতে জিন্নার সঙ্গে বোগড্যানের সাক্ষাৎ হয়েছিল। বোগড্যান বললেন যে, জিন্নার কাছ থেকে যতটা সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পাবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন, কার্যত তার চেয়ে বেশিই পেয়েছেন। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে জিন্না অবশ্য অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। গান্ধীর সম্বন্ধে জিন্না কিছু কিছু বললেন। গান্ধীর মৃত্যুতে জিন্না তাঁর প্রচারিত বাণীতে গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি উদার অভিমত তিনি বোগড্যানের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে

প্রকাশ করলেন। বোগড্যানের কাছে জিন্না বলেছেন—গান্ধীর মৃত্যুতে মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। জিন্না বললেন যে, ভারতের দায়িত্বশীল ক্ষমতার পদে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তির মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বিরুদ্ধ মন্তব্য ক'রে থাকেন, এ অখ্যাতি তাঁর আছে। পাকিস্থানের আর্থিক ও রাজনৈতিক ধ্বংস সাধনের জন্য এই সব ভারতীয় নেতা নানারকম মতলব ও পরিকল্পনা করছেন, জিন্নার এই উক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং জিন্নাই মন্তব্য ক'রে বললেন যে,—'এ'দের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না হয় প্রত্যাহার ক'রেই নিলাম। সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ অভিযোগ হতে দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের আমি রেহাই দিতে রাজি আছি। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো, অন্যান্য চরমপন্থী নেতা ও দলগুলির ক্রিয়াকলাপ। এরাই সমস্ত অশান্তির আসল কারণ'। বোগড্যান লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর ভারত গভর্নমেণ্ট যেভাবে চরমপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে ভারত গভর্নমেণ্টের সম্পর্কে জিন্নার মনের ভাবও একটু ভাল হয়েছে।

একজন 'চরমপন্থী'র মনোভাব ও আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, গত কয়েকদিনের ঘটনাকে তিনি তাঁর পক্ষে খুবই একটা সুযোগের ব্যাপার বলে বোধ করেছেন। ইনি হলেন সোস্যালিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। কংগ্রেস হলেন একটি প্রবীণ রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের প্রধান সংগ্রামও জয়যুক্ত হয়েছে। সুতরাং, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটি গণতন্ত্রসম্মত সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে শক্তিশালী জন-সমর্থন জাগ্রত ক'রে তোলার সাফল্যময় সম্ভাবনা রয়েছে। গান্ধীর মৃত্যুতে এখন সোস্যালিষ্টদের সম্মুখে দু'টি পথ দেখা দিয়েছে, এর মধ্যে যে-কোন একটি পথ গ্রহণ করতে পারলে তাঁরা লাভবান হবেন। একটি পথ হলো, খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষ-ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। আর একটি পথ, কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে এসে কংগ্রেসকে ভিতর থেকেই দখল করা। একটি সাংবাদিক সম্মেলনও আহ্বান করেছেন জয়প্রকাশ, কিন্তু সম্মেলনে তিনি যা বললেন তাতে ঐ দুই পথের কোনটিরই গ্রহণের ইচ্ছার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। তিনি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলের নিন্দাও করলেন। এর ফল এই হবে যে, নেহরুর সঙ্গেও সোস্যালিষ্টদের কোন মিল ও আপোষ প্রায় একটা অসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে।

কিংস্‌লি মার্টিন বললেন যে, গতকাল জয়প্রকাশের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু হতাশ হয়েছেন মার্টিন। গান্ধীর মৃত্যুতে জয়প্রকাশের মন যদিও এখনো বেদনাভিভূত ও ম্রিয়মান হয়ে রয়েছে, তবুও এইটুকু বোঝা গেল যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াসে যে পরিমাণ মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, সে পরিমাণ দৃঢ়তা তাঁর নেই। এই ত্রুটি যেমন বহু সদিচ্ছাসম্পন্ন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, জয়প্রকাশের মধ্যেও তেমনি দেখা গেল। তাঁর সমর্থক ও অনুগামীদের ইচ্ছাটা কি, অথবা মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই এখন তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত কি না, এই কূট প্রশ্ন সম্বন্ধে জয়প্রকাশের অদ্ভুত একটা ঔদাসীন্য ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টার ভাব লক্ষ্য করেছেন মার্টিন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : বিখ্যাত জি ডি বিড়লা আজ তাঁর ভবনে আমাকে ভোজনে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেই বিড়লা ভবনে আবার যেতে হলো। ভবনে ঢুকবার সময় আমি মনের ভিতর অদ্ভুত একটা ভয়-ভয় ভাব অনুভব করছিলাম। সেই সন্ধ্যার হত্যাকাণ্ডের পর আর আমি এই ভবনে আসিনি। হাজার হাজার লোকের মনের বেদনায় ব্যাকুল ও অস্থির সেই

সন্ধ্যার কয়েকটি ঘণ্টার যে দৃশ্য এখানে দেখা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসাবে এখন শুধু পড়ে রয়েছে দড়ি দিয়ে ঘেরা এক খণ্ড ভূমি, নিহত মহাত্মা ঠিক যেখানে মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছিলেন। একটি স্মৃতিফলক এখানে স্থাপিত হবে। এই ভূমিখণ্ডের উপর থেকে ঘাসের চাপ্‌ড়া সেই সন্ধ্যাতেই তুলে নিয়েছে সেই শ্রেণীর লোক, যারা সম্মুখে মহাত্মার মৃত্যুর মতো একটা শোকাবহ ঘটনার মধ্যেও ঐতিহাসিক স্মারক চিহ্ন সংগ্রহের উৎসাহ বর্জন করতে পারেনি।

বিড়লা হলেন একাধারে শিল্পপতি, সংবাদপত্রের মালিক, দানশীল, সেবা-কর্মোৎসাহী এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মধ্যে বিলাসিতার কোন আড়ম্বর দেখা যায় না। বাজ পাখীর মতো তাঁর মুখের গড়ন, যেন একজন ভারতীয় শার্লক হোম্‌স্‌। আমার ধারণা, এই বিখ্যাত ডিটেকটিভের মতোই বিড়লারও প্রখর বাস্তবদর্শিতার ক্ষমতা আছে। বিড়লা ভবনের এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী চেট্টি, জয়পুরের সুযোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণমাচারী, মেটা নামক জনৈক ব্যবসায়ী ধনিক এবং নিউজ ক্রনিকলের সংবাদদাতা নরম্যান ক্লিফ।

যতক্ষণ ভোজন চললো, ততক্ষণ ব্যবসায়ের বিষয়ই আলোচিত হলো। ফাইন্যান্স তথা অর্থ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যার বিষয়। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা ও চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা বিষয়। আলোচনার মধ্যে বহু পরিমাণ তুলা, পাট ও খাদ্যশস্য কখনো বা রপ্তানি ক'রে ফেলা হলো, কখনো বা আটক ক'রে রাখা হলো। আমার মনে পড়ল, মাত্র সাত দিন আগে ঠিক এই স্থানেই কি ব্যাপার হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের মনের বেদনার কোন্‌ রূপ ঠিক এই ঘরগুলির মধ্যেই সমবেত জনতার চোখেমুখে দেখেছিলাম! সেই দৃশ্যের তুলনায় কি অদ্ভুত এবং কত বিপরীত আজকের এই অর্থকরী দালালী গবেষণার দৃশ্য!

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ লক্ষ লক্ষ লোক মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অনুষ্ঠান পালন করেছে। ভারতের সকল পুণ্যতোয়া নদী এবং সমুদ্রের জলে মহাত্মার দেহভস্ম বিসর্জন করা হয়েছে। প্রধান অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতীর ধারা এক প্রবাহে মিলিত হয়েছে।

আজ সকালে দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর স্টাফ ক্যাথিড্রাল চার্চ অব রিডেমসনে উপস্থিত থেকে গান্ধীর স্মরণে এক প্রার্থনার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় খৃষ্টান মাথাইও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ধর্মবাণী পাঠ করলেন। "লীড কাইণ্ডলি লাইট", "অ্যাবাইড উইথ মি" এবং "হোয়েন আই সার্ভে দি ওয়াণ্ড্রাস ক্রস"—গান্ধীর প্রিয় এই তিনটি প্রার্থনা-সঙ্গীত সমবেত জনতা সমস্বরে গাইলেন। চার্চের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক নরনারী যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগদান করলেন, তাই দেখে আমি আমার বিশ্বাসের এই কথা বলতে পারি যে, এই আন্তরিকতা মহাত্মারই আশীর্বাদে ধন্য হবার যোগ্য।

গান্ধী-স্মরণের শেষ অনুষ্ঠান মাউণ্টব্যাটেন উদ্‌যাপন করেছেন আজ রাত্রে তাঁর একটি বেতার ভাষণে। প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস নেতা গান্ধীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতির মধ্যে কতগুলি বিবৃতি অতি বিশুদ্ধ ইংরেজী গদ্যের এবং ভাষাশিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন। কতগুলি বিবৃতি আবার নিছক ভাবোচ্ছ্বাস ও কথার আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত। এই সব বেতার ভাষণে, সংবাদ-পত্রের লেখায় এবং হিন্দু-অভিমতের মধ্যে একটা বিপজ্জনক মনোভাবের লক্ষণও

দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনার পর যে কাজের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে সকলকে প্রস্তুত হতে হবে, সে কাজের কথা উল্লেখ অথবা সে সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই বরং একটা অসহায় অবস্থার দোহাই দিয়ে শুধু আত্ম-করুণার আবেগে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন ক'রে চলেছেন।

ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধেই মাউণ্টব্যাটেন এখন বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। ভারতের লক্ষ্য হলো, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল গণতন্ত্র। নেহরুর নেতৃত্বে এই আদর্শকেই ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সকলের পক্ষে প্রস্তুত হবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমাদের অনেক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। এই আদর্শে অগ্রসর হতে হলে গভর্নমেণ্টকে কোন্ পন্থা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, সে সম্বন্ধে একটা খসড়া রচনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল। সে খসড়া আমি রচনা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু আমার রচিত খসড়ার মধ্যে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি একটু বেশি উৎসাহের ঝোঁকে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন এই খসড়ার শব্দালঙ্কার কিছুটা কমিয়ে দিলেন। তা ছাড়া খসড়ার বক্তব্যও অনেক সংক্ষিপ্ত ক'রে দিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ভাষণে গান্ধীকে তাঁর সুহৃদ বলে উল্লেখ করেছেন। সভ্য জগতের প্রত্যেক দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গান্ধীর মৃত্যুতে যে বস্তুত স্বজনবিয়োগের বেদনা অনুভব করেছে, সে কথাও উল্লেখ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ধর্মের নামে উন্মত্ত মনোভাবের প্রতিরোধে গান্ধীর এই আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মহাত্মার প্রাণহরণের এই ঘটনার আঘাতে ব্যথিত দেশের মানুষ সকল প্রকার ভেদবাদের অবসান ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। এই পন্থাই হলো গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করার এবং ভারতকে তার জাতীয় মহিমার উত্তরাধিকারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পন্থা।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ আমরা সিংহলের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। সিংহলও ডোমিনিয়ন স্টেটাস লাভ করেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় যেভাবে নানারকম অশান্তি, গৃহযুদ্ধ ও হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপে বিব্রত হয়েছে, সিংহলে তা হয়নি। সিংহলের কাছে স্বাধীনতা এসেছে স্বচ্ছন্দে ও সহজে। স্বর্ণবর্ণ সিংহের প্রতিকৃতি চিহ্নিত সিংহলের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন দিল্লীতে সিংহলীয় বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ডি সিল্‌ভা। অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু বক্তৃতা করলেন। নেহরু যেন একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দচিত্তে উপস্থিত হয়েছেন, নেহরুর মনের ভাব দেখে তাই মনে হচ্ছিল। নেহরু তাঁর বক্তৃতায় সিংহলকে সেই ভারতীয় নামে 'লঙ্কা' বলেই সম্বোধন করলেন এবং লঙ্কার সঙ্গে ভারতভূমির ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাচীন অন্তরঙ্গতা ও সম্পর্কের কথা বললেন।

পতাকা উত্তোলনের পর সিংহলী চা পরিবেশন করা হলো। নেহরুকে দেখে বুঝতে পারছি, তাঁর মন এখন শোকের প্রথম আঘাত এবং দেশব্যাপী বিষাদের প্রকোপ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। চায়ের আসরে নেহরু আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বসলেন। সিংহলী চায়ের স্বাদুতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা আরম্ভ করতেই নেহরুও চায়ের প্রসঙ্গে নানা গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। নেহরু বললেন, চা তৈরী করাও একটা চারুকলা এবং এ চারুকলার চর্চায় যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির

প্রয়োজন আছে। তিনি চীন দেশের চা তৈরীর পদ্ধতির অনেক প্রশংসা ক'রে বললেন যে, ভোর বেলার শিশির পদ্মপাতা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেই শিশিরে চায়ের পাতা ভিজিয়ে 'চা' তৈরী করার একটা প্রথা চীন দেশে প্রচলিত আছে।

চায়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল টাস এজেন্সীর প্রতিনিধি ওলেগ ওরেস্টভের কথা। ইনি এখনো দিল্লীতে রয়েছেন, আর কয়েকদিন পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নে ফিরে যাবেন। ইনি সপরিবারে পুরাতন দিল্লীর গরীবদের এক মহল্লায় বাসা নিয়েছেন। ইনি কিছুদিন দিল্লীর বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সময় আমাদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজনে তিনি উপস্থিত থেকে ভারতের 'ক্ষমতা হস্তান্তর' প্রসঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। ভারতের উপর ব্রিটিশ প্রভাবের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বললেন এবং তারই প্রমাণ হিসাবে চায়ের কথা তুললেন। তিনি যেভাবে চা তৈরী করেন, তাই দেখে ভারতীয়েরা বিস্মিত হন। এ'তে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন ওরেস্টভ। ওরেস্টভ বললেন যে, আমার চা তৈরীর পদ্ধতি দেখে ভারতীয়েরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন—'এ চা খেতে কিরকম লাগছে আপনার?'

ওরেস্টভ বলেছেন—'খেতে যেরকম লাগে, ঠিক সেই রকমই লাগছে।'

ভারতীয়েরা বলেন—'কিন্তু এভাবে চা তৈরী করা তো নিয়ম নয়। ইংরেজরা যে দুধ আর চিনি মিশিয়ে চা তৈরী করেন।'

ভারতীয় রুচি ও মনোভাবের উপর প্রবল ব্রিটিশ প্রভাবের এই প্রমাণের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে ওরেস্টভ বললেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় সকল প্রভাবশালী ভারতীয় ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে জীবনের সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ রীতিনীতির উপাসক হয়ে পড়েছেন। ওরেস্টভ বললেন—"এইখানেই হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় জয় ও সাফল্য। একটা বিদেশের উপর থেকে আপনারা সরকারী ক্ষমতা অবশ্য স্বেচ্ছায় লিকুইডেট করেছেন, কিন্তু আপনাদের চিন্তা-প্রসেস এবং ব্যবহার-প্যাটার্ণ চিরস্থায়ী ক'রেই রেখে গেলেন।"

জয়প্রকাশ নারায়ণ এইবার উপযুক্ত জবাব পেয়েছেন। প্যাটেলের সঙ্গে নেহরুর মতবিরোধের কথা উল্লেখ ক'রে চারদিকে যেসব গল্প ছড়ানো হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে নেহরু তাঁর একটি বেতার বক্তৃতায় মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নেহরু বলেছেন—"এটা ঠিকই যে, বিগত বহু বৎসরের মধ্যে বহু বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমার মতের অমিল হয়েছে। বহু সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের অভিমতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও অন্যান্য পার্থক্যও দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের অন্তত এই সত্যটুকু জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের উভয়ের পার্থক্য নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। জনসেবার ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ ক'রে চলেছি, সে ক্ষেত্রে সকল প্রধান বিষয়ে আমাদের ঐক্যই আমাদের ছোটখাট সকল মতভেদের প্রশ্ন ছাপিয়ে সব চেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে। বহু দুরূহ ও মহৎ ব্রতে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কালেরও বেশি সময় আমরা দু'জনে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজ ক'রে এসেছি। আজ আমাদের জাতীয় পরিণামের এই সঙ্কটের সময় আমরা পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠব, একি কল্পনাও করা যেতে পারে? জাতির কল্যাণ ও স্বার্থকেই সব চেয়ে বড় ক'রে দেখা ছাড়া অন্য কোন স্বার্থকে বড় ক'রে দেখা আমাদের দু'জনের কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। একি সম্ভব যে, আজ এতদিন পরে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থকে বড় ক'রে দেখবার মতো ছোট-মনের মানুষ হয়ে যাব?"

নেহর্-প্যাটেল বিরোধের কাহিনী নিয়ে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান এখানেই হয়ে যাওয়া উচিত। যাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভারত রাষ্ট্রের দ্ই মহৎ প্রধান ব্যক্তি সহযোগী হবার মতো মহত্ত্বের প্রমাণ দিতে পারবেন না, তাঁরা উপযুক্ত জবাব পেয়ে গিয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের গবেষণা। নেহর্-প্যাটেলের ঐক্যের উপরেই ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নির্ভর ক'রে রয়েছে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ আমাদের স্টাফের এক বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীরের দুশ্চিন্তাকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে অন্তত এখনই যুদ্ধ বাধবার আশঙ্কা দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু আর একটি বিপদ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই প্রত্যাসন্ন বিপদটির বাস্তবতা আমরা দিল্লীতে থেকে যত সহজে বুঝতে পারছি, লণ্ডনে বসে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে অথবা লেকসাকসেসে বসে রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণের পক্ষে ততটা সহজে বোঝা তাঁদের সাধ্য হচ্ছে না। যেমন ভারত গভর্নমেণ্টের মনে তেমনি রাজনীতিক বিষয়ে সচেতন ভারতীয় জনসাধারণের মনে বিশেষ একটা সন্দেহের ধারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। ভারত গভর্নমেণ্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণ, উভয়েরই মনের এই সন্দেহ একসঙ্গে মিলে বর্তমানের ভারত-ব্রিটিশ সম্ভাবটুকু বিনষ্ট করার মতো একটা বড় রকমের আঘাত হয়ে দেখা দিতে পারে, এ বিপদের আভাষ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

কাশ্মীরের উপর আক্রমণ হয়েছে—এই হলো ভারতের মূল অভিযোগ। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ এখনো এই মূল অভিযোগটিকেই গ্রহণ করেননি। মূল অভিযোগ গ্রহণে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই বিলম্ব লক্ষ্য ক'রে এখানে লোকের মনের ধারণা একটা ধাঁধার মধ্যে পড়েছে, এবং কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু সংস্থাগত একটা রীতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ এই বিলম্ব করছেন, এখানে লোকের মন এরকম কোন কারণ বিশ্বাস করতে রাজি নয়। কোন দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবার উপক্রম হলে সেই বিঘ্নকে দূরীভূত করবার জন্য দায়িত্ব পালনের বিশেষ আদর্শ নিয়েই রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের মূল অভিযোগ গ্রহণে যেভাবে বিলম্ব করছেন, তাতে শান্তিকেই বিঘ্নিত করা হয়েছে—এই ধারণাই এখানের লোকের মনে ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে ক্ষোভের একটা মূল কারণ হয়ে উঠছে। এই থেকেই সন্দেহ বেড়ে উঠছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি সংস্থা। রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিণ প্রতিনিধি ওয়ারেন অস্টিন এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি নোয়েল বেকার, দু'জনেই যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেই অভিমতই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে এবং ভারতীয় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। দুজনেরই বিরুদ্ধে নির্লজ্জ পাকিস্থানপ্রীতির অভিযোগ বেশ রূঢ়ভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। কেন তাঁরা পাকিস্থান-দরদী হয়েছেন, তার নানারকম যুক্তিও দেখানো হচ্ছে, যেগুলি দু'জনের কারও সম্মান রক্ষা করছে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় অভিযোগের সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ মনোভাবের যে পরিচয় নোয়েল বেকার এবং অস্টিনের বিবৃতিতে ফুটে উঠেছে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভারতব্যাপী। সর্বসাধারণের মন যেন একটা আশাভঙ্গের বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছে। এর স্বাভাবিক ফল যা হতে পারে তাই হতেও চলেছে। উঠেছে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা। সোভিয়েট রাশিয়ার ভিটো ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাকে রাশিয়া ইচ্ছা করলে

ভারতীয় দাবীর পক্ষে কাজে লাগাতে পারেন। সোভিয়েট রাশিয়াও তো মধ্যস্থতা করতে পারেন, করে ভারতের উপর সুবিচার তাঁরা করবেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং তাঁদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি আশা করা যায়, এই ধারণা ভারতীয় জনমতে ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে।

ভারতীয় জনমতের এই অস্বস্তিকর অবস্থার কিছুটা অবশ্য আর একটি কারণে ঘটেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধির অকৃতিত্ব। ভারতীয় দাবীর বিষয়টি তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে ভারতীয় বক্তব্য দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে নেহরু ভারতীয় প্রতিনিধিকে ফিরে আসতে বলেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এইবার অন্য কাউকে পাঠানো হবে।

আরও বেশি অকৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন ভারত গভর্নমেণ্টের 'পাবলিক রিলেশন্‌স্‌', আমি যতটা আশঙ্কা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি। ভারতীয় বক্তব্যের তাৎপর্য সর্বদেশের জনসাধারণকে অবহিত করাবার কাজে যে পরিমাণ জনসংযোগ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল, ভারত গভর্নমেণ্ট তা করেননি। এমনই অব্যবস্থা যে, আয়েঙ্গারের বক্তৃতা হয়ে যাবার তিন চার দিন পরে তাঁর বক্তৃতার এক একটা বড় বড় ও দুষ্পাচ্য ছোব্‌ড়া ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শেখ আবদুল্লার কথা, আচরণ ও মনোভাব লেকসাকসেসের উপর কোন ভাল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের আসরে আবদুল্লার ব্যক্তিত্ব বিসদৃশই হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় বক্তব্য যতখানি দুর্বল হয়ে পড়বার কথা, বস্তুত তাই হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব করছেন পাকিস্থানেরই পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লা খাঁ। রাষ্ট্রপুঞ্জের আসরে প্রচলিত তর্করীতিতে একজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি বলেই তিনি পরিচিত। জাফরুল্লার আচরণে যে একটা মোলায়েম ও মৃদু ভাব দেখা যায়, ভারতীয় প্রতিনিধির আচরণে তা দেখা যায় না। বরং রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধিকে একটু বেখাপ্পা এবং রুক্ষ বলেই মনে হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন একটু দুর্ভাবনায় পড়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেছেন, এটলি ও নোয়েল বেকার এই বিরোধীয় বিষয়টির একটা দিক ভাল ক'রে বুঝে দেখছেন না। বিরোধীয় বিষয়টিকে বিবেচনা করার রীতি ও ভঙ্গীর মধ্যে সামান্য একটুও অসতর্কতা ঘটলে তার ফলে কয়েক কোটি মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সে বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন নন। দুপক্ষের সম্পর্কে একটা সমান বিচার ক'রে ফেলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা শুধু সমাধানের সকল কূটনীতিক প্রচেষ্টাগুলিকেই কঠিন ও কষ্টসাধ্য ক'রে তুলছেন। আবদুল্লার হাতে রয়েছে কাশ্মীরের শাসনভার এবং শুধু ভারতীয় সৈন্য রয়েছে কাশ্মীরে, এই অবস্থার মধ্যে যদি নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগেও গণভোট গৃহীত হয়, তবে সেটা কখনই যথার্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে গণভোট গ্রহণের ব্যাপার বলে কারও মনে হবে না, এই সত্যটি মেনে নিতে ভারত অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন এবং ভারতের এই অনিচ্ছাই বস্তুত সমস্যাকে জটিল ক'রে তুলেছে—লণ্ডন সমস্ত ব্যাপারটাকে এইভাবে বুঝছেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ভারত সম্পর্কে একটু কম বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ দিলেই ভাল করতেন এবং সেটা প্রমাণ করবার পথও ছিল। সব কাজের আগে পাকিস্থানকে একটি কাজ করতে হবে, সে কাজ হলো হানাদারদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা—এই অভিমত ব্রিটিশ প্রতিনিধির সমর্থন করাই উচিত ছিল। আইনত যে গভর্নমেণ্ট কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই গভর্নমেণ্টের

অধিকারে হস্তক্ষেপ না ক'রেও গণভোট গ্রহণের সব ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভবপর, এই প্রস্তাবটিও আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ছিল। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, রাষ্ট্রপুঞ্জে এই বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ছিল, ব্রিটিশ প্রতিনিধি তা করেননি।

আজ সকালে এটলির সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন আমাদের কাছে আলোচনা করলেন। এটলির ব্যক্তিত্বের তিনটি প্রধানগুণের উল্লেখ ক'রে তিনি প্রশংসা করলেন। প্রথম হলো, এটলির চিন্তার সততা, এই গুণ এটলির পূর্ণভাবেই আছে; দ্বিতীয়, 'লিবারেটর' বা মুক্তিদাতা হিসাবে এটলির মর্যাদা, কারণ পরাধীন জাতিকে আত্ম-শাসনের অধিকার তিনি দিয়েছেন; তৃতীয়, ভারতের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এটলির গভীর মমতা এবং ভারতীয় সকল বিষয় বোঝবার ও জানবার আগ্রহ। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এই মূল্যবান গুণগুলির যেন কোনক্রমেই অপচয় না হয় সেই দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত।

বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী যে পদ গ্রহণ ক'রে রয়েছেন, সেটা হলো উপদেষ্টার পদ। তিনি গভর্নমেণ্টকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতে পারেন, তার অধিক কিছু নয়। এই কাজ তাঁর কাছে মাঝে মাঝে বড়ই ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে বোধ হচ্ছে। লণ্ডন ও দিল্লীর মধ্যে কোন ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব তাঁর নেই। একমাত্র ব্রিটিশ নৃপতির সঙ্গে তাঁর একটা নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের সূত্র রয়েছে এবং ব্রিটিশ নৃপতিরও রাজকীয় রীতি অনুসারে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই হলো এক একটি সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এক রাষ্ট্রের ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা নেই।

সংবাদ পেলাম, শিল্পপতিদের এক প্রতিনিধিদল আজ নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ খবরও শুনতে পেলাম যে, শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নেহরু তাঁর উষ্মা দমন করতে পারেননি। এই প্রতিনিধিদলে জি ডি বিড়লাও ছিলেন। সেদিনে তাঁর বাড়িতে ভোজসভায় তিনি অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক বিষয়ে যেসব ব্যবস্থার ও সর্তের কথা বলেছিলেন, নেহরুর সঙ্গেও আলোচনা করতে এসে তিনি সেই সব কথারই আবৃত্তি করেছেন। বিড়লা অভিযোগ করেছেন—গভর্নমেণ্টের নীতির জন্যই ক্যাপিটাল ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, শিল্পোন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারছে না। নেহরু উত্তর দিয়েছেন—গভর্নমেণ্ট তো আর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়নি, তবে ক্যাপিটালের এত ভীত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

যাই হোক, আইন সভায় নেহরু অবশ্য অনেকটা মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করেছেন। নেহরু তাঁর সরকারী ঘোষণায় বলেছেন যে, শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে গভর্নমেণ্ট যেসব বিষয় বুঝেছেন, অর্থনৈতিক পলিসি নিরূপণের সময় গভর্নমেণ্ট সেসব বিষয় বিবেচনা করবেন।

নেহরু যদিও ব্যক্তিগতভাবে সোস্যালিজমের সমর্থনে অভিমত প্রকাশ ক'রে থাকেন, কিন্তু তিনি এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বস্তুত মিশ্র-অর্থনীতির সমর্থন করছেন, যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও প্রগতিশীল একটা উৎপাদন ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও চালিত হতে পারে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : ওয়াল্টার মঙ্কটন হায়দরা-বাদে এক সপ্তাহ থেকে আজ দিল্লী এসে পৌঁছেছেন। আমরা আগেই জানতাম যে, মঙ্কটন হায়দরাবাদে এসে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করবেন। মাউণ্টব্যাটেন পূর্বেই নিজামকে এক পত্রে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজাম যেন মঙ্কটনের এই সাক্ষাতের সুযোগে ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার উপায় সম্বন্ধে ভাল ক'রে আলোচনা করেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই পত্রের উত্তরে নিজাম তখনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মঙ্কটনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে রাজি আছেন। নিজামের পত্র পেয়ে আমরা একটু বিস্মিতও হয়েছিলাম, কারণ কিছুদিন থেকে নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের সম্বন্ধে লোকের কাছে যেসব কথা বলছিলেন, সেগুলি মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নয়। নিজাম লোকের কাছে বলেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদের বন্ধু মোটেই নন, মাউণ্ট-ব্যাটেনের কোন ক্ষমতাই নেই এবং ভবিষ্যতের আলোচনার ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেন কোন সাহায্য করলেই বা কি এবং না করলেই বা কি? কিন্তু এই চিঠিতে নিজাম লিখেছেন—"আমি আশা করি, ইংলণ্ডের রাজবংশোদ্ভব মাউণ্টব্যাটেন অবশ্যই হায়দরাবাদ ও ভারতের স্থায়ী সম্পর্কের ব্যবস্থা উদ্ভাবনের আলোচনায় হায়দরা-বাদকে তাঁর সেই অমূল্য সাহায্য দিয়ে অনুগৃহীত করবেন, যে সাহায্য হায়দরাবাদের মতো রাষ্ট্রেরই প্রাপ্য। পৃথিবীর কাছে হায়দরাবাদ বর্তমানে যে উচ্চ-মর্যাদা উপভোগ করছে, সেই মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রেই ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন সাহায্য করবেন বলে আমি আশা করি।" এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, নিজাম প্রত্যেক পত্রে মাউণ্টব্যাটেনের নামের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজবংশের দোহাই দিয়ে থাকেন, যেন রাজবংশের মানুষ বলেই হায়দরাবাদের সঙ্গে আলোচনা করবার একটা বিশেষ মর্যাদাগত অধিকার মাউণ্টব্যাটেনের আছে।

স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মাত্র একটা মাস একরকম ভালভাবেই কেটে গিয়েছে, কোন গোলমাল দেখা দেয়নি। কিন্তু নতুন বৎসর আরম্ভ হতেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যাতে বোঝা গেল যে, এই শান্তিপূর্ণ স্থিতাবস্থা একটা বাইরের আবরণ মাত্র, ভিতরে সবই অস্থির। ভারত গভর্নমেণ্টের নবনিযুক্ত এজেণ্ট-জেনারেল কে এম মুন্সী হায়দরাবাদে কোথায় থাকবেন? এই সামান্য একটা প্রশ্নও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যে ভবনে মুন্সী থাকবেন বলে পূর্বে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নিজাম গভর্নমেণ্ট জানালেন যে, সেই ভবনকে এখনো মুন্সীর জন্য ছেড়ে দেবার মতো ব্যবস্থা তাঁরা করে উঠতে পারেননি। আরও এগার দিন পরে মুন্সীর জন্য বাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন বলে নিজাম গভর্নমেণ্ট জানালেন। এই অবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করলেন যে, এই এগার দিন মুন্সী হায়দরা-বাদের রেসিডেন্সি ভবনে থাকবেন, কারণ এই ভবনটি খালি পড়ে রয়েছে। নিজাম প্রতিবাদ করলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট পূর্বে যে ভবনে থাকতেন, সেই ভবনে ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল মুন্সী থাকবেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে নিজাম ভারতের একটা অভি-সন্ধির ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। নিজামের ধারণা হলো যে, এই প্রস্তাব বস্তুত প্রকারান্তরে ও তলে তলে হায়দরাবাদের উপর সেই অধিরাজক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবারই একটা আয়োজন। নিজামের প্রতিবাদের একটা উত্তরও দিয়ে দিলেন ভারত গভর্নমেণ্ট। নিজামকে স্পষ্টভাবেই ভারত গভর্নমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যদি মুন্সীকে এখন হায়দরাবাদে থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজাম না ক'রে দেন, তবে শুধু মুন্সীই নয়, কোন ব্যক্তিই এজেণ্ট-জেনারেল হয়ে হায়দরাবাদে আর যাবেন না।

এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেনই মাঝখানে পড়ে একটা মীমাংসা ক'রে দিলেন। নিজামের সঙ্গে অনেক চিঠি ও টেলিগ্রাম বিনিময় করার পর মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে

নরম করতে পারলেন। মুন্সীর বাসভবনের সমস্যা মিটে গেল এবং ৫ই জানুয়ারী তারিখে মুন্সী হায়দরাবাদে গিয়ে তাঁর নতুন কার্যভার গ্রহণ করলেন।

জানুয়ারী মাসের শেষদিকে আবার এমন কতগুলি ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল যার ফলে স্থিতাবস্থা চুক্তিকে দুই পক্ষই প্রায় অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে উপদ্রবের ঘটনার সংখ্যা বিপজ্জনকভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে চললো। হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট কতগুলি বিশেষ শ্রেণীর খনিজ ও ধাতু ভারতে চালান নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। এর পরেও একটা কাণ্ড করলেন নিজাম গভর্নমেণ্ট। হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতীয় মুদ্রা ও নোট নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, ভারত গভর্নমেণ্টকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে, এমনই আর একটি কাণ্ড করলেন নিজাম গভর্নমেণ্ট। হায়দরাবাদ পাকিস্থানকে বিশ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন বলে একটি ঘোষণাও ক'রে দিলেন নিজাম গভর্নমেণ্ট।

কিন্তু কি ক'রে, কিভাবে এবং কোন্ সময়ে নিজাম গভর্নমেণ্ট এই ঋণ পাকিস্থানকে দিলেন? সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যপূর্ণ। মাউণ্টব্যাটেন এ রহস্য সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অনুসন্ধান করলেন। অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য জানতে পেলেন মাউণ্টব্যাটেন, তাতে এই সিদ্ধান্ত না ক'রে পারা যায় না যে, হায়দরাবাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রী মোইন নওয়াজ জঙ্গ যেসময়ে নিজাম ডেলিগেশনের নেতা হয়ে ভারতের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাকিস্থানকে ঋণদানের এই ব্যবস্থাটিও নিজাম গভর্নমেণ্ট করেছিলেন। এর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্থানকে প্রদান করা স্থগিত করা হবে কি না, ভারত গভর্নমেণ্ট যখন এই বিষয়টি বিবেচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাকিস্থানকে এই বিপুল অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করবার সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন নিজাম গভর্নমেণ্ট। একদিকে গোপনে এইসব ব্যাপার ক'রে নিজাম গভর্নমেণ্ট আর একদিকে এবং প্রকাশ্যে ভারতেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ঘোষণা করলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদকে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা বিব্রত করতে আরম্ভ করেছেন।

মহাত্মার অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানের দিনেই হায়দরাবাদের ইত্তেহাদের সমর্থনপুষ্ট প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। মাউণ্টব্যাটেন স্পষ্ট ভাষাতেই লায়েক আলিকে জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের এ চালচলন আর বেশিদিন চলতে পারে না। চালচলন বদলাতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ভারতের সঙ্গে আচরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

বাইরে থেকে দেখতে এবং কথাবার্তায় লায়েক আলিকে একজন সাদাসিধা স্বভাবের বলেই মনে হবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের বুঝতে এবং দেখতে একটুও দেরি হয়নি যে, লায়েক আলির এই বাইরের সাদাসিধা আচরণের আড়ালে খাঁটি একটি ইত্তেহাদী প্রকৃতি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ধর্মের নাম ক'রে হিংসা ও প্রমত্ততা এবং তার সঙ্গে ধূর্ততা—এই হলো ইত্তেহাদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লায়েক আলির চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট প্রমাণ পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলিকে এত স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য বলে দেবার পরেও মাউণ্টব্যাটেনের মনে অবশ্য এই সন্দেহ রয়েই গেল যে, এসব কথা লায়েক আলির মনে আদৌ কোন রেখাপাত করেছে কি না? এখন ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে মঙ্কটনের উপর। মঙ্কটন যদি নিজামকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, এখন ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ

ক'রেই নিজামের চলা কর্তব্য এবং এদিকে মাউণ্টব্যাটেন যদি প্যাটেল ও ভারত গভর্নমেণ্টকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, ধৈর্য না হারিয়ে শেষপর্যন্ত আলোচনার পথেই একটা নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা ক'রে যাওয়া উচিত, তবেই বৃহত্তর সংকট পরিহার করা সম্ভবপর হতে পারে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফের আলোচনাসভায় আজ সকালে ওয়াল্টার মঙ্কটন এবং ভি পি মেনন দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট বিষয়সূচীর সীমা ছাড়িয়ে আমাদের আলোচনা অন্যান্য বিষয় এবং প্রসঙ্গের মধ্যে এসে পড়ল। কাশ্মীরের রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপার নিয়ে অতীতের ঘটনাবলী আমরা আলোচনা করলাম। তা ছাড়া, কমনওয়েলথের নাগরিক অধিকার ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। মঙ্কটন বললেন, সত্যি কথা বলতে গেলে এই উপ-মহাদেশের বাইরে কাশ্মীরের সমস্যাটা কেউ বুঝতে পারছে না। ভি পি মেনন বললেন, পাকিস্থানের পক্ষ থেকে নিশ্‌তার দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্র-ভুক্তির বিষয়ে ভারতের উদ্ভাবিত ও গৃহীত বর্তমান নীতিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন বস্তুত ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই। মেনন আরও বললেন, পাকিস্থানের মন্ত্রীরা পরে একথা স্বীকার করেছেন যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তির ঘোষণা মেনে নেওয়ায় তাঁদের পক্ষে বস্তুত তাঁদেরই পূর্বঘোষিত সম্মতি ও প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধকার্য হয়েছে। গত জুলাই মাসে কাক (কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী) যখন দিল্লীতে এসেছিলেন, তখন প্যাটেলের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। প্যাটেল কাককে বলেছিলেন যে, কাশ্মীর-বাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মীর কোন রাষ্ট্রে যোগদান করুক, এটা তিনি চান না। মাউণ্টব্যাটেনেরই সৌজন্যে এই সময় জিন্নার সঙ্গে কাকের সাক্ষাৎ হয়।

গর্ডন ওয়াকারের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে আমি যখন প্রাক্-স্নাতক ছাত্র তখন সেখানে তরুণ অধ্যাপক গর্ডন ওয়াকারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ইতিহাস পড়াতেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা-জটিল ইওরোপীয় ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝতে তিনিই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, রাজকার্যের যে কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণের উপযুক্ত সকল গুণ তাঁর আছে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতোই তাঁর মননশক্তি স্বচ্ছন্দ ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা বলিষ্ঠ আকর্ষণ-শক্তি আছে। কোন বিষয়ে ব্যবস্থা নির্ধারণ করবার উপযোগী প্রতিভাও তাঁর যথেষ্টই আছে। লেবর দলের তরুণ বয়স্ক চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিও একজন, এটলির মতোই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ফেবিয়ান মৃদুতা আছে।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রিক মর্যাদা ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে কতগুলি সমস্যার কথা মঙ্কটন আলোচনা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটেনের 'ন্যাশনালিটি বিলে'র কথাও উত্থাপন করলেন। ক্রীপ্‌সের কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, তার অনেকটা ফল হয়েছে এবং এই বিলটিই তার প্রমাণ। মঙ্কটন বললেন, এখন বিষয়টি মোটামুটি এই দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণত নাগরিক বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে আনুগত্য স্বীকার না ক'রেও কারও পক্ষে ইংলণ্ড-নৃপতির প্রজা হওয়া সম্ভবপর।

ভারতের কমনওয়েলথ সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও চিন্তা করেছেন। তিনি এই বিষয়ে কতগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ ক'রে একটি স্মারক-সন্দর্ভ রচনা করেছেন, যেটা ভারতের কমনওয়েলথ সম্পর্কের প্রশ্নটি বিবেচনার ব্যাপারে

সাহায্য করবে। গর্ডন ওয়াকার যেন যথাসময়ে এই স্মারক-সন্দর্ভটি দেখবার ও পড়বার সুযোগ পান, তারই জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রচনা শেষ ক'রে ফেলতে চাইছেন মাউণ্টব্যাটেন। গত জানুয়ারী মাসের শেষে গভর্নমেণ্ট হাউসে কিছুদিন থাকবার পর গর্ডন ওয়াকার সিংহল চলে গিয়েছিলেন, এখন আবার দিল্লীতে ফিরে এসেছেন, ঠিক সেই সময়ে, যখন কাশ্মীরের প্রশ্ন পরিণামের এক কঠিন সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। একদিকে, কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা থিতিয়ে-পড়া অবস্থা, অন্যদিকে লেকসাকসেসে একটা ফাঁকা শূন্যাবস্থা। এই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অন্যভাবে এবং নতুন ক'রে কূটনীতিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করার উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা হচ্ছে।

গর্ডন ওয়াকারের মতে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথে এখন প্রধান বাধা হয়ে উঠবে সৈন্য অপসারণের প্রশ্নটি। এ প্রশ্নে দুই পক্ষকে একটি ব্যবস্থায় সম্মত করাবার কাজ সহজ হবে না বলেই তিনি মনে করছেন। অন্য দু'টি বিষয়ে, গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা এবং কাশ্মীরের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থায় দুই পক্ষের অভিমত ও দাবীকে একটা আপোষের সূত্রে আনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে বলে তাঁর ধারণা। রাষ্ট্রপুঞ্জে ব্রিটিশ প্রতিনিধির মনোভাব লক্ষ্য ক'রে এখানে ভারতীয় জনসাধারণের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং তার মধ্যে আরও খারাপ প্রতিক্রিয়ার যেসব ইঙ্গিত ও লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা এবং আশঙ্কাগুলি মাত্রাছাড়া হয়েছে বলে গর্ডন ওয়াকারও মনে করেন না।

নেহরুর বৈদেশিক দপ্তরের সুদক্ষ সেক্রেটারি স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর সঙ্গেও তিনি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন। শুনতে পেয়েছি, এই আলোচনায় তিনি স্যার গিরিজাশঙ্করের কাছে রাশিয়ার বন্ধুত্বের তাৎপর্যটা ভালভাবেই এবং বেশ স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দিতে পেরেছেন। রাশিয়ার বন্ধুত্ব পেতে হলে কি মূল্য দিতে হয়, সেই সত্যটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাশিয়াকে প্রভু বলে স্বীকার না করলে রাশিয়ার বন্ধুত্ব পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, রাশিয়ার পক্ষে ভারতের কোন ব্যাপারে চিন্তা করবার বা আগ্রহ দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে রাশিয়া মনে করেন না।

ঘটনাক্রমে আরও একটি বিষয় জানতে পেরেছি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রেডির সঙ্গে কোরিয়ার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন বাজপেয়ী। দুই খণ্ডে বিভক্ত কোরিয়া, মধ্যে ৩৮ অক্ষরেখা। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া, দুই শক্তি কোরিয়ার উপর তাঁদের প্রভাব-ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ ক'রে নিয়েছেন। উত্তরে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিপত্তি এবং দক্ষিণে আমেরিকার। ভিন্ন ভিন্ন দুই রাষ্ট্রশক্তির প্রতিপত্তির অধীন এই বিভক্ত কোরিয়ার অবস্থার সঙ্গে পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীতে বিভক্ত জার্মানীর অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটাও পূর্ব জার্মানী এবং পশ্চিম জার্মানীর রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যারই অনুরূপ। বাজপেয়ীর বক্তব্য হলো, যদি কোরিয়া থেকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সরিয়ে নেবার কথা না ওঠে, তবে কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নেবার কথা ওঠে কেন?

আজ সকালের আলোচনা-সভায় আমি বলেছি যে, আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গর্ডন ওয়াকারের এখানে থাকবার প্রয়োজন আছে। ২৯শে ফেব্রুয়ারীতেই এখানে লিয়াকতের আসবার কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নেহরু-লিয়াকতের আগামী সাক্ষাতের সময় যদি গর্ডন ওয়াকারের মতো একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী আলোচনা-সভায়

উপস্থিত থাকেন, তবে তার ফল ভাল হবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীর উপস্থিতি দুই পক্ষের আলোচনাকে একটা সংযত মাত্রার মধ্যে থাকতে এবং একটা আপোষের ভাব সৃষ্টি করতে অবশ্যই সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। আজ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আলোচনায়, উপযুক্ত স্থানে এবং উপযুক্ত সময়ে, এমন কোন নিরপেক্ষ ও যোগ্য তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি লাভের সুযোগ পাওয়া যায়নি যাঁর উপস্থিতিতে বস্তুত একটা মধ্যস্থতার কাজ হতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বক্তব্য যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেনি। বিশ্বের অভিমত ভারতের অনুকূল হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আমার কি মনে হয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন তাই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। উত্তরে আমি জানিয়েছি, ভারতীয় বক্তব্যের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কি না আছে সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই বলা যায় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বক্তব্যকে উত্থাপন, পরিবেষণ এবং ব্যাখ্যা করার সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত বাজে রকমের হয়েছে। ভারতীয় বক্তব্যের তাৎপর্য এবং আনুষঙ্গিক তথ্য প্রচারের জন্য 'পাবলিক রিলেশনস্'-এর কাজ হিসেবে যা কিছু করণীয় ছিল তার কোনটিই করা হয়নি। ভারতীয় বক্তব্যের তাৎপর্য যেভাবে এবং যে যে ব্যক্তি বা পক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। বরং এ বিষয়ে 'পাবলিক রিলেশনসে'র কর্তব্যের যে প্রচলিত নীতি এবং রীতি আছে তার প্রায় প্রত্যেকটি হয় অবহেলা নয় ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, আর একটি ত্রুটি হয়েছে ভারতীয় প্রতিনিধির আলোচনার মধ্যেই; পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উল্লেখ করেছেন, তার অনেকগুলিকেই খণ্ডন করবার চেষ্টা তিনি করেননি। পাকিস্থানের উত্থাপিত অন্তত একটি অভিযোগ ভারতীয় প্রতিনিধির বিশেষভাবেই খণ্ডন করা উচিত ছিল, 'কংগ্রেস ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ। ভারতের কংগ্রেস আবদুল্লাকে হাত ক'রে মহারাজাকে কাবু করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, পাকিস্থানের এই অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করেননি ভারতীয় প্রতিনিধি। এই ধরনের অভিযোগের উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া আদৌ বিজ্ঞতার কাজ হয়নি।

ভারতের কমনওয়েলথ-সম্পর্কের বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন চিন্তা করছেন। কমনওয়েলথেরই গঠনে এমন কিছু পরিবর্তন করা যায় কি না, যার ফলে এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অধিকতর সহজ হতে পারবে। কিন্তু সম্মুখে রয়েছে কাশ্মীরের ঘটনা এবং কাশ্মীরের সমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় বক্তব্যের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্রিটিশ প্রতিনিধি, তা'তে ভারতীয় জনমত কি কমনওয়েলথের সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হবে?

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : কমনওয়েলথ-সম্পর্ক সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের স্মারক-সন্দর্ভ লেখা শেষ হয়েছে। গর্ডন ওয়াকার এখন ইচ্ছা করলেই মাউণ্টব্যাটেনের সব বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবেন। এই স্মারক-সন্দর্ভে মাউণ্টব্যাটেন কতকগুলি নতুন প্রস্তাব করেছেন। এশিয়ার দেশগুলি যাতে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কমনওয়েলথের সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে পারে, তার জন্য কমনওয়েলথের গঠনে ও নামে যে সব পরিবর্তন করবার প্রয়োজন আছে, সেই সম্বন্ধে বিবেচ্য কতকগুলি প্রস্তাব এই সন্দর্ভে মাউণ্টব্যাটেন বিবৃত করেছেন। এই বিষয়ে যদিও তিনি স্টাফের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন এবং স্টাফের মতামত শুনেছেন, তবুও সন্দর্ভটিকে বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই নিজস্ব চিন্তার সৃষ্টি বলা যায়। কোনরকম দ্বিধার প্রশ্রয় না দিয়ে সমুচিত সাহসের সঙ্গে এবং সুস্পষ্ট

ক'রেই মাউণ্টব্যাটেন কতগুলি নতুন কথা বলে দিতে পেরেছেন। তাছাড়া, কাজটা খুব সময়োচিতও হয়েছে। কারণ, ভারত গভর্নমেণ্ট আগামীকাল তাঁদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের খসড়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করবেন। গণপরিষদের সদস্যদের বিবেচনার জন্য খসড়াটি সদস্যদের কাছে দেওয়া হবে এবং এক মাসের মধ্যেই সদস্যদের মন্তব্য ও অভিমত সংগৃহীত হবার পর খসড়াটিকে সংশোধিত ক'রে গণপরিষদে উপস্থিত করা হবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর মনের কথা খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ধারণা, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি অবশ্য আছেন, যাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কমনওয়েলথ-সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে পারলে সেটা ভারতের পক্ষে কতগুলি সুবিধালাভেরই বিষয় হবে। কিন্তু এই অভিমত প্রকাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করছেন, কারণ, তাতে জনসাধারণের কাছে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দুর্বল হয়ে যাবার ভয় আছে। ভারতীয় নেতাদের অবস্থা এইভাবে দুর্বল ক'রে দিয়েছে—নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধির ঘোষিত নীতি ও মনোভাব। ব্রিটিশের কাশ্মীর-পলিসি ভারত গভর্নমেণ্টের মনোভাবকেও বিরূপ ক'রে তুলেছে। ভারতীয় জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষে ব্রিটিশের সম্পর্কে এই ধরনের বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে বিষয়ে একটা অভিমত দাঁড় করানো মাউণ্টব্যাটেনের লক্ষ্য নয়। ভারতীয় মনোভাব বস্তুত যা দাঁড়িয়েছে, তাকে একটা রাজনীতিক বাস্তব সত্য হিসাবেই তিনি বিবেচনা করেছেন। তিনি বললেন, ভারতীয় সংবিধানের খসড়া থেকে 'রিপাব্লিক' কথাটি বাদ পড়লেই ভাল হয়। কমনওয়েলথ সম্পর্কের অনুকূল ক'রে ভারতীয় সংবিধান রচনা করা হোক, এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের খসড়ায় তাঁর এই পরিবর্তনটুকু করাবার ইচ্ছা যে সফল হবেই, এমন ধারণা তিনি করতে পারছেন না। তিনি একথাও বললেন—'আমি মনে করি, কোন রিপাব্লিকের পক্ষে কমনওয়েলথের মধ্যে স্থানলাভ করা অবশ্যই সম্ভবপর।'

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, যাই হোক না কেন, ভারতের পক্ষে 'ডোমিনিয়ন' কথাটা মেনে নেওয়া সহজ হবে না, কারণ ইতোমধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস রিপাব্লিকের সমর্থন জানিয়েই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ফেলেছেন। ভারতে 'ডোমিনিয়ন' কথাটা এখনো একটা হীনতাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর ডোমিনিয়ন কথাটির সঙ্গে অপরের প্রভুত্বসূচক একটা অর্থের ইঙ্গিত মিশে রয়েছে এবং তার স্টেটাস তথা রাজনীতিক মর্যাদার অর্থও হলো পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম একটা মর্যাদা, এই হলো ভারতীয় জনসাধারণের ধারণা। মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, 'ব্রিটিশ প্রজা' কথাটার বদলে 'কমনওয়েলথ নাগরিক' কথাটাকে প্রবর্তিত করলে একটা বাঞ্ছনীয় এবং উপযুক্ত পরিবর্তনই করা হবে। মাউণ্টব্যাটেনের সকল বক্তব্যের মধ্যে যেটা আসল কথা এবং সারকথা, সেটা হলো কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ গঠনে বিশেষ একটি বিষয়ে পরিবর্তনের দাবী। 'ক্রাউনে'র প্রতি আনুগত্যের, তথা রাজানুগত্যের বিষয়ে পরিবর্তন। তিনি চান, যদি সম্ভব হয়, তবে ক্রাউনের সঙ্গে কমনওয়েলথের 'নাগরিক রাষ্ট্রের' অর্থাৎ সদস্যরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টিকে একেবারে কোন উল্লেখ না ক'রেই ছেড়ে দিলে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : ভের্নন দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির নীতি সম্পর্কে সকল তথ্য বর্ণনা ক'রে একটা খসড়া মেমোরেণ্ডাম রচনা

করেছেন, যার মধ্যে জুনাগড় এবং কাশ্মীরের রাষ্ট্রভুক্তির বিষয় উল্লেখ ক'রেই বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। ভের্নন জানতে চেয়েছেন, এই খসড়া মেমোরেণ্ডাম পড়ে আমার কি মনে হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্য কি আছে। মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত তথ্যের আনুষঙ্গিক কতগুলি বিষয়ে আমার যা বলবার ছিল তা বলে দেবার পর আমি আমার আসল বক্তব্যটি ভের্ননকে জানিয়েছি। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং পাকিস্থান সে ঘোষণা সরকারীভাবে মেনে নিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজাও ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং ভারত সে ঘোষণা সরকারীভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এই দুইটি দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, দুই ঘটনাকে একই ধরনের ঘটনা বলে মনে করা যায় না। কেন করা যায় না, সেই বিষয়টি আমি এইভাবে বর্ণনা করেছি :

"জুনাগড়ের অধিকাংশ প্রজার অভিমত ও ইচ্ছার কথাটা আমি আপাতত প্রসঙ্গের মধ্যে আনছি না। প্রজার ইচ্ছার কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি নীতিবিরুদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতিবিরুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্থানের নেতারা পূর্বেই এই নীতি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের বাস্তব সত্যটির দিকে লক্ষ্য রেখে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত করতে হবে। কোন দেশীয় রাজ্যের পক্ষে এমন কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হবে না, যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে কোন সংযোগ বা সম্পর্ক সেই দেশীয় রাজ্যের নেই। কিন্তু জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পাকিস্থান এই পূর্বঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, কারণ জুনাগড় হলো পাকিস্থান সীমান্ত হতে দূরে এবং ভারতের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত একটি দেশীয় রাজ্য। পাকিস্থানের সীমান্তের সঙ্গে জুনাগড় রাজ্যের কোন ভৌগোলিক সংযোগ নেই।

"কিন্তু দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের অবস্থান এ ধরনের নয়। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সংযোগ রয়েছে। আর একটি বাস্তব সত্যও লক্ষ্য করার বিষয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, অথবা দেশরক্ষার জন্য সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনে জুনাগড় পাকিস্থানের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। ঐ দুই উদ্দেশ্যের জন্য পাকিস্থানের পক্ষে জুনাগড়কে নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করার কোনই প্রয়োজন নেই, হেতুও নেই। কিন্তু ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, ঐ দুই কারণেই—অর্থনৈতিক কারণে এবং রাষ্ট্রের দেশরক্ষার প্রয়োজনের কারণে।

"এ ছাড়াও আরও দুটি ঘটনাগত বাস্তব ব্যাপার আছে যার জন্য কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সমর্থন করা যায় এবং জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি সমর্থন করা যায় না। প্রথম হলো, কাশ্মীরের মহারাজা যে সময় কোন রাষ্ট্রেই অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, সেই সময়েই অস্ত্রবলে মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করবার জন্য উপজাতীয়ের দল কাশ্মীরের উপর অভিযান ও আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু জুনাগড়ে এ ধরনের কোন ঘটনা হয়নি। জুনাগড় নবাবের পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার আগে জুনাগড়ে কোন হাঙ্গামাই হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতভুক্তির আগে থেকেই কাশ্মীর রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক সঙ্ঘ ছিল। জুনাগড়ে এ ধরনের কোন রাজনৈতিক প্রজাসঙ্ঘ ছিল না।

"এইসব 'অন্যান্য তথ্য' বিবেচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত না ক'রে পারা যায় না যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি সম্পূর্ণভাবে একটা খামখেয়ালী ব্যাপার মাত্র, এর পিছনে

কোন বাস্তবসম্মত যুক্তি নেই। কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ব্যাপার সুস্পষ্ট-ভাবেই একটি বাস্তবসম্মত ঘটনা, যা সমর্থন করার মতো যথেষ্ট যুক্তি আছে।

"দুই দেশীয় রাজ্যের ঘটনাবলীর এই পার্থক্য এবং অবস্থার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রেই ভারত গভর্নমেণ্ট এই নীতি গ্রহণ করেছেন যে, দুই রাজ্যেই গণভোটের দ্বারা প্রজার অভিমত যাচাই করা হবে। কাশ্মীর এবং জুনাগড় সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সে ব্যবস্থায় প্রজার সমর্থন আছে কি না, সেটা গণভোটের দ্বারাই চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হবে।

"আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। জুনাগড় নবাবের পাকিস্থানভুক্তির সিদ্ধান্ত পাকিস্থানকে মেনে নিতে দেখে ভারত গভর্নমেণ্ট যখন প্রতিবাদ ক'রে এই ধরনের রাষ্ট্রভুক্তির বৈধতার প্রশ্ন তুললেন, তখন পাকিস্থান প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের নৃপতির সিদ্ধান্তই একমাত্র বৈধ সিদ্ধান্ত এবং সে সিদ্ধান্ত করবার পূর্ণ অধিকার ও একমাত্র অধিকার নৃপতিরই আছে। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা যখন ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং ভারত সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন, তখন পাকিস্থান সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি ক'রে বসলেন যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি অবৈধ হয়েছে এবং এ সিদ্ধান্ত করবার অধিকারও মহারাজার নেই।"

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদের নতুন ডেলিগেশন দিল্লীতে এসেছেন। এই ডেলিগেশনে আছেন মঙ্কটন, মীর লায়েক আলি এবং মোইন নওয়াজ জঙ্গ। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নতুন ডেলিগেশনের দুটি বৈঠকও হয়ে গিয়েছে, একটি গত বৃহস্পতিবারে এবং একটি আজ। দুই বৈঠকেই ভি পি উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল মীর লায়েক আলি করাচী গিয়েছিলেন। যাবার আগে মাউণ্টব্যাটেন লায়েক আলিকে এই কথা বলে দিয়েছিলেন যে, করাচীতে গিয়ে লায়েক আলি যেন বিশ কোটি টাকা ঋণের প্রসঙ্গ লিয়াকৎ আলির সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করেন। যতদিন ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের স্থিতাবস্থা চুক্তির সম্পর্ক থাকবে, ততদিনের মধ্যে পাকিস্থান যেন ঐ ঋণ ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা হস্তগত ক'রে না ফেলেন, লিয়াকৎ আলির কাছে এই অনুরোধ করবার জন্য লায়েক আলিকে বলে দিয়েছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। লায়েক আলি করাচী থেকে ফিরে এসে বললেন, লিয়াকৎ আলি মৌখিকভাবে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে পাক-গভর্নমেণ্ট এই বিশ কোটি টাকার লোন ভাঙ্গাবেন না।

নিজামী ডেলিগেশনের সঙ্গে আলোচনায় দু' পক্ষ থেকেই অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি উল্লেখ করা হলো। ভি পি অভিযোগ করলেন, নিজাম গভর্নমেণ্ট কেন পাকিস্থানকে এত টাকা ঋণ দিলেন? কেন অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে ভারতীয় মুদ্রা ও নোট হায়দরাবাদে 'বে-আইনী' ঘোষণা করেছেন নিজাম গভর্নমেণ্ট? লায়েক আলিও অভিযোগ ক'রে বললেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা হায়দরাবাদকে বিপন্ন ক'রে তুলেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন ডেলিগেশনকে জানিয়ে দিলেন যে, ভারতে বে-সরকারীভাবে সাম্প্রদায়িক সৈন্যদল গঠন নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন ভারত গভর্নমেণ্ট। সুতরাং হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টেরও অবিলম্বে রাজাকর দল ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। এই রাজাকর দলই হলো ইত্তেহাদের সংগ্রামকারী বাহিনী এবং এদের বহুবিধ উপদ্রবের সংবাদ কিছুদিন থেকে খুব বেশি ক'রেই পাওয়া যাচ্ছে। আর একটি কর্তব্য ডেলিগেশনকে

স্মরণ করিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আর দেরি না ক'রে হায়দরাবাদে এখন একটি জনপ্রতিনিধিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলাই কর্তব্য।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮ সাল : নিজাম ডেলিগেশনের নেতা হয়ে মীর লায়েক আলি এসেছেন ভারত ও হায়দরাবাদের স্থায়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য; কিন্তু বর্তমানের 'অস্থায়ী' সম্পর্কই (স্থিতাবস্থা চুক্তি) যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে, তাতে স্থায়ী সম্পর্কের আলোচনায় কোন সুফল হবে কি না সন্দেহ। এই সন্দেহ করছেন প্যাটেল। তাঁর মতে, স্থিতাবস্থা চুক্তিই যদি ভালভাবে পালিত না হয়, তবে স্থায়ী সম্পর্কের চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা বৃথা। প্যাটেলের ধারণা এই যে, যদি হায়দরাবাদে এখন জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে স্থিতাবস্থা চুক্তিও যথার্থ নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হবে না। কিন্তু প্রথম দিকে সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে গভর্নমেণ্ট গঠিত হওয়া উচিত, হায়দরাবাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করতে প্যাটেল অবশ্য রাজি নন। এদিকে মীর লায়েক আলি বলছেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমানের 'স্থিতাবস্থায়' মুসলমান প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশিসংখ্যক হিন্দু প্রতিনিধিকে গভর্নমেণ্টের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না।

আলোচনার শেষে প্রশ্ন উঠল, আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে? এই প্রশ্ন নিয়ে একটা বিরোধের ঝড়ও বেশ প্রবলভাবেই দেখা দিল। স্থিতাবস্থা চুক্তি ঠিকমতো প্রতিপালিত হচ্ছে না, বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই কথার উল্লেখ করতে গিয়ে এটা যেন না বলা হয় যে, ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকেও স্থিতাবস্থা চুক্তির নির্দেশ ও সর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্টেরও 'ত্রুটি' হয়েছে, এই ধরনের উল্লেখের বিরুদ্ধে প্যাটেল তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। এ বিষয়ে প্যাটেল তাঁর অভিমতের এক বিন্দু নড়চড় করতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে স্থিতাবস্থা চুক্তি পালনে কোন ত্রুটিই হয়নি। প্যাটেলের এই ধারণা যুক্তিহীন নয়। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের দিক থেকে স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন হানিই আজ পর্যন্ত হতে দেখা যায়নি। যদি হয়ে থাকে তবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের সরকারী কর্মচারীদের আচরণে হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর দিয়েই এমন চাপ যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে শুধু একটা নির্দেশ দিয়ে দিলেই কাজ হতে পারে না। নির্দেশ দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কর্মচারীদের পক্ষে সে নির্দেশ সার্থকভাবে পালন করা খুবই কঠিন। এর একটা কারণ অবশ্য প্রশাসনিক কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা। হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত যেসব মালপত্র ভারতীয় অঞ্চলে আটক ক'রে রাখা হয়েছে, সেসব মালপত্র ভারত গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দেবেন—এই সিদ্ধান্তের কথাটি পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে প্যাটেল রাজি নন। প্যাটেলের মনোভাব দেখে মঙ্কটন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন আজ টেলিফোনে মঙ্কটনকে জানিয়েছেন যে, তিনি আগামীকাল ব্যক্তিগতভাবে এই সম্পর্কে তাঁর সাধ্যমতো একটা চেষ্টা ক'রে দেখবেন যে, বিজ্ঞপ্তির মধ্যে স্থিতাবস্থা চুক্তির 'ভারতীয় ত্রুটি' সম্বন্ধে কোন স্বীকৃতির উল্লেখ করাতে পারেন কি না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল : মঙ্কটন হায়দরাবাদে চলে গেলেন এবং মাউণ্টব্যাটেন সেই বিজ্ঞপ্তির সমস্যা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে খোঁজখবর

নিতে আরম্ভ করলেন। নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর কথার মধ্যে সমর্থনসূচক মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া গেল। কিন্তু নেহরু স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে যেকোন বিষয়ের আলোচনা করতে হলে প্যাটেলের সঙ্গেই করা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্যাটেলই হলেন দেশীয় রাজ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। আজই বিকালে প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন ম্যাউণ্টব্যাটেন, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নেই প্যাটেলের হৃদযন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। প্যাটেল প্রায় মরেই গিয়েছিলেন। দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে এখন সম্পূর্ণরূপেই শয্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ডাক্তারেরা বলে দিয়েছেন, কোন রকমেরই কাজ এখন প্যাটেলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কবে তিনি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, তা'ও ডাক্তারেরা এখন অনুমান করতে পারছেন না। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষেও হায়দরাবাদের ব্যাপারে একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে, ভারত থেকে মাউণ্টব্যাটেন বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে প্যাটেল সুস্থ হয়ে উঠতেই পারবেন না এবং হায়দরাবাদ সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন আর কোন পরামর্শ দেবারই সুযোগ পাবেন না।

আমার মনে হয়, গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিযাত্রার দিনে প্যাটেল ছয় ঘণ্টা ধরে শবাধারের অনুগমন ক'রে নিজের শরীরে উপর যে নির্যাতন করেছিলেন, সেটা সহ্য করবার মতো দৈহিক শক্তি তাঁর ছিল না। তার ফলেই প্যাটেলের শরীর এইভাবে আজ হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। সেদিন রাজঘাটে আমি প্যাটেলের মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। তখনি মনে হয়েছিল, প্যাটেলের শরীরেও জীবনীশক্তি যেন কিছু আর নেই, যেন সম্বিৎ হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। মহাত্মার প্রাণনাশের ঘটনা প্যাটেলের উপরেই সবচেয়ে বেশি কঠোর আঘাত হয়ে পড়েছে। তিনিই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, গান্ধীকে রক্ষা করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল তাঁরই। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর ব্যর্থতার জন্য তাঁকে যেভাবে ও যে পরিমাণ সমালোচনার দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে, সে-পরিমাণ সমালোচনা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু এই মাত্রাহীন সমালোচনা নিঃশব্দে সহ্য করেছেন প্যাটেল। তাঁর অসুস্থতাও যে এই সঙ্কটকালে গভর্নমেণ্টের উপরে কত বড় আঘাত, সেটাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আর একটা বাস্তব সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, এই নতুন ভারত রাষ্ট্র ভারতের দুই প্রধান ব্যক্তির উপর কত বেশি নির্ভর ক'রে রয়েছে।

হায়দরাবাদ সম্পর্কে প্যাটেলের সিদ্ধান্তের বদলে অন্য কোন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারেন, গভর্নমেণ্টের মধ্যে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। প্যাটেলের সিদ্ধান্ত বাতিল করার বা বদলে দেবার দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি নন। সুতরাং বিজ্ঞপ্তি প্রচার করাও আর হলো না। মাউণ্টব্যাটেনও আজ মঙ্কটনকে একপত্রে জানিয়ে দিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় সংবাদপত্রের জন্য সরকারীভাবে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৬ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল কে এম মুন্সী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মুন্সী বেশ কর্মোৎসাহী মানুষ এবং তাঁর মনের সঙ্কল্পও অনেক। আমার মনে হয়, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ মানুষ। কংগ্রেস মহলে তিনি এখন প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেই চলেছেন, যদিও কংগ্রেসী মর্যাদার সেই বিশেষ তকমাটি তাঁর নেই, ব্রিটিশ-

বিরোধী সংগ্রাম ক'রে জেল খাটবার 'তক্‌মা'। জেল খেটে স্বাদেশিকতার বড় পরিচয় আগে দিতে পারেননি বলেই হয়তো আজ তিনি খুব বেশিরকম 'স্বদেশী' হয়ে উঠেছেন। মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে মুন্সী বেতারে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তিনি নিজেকেও অহিংসার উপাসক বলে বর্ণনা করেছেন। এই মুন্সীই কয়েক বছর আগে গান্ধীর সঙ্গে অহিংসাতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করেননি। মুন্সী বলেছিলেন, গান্ধীর ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। মুন্সীর বক্তব্য ছিল, ঐ আন্দোলন "বিশুদ্ধ অহিংস নীতি অনুসারে চালিত হয়নি, কারণ ঐ আন্দোলন বিপক্ষের হৃদয়ে প্রেম উদ্রেক না ক'রে বরং ক্রোধের উদ্রেক করেছিল।"

কিন্তু আজ মুন্সী মাউণ্টব্যাটেনের কাছে যেসব কথা বললেন, তাতে বোঝা গেল যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে তিনি অহিংস নীতির উপর খুব বেশি নির্ভর ক'রে থাকতে ইচ্ছুক নন। যদি নিজাম গভর্নমেণ্ট রাজাকরদের ক্রিয়াকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে বা সংযত করতে না পারে, তবে হায়দরাবাদে ভারতীয় পুলিশের সাহায্যেই রাজাকর দমনের ব্যবস্থা করা উচিত, ভারত গভর্নমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়েছেন মুন্সী। মুন্সী মনে করেন, হায়দরাবাদের রাজাকর হাঙ্গামা দমনে যদি ভারতীয় পুলিশ নিয়োগ করা হয় তবে সেটা আইনত স্থিতাবস্থা চুক্তির সর্তসঙ্গত ব্যাপারই হবে। মুন্সীর দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, হায়দরাবাদের বর্তমান গভর্নমেণ্ট রাজাকরদের সংযত করবেন না, সংযত করবার ক্ষমতাও নেই।

মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছেন। তিনিও দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্গত, নীতিসম্মত এবং নির্ভুল পন্থা অনুসরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাতে পৃথিবীর জনমতের কাছে ভারত নিজেকে দোষমুক্ত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এখন হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনারত অবস্থায় মুন্সীর প্রস্তাবিত পুলিশী ব্যবস্থাকে নিতান্তই অন্যায় এবং অসঙ্গত কাজ বলে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, রাজাকরদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার সুযোগ এখন মীর লায়েক আলিকেই দেওয়া কর্তব্য। স্থিতাবস্থা চুক্তি পালনে এবং দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনে মীর লায়েক আলি নিজের থেকেই যাতে চেষ্টা করতে পারেন, তার সুযোগ বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত হবে না।

মুন্সী চলে যাবার পর মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বললেন যে, মুন্সীর মনোভাব তাঁর একটুও ভাল লাগছে না। মুন্সীর যোগ্যতা ও কর্মশক্তি সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, বর্তমানের জটিল অবস্থায় নিজামকে বুঝিয়ে কাজ করাবার মতো মানসিক প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মুন্সীর নেই। যথেষ্ট অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ধৈর্যশীল কূটনৈতিক প্রয়াসে অকুণ্ঠ-ভাবে লিপ্ত থাকাই এখন হায়দরাবাদ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পন্থা। মুন্সীকে এই পন্থার উপযুক্ত বলে মনে করেন না মাউণ্টব্যাটেন।

মঙ্কটনও লণ্ডন চলে গিয়েছেন। আমাদেরও এই আশঙ্কা হচ্ছে যে, মঙ্কটনও এইবার তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং এ ব্যাপারের মধ্যে আর আসতে চাইবেন না। গত সপ্তাহে যেভাবে আলোচনা হয়েছে, সেভাবে আলোচনা আর চালিয়ে যাওয়া বৃথা সময় নষ্ট করার ব্যাপার বলেই সম্ভবত মঙ্কটন ধারণা করবেন। কিন্তু মঙ্কটন না থাকলে মাউণ্টব্যাটেনও হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানে আর কিছু করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

নানা রহস্যের উন্ধার

কলিকাতা, সোমবার, ৮ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল মাউণ্টব্যাটেন এখন ভ্রাম্যমাণ। নয় দিনের মধ্যে কলিকাতা, উড়িষ্যা, রেঙ্গুণ ও আসাম পরিভ্রমণ ক'রে দিল্লী ফিরে যেতে হবে।

দমদম বিমান ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর বিখ্যাত সি আর অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনার পর মাউণ সঙ্গে আমরা দমদম থেকে কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউস পর্যন্ত দীর্ঘ পথ মোটরযানে অতিক্রম করবার সময় ভারতের এক বিখ্যাত শহরের রূপ দেখবার সুযোগ পেলাম। গত চার বৎসর ধরে এইভাবে ভারতের অনেক শহর দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠ এবং বস্তি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে যে শঙ্কা ও নৈরাশ্যের বেদনা অনুভব করেছি, সেটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা নয়। ভারতের অন্যান্য শহর অঞ্চলেও ভ্রমণের সময় একই অস্বস্তি বরাবর অনুভব ক'রে এসেছি। কি আবর্জনাময় ও নোংরা এইসব শহুরে জীবন। মানবীয় জীবনযাত্রার ন্যূনতম আশা ও অধিকারের নিম্নতম স্তরেরও নীচে পড়ে রয়েছে এইসব শহরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি। অবনত জীবনের এই রূপ মার্জিত ও উন্নত করা কি ধীরে-সুস্থে চালিত কোন সংস্কারের নীতি ও প্রয়াসের দ্বারা সম্ভবপর? এই অবনত জনতাজীবনের একমাত্র দাবী হলো—'আজই চাই।' এক দিনের মতোও অপেক্ষা ক'রে থাকার সঙ্গতি এদের নেই। প্রতিদিনের অভাবের তাড়নায় এই জীবন পর্যুদস্ত। রুটি চাই আজই—এই হলো প্রতিদিনের দাবী। যেখানে একটি দিনের সমস্যারই এই রূপ, সেখানে সমগ্রের উন্নতি যে কত দূরের এবং কত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেটাও অনুমান করতে পারি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার শোষণ প্রক্রিয়া এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিভীষিকা থেকে এই জনতাজীবনের মুক্তি সুদূরপরাহত বলেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে আর এক সমস্যা হলো কম্যুনিষ্ট ঠগের দল, যারা সব সমস্যা সমাধান ক'রে দেবে বলে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে।

কলকাতার মেয়র এক চায়ের আসরে মাউণ্টব্যাটেনকে সম্বর্ধনা করলেন। মাউণ্ট-ব্যাটেনের 'ধমনীতে প্রবাহিত রাজবংশের শোণিতের' স্তুতি ক'রে ভাষণ দান করলেন মেয়র। তা ছাড়া আলঙ্কারিক ভাষায় হিজ এক্সেলেন্সীর গুণগ্রামেরও প্রশংসা করলেন। দেশ খণ্ডনের কথা উল্লেখ ক'রে মেয়র বললেন যে, এই অখণ্ড ও অবিভাজ্য প্রাচীন দেশ এক ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষুন্ন ক'রে আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভাষণের উপসংহারে মেয়র বললেন, "ইওর এক্সেলেন্সী, আপনি আপনার নিপুণ অঙ্গুলি এবং বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে দুটি নিকেতন সৃষ্টি করেছেন। আমরা আশা করি, ইওর এক্সেলেন্সী এরপর আপনার এই দুই সৃষ্টিকে একটি শান্তির সেতু এবং একটি আনন্দের সেতু দিয়ে যুক্ত ক'রে দেবেন।" এই তুরীয় কল্পনা অথবা চায়ের পেয়ালার শব্দঝঙ্কার, কিংবা সভার ভিড়ের নিঃশ্বাসে বাতাস ভারি হয়ে ওঠায়, ঠিক বলতে পারি না এর মধ্যে কোন্‌টির জন্য মাউণ্টব্যাটেন একটু লজ্জিত হয়ে উঠলেন এবং একটা অস্বস্তির ভার অনেক চেষ্টায় সহ্য ক'রে তাঁর বক্তৃতাও শেষ ক'রে দিলেন।

সভায় বক্তৃতার ব্যাপার যখন শেষ হলো এবং অতিথিদের মধ্যে বেশির ভাগই

চলে গেলেন, তখন সি আর উঠে এসে আমার টেবিলের কাছে বসলেন। সত্যিকারের জ্ঞানবৃন্ধ মানুষের মতোই তিনি প্রচণ্ড সরলতার সঙ্গে এবং মনের মধ্যে কিছুই চাপা না রেখে তাঁর কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি বললেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠেছে। দেশের অর্থ-সম্পদের বড় বেশি অপচয় হয়ে চলেছে। তিনি একটা উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করলেন। এই চা-এর সভায় অতিথিদের কথা ভুলে গিয়ে, যদি একটা ভাঙা পেয়ালাকে জোড়া দেবার চেষ্টায় আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠতাম, তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াতো, কাশ্মীরকে নিয়ে ব্যাপার সেরকম দাঁড়িয়েছে। সি আর বললেন, আমাদের মুখরোচক হবে না মনে করেই মাউণ্টব্যাটেন সম্ভবত অনেক উচিত কাজের উপদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন এবং সেসব উপদেশ দিচ্ছেনও না। তিনি আরও বললেন,—'অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শান্তভাবে শুনবার অদ্ভুত শক্তি আছে পণ্ডিতজীর (নেহরুর)।' আমি উত্তরে বললাম—একমাত্র উপদেশ দেওয়া ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের যখন আর কোন নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব নেই এবং কিছু করবারও নেই, তখন তিনি নিজেকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে চান না, যে অবস্থায় তিনি শুধু একটা মানসিক অস্বস্তিই জাগিয়ে তুলবেন, অথচ কাজের দিক দিয়ে কোন্ প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। যেভাবে যে উপদেশ দিলে তার একটা প্রভাব হতে পারে, মাউণ্টব্যাটেন সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন।

কথায় কথায় প্যাটেলের প্রসঙ্গও এসে পড়ল। রাজগোপালাচারী বললেন, প্যাটেলের মনের ভিতর নারীসুলভ একটা মমতাপ্রবণ ভাব আছে। প্যাটেলের সম্বন্ধে গান্ধীর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করলেন রাজগোপালাচারী। গান্ধী বলতেন, সর্দারের চরিত্রে মাতৃসুলভ স্নেহপরায়ণ ভাব দেখা যায়। রাজগোপালাচারী বললেন, তিনটি বিশেষণের দ্বারা তিনি প্যাটেলের চরিত্র সংক্ষেপে বলে দিতে পারেন—'বিশ্বস্ত, স্নেহশীল ও একরোখা'।

ইতিহাসের চাকা কিভাবে ঘুরে গেল, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন রাজগোপালাচারী। আজ এই কক্ষে মাউণ্টব্যাটেন ও তিনি এমন শুভলক্ষণপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে একসঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছেন, এমন ঘটনাও বাস্তবে ঘটে গেল! রাজগোপালাচারী বললেন যে, সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তৃতায় অতীতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখন যে অট্টালিকায় দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, সেই অট্টালিকারই তের নম্বর কক্ষে লেডি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন পরিণয়ের অঙ্গীকারসূত্রে আবন্ধ হয়েছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই উক্তি শুনে রাজগোপালাচারীও তখনি স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। সেই সময় তিনি কোথায় ছিলেন? রাজগোপালাচারীর মনে পড়ে গেল, মাউণ্টব্যাটেন ঠিক যে সময়ে দিল্লীর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের তের নম্বর কক্ষে লেডি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পরিণয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করছিলেন, সেই সময়ে রাজগোপালাচারী ছিলেন এই দিল্লীরই জেলের পঁয়ষট্টি নম্বর কক্ষে।

আজ গভর্নমেণ্ট হাউসের নৈশ ভোজনের আসরে সুভাষের ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুভাষ এখনো বাঙালী জাতীয়তাবাদের হিরো। শরৎ এক সময়ে ভাইসরয়ের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। এখন তিনি বাংলার অশান্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী সোস্যালিষ্ট সংহতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সমর্থক।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৪৮ সাল : দিল্লী থেকে কলকাতা, তারপর উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যা থেকে রেঙ্গুণ, রেঙ্গুণ থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এসে আসাম যাত্রা। আসাম ভ্রমণ শেষ ক'রে দেশপরিক্রমার এক দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাপনের পর মাউণ্টব্যাটেন আবার দিল্লী ফিরে এসেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের উড়িষ্যা ও আসাম ভ্রমণের সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম না। সেই কয়েকটা দিন আমি কলকাতাতেই গভর্নর রাজগোপালাচারীর অতিথি হয়ে ছিলাম।

পুরো দু'টি মাসের পর আজ আবার নেহরু ও লিয়াকতের সাক্ষাৎ হলো। যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের কাজের নাম ক'রেও দু'জনকে একত্র করতে মাউণ্টব্যাটেনকে বেশ কিছুটা অসুবিধা ভুগতে হয়েছে। নেহরু ও লিয়াকৎ দু'জনেই ঠিক করেছেন যে, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের এই বৈঠকই হবে শেষ বৈঠক।

পূর্বেই এই নিয়ম নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয়েছে যে, বর্তমান যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ আগামী পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত চলে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। নিয়ম করা হয়েছিল যে, যতদিন মাউণ্টব্যাটেন ছেড়ে না দেন ততদিন তিনিই পরিষদের সভাপতি হয়ে থাকবেন। তিনি ছেড়ে দেবার পর যেবার যে ডোমিনিয়নে পরিষদের বৈঠক হবে, সেবার সেই ডোমিনিয়নেরই প্রধান মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি হবেন। মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছা, বর্তমানে যেভাবে তাঁর সভাপতিত্বে পরিষদের কাজ চলছে, সেইভাবেই যেন আরও একটি বছর চলে। মাত্র বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়েই পরিষদ আলোচনা ও বিবেচনা ক'রে থাকেন। মাউণ্টব্যাটেন পরিষদের বিবেচনার ক্ষেত্র প্রসারিত ক'রে তার মধ্যে আরও অনেক বিষয় আনতে চাইছেন। তাঁর ইচ্ছা, ক্রমে ক্রমে অর্থসংক্রান্ত বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়গুলিকেও পরিষদের বিবেচনার বিষয় ক'রে তুলতে হবে।

নেহরু ও লিয়াকৎ, দু'জনের কারও কাছেই যদিও মাউণ্টব্যাটেনের এই ইচ্ছার কথাগুলি ভাল লাগল না এবং তাঁরা সমর্থনও করলেন না, তবুও দু'জনেই যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের অন্য একটি মূল্য স্বীকার করলেন, যার জন্য পরিষদকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁরা মনে করেন। যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের কাজের নাম ক'রেই দুই প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভের এবং মুখোমুখি বসে আলোচনা করবার সুযোগ পাচ্ছেন। এই একটি লাভ এবং এইদিক দিয়ে পরিষদকে প্রচলিত রাখার একটা মূল্য তথা সার্থকতা আছে। এই কথার পর মাউণ্টব্যাটেন দু'জনকে সহজেই রাজি করাতে পারলেন যে, দু'জনে অন্তত মাসে একবার ক'রে পরস্পরের সাক্ষাতে এসে দুই রাষ্ট্রেরই সাধারণ স্বার্থের ও প্রয়োজনের বিষয়গুলি আলোচনা করবেন।

গত ছয় মাস ধরে এই বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টায় যদিও অজস্র তিক্ততা এবং ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়েছে তবুও তার মধ্যে এমন আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার আমাদের চোখে পড়েছে যার মূল্যও কোন দিক দিয়েই কম নয়। নেহরু ও লিয়াকৎ উভয়েই এই ঝড়ের মধ্যেও যে পরিমাণ বাস্তবসচেতন সুস্থবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আসছেন এবং সমগ্র ঘটনাকে যেভাবে মনের ধীরতা রক্ষা ক'রে বিচার করছেন, তারই ফলে সব চেষ্টার আশা ভরাডুবির পরিণাম থেকে এখনো রক্ষা পেয়ে আসছে। সব সময়েই মনে হয়, যদি শুধু এ'দের দু'জনের উপর সব বিষয় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারতো এবং এ'দের দু'জনের উপর অন্যান্য ক্ষেত্র ও সূত্র হতে যেসব ইচ্ছা ও মনোভাবের চাপ এসে পড়েছে, সেগুলি যদি সরিয়ে ফেলা যেত, তবে দুই রাষ্ট্রের

মধ্যে যত বিরোধের ব্যাপার রয়েছে সবই অল্পদিনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিষ্পত্তি ক'রে এবং সে নিষ্পত্তিকে একেবারে স্বাক্ষরিত ক'রে ও সরকারী মোহরাঙ্কিত ক'রে কার্যে পরিণত ক'রে ফেলাও সম্ভবপর হতো।

নেহরু-লিয়াকতের এইবারের আলোচনায় অন্যান্য সাধারণ ও গৌণ কতগুলি বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ মীমাংসাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেটি মুখ্য বিষয়, সেই কাশ্মীর সম্পর্কেই কোন আলোচনা হয়নি। এর কারণ এই নয় যে, কাশ্মীরের সম্পর্কে আলোচনা করবার মতো নতুন কোন ঘটনার প্রসঙ্গ ছিল না। নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি ডাঃ সিয়াং ইতোমধ্যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে যে প্রস্তাব করেছেন, সে প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ভারতের কাছে সন্তোষজনকই মনে হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ডাঃ সিয়াং তাঁর পরিকল্পনাকে নিরাপত্তা পরিষদে আর সব সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমর্থন করিয়ে নেবার অপেক্ষায় থাকেননি। তার ফল এই হবে বলে মনে হচ্ছে যে, এই প্রস্তাব আরও তিক্ততা সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠবে এবং এখনো দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ শুভেচ্ছার ভাব এবং আলোচনার আগ্রহ রয়েছে, তা'ও ক্ষীণতর হয়ে উঠবে। লেকসাকসেসের আলোচনার প্রণালী ও ভঙ্গীর মধ্যেই সাঙ্ঘাতিক রকমের একটা ভুল হয়ে চলেছে। প্রত্যক্ষভাবে সকলের সম্মুখে এবং একটা আন্তর্জাতিক আসরে বসে মীমাংসার চেষ্টায় মতভেদটাকেই যেভাবে পাকাপাকি ক'রে তোলা হচ্ছে, তার কুফল প্রতিরোধ করার জন্য কি আবার আড়ালের ও গোপনের কূটনীতিতে ফিরে গিয়ে কোন কাজ হবে?

খুশি হয়েছি দেখে, লেকসাকসেসে ভারতের যে নতুন প্রতিনিধি দল চলেছেন, তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন বি এল শর্মা, পাবলিক রিলেশনস্-এর সেই দায়িত্ব নিয়ে, যে দায়িত্ব এতদিন শোচনীয়ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। তাঁর উপর হঠাৎ আদেশ এসেছে—যেতে হবে। তিনি বস্তুত তাঁর জিনিসপত্রও গুছিয়ে নেবার মতো সময় পাননি। আমি কয়েকজনের নামে পরিচয়-পত্র লিখে শর্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে লেকসাকসেসে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়া শর্মার পক্ষে সহজ হয়। আমার বিশ্বাস আছে, শর্মা ভাল কাজ দেখাতে পারবেন।

শেখ আবদুল্লা এবার আর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যাচ্ছেন না। তিনি এর আগে লেকসাকসেসে নিজেকে জাহির করার ভঙ্গী নিয়ে যে বক্তৃতার নমুনা দেখিয়ে এসেছেন, সে বক্তৃতা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের এবং মার্কিণ জনসাধারণের কাছে বস্তুত একটা মুগুরের ভোঁতা আঘাতের মতো বোধ হয়েছে। শেখ আবদুল্লার বক্তব্য কারও মনে কোন বিশ্বাস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারেনি। আবদুল্লা সেখানে গিয়ে আলোর চেয়ে উত্তাপই বেশি সৃষ্টি ক'রে এসেছেন।

জাফরুল্লা লেকসাকসেসে এইবার যা আরম্ভ করেছেন, সেটাই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে তিনি তাঁর প্রচার-অভিযানের পদ্ধতিতে হঠাৎ একটা নতুন ব্যাপার ক'রে ফেলেছেন—ভারতের উত্থাপিত অভিযোগের মূল বিষয় থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মনোযোগ অন্য বিষয়ের দিকে চালিত করার চেষ্টা। পাকিস্থানের ক্ষোভের কারণগুলির এক নতুন তালিকা তিনি উপস্থিত করেছেন এবং সেই তালিকা ক্রমে ক্রমে আরও বড় ক'রে তুলছেন। এই প্রচার-সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি অভিনব রকমের যে ব্যাপারটি তিনি করেছেন, মার্কিণ জনসাধারণ তার নাম দিয়েছেন—'চরিত্র হত্যা'। জাফরুল্লা এক একজনের নাম ক'রে তাঁদের ব্যক্তিগত সততার প্রশ্ন তুলে অভিযোগের অভিযান চালিয়েছেন। এইবার

তিনি ধরেছেন মাউণ্টব্যাটেনকে। মাউণ্টব্যাটেনের অভিসন্ধির কথা লেকসাকসেসের আসরে উত্থাপন করেছেন জাফরুল্লা।

মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অপবাদ রটনার কাজ জাফরুল্লা বুঝে বুঝে ঠিক এমন একটি সময়ে আরম্ভ করেছেন, যে সময়ে মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে জাফরুল্লার অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন না। তিনি বর্তমানে যে কার্যপদে নিযুক্ত রয়েছেন তাতে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে প্রত্যুত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক কারণেই সম্ভবপর নয়।

জাফরুল্লার অভিযোগ হলো, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে, ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় থেকেই মাউণ্টব্যাটেন ভবিষ্যতের পাকিস্থানকে বিপন্ন করার জন্য চেষ্টা ক'রে এসেছেন। আমাদের স্টাফের আলোচনা-সভায় আজ এই বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা হলো। জাফরুল্লা যে নতুন একটা সমস্যা সৃষ্টি করলেন, তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? মাউণ্টব্যাটেন ভেবেছেন, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ ভেঙে দেবার আগেই জাফরুল্লার সব অভিযোগের প্রত্যুত্তর এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণ তিনি পরিষদের রেকর্ডে উল্লেখ ক'রে রাখবেন, যার দ্বারা বিষয়টিকে ভারতের ও পাকিস্থানের দুই গভর্নমেন্টেরই গোচরীভূত করা হবে। জাফরুল্লার অভিযোগের প্রত্যুত্তরগুলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টেরও গোচরীভূত করা কর্তব্য; কারণ ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অর্থ অবশ্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেও অভিযুক্ত করার ব্যাপার।

মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে জাফরুল্লার প্রধান দু'টি অভিযোগ হলো এই : মাউণ্টব্যাটেন যখন ভাইসরয় ছিলেন সেই সময়ে জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই তিনি শিখদের একটা গোপন পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং জেনেও তিনি সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শিখ নেতাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেননি মাউণ্টব্যাটেন। পূর্বে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, হাঙ্গামা-কারীদের তিনি দমন করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে তিনি হাঙ্গামার চক্রান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিখ নেতাদের সায়েস্তা করার জন্য চেষ্টাই করেননি।

এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মাউণ্টব্যাটেন যে মেমোরেণ্ডাম দেশরক্ষা পরিষদের রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাতে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ক'রেই বর্ণনা করেছেন। শিখসমস্যা কোন্ রূপ গ্রহণ করেছিল, সে সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সকলেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কারও মনে কোনপ্রকার সতর্কতার অভাব বা ধারণার অস্পষ্টতা ছিল না। শিখ-সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু শিখেরা গোপনে গোপনে একটা 'বড় রকমের' পরিকল্পনা করেছে, এরকম কোন সংবাদ মাউণ্টব্যাটেন পূর্বে পাননি। ৫ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক অফিসারের কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন এই 'শিখ পরিকল্পনার' কথা প্রথম শুনলেন। এই গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে আলোচনা ক'রেও মাউণ্টব্যাটেন যে সব তথ্য জানলেন তাতেও 'শিখ পরিকল্পনা' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কতগুলি বিষয়ের নিঃসংশয় প্রমাণ ও তথ্য তিনি পাননি। এই 'শিখ পরিকল্পনা'র আকার-প্রকার কি, কোন্ কোন্ অঞ্চলে কতখানি ব্যাপকতার সঙ্গে এই গোপন শিখ-পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা হবে, সে বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য গোয়েন্দা অফিসার দিতে পারেননি।

পাঞ্জাবের গভর্নর জেংকিন্‌স্‌-এর লেখা একখানি চিঠিকে মাউণ্টব্যাটেন প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যেটা জাফরুল্লার অভিযোগ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। চিঠিখানির ভাষায় কোনই অস্পষ্টতা নেই, বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবেই লিখিত। এ চিঠি লিখেছিলেন জেংকিন্‌স্‌ ৯ই আগস্ট তারিখে। জেংকিন্‌স্‌ এই চিঠিতে পাঞ্জাবের তিন গভর্নরেরই (স্বয়ং জেংকিন্‌স্‌ এবং তাঁর পরবর্তী দুই গভর্নর, যাঁরা বিভক্ত পাঞ্জাবের দুই অংশের দুই গভর্নরের পদে নিযুক্ত হবেন বলে তখন স্থির করা হয়েছিল) অবিসংবাদিত অভিমত জানিয়েছিলেন। তিন গভর্নরই একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শিখ নেতাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না। শুধু গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা ক'রে রাখতে হবে, যেটা প্রয়োজন অনুযায়ী দুই পাঞ্জাবেই অতি দ্রুততার সঙ্গে কার্যে পরিণত করা ও প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে।

এই চিঠিতে উল্লিখিত অন্যান্য বক্তব্য থেকে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা যায় এবং এই তথ্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন মুডি এবং তাঁর পক্ষে পাকিস্থানের দিকে টেনে কথা বলাই ছিল স্বাভাবিক; কারণ পাকিস্থানের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মুডিই বলেছিলেন, পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত কি মনোভাব অবলম্বন করবেন, সেটা সুস্পষ্ট ক'রে এবং নিঃসংশয়ভাবে না জেনে নিয়ে জেংকিন্‌সের 'বিশেষ ক্ষমতা'র আইন অনুসারে শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা একটা অত্যন্ত বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। মুডি আরও বলেছিলেন, শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে কোথায় রাখা হবে, সেটাও একটা দুশ্চিন্তার বিষয় এবং এ বিষয়টা স্পষ্ট ক'রে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গ্রেপ্তারের পর শিখ নেতাদের এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে তাঁদের নাম ক'রে জনসাধারণ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে না পারে। ধৃত নেতাদের বন্দী ক'রে রাখবার জন্য জেংকিন্‌স্‌ তাঁদের অবশ্যই এমন স্থানে পাঠাতে পারেন না, যে স্থান আর কয়েকদিন পরেই পাকিস্থানে পরিণত হবে। অপরদিকে ধৃত নেতাদের যদি শুধু পূর্ব পাঞ্জাবেরই বিভিন্ন স্থানে বন্দী ক'রে রাখা হয়, তবে নেতাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন ও বিক্ষোভ জেগে উঠবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্থান মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এনেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনেরই অসঙ্গত চাপে পড়ে র‍্যাডক্লিফ সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে পাকিস্থানের প্রতি অন্যায় করেছেন। পাকিস্থান বলেছেন, র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবার পূর্ব মুহূর্তে ভাইসরয়ের ভবন থেকে যে গোপন অনুরোধ র‍্যাডক্লিফের কাছে পেঁাছেছিল, তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে র‍্যাডক্লিফ সীমানার রেখা রদবদল ক'রে ভারতের সুবিধা এবং পাকিস্থানের ক্ষতি ক'রে দিয়েছেন। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ পাকিস্থান একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। ৮ই আগস্ট তারিখে জেংকিন্‌সের কাছে লেখা অ্যাবেলের (স্যার জর্জ অ্যাবেল, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি) একখানি চিঠি। এই চিঠিতে অ্যাবেল লিখেছিলেন যে, সীমানা কমিশনের বাঁটোয়ারা ১১ই আগস্ট তারিখে ঘোষণা করবার ইচ্ছা আছে। চিঠিতে বাঁটোয়ারার একটা আভাস তথা মোটামুটি পরিচয়ও উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে অ্যাবেলের চিঠিতে এই কথা বলা হয়েছিল যে, ফিরোজপুর এবং জিরা নামে তহশীল দু'টি পাকিস্থানের ভাগে পড়েছে।

স্যার জর্জ অ্যাবেলের লেখা চিঠির মধ্যে গভীর রহস্যের কোন বস্তু ছিল না। চিঠির তাৎপর্যও সরল এবং স্পষ্ট। এই চিঠি সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য মেমোরেণ্ডামে পরিষ্কারভাবেই বিবৃত করেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই : পাঞ্জাবের গভর্নর জেংকিন্‌স্‌ই কিছুদিন পূর্বে জানতে চেয়েছিলেন যে, সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটা আভাস তিনি ঘোষণার আগেই পেতে পারেন কি না। র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগে থেকেই তাঁর জানবার প্রয়োজন হয়েছিল। সীমানারেখা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস তিনি পেতে চেয়েছিলেন। দুই পাঞ্জাবের মধ্যে সৈন্যদল এবং পুলিশদল চালাচালি করবার যে প্রয়োজন আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা দেবে, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য প্রস্তুত হতে চাইছিলেন জেংকিন্‌স্‌। পাঞ্জাবের কোন্‌ অংশ পাকিস্থানে এবং কোন্‌ অংশ ভারতের মধ্যে পড়বে, তারই মোটামুটি একটা পরিচয় জেনে নিয়ে সৈন্য ও পুলিশদল চালাচালির কাজটা এগিয়ে রাখবেন, এই ছিল জেংকিন্‌সের উদ্দেশ্য।

র‍্যাডক্লিফের সেক্রেটারি অ্যাবেলকে বাঁটোয়ারার একটা পূর্বাভাস মাত্র দিয়েছিলেন, যেটা নিতান্ত একটা আন্দাজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কমিশন তখনো চূড়ান্ত-ভাবে সীমানারেখা নির্ণয় করে ফেলেননি।

বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবার পর দেখা গেল যে, র‍্যাডক্লিফের সেক্রেটারি অ্যাবেলকে বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তার অনেক কিছুই ভুল। জেংকিন্‌সের কাছে লেখা অ্যাবেলের চিঠিতে ঘোষণার সময় সম্বন্ধে এবং দু'টি তহশীলের সম্বন্ধে যে কথা লেখা হয়েছিল, সেই দুটি সংবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো। কারণ, ফিরোজপুর আর জিরা তহশীল পাকিস্থানে পড়েনি এবং ১১ই আগস্ট তারিখেও বাঁটোয়ারা ঘোষিত হয়নি। এই হলো অ্যাবেলের লেখা চিঠির রহস্য ও তাৎপর্য। চিঠিতে ঐ দু'টি সংবাদ ছাড়া আর কোন সংবাদ ছিল না। এ ছাড়া চিঠির এক বিন্দু বেশি বা কম আর কোন রহস্য নেই।

তবুও অ্যাবেলের লেখা এই চিঠিকেই মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন পাকিস্থান। চিঠিতে যেসব কথার উল্লেখ আছে, সেগুলিকে হঠাৎ শুনলে একটা প্রমাণের মতোই মনে হয় এবং এই কারণেই চিঠিটিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারছেন পাকিস্থান।

এর মধ্যে আর একটি বিষয়ে ভেবে দেখবার আছে। জেংকিন্‌স্‌ যদি সত্যিই মনে করতেন যে, তাঁকে একটা গোপন তথ্য অ্যাবেল গোপনে সরবরাহ করেছেন, তবে তিনি ঐ চিঠিকে তাঁর দপ্তরের সাধারণ ফাইলে রেখে দিয়ে চলে যেতে পারতেন কি? তাঁর কি এতটাই মাথা খারাপ হয়েছিল যে, তাঁরই একটা পাকিস্থান-বিরোধী গোপন কর্মের প্রমাণ তিনি লাহোর দপ্তরে ফেলে রেখে চলে যাবেন তাঁরই পরবর্তী পাকিস্থানী গভর্নরের অবগতির জন্য? আরও একটা কথা, পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর মুডি যদি সত্যিই মনে করতেন যে, তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীরা একটা অসৎ কাণ্ড করছেন, তবে তিনি কি ব্রিটিশ সহকর্মীদের ধরিয়ে দেবার জন্য এই চিঠিটি তাঁর হাতছাড়া ক'রে সাধারণ সরকারী ফাইলে রেখে যেতেন? মাউণ্টব্যাটেনের মতো মানুষের আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংশয় প্রকাশ ক'রে সস্পর্ধভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন পাকিস্থান। সে কথা ছেড়ে দিই। র‍্যাডক্লিফের কথাই ধরা যাক। কোন বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্রে র‍্যাডক্লিফের মতো মানুষের যে আইনগত সততার খ্যাতি ও ব্যক্তিগত খ্যাতি আছে, তার বিরুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করার সাহস কি কারও হতে পারে? কিন্তু

দেখা যাচ্ছে যে, তা'ও হয়েছে। পাকিস্থানের অভিযোগের একটা অর্থ এই যে, সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে ন্যায়সংগতভাবে বিচার ও বিবেচনার দ্বারা সিদ্ধান্ত না ক'রে র‍্যাডক্লিফ বাইরের চাপে পড়ে একটা সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২১শে মার্চ, ১৯৪৮ সাল : কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনা প্রতিনিধি ডাঃ সিয়াং যে প্রস্তাব অথবা পরিকল্পনা রচনা করেছেন, সে সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের সংবাদপত্রে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। যা ধারণা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ভারত ও পাকিস্থানের অভিমত পরস্পরের ঠিক উল্টোটি হয়েছে। ভারতের হিন্দুস্থান টাইম্‌সের মতে এই চীনা প্রস্তাব হলো,—"যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত পন্থায় বিরোধ সমাধানের প্রথম যথার্থ প্রচেষ্টার উদাহরণ।" এই পত্রিকা আরও বলেছেন যে, পৃথিবীর শান্তিকামী এবং আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন প্রত্যেক রাষ্ট্র যে উপায়কে সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় বলে মনে করেন, চীনা প্রস্তাবে সেই উপায়ের কথাই বলা হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্থানের ডন বলছেন—"আমরা এখনও আশা করছি যে, নিরাপত্তা পরিষদ পূর্বে যে বাস্তবসম্মত কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছিলেন, চীনা প্রস্তাব উপেক্ষা ক'রে পুনরায় সেই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেবেন। চীনা আপোষ প্রস্তাবে বস্তুত একপক্ষকে (ভারতকে) সব কিছু দেওয়া হয়েছে এবং অপরপক্ষকে (পাকিস্থানকে) কিছুই দেওয়া হয়নি।" পাকিস্থান এখনো এই দাবী করছেন যে, বর্তমান কাশ্মীর রাজ্য-সরকারের রাজনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার নির্ণয় করতে হবে গণভোটের আগে নয়, নিরপেক্ষভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে কাশ্মীরী গণমত জানা হয়ে যাবার পরে।

অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। দুই পক্ষের এই ধরনের পরস্পরবিরোধী অভিমতের ও তর্কের মধ্যে মীমাংসার সম্ভাবনা আরও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একটা নতুন কথাও হঠাৎ কানে এসেছে। বলেছেন গতকালের হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌। হিন্দু-স্থান টাইম্‌সের দেবদাস গান্ধী এবং জি ডি বিড়লার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেটা আমাদের জানা আছে। সুতরাং এই মহল থেকে যে নতুন একটা নীতিকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার প্রস্তাব করা হচ্ছে, সেটা একটু মনোযোগ দিয়েই বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। গণভোটে যে যে বিষয়ে কাশ্মীরী জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করার কথা এ পর্যন্ত বলা হয়ে আসছে, তার মধ্যে আর একটা নতুন বিষয় যোগ ক'রে দেবার প্রস্তাব করেছেন হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌। কাশ্মীরবাসী ভারতে যোগদান করবে, না পাকিস্থানে যোগদান করবে—গণভোটে মাত্র এই দুটি জিজ্ঞাস্য কাশ্মীরবাসীর সম্মুখে উত্থাপন করার প্রস্তাব হয়ে আছে। হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌ বলছেন, সেই সংগে আর একটি জিজ্ঞাস্য কাশ্মীরবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা কর্তব্য। সেটি হলো—কাশ্মীরবাসী কি স্বতন্ত্র থাকতে চায়? গণভোটে এইভাবে তিনটি জিজ্ঞাস্য উপস্থিত ক'রে কাশ্মীরবাসীর ইচ্ছা জানবার জন্য ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেছেন হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌। আরও বলেছেন—"কাশ্মীরবাসীকে মাত্র দুই ডোমিনিয়নের কোন একটিতে যোগদানের পক্ষে ভোট দিতে বললে ভুল হবে এবং অন্যায় করা হবে। শুধু দুই ডোমিনিয়নের কোন একটিতে যেগাদানের ইচ্ছার কথা নয়, সেই সংগে কাশ্মীরবাসীকে এই ইচ্ছা প্রকাশেরও সুযোগ দিতে হবে যে, তাঁরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকাই পছন্দ করেন কি না।"

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : দিল্লীর গভর্নমেণ্ট হাউসে বিগত এক পক্ষ কাল কোন চঞ্চলতার সাড়া ছিল না। কারণ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে মাউণ্ট-

ব্যাটেনের সঙ্গে যেতে হয়েছিল। সুদূর দক্ষিণের কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর এবং নিকটের উদয়পুর ও কাপুরথালা ঘুরে আসতে হয়েছে।

কাপুরথালা গিয়ে কয়েক মুহূর্তের মতো একটা সরস আমোদ উপভোগের সুযোগ পেয়েছি। কাপুরথালার মহারাজার বয়স হলো ছিয়াত্তর বৎসর। বিগত একাত্তর বৎসর ধরে তিনি গদিতে রয়েছেন, কারণ পাঁচ বৎসর বয়সেই তাঁকে হিজ হাইনেস হয়ে গদিতে আরোহণ করতে হয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে অভিনন্দন জানাবার সময় কাপুরথালার মহারাজা তাঁর বক্তৃতায় বললেন—'লর্ড ও লেডি উইলিং-ডনকে আজ এ রাজ্যে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার সুযোগ পেয়ে......ইত্যাদি'।

কোচিনের মহারাজার সঙ্গে আলাপ করতে মাউণ্টব্যাটেনকে বেশ অসুবিধা ভুগতে হয়েছে। মহারাজার শরীর খুবই অশক্ত ও অসুস্থ বলে মনে হলো। মহারাজা শুধু তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে নানা কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন। মহারাজা জানালেন যে, তাঁর পরিবারের লোকসংখ্যা হলো চার শত ষাট। একটি মাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন করলেন মহারাজা। মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—স্ট্যালিনের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

আবার দিল্লী। দিল্লী ফিরে এসে মাউণ্টব্যাটেন দেখলেন যে, সেই হায়দরাবাদ-সঙ্কটই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। বর্মা থেকে ফিরে এসেই মাউণ্টব্যাটেন দেখেছিলেন যে, নিজামের কাছ থেকে তাঁর উদ্দেশে লেখা একখানি চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাবার জন্য তখুনি মাউণ্টব্যাটেনকে আবার দিল্লী ছেড়ে যেতে হয়েছিল বলে তিনি গভর্নমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরকেই নিজামের এই চিঠির উত্তর দেবার জন্য অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মাউণ্টব্যাটেনের। তিনি নিয়মতন্ত্র অনুসারে যা করতে পারেন, একমাত্র সেই কর্তব্যটুকু পালন করা ছাড়া অন্য কোনভাবে এইসব বিরোধবিষয়ক আলোচনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিলেন না। তিনি নিয়মতন্ত্র অনুসারে গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু 'কাজ' করতে পারেন একমাত্র গভর্নমেণ্টেরই পরামর্শ অনুসারে।

দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে চিঠি প্রত্যুত্তরে পাঠিয়েছেন, তার খসড়া প্রথমে রচনা করেছিলেন ভি পি। প্যাটেলের হাতে পড়ে সে চিঠির ভাষা আর এক দফা কড়া হয়ে উঠল, নেহরু আবার সে চিঠিকে এক দফা নরম ক'রে দিলেন। এত ক'রেও শেষ পর্যন্ত যে উত্তর তৈরী হলো, তার মধ্যে যথেষ্ট শক্ত ভাষা ও শাসানির ভাব রয়েই গেল। এই চিঠিই নিজামের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেশীয় রাজ্য দপ্তর। প্রেরিত হবার আগে এই চিঠি দেখবার সুযোগ পাননি মাউণ্টব্যাটেন। চিঠিতে খোলাখুলিভাবেই নিজামকে এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, তিনি স্থিতাবস্থা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। চুক্তি অনুসারে অঙ্গীকৃত দায়িত্ব পালনের জন্য নিজামকে বলা হয়েছে। তা ছাড়া ইত্তেহাদ ও রাজাকর দলকে নিষিদ্ধ করার জন্যও নিজামকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মঙ্কটন এর আগেই অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এবং হায়দরাবাদের ব্যাপারে আর ভিড়তে আসবেন না। কিন্তু ২৮শে মার্চ তারিখেই লণ্ডন থেকে হায়দরাবাদ ফিরে এসে মঙ্কটন আবার এই ঘটনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের চিঠি পড়ে এবং চারদিকের ব্যাপার দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। মঙ্কটন যদিও শান্ত স্বভাবের মানুষ কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের এই চিঠি পড়ে তিনি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত

হয়েছেন। গত রাত্রিতেই তিনি হায়দরাবাদ থেকে সোজা দিল্লী চলে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিজামের একখানি চিঠি, মাউণ্টব্যাটেনের কাছে লেখা। মঙ্কটন এই ব্যাপার নিয়ে সবারই সঙ্গে যেন যুদ্ধ করবার জন্য একটা উত্তেজিত মনোভাব নিয়ে হাজির হয়েছেন। গভর্নর-জেনারেল হোক্ বা আর যেই হোক্ কাউকে এবার আর ছেড়ে কথা বলবেন না মঙ্কটন। এখন, এইরকম ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মঙ্কটনের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন মঙ্কটন, সে চিঠি পড়ে এটা বোঝা গেল যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের এই দলিল রচনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় নিজাম দিতে পেরেছেন। ভারত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে শাসানি দিয়েছেন, সে ব্যবস্থার যুক্তিহীনতা প্রমাণ করার মতো কয়েকটি যুক্তিও দেখিয়েছেন নিজাম। চিঠি পড়ে বোঝা যায় যে, নিজাম তাঁর নিজেরই মনের প্রেরণায় এ চিঠি লিখেছেন। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে পত্র দিয়েছেন, সেই পত্রকে 'চরম-পত্র' বলেই মনে করেছেন নিজাম। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর এই ধারণার কথা প্রথমেই উল্লেখ ক'রে নিয়ে তার পর অন্যান্য বক্তব্য বলেছেন নিজাম। নিজাম আরও বলেছেন, ভারত সরকারের এই চিঠিকে হায়দরাবাদের সঙ্গে সকল সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দেবার প্রাথমিক উদ্যোগ বলে তিনি মনে করছেন। এই অবস্থায় নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের কাছে 'শেষ আবেদন' জানিয়েছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন যেন তাঁর পদক্ষমতার সাহায্যে এই অবাঞ্ছিত পরিণাম নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

মঙ্কটনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, উভয়েই উভয়ের মন ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে সুপরিচিত। সুতরাং ক্ষুব্ধ মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনা করতে মাউণ্টব্যাটেনের কোন অসুবিধা হলো না। খোলা মন নিয়েই দুজনে আলোচনা করলেন। মাউণ্টব্যাটেন এই সত্য কথাটি মঙ্কটনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, ভারত সরকার সত্য সত্যই নিজামের কাছে কোন 'চরম-পত্র' প্রেরণ করেননি। ঐ পত্রটি মোটেই চরম-পত্র নয় এবং ভারত সরকার হায়দরাবাদের 'অর্থনৈতিক অবরোধে'র জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা গ্রহণের নির্দেশ দান করেননি। আলোচনা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই নেহরু উপস্থিত হলেন। নেহরুও নিজ মুখেই জানিয়ে গেলেন যে, ভারত সরকার নিজামকে 'চরম-পত্র' হিসাবে এই পত্র দেননি এবং হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক অবরোধও ভারত সরকারের কাম্য নয়।

কিন্তু আর একটি ব্যাপারে আবার জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। জল ঘোলা করার মতো এই প্রস্তরটি নিক্ষেপ করেছেন ইত্তেহাদের নেতা কাশিম রেজভি। অনেকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রে ধর্মোন্মাদ রেজভির একটি বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত ৩১শে মার্চ তারিখে হায়দরাবাদের অস্ত্র-সপ্তাহ উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় রেজভি একটি 'শোণিত-পিপাসু' বক্তৃতা দিয়েছেন। রেজভি তাঁর বক্তৃতায় হায়দরাবাদের প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশে এই আবেদন জানিয়েছেন যে, যতদিন না ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যন্ত কোন হায়দরাবাদী মুসলমান যেন তরবারি কোষবদ্ধ না করেন। এই বক্তৃতায় একটি গর্হিত অভিসন্ধিমূলক মন্তব্যও করেছেন রেজভি—'ভারতীয় ইউনিয়নে আমাদের মুসলিম বেরাদারগণ হায়দরাবাদের স্বার্থের জন্য পঞ্চমবাহিনীর কাজ করবেন।'

এই ধরনের ভাষার ব্যবহার চলতে থাকলে, পরিণামে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা

কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে, সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। দৈবের অনুগ্রহে দক্ষিণ ভারতে এখনো সাম্প্রদায়িক শান্তি রয়েছে। উত্তর ভারতের ভয়ঙ্কর উত্তেজনা এখনো দক্ষিণ ভারতের দেহে ও মনে সংক্রামিত হতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের শান্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই রেজভি তাঁর বক্তৃতায় এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করছেন বলে ধারণা না ক'রে পারা যায় না।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : রেজভি-ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়ে উঠছে। মঙ্কটন গত কালই দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছেন। যাবার সময় তিনি একটা বিষয় ভাল ক'রেই বুঝে গিয়েছেন। অবিলম্বে হায়দরাবাদে দায়িত্ব-শীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা যে বর্তমানে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। আর একটি বিষয়ে মঙ্কটন দিল্লী থেকেই তাঁর কর্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়ে গিয়েছেন। রেজভিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা কর্তব্য, এই পরামর্শ নিজামকে এখনই দিতে হবে এবং এই পরামর্শ দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েই হায়দরাবাদে গিয়েছেন মঙ্কটন।

কিন্তু আজই মঙ্কটনের কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক টেলিগ্রাম উপস্থিত হলো। মঙ্কটন লিখেছেন যে, রেজভির বক্তৃতার সংবাদটি মিথ্যা। মঙ্কটন খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, এরকম কোন 'জেহাদী' বক্তৃতা রেজভি দেননি। মঙ্কটনের ধারণা, ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেন আর কোন আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে চালিত হতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই ভিত্তিহীন সংবাদটি ইচ্ছা ক'রেই কেউ প্রচার করেছে।

মাউণ্টব্যাটেন আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, অবিলম্বে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে হবে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ ক'রে দিলাম। রেজভি-বক্তৃতার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাকে দস্তুরমতো ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোমসের মতোই অতি দুরূহ এক সন্ধানকার্যের ভার নিতে হলো। নানা-সূত্রে প্রাপ্ত যে সব গোলমেলে এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করলাম, তার ভিতর থেকে প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্কার করতে গিয়ে ডাঃ ওয়াটসনের মতো আমাকেও একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে হতভম্ব হয়ে যেতে হলো।

একটা বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, রেজভির ৩১শে মার্চের বক্তৃতাটি ভারতীয় সংবাদপত্রে সাতদিন পরে প্রকাশিত হয়েছে। কেন এই বিলম্ব? ভারতীয় সংবাদপত্রে যেভাবে এই বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মনে হয় রেজভি সত্য সত্যই ৩১শে মার্চ তারিখে কোন সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতার বিবরণের মধ্যে উৎসাহী শ্রোতাদেরও নানারকম উল্লাস মন্তব্য ও জয়ধ্বনির উল্লেখও করা হয়েছে। অথচ মঙ্কটন লিখেছেন, কোন 'সভা'ই হয়নি।

দু'দিন আগে নেহরুও আইনসভায় তাঁর একটি বক্তৃতায় রেজভির এই বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন। হিংসা ও নরহত্যার প্ররোচক এই বক্তৃতা সম্বন্ধে নেহরুও মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, 'রেজভি এই রকম হিংসা-প্ররোচক বক্তৃতা আরও বহুবার দিয়েছেন।' ভারতীয় সংবাদপত্রে রেজভির পূর্বে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ সঙ্কলিত ক'রে একটা নতুন রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আরম্ভ ক'রে মার্চ মাস পর্যন্ত রেজভি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন, তারই বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি। এর মধ্যে রেজভির এমন সব উক্তির উল্লেখ দেখছি, যেগুলি এর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে আমি দেখিনি। এসোসিয়েটেড প্রেস প্রামাণ্যসূত্রে প্রাপ্ত

একটি সংবাদে রেজভির এমন একটি বক্তৃতার বিবরণ দিয়েছেন, যেটা আমার বর্তমানের অনুসন্ধানীয় ৩১শে মার্চের রেজভি-বক্তৃতার চেয়েও অনেক বেশি আক্রমণমূলক ও গর্হিত। অথচ এই বক্তৃতার রিপোর্ট পূর্বে কোন সংবাদপত্রে আমি দেখিনি। এসোসিয়েটেড প্রেসের এই সংবাদে দেখছি যে, প্রতাপশালী মোগল বাদশাহের মতো উদ্ধত ভঙ্গী ক'রে রেজভি একটি রাজ্যাংশ দাবী করেছেন। বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি অংশ হায়দরাবাদকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবী করেছেন রেজভি। মাদ্রাজের এই সকল অংশ অতীতে হায়দরাবাদ রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেজভি বলেছেন—"সেদিন আসতে আর দেরি নেই, যেদিন বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ আমাদের হায়দরাবাদের বাদশাহের পা ধুইয়ে দেবে।"

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আলি এবং রেজভি, উভয়েই অস্বীকার করেছেন, এবং উভয়েই বলেছেন যে, ৩১শে মার্চ তারিখে 'অস্ত্র-সপ্তাহ' উপলক্ষে কোন জনসভা হয়নি এবং কোন বক্তৃতাও দেওয়া হয়নি। টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা এরিক ব্রিটার এই সময় হায়দরাবাদে ছিলেন। ব্রিটারের কাছ থেকে আমি অনেক সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এইবার বুঝতে চেষ্টা করলাম, রেজভির এই জেহাদী বক্তৃতার সত্যতা কতটুকু এবং সংবাদটি ভিত্তিহীন কি না।

বুঝলাম, মীর লায়েক আলি এবং রেজভি ঠিক কথা বলেননি। ব্রিটার বলেছেন, ৩১শে মার্চ তারিখে সকাল বেলা হায়দরাবাদে একটি জনসভা আহূত হয়েছিল এবং সেই সভায় রেজভি উপস্থিত থেকে সামরিক কায়দায় প্রায় পাঁচশত রাজাকরের অভিবাদনও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সভায় যতক্ষণ রেজভি ছিলেন, ততক্ষণ কোন বক্তৃতা তিনি দেননি। রাজাকরদের কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে যাবার পরেও ব্রিটার সেই সভায় আরও বিশ মিনিট কাল ছিলেন। এর পর রেজভি এবং প্রায় ত্রিশজন লোক সভাস্থল থেকে চলে গিয়ে একটি গৃহে সমবেত হন। ব্রিটারও সেখানে উপস্থিত হন। এই গৃহের ক্ষুদ্র সম্মেলনে চা ও কেক পরিবেশন করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে নানারকম আলাপ-আলোচনা করেন। ব্রিটার বলেছেন, রেজভি নিজে দরজা পর্যন্ত এসে ব্রিটারকে বিদায় দিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত তথ্য ব্রিটারের কাছ থেকে পাওয়া গেল। ব্রিটার বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সেই গৃহে রেজভি কোন বক্তৃতা দিয়েছিলেন কি না, সেটা বলতে পারেন না ব্রিটার। সুতরাং রহস্য রয়েই গেল।

রেজভি-বক্তৃতার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য শার্লক-হোমস্‌গিরি করতে গিয়ে আর একটি তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেলাম। হায়দরাবাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে এখন সকল পক্ষ থেকেই গোয়েন্দাগিরির জাল পাতা হয়েছে। রেজভি প্রকাশ্যে জনসভায়, অথবা গোপনে ঘরোয়াভাবে যেসব কথা বলেন, সেসব শুনবার জন্য মুন্সী এবং নিজাম উভয়েরই চর নিয়মিতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকে। এই লুকোচুরি খেলার মধ্যে রেজভিও অসতর্ক নন। রেজভির চরও আবার নিজাম ও মুন্সীর প্রত্যেকটি উক্তি ও আলোচনা শুনে এবং সংগ্রহ ক'রে রেজভির কাছে রিপোর্ট ক'রে থাকেন। কিন্তু এই চরদের ধরা-ছোঁয়া যায় না, চেনাও যায় না। যেন একটা ছায়াজগতের জীবের মতো এই সব চর গোপনে কাজ ক'রে চলেছে। যাই হোক, একটি বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হয়েছি। রেজভি এমন এক ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন, যেটা এইভাবে অবাধে চলতে থাকলে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবেই বিনষ্ট ক'রে দেবে। রক্তপাতের জন্য যেভাবে

সদাসর্বদা আবেদন জানিয়ে চলেছেন রেজভি, তাতে ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক চূড়ান্তভাবেই ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আর একটা বাস্তব সত্য এই যে, রেজভির কোন ক্রিয়াকলাপের খবর আর অজানা থাকছে না। সতর্ক পক্ষের চরেরা যথেষ্ট সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে।

হায়দরাবাদ-সমস্যায় এখন বস্তুত একটা 'অচল অবস্থাই' দেখা দিয়েছে। মাউণ্ট-ব্যাটেনও সমস্যার সমাধানের একটা সূত্র আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, যাতে এই অচল অবস্থার উপশম হয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই মাউণ্টব্যাটেনের আলোচনা চলছে। মঙ্কটন গত বুধবারে দিল্লীতে এসেছেন এবং লায়েক আলি এসে পেঁাছেছেন বৃহস্পতিবার। গভর্নমেণ্ট হাউসে সাঁতার খেলার জন্য রচিত কৃত্রিম জলকুণ্ডের পাশে ছায়াশীতল ও শান্ত উদ্যানভূমির এক নিভৃতে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে যোগদান করেছেন মীর লায়েক আলি। এই ভোজনের আসরে মাউণ্টব্যাটেন ও লায়েক আলি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। এখানে বসে প্রায় দু'ঘণ্টা কাল দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন যে, লায়েক আলিকে তিনি এখন কিছুটা নরম ক'রে আনতে পেরেছেন। লায়েক আলির মনোভাবের যে পরিচয় এতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে এটাই বোঝা গিয়েছিল যে, হায়দরাবাদ-সমস্যার সমাধান চাইছেন না লায়েক আলি। সমস্যা এড়িয়ে শুধু সময় পার ক'রে দেবার কৌশল অনুসরণ ক'রেই চলছেন নিজামের এই একরোখা স্বভাবের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু মাউণ্ট-ব্যাটেন মনে করছেন যে, এতদিনে তাঁর কথা লায়েক আলির মনের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও লায়েক আলি সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের পূর্বের ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি। মাউণ্টব্যাটেন এখনো পূর্বের মতোই বিশ্বাস করেন যে, হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী হবার মতো যোগ্যতা লায়েক আলির নেই। এই দুরূহ কূটনৈতিক আলোচনার ব্যাপারে যে পরিমাণ সংযত বিবেচনাশক্তি নিয়ে নিজামের প্রতিনিধির পক্ষে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, লায়েক আলির মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব আছে। অদ্ভুত একরকমের গোঁ নিয়ে তিনি প্রত্যেক আলোচনায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে সমস্যার কোন নিষ্পত্তি তো হতেই পারে না, বরং এইভাবে যদি আর কিছুদিন তিনি আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেন, তবে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারটিই চূড়ান্তভাবে ভেঙে যাবে।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝেছেন, আর সময় নেই, যা করবার তা এখনি ক'রে ফেলতে হবে। প্যাটেলও এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, অন্তত আলোচনা করবার মতো দৈহিক শক্তি এখন তিনি লাভ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এই হলো সুযোগ। এদিকে প্যাটেলকে এবং ভি পিকে পাওয়া যাচ্ছে, ওদিকে নিজাম, মঙ্কটন, লায়েক আলিকেও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, আলোচনাকে চরম পর্যায়ে তুলে নিয়ে একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলবার চরম চেষ্টার সুযোগও এসে পড়েছে। এর মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সত্য সত্যই 'মাঝখানে' থেকে এই আলোচনা পরিচালিত করতে সক্ষম।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আলির সঙ্গে আলোচনা করবার আগে মাউণ্টব্যাটেন নেহরু, ভি পি এবং মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নিয়েছেন। গত তিনদিন ধরে প্রতি সকালে প্রত্যেকের সঙ্গে অতি বিশদ-

ভাবেই আলোচনা করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। আলোচনা ক'রে চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে তিনি সমাধানের এক ফরমুলা রচনা করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন আশঙ্কা করছিলেন যে, হায়দরাবাদের অবিলম্বে রাষ্ট্রভুক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থার প্রস্তাবে প্যাটেল এখন আর সম্মতি দিতে রাজি হবেন না। মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন ফরমুলার খসড়াপত্র নিয়ে ভি পি মুসৌরিতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করলেন। ভি পি ফিরে আসার পর মাউণ্টব্যাটেন যেমন বিস্মিত তেমনি নিশ্চিন্তও হলেন, কারণ, প্যাটেল আপত্তি করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের ফরমুলাকে সুযোগ দিতে রাজি হয়েছেন প্যাটেল।

মাউণ্টব্যাটেনের উদ্ভাবিত চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব হলো এই :

(১) কাশিম রেজভিকে অবিলম্বে সামলাতে হবে। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে রাজাকর দলের মিছিল, জনসভা, বিক্ষোভ এবং বক্তৃতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২) হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের যেসব সদস্যকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। অবিলম্বে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারাগার থেকে ছেড়ে দিয়ে বন্দিমুক্তির উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে।

(৩) অবিলম্বে দুই সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে হায়দরাবাদের বর্তমান গভর্নমেণ্টকে পুনর্গঠিত করতে হবে। পুনর্গঠন নামেমাত্র হলে চলবে না, যথার্থ পুনর্গঠন চাই।

(৪) অত্যল্পকালের মধ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব-সম্পন্ন দায়িত্বশীল গভর্ন-মেণ্টের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বর্তমান বৎসর শেষ হবার আগেই একটি গণপরিষদ গঠন ক'রে ফেলতে হবে।

মঙ্কটন এই চারদফা প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পক্ষেই তিনি নিজামকে পরামর্শ দান করবেন। আর একটি ইচ্ছার কথা বলেছেন মঙ্কটন। মীর লায়েক আলির বদলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করবার জন্য তিনি নিজামকে বলবেন। মীর লায়েক আলিকে ভারতীয় সরকারী মহলের প্রত্যেকে অবিশ্বাস করেন, এটা এখন উপলব্ধি করেছেন মঙ্কটন। বর্তমানে যদি দিল্লীতে নিযুক্ত নিজামের এজেণ্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন, তবেই সবচেয়ে ভাল হয়। জইন ইয়ার জঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হলে নিজামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানকার সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব যতখানি দূরীভূত হবে, আর কোন ব্যক্তির নিয়োগে ততখানি হবে কি না সন্দেহ। কারণ এজেণ্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সুরুচিসম্পন্ন স্বভাবের পরিচয় এখানে অনেকেই পেয়ে গিয়েছেন। নিজামের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কোন অভাব নেই এবং সে সম্বন্ধে সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বোঝা গিয়েছে যে তিনি যথেষ্ট বাস্তবসচেতন বুদ্ধির মানুষ। জইন ইয়ার জঙ্গ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের মনে, বিশেষ ক'রে ভি পি মেননের মনে খুবই ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : মঙ্কটন এবং লায়েক আলি হায়দরাবাদ চলে গিয়েছেন। আজ গভর্নমেণ্ট হাউসে দু'জন নতুন অতিথি এসেছেন—কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণী। অতিথিদ্বয় চারদিন এখানে অবস্থান করবেন।

কাশ্মীরের মহারাজা এবং মহারাণী গভর্নমেণ্ট হাউসের অতিথিরূপে এসেছেন, কিন্তু এ ঘটনাও এমনিতে বা সহজে হয়নি। এর জন্যও দস্তুরমতো একটা ফরমূলা আবিষ্কারের চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছে। হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ফরমূলা রচনার চেষ্টায় আমাদের যতটা মন লাগিয়ে খাটতে হয়েছে, কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণীকে গভর্নমেণ্ট হাউসের অতিথিরূপে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়েও প্রায় ততটাই করতে হয়েছে।

প্যাটেলের কাছ থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে প্রথম অনুরোধ এসেছিল— কাশ্মীরের মহারাজাকে একবার আমন্ত্রণ করা হোক। মাউণ্টব্যাটেন যেন মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন, এই ছিল প্যাটেলের প্রস্তাব। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত অথবা বিকৃত ধারণা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। মাউণ্ট-ব্যাটেনের আশঙ্কা ছিল, বিশেষ ক'রে ভারতের বাইরে এই আমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে একটা জল্পনার সৃষ্টি হবে এবং মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাই প্রত্যুত্তরে প্যাটেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বয়ং প্যাটেলই যেন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন এবং সেই সঙ্গে যেন এই কথাও মহারাজাকে জানিয়ে দেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট সানন্দে মহারাজাকে গভর্নমেণ্টের অতিথিরূপেই গভর্নমেণ্ট হাউসে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধ অনুযায়ী প্যাটেলও মহারাজাকে ভিন্ন পত্রে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; কিন্তু মহারাজাই প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ না করলে তিনি আসবেন না। মাউণ্ট-ব্যাটেন অগত্যা ব্যক্তিগতভাবেই নিমন্ত্রণ করলেন এবং মহারাজাও এলেন। কিন্তু আমার ফাইলে ক'দিন আগের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি এখনো রয়েছে, যেটা পড়লে এইটুকু সুস্পষ্টভাবেই মনে হবে যে, প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মহারাজা দিল্লীতে আসছেন। এই বিজ্ঞপ্তি এখনো প্রচার করা হয়নি, প্রচার করবার কথা; কিন্তু আমি মনে করছি, এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে এসে কার অতিথি হয়ে গভর্নমেণ্ট হাউসে রয়েছেন, এ বিষয় নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাবে না। মহারাজার এতটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখন আর নেই। ঘটনার স্রোত অনেক দূর প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : নিরাপত্তা পরিষদ গত সপ্তাহে এক নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সকল সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব। ভারত ও পাকিস্থানকে কোন প্রস্তাবে রাজি করাবার ভরসা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েই নিরাপত্তা পরিষদ এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবে নানারকম নতুন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের ও পাকিস্থানের পক্ষে নতুন ক'রে কিছু করবার সুপারিশ এ প্রস্তাবে আর করা হয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নেহরুর আপত্তি প্রথম দিকে অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। গতকাল তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে এবিষয়ে লিখেছেন। নেহরুর বক্তব্য হল, ডাঃ সিয়াং-এর মূল প্রস্তাবের তুলনায় এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ রকমের একটা ভিন্ন ও নতুন প্রস্তাব। ভারতীয় প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জে যেসব যুক্তি, তথ্য ও বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তার সবই এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নেহরু বিশেষ একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন যে, এখন ভারত গভর্ন-

মেণ্টের সম্মুখে একটিমাত্র পথ আছে, সে পথ হলো নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা।

নেহরুর এই পত্রের উত্তর দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে উল্লিখিত নতুন ও সংশোধিত সুপারিশগুলির মধ্যে যদি মূলগত অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন সুপারিশ থেকেও থাকে, তবে খুব কমই আছে বলতে হবে। দুই প্রস্তাবের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে, সেসব এক-এক ক'রে সাজিয়ে লিখে ফেলবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন ভের্ননকে নির্দেশ দিয়েছেন। ভের্ননও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সেরে ফেলেছেন, যাতে মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরু আজই এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন।

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে আলোচনা হলো। আলোচনা আরম্ভ হতেই বোঝা গেল, নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাবকে সমূহভাবে নিন্দা ক'রে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য লেকসাকসেসে আয়েঙ্গারের কাছে নির্দেশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেহরু ক'রে ফেলেছেন।

বাধা দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। মত পরিবর্তন করার জন্য তিনি নেহরুকে যুক্তি দিয়ে এবং তর্ক ক'রে বার বার বোঝাবার চেষ্টা ও অনুরোধ করলেন। নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাবের সম্পর্কে নেহরুর সঙ্গে সকল প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। শেষ পর্যন্ত নেহরু মত পরিবর্তন করলেন। প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল ব্যবস্থা ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি না জানিয়ে মাত্র বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি জানাবেন বলে ঠিক করলেন নেহরু। বিষয় অনুসারে আপত্তিগুলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। এই চার শ্রেণীর আপত্তির মধ্যে তিনটি হলো বস্তুত একই বিষয় সম্পর্কিত আপত্তি। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে শেখ আবদুল্লার কর্তৃত্ব-ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তারই বিরুদ্ধে। আপত্তির মধ্যে এই কথাই প্রসঙ্গত উল্লিখিত হলো যে, ভারত গভর্নমেণ্টের মতে শেখ আবদুল্লার কর্তৃত্বক্ষমতাকে কোন-মতেই খর্ব করা উচিত হবে না। মাউণ্টব্যাটেন আর একটি বিষয়ে নেহরুকে রাজি করাতে পেরেছেন। প্রস্তাবিত কাশ্মীর কমিশনকে ভারতে আসতে দিতে রাজি হয়েছেন নেহরু।

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। বুঝলাম, আলোচনার ফল যা হয়েছে, তাতে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, নেহরু সমস্ত বিষয়টিকে দ্বিতীয়বার চিন্তা ও বিবেচনা ক'রে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। ভালই হয়েছে। আগের থেকেই মনের মধ্যে কতগুলি ধারণা ক'রে নিয়ে নেহরু নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের সম্পর্কে যে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত তিনি শেষ পর্যন্ত পরিহার করতে পেরেছেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : প্যাটেল মুসৌরী থেকে দিল্লী ফিরে এসেছেন। মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে আজ প্যাটেলকে দেখতে গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিটকাল প্যাটেলের কাছে কাটিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন পরিবারকেও কাছে দেখতে পেয়ে এবং আলাপ ক'রে প্যাটেল খুবই খুশি হয়েছেন।

আজ গভর্নমেণ্ট হাউসে ভি পি মেননের ঘরে চা-এর আসরে দশ-বার জন

সাংবাদিকও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতীয় এবং ইওরোপীয়, উভয় শ্রেণীর সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেবেন, এই উদ্দেশ্যেই ভি পি এই চা-এর অনুষ্ঠান করেছিলেন।

কাশ্মীরের মহারাজাকে দেখলাম। দেখে মনে হলো, তিনি যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন। কথাও বললেন খুব সামান্য। রাজধানী শ্রীনগর থেকে তিনি কিভাবে এবং কেমন ক'রে চলে আসতে পারলেন, সাংবাদিকেরা এই প্রশ্ন করলেও মহারাজা চুপ ক'রে রইলেন। উত্তর দিলেন অন্য এক রাজন্য-ভাই, নবনগরের জামসাহেব। যেন গোষ্ঠীগত সহানুভূতির আবেগে রাজন্য-গোষ্ঠীর এক ভ্রাতার মুখ-রক্ষার জন্য অনেক বাখান ক'রে এক কাহিনী শোনালেন জামসাহেব। কাশ্মীরের মহারাজার সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বললেন।

চা-এর আসর থেকে চলে আসার পর আমি কাশ্মীরের মহারাজার কথাই একবার চিন্তা ক'রে দেখলাম। জামসাহেব কাশ্মীর-মহারাজার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, জামসাহেব বড় বেশি পুরু পলেস্তারা দিয়ে এক রাজন্য-ভাইয়ের বহু ত্রুটির মলিনতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কাশ্মীরের মহারাজাকে দেখে মনে হলো, তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর মনের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি সদাসর্বদা অত্যন্ত তীব্রভাবে শুধু এই অভিযোগই ক'রে চলেছেন যে, তাঁর উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁর প্রাসাদও সরকারী কাজের জন্য দখল ক'রে নিয়েছেন। মহারাজা অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রাসাদ নিয়ে নেবার আগে গভর্নমেণ্ট তাঁকে চিঠি দিয়ে একবার জানাবার প্রয়োজনও উপলব্ধি করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন মহারাজা, এই অবস্থার প্রতিকার কোথায়? কার কাছে গেলে তিনি সুবিচার পাবেন? এই সব অসম্মানের হাত থেকে কে তাঁকে রক্ষা করবে? মহারাজার এই অভিযোগের কথা প্যাটেলকে জানিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে এইটুকু কথা মাত্র দিয়েছেন যে, তিনি এই বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, গতকাল মহারাজার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছে। কাশ্মীরের বিগত ঘটনাবলীর তাৎপর্য এবং তথ্য সম্বন্ধে মহারাজার সঙ্গে আলোচনা ক'রে মহারাজার মনের এক বিচিত্র অবস্থার পরিচয় পেয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন অনুযোগের সুরেই মহারাজাকে বলেছেন,—'বিগত জুন মাসেই আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ১৫ই আগস্টের আগেই আপনার মন স্থির ক'রে দুই ডোমিনিয়নের কোন একটি ডোমিনিয়নে যোগদান ক'রে ফেলা কর্তব্য। কিন্তু আপনি আমার সে পরমার্শ গ্রহণ করলেন না। তার ফলে কাশ্মীরের আজ এই অবস্থা।'

মহারাজা তাঁর সিদ্ধান্তহীনতারই পক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা ক'রে বললেন—"দেখতেই তো পাচ্ছেন, এতদিন দেরি ক'রেও ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ামাত্র হাঙ্গামা কি ভয়ানকভাবে দেখা দিল। যদি আরও আগে ভারতে যোগদান করতাম, তাহলে আরও কত বেশি ভয়ানক হাঙ্গামা দেখা দিত, সেটাই ভেবে দেখুন।"

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মহারাজা যদি যথাসময়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন, তাহ'লে পাকিস্থান এক পা'ও অগ্রসর হতে পারতেন না। তেমনি যদি যথা-সময়ে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার চুক্তিপত্রে তিনি স্বাক্ষর দান ক'রে ফেলতেন, তবে ভারতও কিছুই বলতেন না, কোন আপত্তি করতেন না। মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, প্যাটেল এবিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তো পূর্বেই ঘোষণা ক'রে রেখেছিলেন।

অচল অবস্থা

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে মঙ্কটন হায়দরাবাদ ছেড়ে লণ্ডনে চলে গিয়েছেন। লণ্ডন থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক পত্র লিখেছেন মঙ্কটন। নিজামের সঙ্গে মঙ্কটনের যে সব কথা হয়েছে, এই পত্রে তাই উল্লেখ ক'রে মঙ্কটন বলেছেন যে, চার দফা ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে রচিত মাউণ্টব্যাটেনের 'ফরমূলা' নিজাম মেনে নিতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। দিল্লীর এই ফরমূলার মধ্যে যে প্রস্তাব সম্পর্কে হায়দরাবাদ সবচেয়ে বেশি গোলমাল বাধাবে, সেটা হলো অবিলম্বে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। গভর্নমেণ্ট গঠনের পদ্ধতি নির্ণয় সম্পর্কেই সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে নিজাম যে অভিমত পোষণ করেন, তাতে ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসা শীঘ্র অথবা সহজে কখনই সম্ভবপর হবে না। তা ছাড়া, গণপরিষদ গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কেও নিজামের আপত্তি আছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে গণপরিষদ গঠন করতে রাজি হবেন না নিজাম, কারণ, তার ফলে গণপরিষদে হিন্দু প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ রকম হিন্দুপ্রধান গণপরিষদ গঠন নিজামের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর ব্যাপার। মঙ্কটন অবশ্য নিজামকে একটি বিষয় জোর দিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে যতদূর সাধ্য একটা প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট গঠন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মঙ্কটনকে আরও কিছুকাল উপদেষ্টা হিসাবে হায়দরাবাদে থাকবার জন্য অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন নিজাম, কিন্তু মঙ্কটন এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্কটন বলেছেন, হায়দরাবাদের বর্তমান গভর্নমেণ্টের বদলে নতুন গভর্নমেণ্ট স্থাপিত না হলে এবং নতুন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরামর্শ দানের দায়িত্বও আর পালন করতে সক্ষম হবেন না। বর্তমান গভর্নমেণ্ট যতদিন আছেন, ততদিন তাঁর পক্ষে উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত থাকার অর্থ নিজের বিচারবুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করা মাত্র।

দিল্লীতে আমরা সকলেই আশা করেছিলাম যে, মাউণ্টব্যাটেনের চার দফা প্রস্তাব সমর্থন ক'রে এবং গ্রহণ ক'রে নিজাম শীঘ্রই একটি ফারমান ঘোষণা করবেন। ফারমান ঘোষণা করতে অবশ্য নিজাম দেরি করেননি, গতকালই ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আশাটাই নিতান্ত অমূলক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। নিজাম এক কথাতেই চার দফা প্রস্তাবের সকল মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বাস্তব সার্থকতা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন।

নিজাম তাঁর ফারমানে এইটুকু মাত্র বলেছেন যে, হায়দরাবাদের বর্তমান অন্তর্বর্তী ও অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নেই, তাঁদের আহ্বান করা হবে গভর্নমেণ্টের মধ্যে যথাযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। এই উক্তির পর আর একটি উক্তিতে নিজাম যেন নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ এক মরণ-কামনার বশে তাঁর সেই পুরনো সাধের তত্ত্বটিই আর একবার ঘোষণা করেছেন— "অন্যত্র যে ধরনের গভর্নমেণ্ট যে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তারই হুবহু অনুকরণ ক'রে কোন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হায়দরাবাদে সম্ভবপর হতে পারে না। আমি এই আশঙ্কা পোষণ করি যে, বাইরের কোন গভর্নমেণ্টের গঠনতন্ত্রের অনুকরণ ক'রে

হায়দরাবাদে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে হায়দরাবাদের বাতাস ঠিক সে-রকমই বিষাক্ত হয়ে উঠবে, যে রকম বাইরের অন্যান্য স্থানে হয়ে উঠেছে।"

শত সদিচ্ছা নিয়েও মীমাংসার চেষ্টা করলে এই ধরনের নিজামী মনোবৃত্তির সঙ্গে কাজ করার আশা বৃথা, সাফল্য আশা করা বৃথা। কত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুর জন্য জেদ করতে গিয়ে নিজাম একটা বৃহৎ লাভের সম্ভাবনাকে কত সহজে উপেক্ষা করতে পারছেন, এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদ ক্রমশ আরও উত্তেজনার কারণ ঘটিয়ে চলেছে। হায়দরাবাদে সীমানা অঞ্চলে উপদ্রব ও হাঙ্গামা খুব বেশি ক'রেই চলছে। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যাদের মাথা আগেই গরম হয়ে উঠেছিল, তাদের মনের ধূমায়িত জ্বালা এখন বস্তুত শিখায়িত হয়ে উঠছে। গত শনিবার বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার একটি রিপোর্ট আজ হাতে এসেছে। নেহরু বলেছেন—"হায়দরাবাদের সম্মুখে এখন মাত্র দুটি পথ খোলা পড়ে রয়েছে, রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধ। এই দুই পথের মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়া ছাড়া হায়দরাবাদের এখন আর অন্য কোন পথ নেই।' নেহরুর এই উক্তিতে ভারতের রাজনৈতিক উত্তাপের মাত্রা এখন একেবারে স্ফুটনাঙ্কে গিয়ে উঠেছে।

সংবাদপত্রে নেহরুর বক্তৃতার এই বিবরণ যেদিন প্রকাশিত হয়েছে, সেদিন মাউণ্ট-ব্যাটেনের চোখে এই সংবাদটি পড়েনি। পরের দিন সংবাদটি পাঠ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বস্তুত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধ'—এই শিরোনামা দিয়ে নেহরুর বক্তৃতার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় দিল্লীর বাইরে ছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। দিল্লীতে ফিরে এসেই তিনি নেহরুর কাছে জানতে চাইলেন, এ রিপোর্ট কি সত্য?

নেহরু যেমন বিস্মিত তেমনি বিড়ম্বিত হলেন। নেহরু বললেন যে, তাঁর বক্তৃতার সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধের কোন উল্লেখই করেননি। ভুল রিপোর্ট প্রচারিত হবার মূল কারণ হলো জনৈক মাদ্রাজী স্টেনোগ্রাফারের ভুল, যিনি রিপোর্ট লিখবার সময় নেহরুর হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার অর্থই ধরতে পারেননি।

নেহরু বলেছিলেন যে, পরের দিন এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান ক'রে তিনি এই ভুল রিপোর্টের প্রতিবাদ ক'রে এবং তাঁর প্রকৃত বক্তব্য সুস্পষ্ট ক'রে একটি বিবৃতি দেবেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে, তবুও কোন সাংবাদিক সম্মেলন আহূত হতে দেখা গেল না এবং নেহরুও ভুল রিপোর্টের সংশোধন ক'রে কোন বিবৃতি দিলেন না। সংবাদ-জগতে এটা একটা কুৎসিত সত্য যে, কোন মিথ্যা সংবাদ একবার প্রচারিত হয়ে গিয়ে জনসাধারণের মনে যে ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, সে ধারণা পরবর্তী বহু প্রতিবাদেও সমূহভাবে দূরীভূত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ প্রচারিত হলেও মিথ্যা ধারণার বড় জোর দশ ভাগের এক ভাগও দূরীভূত হয় কি না সন্দেহ। ওদিকে হয়াদরাবাদে মীর লায়েক আলিও আইন পরিষদে একটি বড় বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের চার-দফা প্রস্তাবের কোন উল্লেখই করেননি। লায়েক আলির এই কীর্তিতে শুধু এইটুকু মাত্র 'লাভ' হতে পারে যে, নিজামের ফারমানের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে দিল্লীর মন হতে বিশ্বাসের অবশেষটুকুও এইবার ক্ষয় হয়ে যাবে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৪ঠা মে, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদের অচল অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন খুব বেশি উদ্বেগ বোধ করছেন। আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকি আছে, তার পরেই রাজগোপালাচারীর হাতে এই বিরাট রাষ্ট্রের গভর্ণর-জেনারেলের সকল দায়িত্ব অর্পণ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন স্বদেশে প্রস্থান করবেন। মাউণ্টব্যাটেনের মনের ইচ্ছা, যাবার আগে হায়দরাবাদ-সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান ক'রে দিয়ে খুশিমনে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। সময় খুবই কম এবং সেই জন্যই শেষবারের মতো একটা চেষ্টা করতেই হবে। ভারত গভর্নমেণ্ট এবং নিজাম, উভয়েরই এখন বোঝা উচিত যে, সময় আর বেশি নেই। মতভেদের সব ব্যাপার এখন খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলার জন্য দুই পক্ষেরই বিশেষভাবে উদ্যোগী হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারছেন না, কেমন ক'রে কি ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন। কিভাবে কাকে বুঝিয়ে প্রভাবিত করতে পারলে সবচেয়ে বেশি কাজ হবে? মঙ্কটনও এখন আর নেই, সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন আরও বেশি অসুবিধায় পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি নিজামকে শেষবারের মতো সতর্ক ক'রে দিয়ে এক পত্র দেবেন। কিন্তু আমি আপত্তি করেছি। আমি বলেছি, অন্যভাবে চেষ্টা করার সকল উপায় পরীক্ষা না ক'রে এখনই এই ধরনের শেষ-পত্র দিয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত হবে না। অন্যভাবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবেই শেষ-পত্র দেওয়া অথবা সতর্ক ক'রে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তার আগে নয়। নিজামকে দেবার জন্য 'শেষ-পত্রের' একটা খসড়াও রচনা ক'রে ফেলেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আমি বলেছি, যে ধরনের ভাষায় এবং যে সব যুক্তি ও বক্তব্য উল্লেখ ক'রে এই পত্র রচনা করা হয়েছে, সেটা বর্তমানে ভারত ও হায়দরাবাদের পারস্পরিক মনোভাব আরও ক্ষুণ্ণ করতেই সাহায্য করবে। এটা ভুল পন্থা।

হিজ এক্সেলেন্সির কূটনীতিক দক্ষতার ও সাফল্যের সবচেয়ে বেশি পরিচয় তখনই পাওয়া যায়, যখন তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এটা মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমার মতে এখন নিজামের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের একটা সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাতে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করলে মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে প্রভাবিত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে যেতে চাইবেন না। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের আপত্তি যে খুবই যুক্তিসঙ্গত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় নিজামকে দিল্লীতে আনিয়ে আলোচনা করাই একমাত্র পন্থা। আমি প্রস্তাব করেছি, আলোচনা সম্বন্ধে কোন রকম সর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা আরোপ না ক'রে নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করা হোক।

মাউণ্টব্যাটেন আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। ভি পি বললেন, নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করলে নিজাম প্রত্যুত্তরে মাউণ্টব্যাটেনকেই হায়দরাবাদে যেতে আমন্ত্রণ করবেন। নিজাম এর আগেও মাউণ্টব্যাটেনকে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এখন আর একবার নতুন ক'রে আমন্ত্রণ করবেন। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি আছেন, এটা প্রমাণিত হবার পর নিজামের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার কোন যুক্তি মাউণ্টব্যাটেনের আর থাকবে না। ভি পি অবশ্য স্বীকার করলেন যে, একটা যুক্তি অবশ্য পাওয়া যাবে। মাউণ্টব্যাটেনের হাতে সময় এখন খুব কম,

আর ছয় সপ্তাহ পরেই তাঁকে চলে যেতে হবে—এই যুক্তি দেখিয়ে মাউণ্টব্যাটেন এখন হায়দরাবাদে যাবার জন্য নিজামী আমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে পারবেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির বর্তমান অবস্থার কতগুলি সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। দেশীয় রাজ্যগুলির পরিণামের আর এক অধ্যায় শুরু হয়েছে। আগে হয়েছে রাষ্ট্রভুক্তি, এবার শুরু হয়েছে সমতন্ত্রসাধন। সমগ্র ভারতের সঙ্গে একই শাসনতন্ত্রের অধীনস্থ হয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতোই পরিচালিত হবে, প্যাটেলের প্রতিভা হতে উদ্ভাবিত রাষ্ট্রীয় সংহতির এই পরিকল্পনা অনুসারে ভি পি'ও তাঁর প্রবল কর্মশক্তি ও উৎসাহের আবেগে কাজ ক'রে চলেছেন। একের পর এক সাফল্যের পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছেন। বিহার ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ক'রে পরিকল্পনার প্রথম সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পূর্ব-পাঞ্জাবের সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর একটি পদ্ধতি হলো, একই অঞ্চলের পরস্পরসংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে এক একটি রাজ্য ইউনিয়ন গঠন। ইউনিয়নগুলি সাধারণ প্রদেশের মতোই কেন্দ্রের সঙ্গে একই নিয়মতন্ত্রের সম্পর্কে যুক্ত হয়ে থাকবে। এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে মালব ইউনিয়ন, মৎস্য ইউনিয়ন, শিখরাজ্যগুলিকে নিয়ে পাতিয়ালা ইউনিয়ন, রাজস্থান ইউনিয়ন, সৌরাষ্ট্র ইউনিয়ন প্রভৃতি। মধ্যভারতের ভোপাল শুধু কোন ইউনিয়নের মধ্যে না গিয়ে ভিন্নভাবে রাজ্যে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন।

আজ আবার আর এক পদ্ধতির কথা শুনলাম। কচ্ছ নামে দেশীয় রাজ্যকে সোজাসুজি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টেরই পরিচালনাধীন করা হয়েছে। যতদূর বুঝেছি. দেশরক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সীমান্তবর্তী এই দেশীয় রাজ্যটিকে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনে নিয়ে আসা হয়েছে।

কোনই সন্দেহ নেই, তাঁরা এক অত্যুচ্চ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ও রাষ্ট্রসংগঠনী প্রতিভার সার্থক পরিচয় দিতে পেরেছেন, যাঁরা দেশীয় রাজ্যগুলিকে এইভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত ক'রে ফেলতে পারলেন। ঐতিহ্যগত রীতির বড় রকম কোন ওলট-পালট না ক'রেও কত বড় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন কত সহজে হয়ে গেল!

মাউণ্টব্যাটেন অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করছেন যে, এ ব্যাপার এতটা সহজে ও স্বচ্ছন্দে হবে বলে তিনি আগে কল্পনাও করতে পারেননি। রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে উল্লিখিত তিনটি ক্ষমতার বিষয় ছেড়ে দেবার পর দেশীয় রাজ্যগুলি যে অন্যান্য ক্ষমতার বিষয়গুলিও এত শীঘ্র ছেড়ে দিতে পারবেন, পূর্বে এতটা ধারণা ক'রে উঠতে পারেননি মাউণ্ট-ব্যাটেন। এটাও তাঁর কখনো মনে হয়নি যে, রাষ্ট্রভুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষমতার সকল বিষয় নিজের হাতে নিয়ে নেবার জন্য ভারত সরকারের দিক থেকেও এত শীঘ্র প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

এবিষয়ে স্যার আর্চিবল্ড নাই-এর অভিমত আমাদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। নাই বলেছেন—দেশীয় রাজ্যগুলিই যে কত বড় একটা সমস্যা, এটা ভারতের বাইরে কারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ নেতৃত্ববৃন্দ, শুধু এই তিন পক্ষের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার ব্যাপারটাকেই কঠিন সমস্যার ব্যাপার বলে সকলেই মনে করেছিলেন। কারও মনে হয়নি যে, দেশীয় রাজ্য নামে আর একটি যে পক্ষ আছে, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করা কত দুঃসাধ্য। নাই বললেন, তিনি বস্তুত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে বন্ধু-

ভাবে কোন নিষ্পত্তি সম্ভবপর হতে পারে। পনরই আগস্টের পরে দেশীয় রাজন্যেরা প্রচণ্ডভাবে এবং মাত্রাছাড়া রকমের একটা গোলমাল বাধাবেন বলেই তিনি মনে করে-ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যেই 'দেশীয় রাজ্য' নামে সমস্যাটার যে সমাধান হয়ে গেল, সেটা হতে যদি একপুরুষের আয়ুও পার হয়ে যেত, তবুও তিনি বিস্মিত হতেন না। নাই বলেছেন, এ ঘটনা ইতিহাসে একটা কীর্তিরূপেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজকের আলোচনা-সভায় শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হলো, নিজামকেই দিল্লীতে আসবার জন্য অনুরোধ করবেন মাউণ্টব্যাটেন। নিমন্ত্রণপত্রও রচনা করা হলো। নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে আমি চললাম কিংসওয়েতে অবস্থিত হায়দরাবাদ হাউসে, যেখানে অতিমান্য নিজামের এজেণ্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ অবস্থান করছেন।

কিংসওয়ের প্রান্তে অবস্থিত হায়দরাবাদ হাউসে প্রবেশ ক'রেই প্রথমে বিরাট এক ড্রইংরুমের অভ্যন্তরে গিয়ে বসলাম। ড্রইংরুমের দরজা ও জানালার পর্দা গোটানো ছিল। চোখে পড়ল, একটু দূরেই রয়েছে নিজামের দুই সুন্দরী পুত্রবধূর দুটি বড় ফটোগ্রাফ। নিজামের এই পুত্রবধূ দু'জনের মধ্যে একজন হলেন তুর্কীর খলিফার কন্যা এবং আর একজন হলেন নিকটসম্পর্কে খলিফার ভগিনী। সুতরাং এই দুটি ফটোকে অতিমান্য নিজামেরই আভিজাতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলতে পারা যায়। ইসলামীয় ধর্মতন্ত্রের এবং বংশগত মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য নিজাম কতখানি আগ্রহ পোষণ করেন, খলিফার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের দ্বারাই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন জইন ইয়ার জঙ্গ ও তাঁর এক ছেলে। ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনজনে এক টেবিলে চা খেলাম। জইন ইয়ার জঙ্গকে অত্যন্ত মার্জিতরুচি ও সৌজন্যশীল মানুষ বলেই মনে হলো। ইত্তেহাদ-সুলভ গোঁড়ামির কোন চিহ্ন তাঁর আচরণে অন্তত পেলাম না। ইত্তেহাদী অভিসন্ধির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে, এরকম কোন ধারণা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। অথচ এটা জানি যে, ইত্তেহাদ দল জইন ইয়ার জঙ্গকে বিশ্বাস করেন এবং নিজামের উপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক কথাই মনে আসে, কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানে ধারণা করাই উচিত।

নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ এবং নিজামের দিল্লী আসবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার যা বলবার ছিল, সবই জইন ইয়ার জঙ্গের কাছে বললাম।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না জইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি উত্থাপন করলেন পথের অসুবিধার কথা: হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী অনেক দূর। যদি এই দূরপথের যাত্রায় নিজামের জন্য যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে কি ক'রে দিল্লীতে আসবেন নিজাম? জইন ইয়ার জঙ্গ বললেন, নিজামকে দিল্লীতে আনতে হলে ট্রেণে তাঁর জন্য বিশেষ একটি ঠাণ্ডা কামরা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে তিনি ট্রেণে আসতে চাইবেন না। বিমানযোগে আসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ অতিমান্য নিজাম বিমান সম্বন্ধে নিছক ঘৃণাই পোষণ করেন। হায়দরাবাদে নিজাম এখনো তাঁর সেই পুরনো ১৯১০ মডেলের রোল্‌সে চড়েই যাতায়াত ক'রে থাকেন।

জইন ইয়ার জঙ্গ প্রস্তাব করলেন, দিল্লীর বদলে বোম্বাইয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও নিজামের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক। এক পক্ষ দিল্লীকেই সাক্ষাতের স্থান হিসাবে পছন্দ করছেন, আর এক পক্ষ পছন্দ করছেন হায়দরাবাদকে। এই অবস্থায়

দু পক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে আপোষ হিসাবে বোম্বাই শহরই সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করছেন জইন ইয়ার জঙ্গ। তাছাড়া আর একটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছেন জইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি বললেন, এই সাক্ষাৎকারের সময় মঙ্কটনের একবার লণ্ডন থেকে না আসলেই চলবে না। মঙ্কটনের অনুমোদন চাই এবং উপস্থিতি চাই। মঙ্কটনকে ফিরে এসে আর একবার বৃদ্ধ নিজামের হাত ধরতে হবে। শেষ পর্যন্ত জইন ইয়ার জঙ্গ এইমাত্র আশ্বাস দিলেন যে, নিজাম হয়তো মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ অনুযায়ী দিল্লী আসতে রাজি হবেন। এ বিষয়ে তিনি একেবারে 'সম্পূর্ণরূপে আশাহীন' নন।

গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এসে জইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার আলোচনার মর্মার্থ মাউণ্টব্যাটেনকে জানালাম। বোম্বাইয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থার প্রস্তাব পছন্দ করলেন না মাউণ্টব্যাটেন। ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যেভাবে যোগসূত্র রক্ষা ক'রে গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকে কাজ করতে হয়, বোম্বাইয়ে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলে সেই দিক দিয়ে অনেক অসুবিধার ব্যাপার দেখা দেবে বলে মনে করছেন মাউণ্টব্যাটেন।

স্টাফের অভিমত জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। বোম্বাইয়ে যাবার প্রস্তাব বাদ দিয়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে নিজামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে কি না?

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৯ই মে, ১৯৪৮ সাল : ভের্ননের কাছ থেকে আজ জানতে পেলাম যে, মাউণ্টব্যাটেন, ভি পি মেনন এবং জইন ইয়ার জঙ্গ একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকের পর শুধু ভি পি ও জইনের মধ্যে একটি আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। আজই সন্ধ্যায় জইন হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছেন নিজামের উত্তর নিয়ে।

নিজামের উত্তর পেয়ে বিস্মিত হননি মাউণ্টব্যাটেন, কারণ তিনি যা অনুমান করেছিলেন, তাই হয়েছে। গত ৬ই মে তারিখেই এক টেলিগ্রামে নিজাম মাউণ্ট-ব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জইন ইয়ার জঙ্গ নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তাতে সেই পাল্টা-আমন্ত্রণের প্রস্তাবই আরও স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করা হয়েছে। টেলিগ্রামটি ৬ই মে তারিখের এমন এক সময়ে হায়দরাবাদ থেকে ছেড়েছিলেন নিজাম, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদে পেঁছিবার আগে তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বোঝা যায়, একটা প্রমাণ তৈরী ক'রে রাখবার জন্যই ৬ই মে তারিখের টেলিগ্রামটি বিশেষ একটি সময়ে প্রেরণ করেছেন নিজাম। মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে হায়দরাবাদযাত্রী জইন ইয়ার জঙ্গ যখন বিমান পথে ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ জইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদ পেঁছিবার আগেই নিজাম এই টেলিগ্রাম করেছেন। এর দ্বারা নিজাম এই তথ্য তৈরী ক'রে রাখলেন যে, তিনি সত্য সত্যই 'পাল্টা আমন্ত্রণ' করেননি, মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার আগেই স্বাভাবিক আগ্রহে মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদের অতিথিরূপে দেখবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জইন ইয়ার জঙ্গ যে চিঠি এনেছেন, তাতে দেখা গেল যে, দিল্লীতে আসবার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'না' জানিয়ে দিয়েছেন। নিজাম বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং দিল্লীতে উপস্থিত হলে 'হায়দরাবাদে এবং হায়দরাবাদের বাইরে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে এবং তিনি এইরকম ভুল ধারণা সৃষ্টির সুযোগ না দিতেই বাধ্য।'

ভের্নন বললেন, মাউণ্টব্যাটেন এই চিঠি পেয়েও এখনো তাঁর 'পরাজয়' স্বীকার

করছেন না। এখনো মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই বিশ্বাস টগবগ করছে যে, নিজামকে একবার মুখোমুখি পেলে তিনি অবশ্যই রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে নিজামকে রাজি করাতে সমর্থ হবেন।

জইন এসে এই খবরও দিয়েছেন যে, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা সুস্পষ্ট-ভাবেই আরও খারাপের দিকে চলেছে। হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের বহু সমর্থক এখন রাজাকরদের সমর্থক হয়ে পড়েছে। মীর লায়েক আলির বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হতে চলেছিল, কিন্তু কোনগতিকে সে প্রস্তাবের উত্থাপন বন্ধ করা গিয়েছে। জইন বলেছেন, এখন হায়দরাবাদের অনেকের মন এমন চরমপন্থী হয়ে উঠেছে যে, কাশিম রেজভিকেও তারা আপোষবাদী নরমপন্থী বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে। ভি পি মেনন শান্তভাবেই জইন ইয়ার জঙ্গের সব কথা শুনেছেন। হায়দরাবাদের দাবীর যেসব কথা শুনতে পেলেন ভি পি, সে সম্বন্ধেও সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় তিনি দিলেন। তিনি হায়দরাবাদকে কতগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধার অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে, এমনকি উপকূলভাগে বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য হায়দরাবাদকে পথ দেবার প্রস্তাব সম্বন্ধেও আপত্তি করলেন না। ভি পি বলেছেন, হায়দরাবাদকে এই ধরনের সুবিধা ও অধিকার দিতে তিনি রাজি আছেন।

ভের্নন বললেন, হায়দরাবাদ ক্রমেই একটা বিপজ্জনক পরিণামের হেতু পুঞ্জীভূত ক'রে তুলছে। এমন এক অবস্থার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি, যেখানে গিয়ে মাত্র দু'টি পথ ছাড়া আর কোন পথ পাওয়া যাবে না। হয় বলপ্রয়োগ করতে হবে, কিংবা বলপ্রয়োগের শাসানি দিতে হবে—এই দুই পথ।

আমি সমস্যার একটা ভিতরের ব্যাপার যা বুঝেছি, ভের্ননকে তারও খানিকটা আভাস দিলাম। হায়দরাবাদের এই সব ব্যাপার দেখে আমার মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হায়দরাবাদের প্রকৃত প্রভু কে? হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার এখন কার হাতে? নিজামের অবস্থাই বা কি? সত্য সত্যই কি তিনি এখনো রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা রাখেন?

আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নিজাম তাঁর নিজের সম্পর্কেই বা কি ধারণা পোষণ করেন? তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং রাজ্যের বাইরের জনমতে তিনি কতখানি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন? এসব বিষয়ে নিজাম তাঁর মনে যে ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন, সেটাই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি। নিজামের এই আত্মধারণাগুলিকে সোজা উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। ব্যক্তিগতভাবে নিজামের গুরুত্বটুকু লাঘব ক'রে দেবার চেষ্টা না ক'রে বরং তাঁর রাজনৈতিক মূল্য স্মরণে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, নিজাম এখন বস্তুত অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, মীর লায়েক আলিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য নিজামকে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই অনুরোধ শুনে নিজাম মনঃক্ষুণ্ণ হননি, রাগও করেননি। নিজাম শুধু পাল্টা প্রশ্ন করেছেন—তাহ'লে প্রধান মন্ত্রী হবেন কে? কাকে ওঁরা চাইছেন?

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১০ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনার কোন উপায় উদ্ভাবন করা স্টাফের পক্ষে খুবই কঠিন, কারণ স্বয়ং নিজামই এখন কি অবস্থায় আছেন, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য

স্টাফের জানা ছিল না। জানা সম্ভবপরও হচ্ছে না। নিজাম সত্য সত্যই নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা এখনো রাখেন কি না, অথবা পরের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতের ক্রীড়নকে মাত্র পরিণত হয়েছেন কি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করাও সম্ভবপর হবে না। আমি ও ভের্নন দুজনেই এ বিষয়ে একমত হয়ে বলেছি যে, বর্তমান হায়দরাবাদের রাজনীতিতে নিজামের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়টুকু সঠিকভাবে না জানতে পারলে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের সাক্ষাতের কোন উপায় নির্ণয় করা যাবে না।

মাউণ্টব্যাটেন ও নিজামের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয়েছে, তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই বোঝা গিয়েছে যে, আবার একটা অচল অবস্থার মধ্যেই এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। দিল্লীর আমন্ত্রণ নানা তুচ্ছ অজুহাতে উপেক্ষা করেছেন নিজাম, এর পর মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে দিতে কখনই রাজি হবেন না ভারত গভর্নমেণ্ট। তাছাড়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও এরই মধ্যে তাদের সংবাদ সংগ্রহের সুবিস্তৃত সূত্রজালের সাহায্যে জেনে ফেলেছেন যে, নিজামকে দিল্লীতে আনবার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টার সমগ্র কাহিনীই এখন সর্বজনবিদিত তথ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন যদি হায়দরাবাদে যান, তবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই নিজামকে তোষণ করবার একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলেই লোকের মনে ধারণা হবে।

আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফেরই কাউকে যদি 'ইংলণ্ড-নৃপতির দূত' গোছের একটা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দিয়ে হায়দরাবাদে প্রেরণ করা হয়, তবে কাজ হতে পারে। গভর্নর-জেনারেল হিসাবে নয়, ইংলণ্ড-নৃপতির ভ্রাতা মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্টাফেরই কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে নিজামসকাশে উপস্থিত হবার অধিকার দেবেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই ব্যক্তিগত প্রতিনিধি যথোপযুক্ত ও প্রামাণ্য পরিচয়-পত্র মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন, যার ফলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে নিজামের মনে কোন দ্বিধা বা আপত্তির কারণও থাকবে না। মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতে যেসব কথা মন খুলে বলতে পারতেন নিজাম, মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির কাছেও তাই বলতে পারবেন, এই ধরনের অনুরোধসম্বলিত একটি পত্র মাউণ্টব্যাটেন যদি প্রতিনিধির সঙ্গে দিয়ে দেন। বর্তমানের এই বিপজ্জনক অচল অবস্থাকে কিছুটা সচল করে তুলতে পারা যাবে, যদি মাউণ্টব্যাটেনের এই ধরনের কোন ব্যক্তিগত প্রতিনিধির সঙ্গেই নিজামের আলোচনার একটা ব্যবস্থা করা যায়।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে আমরা এই নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। প্রস্তাব অনুমোদন করলেন মাউণ্টব্যাটেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ইচ্ছাও জানিয়ে দিলেন যে, ক্যাম্বেল জনসনকেই এই অভিনব 'রাজার দূতের' ভূমিকায় কাজের ভার নিতে হবে।

'রাজার দূতের' পরিচয়-পত্রের খসড়া রচনা করবার জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। মাউণ্টব্যাটেন বলে গেলেন, তিনি নেহরু এবং জইন ইয়ার জঙ্গকে এই ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দেবেন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি আরও কিছু আলোচনা করবার থাকে, তবে সেসবও তাঁদের দুজনের সঙ্গে তিনি আলোচনা ক'রে রাখবেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ১২ই মে, ১৯৪৮ সাল : সকলেরই অভিমত এই যে, আর দেরি করা উচিত হবে না, আমাকে অবিলম্বে হায়দরাবাদে যেতে হবে। মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রতিনিধিরূপে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং মুখোমুখি বসে আলোচনা ক'রে বুঝে নিতে হবে হায়দরাবাদের অবস্থার ভিতরের রহস্যটা কি। আরও একটা দায়িত্ব চেপেছে আমার উপর। যদি সম্ভবপর হয়, তবে নিজাম ও

তাঁর পরামর্শদাতাদের মনে একটি বাস্তব সত্যের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। এই রকমের অচল অবস্থা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ভারত সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনা আরম্ভ করবার একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে। নিজামকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মাউণ্টব্যাটেন মাত্র আর কয়েক সপ্তাহ ভারতে আছেন এবং তাঁর অবস্থিতির এই শেষ কয়েকটি দিনের সুযোগ নিজাম ইচ্ছা করলেই ভালভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং ইচ্ছা করাই উচিত।

আজ সকালে আমাদের স্টাফের বৈঠকে আমার হায়দরাবাদ যাত্রার প্রস্তাব খুবই আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করলেন ভি পি। সমস্যাগ্রস্ত হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি তথ্যও ভি পি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এখন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, হায়দরাবাদে রাজাকর দল ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মিতালী হয়েছে। এই দুই দল এখন ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে, অথচ হায়দরাবাদের ঘটনাবলীর এই নতুন ব্যাপারটির প্রতি এখনো যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করার মতো মনোভাব কারও বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে না। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করতেই পারছেন না যে, রাজাকর দলে এবং কম্যুনিষ্ট দলে কোন মিতালী আদৌ সম্ভবপর। কিন্তু ভি পি জোর দিয়েই বললেন যে, ঘটনা সর্বাংশে সত্য। ভি পি'র মতে, রাজাকর দল ও কম্যুনিষ্ট দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকেই এখন হায়দরাবাদ-সমস্যার আসল সমস্যা বলে মনে করতে হবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মে, ১৯৪৮ সাল : শেষপর্যন্ত দেশরক্ষা কমিটির একটা বৈঠক আহ্বান করতে পেরেছেন মাউণ্টব্যাটেন। এই বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন কথায় কথায় এমন এক প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, যখন নেহরু নিজ মুখেই আর একবার সেই প্রতিশ্রুতির কথাই নতুন ক'রে বললেন, যেটা তিনি আগেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একবার বলেছিলেন। বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং আমি এইবার স্বকর্ণেই শুনবার সুযোগ পেলাম যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রার প্রস্তাব নেহরু খুশিমনেই সমর্থন করেছেন। নেহরু বললেন, নিজাম যদি ভারতের রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন, তবে নিজামকে রক্ষা করবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের যথাশক্তি সকল ব্যবস্থাই করবেন। নিজামের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থার দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করবেন। আমিও হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার যে অভিমতের খসড়া রচনা ক'রে গভর্নর-জেনারেলকে দিয়েছি, তাতে এই সম্ভাবনার দিকটাও আলোচনা করেছি। নিজাম এখন নিজেই তাঁর নিজের ঘরের মালিক নন, এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। মনে হচ্ছে, এখন তিনি নিজেই নিজের ঘরে বন্দীর মতো অবস্থায় রয়েছেন, ঘরের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। খুব সম্ভব গোপনে অথচ স্বচ্ছন্দে একটা 'প্রাসাদ-বিপ্লব' ঘটাবার ষড়যন্ত্র চলছে। নিজাম শীঘ্রই তাঁর নিজের লোকের ষড়যন্ত্রের ফলেই প্রভুত্ব হারিয়ে একরকমের বন্দিদশা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন অনুমান ভিত্তিহীন নাও হতে পারে।

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠক শেষ হবার পর নেহরুর কাছ থেকে আরও কিছু পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে একই মোটরে বের হলাম। নেহরু বললেন যে, তিনি কয়েকটি 'সাধারণ উপদেশ' ছাড়া এ বিষয়ে বিশেষভাবে আর কিছু বলতে ইচ্ছা করেন না। নেহরু বললেন, অশান্তিকে কোনমতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই অনেক সময় অশান্তিকেই এগিয়ে আনবার আসল কারণ হয়ে ওঠে। নেহরু আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলে দিলেন যে, হায়দরাবাদ সীমান্তে প্রতিদিন যেসব হাঙ্গামা ঘটে

চলেছে, সেসব এইভাবে চলতে দেওয়া আর সম্ভবপর নয় এবং গুলী ক'রে মানুষ খুন করবার ঘটনাগুলিকে চুপ ক'রে শুধু তাকিয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না।

গভর্নমেণ্ট হাউসে ফিরে এসে দেখলাম, মাউণ্টব্যাটেন ও ভি পি এখনো আলোচনা করছেন। মাউণ্টব্যাটেন খুবই আশা পোষণ করছেন যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রা সুফলপ্রসূ হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন,—আপনাকে হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টেরই অতিথি হিসাবে যেতে হবে। হায়দরাবাদে আপনি যেখানে থাকবেন ও যেখানে যেতে ইচ্ছা করবেন, তার ব্যবস্থা সবই হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট ক'রে দেবেন, এবং আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

বিকালের শেষ দিকে বেলা পাঁচটার সময় হায়দরাবাদ হাউসে গিয়ে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য জইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলাম। জইন ইয়ার জঙ্গ ও তাঁর ছেলে আলি খাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। জইন বললেন—সবই ভাল হবে যদি ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের দাবী নিজামের উপর চাপাবার জন্য বেশি বাড়াবাড়ি অথবা জোরজার না করেন।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৪ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি-রূপে আগামী কাল আমাকে হায়দরাবাদ রওনা হতে হবে। আজ আবার জইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলাম এবং কতগুলি বিষয় শেষবারের মতো আলোচনা ক'রে তাঁর চূড়ান্ত অভিমতও জেনে নিলাম। জইন জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদে আমি যতদিন থাকব, ততদিন মীর লায়েক আলির ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে আমাকে থাকতে হবে। আমি কবে হায়দরাবাদ রওনা হব, সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন আলোচনা হলো না, কারণ এই প্রসঙ্গই আমি উত্থাপন করলাম না। আমার হায়দরাবাদ যাত্রার জন্য কোন ধরাবাঁধা তারিখ এবং সময়ের প্রস্তাবও করলেন না এজেণ্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি আমার আগেই হায়দরাবাদে পেঁছে যাবেন বলে আশা করছেন। যদিও তিনি জানেন না যে, আমি কবে হায়দরাবাদে পেঁছে যাচ্ছি।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে যে পত্র নিয়ে আমি নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি সে পত্রে মাউণ্টব্যাটেন বলেছেন যে, অতিমান্য নিজাম দিল্লীতে আসবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় মাউণ্টব্যাটেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। একথাও মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন যে, তাঁর পক্ষে হায়দরাবাদ যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, কারণ এখন হায়দরাবাদ যাবার মতো সময় ও সুযোগ তাঁর হাতে আর নেই। মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন—"কিন্তু ভারত থেকে যাবার আগে আমি আপনার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। সরকারীভাবে চিঠিপত্রের বিনিময়ের দ্বারা বা অন্য কোন মামুলী পদ্ধতির আলোচনার দ্বারা পরস্পরের বক্তব্য জানবার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তাই আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্যাম্বেল জনসন যাচ্ছেন। তিনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আমার ধারণা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন।"

পত্রের উপসংহারে মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন—"হায়দরাবাদের কম্যুনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্পর্কে নানাবিধ ঘটনার যে সংবাদ প্রতিদিন দিল্লীতে আসছে, তাতে আমি নিতান্ত উদ্বেগ বোধ করছি। আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছি এই কারণে যে, কম্যুনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয়ই আপনার পদমর্যাদা ও স্বার্থের বিশেষ ব্যাঘাতের হেতু হয়ে উঠছে। সুতরাং আমি আশা করি যে, আপনি অকুণ্ঠভাবে আপনার মনের কথা ও বক্তব্য ক্যাম্বেল

জনসনের কাছে বলবেন। বর্তমান সমস্যা ও অবস্থা সম্বন্ধে আপনি নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে কি ভাবেন, সাধারণভাবেই বা কি বলবার আছে, সবই আপনি জানিয়ে দেবেন। আমি ক্যাম্বেল জনসনকে বলে দিয়েছি যে, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারও কাছে আমার এই ব্যক্তিগত অনুরোধ যেন তিনি উপস্থাপিত না করেন। আমার জিজ্ঞাস্য একমাত্র আপনারই কাছে, এবং একমাত্র আপনারই ব্যক্তিগত বক্তব্য আমি জানতে চাই। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে এর মধ্যে আনবেন না, কারণ তা হলে আমার ও আপনার এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুন্ন হবে।"

নিজাম সকাশে

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল : প্রাতঃরাশের অল্পক্ষণ পরেই উইলিংডন বিমানক্ষেত্রে এসে একটি ডাকোটায় উঠলাম। হায়দরাবাদে এসে পৌঁছেছি মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের সামান্য কিছুক্ষণ আগে। মাঝে ভোপালে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য একবার নেমেছিলাম।

হায়দরাবাদের বিমান ময়দানে নেমেই দেখি যে মীর লায়েক আলির পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন বেগ উপস্থিত হয়েছেন। আর আছেন মুন্সীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর স্টাফের তিনজন ভারতীয় অফিসার। মুন্সীর প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ জানালেন। এঁরা বেশ জোর দিয়েই দাবী করলেন যে, বিমান ময়দান থেকে এখন আমার পক্ষে সোজা এবং সবার আগে মুন্সীর ভবনে গিয়েই ওঠা উচিত। আজ সন্ধ্যায় মুন্সীর ভবনেই আমাকে আহার করতে হবে, এই দাবীও তাঁরা জানালেন। হায়দরাবাদের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র আমাকে এক জটিল কূটনীতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হলো। দু'পক্ষই নিমন্ত্রণ করছেন এবং এই দুই নিমন্ত্রণই বস্তুত রাজনৈতিক টানাটানির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকেও তিন মিনিটের মধ্যে মনে মনে আমার কূটনীতিক সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলতে হলো। আমি বললাম, হায়দরাবাদে এখন আমি মীর লায়েক আলির ব্যক্তিগত অতিথি এবং যতক্ষণ না আমি জানতে পারি তিনি এখানে আমার থাকবার কি ব্যবস্থা করেছেন, ততক্ষণ আমি অন্য কারও ভবনে থাকবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না। অবশ্য একথাও আমি জানিয়ে দিলাম যে, মুন্সীর সঙ্গে আমি দেখা করব।

মুন্সী ক'দিন আগে বাঙ্গালোরে ছিলেন। আমি হায়দরাবাদে পৌঁছবার আগেই তিনি হঠাৎ বাঙ্গালোর থেকে হায়দরাবাদে উপস্থিত হয়েছেন। মনে হচ্ছে, আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যাপারের জন্যই তিনি এই সময় বাঙ্গালোর থেকে এখানে চলে এসেছেন। সুতরাং, এটা অনুমান করতে পারি যে, আমার হায়দরাবাদে আসবার ব্যবস্থার কথা তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন। বুঝতে পারছি, হায়দরাবাদে আমার গোপন দৌত্যের এত গোপন ব্যবস্থার কথাও চারদিকে রটে গিয়েছে। আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যাপার একটা মস্ত বড় সংবাদ সৃষ্টি করুক, এটা আমি চাইনি। বরং, আশা করেছিলাম যে, আমি নিঃশব্দে আমার দৌত্যকার্য লোকচক্ষুর সেরে নিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে পারব। কিন্তু সে আশা আর নেই। মুন্সী হায়দরাবাদের সকল সংবাদদাতা ও সাংবাদিকদের খবর জানিয়ে দিয়ে রেখেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিনিধি নিজামের সঙ্গে আলোচনার জন্য আসছেন। এখন সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়ে এবং তাঁদের প্রচারের চোটে বিখ্যাত হবার দুর্ভাগ্য আমাকে বরণ করতেই হবে।

যাই হোক, নিমন্ত্রণের কূটনীতিক সমস্যার বাধা পার হয়ে মোটরে উঠলাম এবং সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দশ মাইল পথও পার হলাম। পথের পরিচ্ছন্ন চেহারাটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ল, কোথাও কোন গোলমালের আওয়াজও শুনলাম না। পথে লোকজনও খুব বেশি দেখা গেল না। পথের উপর এবং ঘরের মধ্যে লোকজন যারা রয়েছে, তাদের দেখে মনে হয় না যে কোন প্রকারের

উত্তেজনা বা গোলমেলে অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। দেখে মনে হলো, প্রত্যেকেই যে যার নিজের মনে শান্তভাবে নিজের নিজের জীবিকার কাজ ক'রে চলেছে।

শাহ-মঞ্জিল্—এই ভবনে মীর লায়েক আলি থাকেন। শাহ-মঞ্জিলে পেঁাছেই ভিতরে চলে গেলাম এবং লায়েক আলির সঙ্গে দেখা হলো। লায়েক আলির শরীর একটু অসুস্থ। তিনি বললেন যে, আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত অতিথিরূপে পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। কিন্তু, আজ সন্ধ্যায় আমার আহারের জন্য কোন বিশেষ বন্দোবস্ত তিনি ক'রে উঠতে পারেননি। লায়েক আলি জানালেন, অতএব আজ সন্ধ্যায় আমার পক্ষে মুন্সীর ভবনেই আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেই ভাল হয়। আর একটি বিশেষ যুক্তি আছে। আগামীকাল সকালবেলাতেই মুন্সী আবার বাঙ্গালোরে ফিরে যাবেন, সুতরাং আজ সন্ধ্যাতেই মুন্সীর নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসা আমার কর্তব্য। লায়েক আলি বললেন, তিনি হায়দরাবাদের সকল রাজনৈতিক দলের ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছেন। আমার ইচ্ছানুযায়ী হায়দরাবাদের ভিতরে কোথাও যেতে এবং যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে কোন বাধা নেই, একথাও জানিয়ে দিলেন লায়েক আলি। তিনি অভিযোগের সুরে বললেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক অবরোধের উপশম এখনো হয়নি এবং শহরের পানীয় জল সরবরাহে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, কারণ ভারত গভর্নমেণ্টের অবরোধ ব্যবস্থার জন্য বাইরে থেকে হায়দরাবাদে ক্লোরিণ আমদানী করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তা ছাড়া, হায়দরাবাদ শহরের যাত্রী বহনের জন্য ইংলণ্ড থেকে কতকগুলি মোটরবাস কিনেছিলেন নিজাম গভর্নমেণ্ট, কিন্তু মোটরবাসগুলি বোম্বাইয়ের বন্দরে পেঁাছে এখনো পড়ে রয়েছে এবং পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। মোটরবাসগুলির কলকব্জা খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং গদিও কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এর উপর, বন্দরে পড়ে থাকার দরুণ ডেমারেজ চার্জও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

লায়েক আলির এই সব অভিযোগের বিবরণ শুনে আমিও প্রত্যুত্তরে কয়েকটা কথা বললাম। আমি বললাম, এই ধরনের অভিযোগের বিষয় অমীমাংসিত অবস্থায় বেশি দিন ফেলে রাখা অবশ্যই উচিত নয়। যে বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন লায়েক আলি, সে ঘটনা কতদূর সত্য অথবা মিথ্যা তা আমি জানি না। আমি বললাম, কোন্ পক্ষ অন্যায় করছেন, এই প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে আমি এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয়ে একটা মীমাংসা ও মিল হয়ে গেলে, তবেই এই ধরনের অভিযোগের ব্যাপারগুলিকে সহজে এবং সন্তোষজনকভাবে মিটিয়ে ফেলা সম্ভবপর।

লায়েক আলির ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হতে বেশ কিছুটা দেরি হলো। আমাকে খবর দেওয়া হলো যে, বেলা পাঁচটার সময় অতিমান্য নিজাম বাহাদুর আমাকে দেখা দিতে রাজি হয়েছেন।

শাহ-মঞ্জিল থেকে কিং-কোঠি—অর্থাৎ লায়েক আলির ভবন থেকে নিজাম বাহাদুরের সরকারী বাসভবনে উপস্থিত হলাম। কিং-কোঠিতে পেঁাছেই দেখলাম, লায়েক আলি উপস্থিত রয়েছেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট আগে পেঁাছেছেন। আমাকে পথ দেখিয়ে ছোটখাট একটি ড্রইং-রুমের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলা হলো। ভিক্টোরিয়ার আমলের নানারকম শিল্পসামগ্রী দিয়ে ড্রইং-রুমটি সাজানো

রয়েছে। ঘরের ভিতর ঝাপ্‌সা আলোর মধ্যেই দেখতে পেলাম, দেয়ালের গায়ে রাজা পঞ্চম জর্জের একটি বড় ছবি ঝুলছে।

মীর লায়েক আলি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মস্ত বড় একটা সোফাকে উদ্দেশ করে আমার পরিচয়বাণী শোনালেন। অতিমান্য নিজাম বসেছিলেন এই সোফারই উপর। কিন্তু নিজামের মূর্তি প্রথমে আমার চোখেই পড়েনি। আমি দেখেছিলাম শুধু মস্ত বড় একটা সোফা। পরে দেখলাম, সোফার এক কোণে এইটুকু চেহারার নিজাম বস্তুত একটা অদৃশ্য বস্তুর মতোই বসে রয়েছেন।

নিজামের চেহারা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। কাঠির মতো হাল্‌কা ও ক্ষুদ্র চেহারার একটি মানুষ। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, যে অতিমান্য নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি, তিনিই ইনি। নিজামকে যথোচিত অভিবাদন জানাবার জন্য নিজের মনকেই তৈরী করতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল।

অত্যন্ত বাজে রকমের পরিচ্ছদে বিশ্রীভাবে সেজে বসে রয়েছেন নিজাম। পরিধানে মোটা সুতীর আচকান আর পায়জামা, পায়ে এক জোড়া চকোলেট রঙের চটি এবং রঙীন সুতীর একজোড়া মোজা। দু'পায়ে পায়জামার উপর দিয়ে মোজা-জোড়া হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। মোজার কোন বাঁধনও নেই, হাঁটু পর্যন্ত উঠে ঢিলে মোজা হাঁ ক'রে রয়েছে। একটি ফেজ টুপি পরেছেন নিজাম, কিন্তু টুপিটা কপাল থেকে সরে গিয়ে মাথার পিছনে হেলে রয়েছে। একে চেহারাটাই ক্ষুদ্র, তার উপর শরীরের উপরটা কুঁজোর মতো ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। নিজামের মুখের গড়নও কেমন যেন ঢিলেঢালা ও শিথিল হয়ে গিয়েছে, দাঁতের অবস্থা শোচনীয়। দেখলাম, নিজামের হাত দুটোও সব সময় কাঁপছে। কথা বলার সময় পা-কাঁপিয়ে দুই হাঁটুকে এমনভাবে ঠুকতে থাকেন নিজাম যে দেখে মনে হবে, কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর অসাড় শরীর কাঁপছে। নিজামের চেহারার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ একমাত্র রয়েছে তাঁর তাকাবার ভঙ্গী এবং গলার স্বরের মধ্যে। তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকানো এবং কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে জোর দিয়ে কথা বলা, মাত্র এই দু'টি অভ্যাসের মধ্যে নিজামের ব্যক্তিত্বের পরিচয়টুকু পাওয়া যায়।

মাউণ্টব্যাটেনের চিঠি নিজামের হাতে তুলে দিলাম। অত্যন্ত দ্রুত চিঠির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে নিজাম বললেন—'আর এক মাস মাত্র সময়ের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন এমন কি একটা কাজ ক'রে যাবার আশা করছেন?'

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চিঠিতে নিজামকে সুস্পষ্টভাবেই এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজামের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে যেন না থাকেন। আমিও আশা করছিলাম যে, মাউণ্টব্যাটেনের চিঠি পড়বার পর নিজাম মীর লায়েক আলিকে চলে যেতে বলবেন। কিন্তু চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়েও নিজাম লায়েক আলিকে চলে যেতে বললেন না। স্পষ্টই বুঝলাম যে, নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের বিশেষ অনুরোধটি ইচ্ছা ক'রেই তুচ্ছ করলেন এবং মীর লায়েক আলি শক্ত হয়ে বসেই রইলেন।

আমার দিকে তেমনি শক্তভাবে তাকিয়ে নিজাম চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমি ভাল ক'রেই জানি যে, ভারতের গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের সময়-সুযোগ যেমন খুবই অল্প, তেমনি অল্প তাঁর ক্ষমতা।'

তার পরেই নিজাম বললেন—'হায়দরাবাদ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যে আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই সত্যটি মাউণ্টব্যাটেন ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন মনে হচ্ছে, অথচ দেখতে পাচ্ছি যে, হায়দরাবাদে এসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, সে সুযোগ তাঁর নেই।'

মাউণ্টব্যাটেনকে যেন সোজা বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন, তেমনি ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নিজাম বললেন—'বেশ তো! না আসতে পারেন, আসবেন না। আমি দুঃখিত। এই অবস্থায় আমিও তাঁকে বলব, বিদেয় নিন তা'হলে এবং আপনার যাত্রা সফল হোক্।'

নিজাম বললেন, ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতি তাঁর যা কর্তব্য, তার সবই তিনি করেছেন। যেসব সর্তে তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যে আসতে রাজি আছেন, সেসব তিনি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নিয়মতান্ত্রিক উপদেষ্টা এবং প্রধান মন্ত্রীর মারফৎ তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য স্পষ্টভাবেই ভারত গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন ঘরোয়াভাবে অন্য কোন পক্ষকে জানাবার মতো কোন নতুন বক্তব্য তাঁর নেই।

আমি বললাম, ভারত থেকে চলে যাবার আগে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত ও হায়দরাবাদের মতভেদের একটা নিষ্পত্তি ক'রে দিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যতটুকু করা তাঁর সাধ্য, তিনি আন্তরিকভাবেই সেটুকু ক'রে যাবার সুযোগ খুঁজছেন। এখন অতিমান্য নিজামের পক্ষেই একবার বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার যে, মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রভাব ও মর্যাদাকে একটা মীমাংসা লাভের চেষ্টায় কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা। নিজামকে আমি একথাও বললাম যে, ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের সাধারণ অভিমত ও বিচার-বিবেচনার পরিচয় নিজাম বাহাদুরের সবই জানা আছে। যদি মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্যের বিশেষ কোন বিষয় বুঝতে নিজাম বাহাদুর কোন অসুবিধা অনুভব ক'রে থাকেন, অথবা কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থেকে থাকে, তবে আমি খুশি হয়েই এখানে মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য বিশদভাবেই ব্যাখ্যা ক'রে সে অসুবিধা ও অস্পষ্টতা দূর করতে চেষ্টা করতে পারি।

আমি প্রসঙ্গত একটি তথ্য নিজামকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের যে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার পিছনে মাউণ্টব্যাটেনের বিশেষ চেষ্টার ইতিহাস রয়েছে। এই চুক্তি বিশেষভাবেই মাউণ্টব্যাটেনের চেষ্টার ফল।

প্রত্যুত্তরে নিজাম বললেন—ওসব ব্যাপার তো হয়েই গিয়েছে।

আমি বুদ্ধি খাটিয়ে এইবার মাউণ্টব্যাটেনের আর একটি বক্তব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম—'মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, রাষ্ট্রভুক্ত হওয়া অথবা রাষ্ট্রভুক্তির সমতুল কোন সম্পর্ক স্বীকার ক'রে নেওয়াই নিজামের স্বার্থের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।'

আমার কথাগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না নিজাম। খুব জোরে হাত নেড়ে একটি আপত্তির ভঙ্গী ক'রে রাষ্ট্রভুক্তি কথাটাকেই এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বিষয়টাকেই একেবারে বাতিল ক'রে দিলেন।

এইবার গায়ে পড়ে কথা বললেন লায়েক আলি। তিনি বললেন, রাষ্ট্রভুক্তি সম্বন্ধে তিনি হায়দরাবাদে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে রাজি আছেন। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই যে একটা সমস্যা! শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট গ্রহণ যদি সম্ভবপর হতো, তবে তিনি এখনি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শান্তিরক্ষা করা সম্ভবপর হবে না বলেই তিনি গণভোট গ্রহণের ইচ্ছা বাতিল ক'রে দিতেই বাধ্য হয়েছেন।

লায়েক আলির কথায় সায় দিয়ে নিজাম বললেন—বহুৎ খুব, একেবারে খাঁটি কথা!

হায়দরাবাদে কম্যুনিষ্টদের উৎপাত সম্পর্কে নিজামের বক্তব্য জানবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ প্রসঙ্গের মধ্যে আসতেই চাইলেন না নিজাম। তিনি বললেন—'এটা একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র, এ বিষয়ে আমার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আপনি আলোচনা করতে পারেন।'

নিজামের মুখ থেকে এইবার একটি নতুন প্রসঙ্গের আলোচনা শুনলাম। তিনি বললেন, ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজন্যদের অদৃষ্টে কি হলো বা না হলো, সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করতে রাজি নন। অন্যান্য রাজন্যের ভবিষ্যতের প্রশ্নটা তাঁর কাছে একটা প্রশ্নই নয়। অন্যান্য রাজন্য কোন্ নীতি গ্রহণ করেছেন, সেটা ভেবে দেখবার কোন প্রয়োজনও তাঁর নেই। নিজামের মতে, ভারতের অন্যান্য রাজন্যেরা বস্তুত কতগুলি 'রহিস্' (অভিজাত) ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নন, যাঁরা কতগুলি বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র দাবী করতে পারেন।

এর পর নিজাম আমাকে যেসব কথা বললেন, তার বেশির ভাগ হলো মোসলেম-জীবনের নীতি ও দর্শনের কথা। এ বিষয়ে খুব জোরাল ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন নিজাম। নিজাম বললেন—কিস্মৎ, কিস্মৎই হলো একমাত্র সত্য। জীবনে যা হবে, তা পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, কেউ তা খণ্ডাতে পারে না। নিজাম বললেন, হায়দরাবাদের প্রাক্তন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লোথিয়ানের সঙ্গেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। লোথিয়ান ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু লোথিয়ানের একটি উক্তি আজও স্মরণ ক'রে রেখেছেন নিজাম। নিজাম বললেন—'লোথিয়ান আমাকে এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে, রেস-কোর্সের মতোই আমাদের জীবনে দৈবের একটা স্থান আছেই আছে।'

নিজামের অভিমত হলো, অদৃষ্টের হাত থেকে কারও ছাড়া নেই। হয় ভাল অদৃষ্ট, নয় খারাপ অদৃষ্ট, এই দু'য়ের মধ্যে একটা হবেই হবে।

বর্তমান অবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করলেন নিজাম। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে অবস্থা ভালর দিকে যেতে পারে। কিম্বা, আরও কয়েকদিন পর থেকে ভাল হতে আরম্ভ করবে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে তিনি কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু যাই হোক না কেন নসীবে যা আছে, তার জন্য তিনি সম্পূর্ণ-ভাবেই তৈরী হয়ে আছেন।

"মহরমের নাম কখনো শুনেছেন?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন নিজাম।

আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম—হ্যাঁ শুনেছি।

নিজাম উত্তর দিলেন—"শুনেছেন তো, কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই কিছু জানেন না। মহরম হলো পয়গম্বরের দৌহিত্রের মৃত্যুদিবসের স্মরণ অনুষ্ঠান। মৃত্যু এবং ক্ষতিকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই আমাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি অঙ্গ।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিজাম প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় তাঁর মাতার সমাধি পরিদর্শনে গিয়ে থাকেন এবং সেখানে উপাসনা ক'রে ফিরে আসেন।

নিজামের গদির অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন কতখানি আগ্রহ পোষণ করেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই আমি বললাম যে, মাউণ্টব্যাটেন নিজে নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারবাদে বিশ্বাসী। এই কথা শোনা মাত্র নিজাম প্রতিবাদ করবার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ঠিক এইখানেই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার মতভেদ। নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারবাদ

পাশ্চাত্ত্যে এবং ইওরোপে চলতে পারে এবং সেসব দেশের পক্ষে ভালও হতে পারে, কিন্তু প্রাচ্যে ও-জিনিসের কোনই প্রয়োজন নেই। ঐ কথাটাই এদেশে সম্পূর্ণ অর্থহীন।'

মীর লায়েক আলি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। নিজাম প্রশ্ন করলেন, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকতে রাজি হবে, এরকম কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও বিবেচনার ব্যাপার চলছে। ভারতীয় জনমতের উপর বিশেষ প্রভাব আছে, এইরকম এক মহলের অভিমত হলো, ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাই উচিত।

কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে নানা কথা উঠতেই আমি এমন আর একটি মন্তব্য করলাম যেটা বস্তুত লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফের কোন ব্যক্তির মন্তব্য নয়। আমি বললাম, ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই যে, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক তাতে ভারতের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব ও নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। ভারতীয় উপমহাদেশের এক অংশ যদি কমনওয়েলথের মধ্যে থাকে এবং অপর কোন অংশ যদি না থাকে, তবে দুই অংশেরই প্রতি ব্রিটিশ জনমত এবং ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের মনোভাব সমভাবেই সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। মাত্র কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা বা না-থাকার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের অংশগুলির মধ্যে ব্রিটিশের আনুকূল্যে কোন তারতম্য হবে না। আমি স্পষ্ট ক'রেই বললাম, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া যাবে, এইরকম যুক্তিতে কোন ধারণা করলেই একটা মিথ্যা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে মাত্র।

আমার ধারণা, আমার এই মন্তব্যটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আমার উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন নিজাম।

অতিমান্য নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার পর্ব এখানেই শেষ হলো। আলোচনার উপসংহারে নিজাম বর্তমান বিশ্বের অশান্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বললেন, এবং প্যালেস্টাইনের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সবশেষে মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার ব্যাপার মিটে গেল। আলোচনা করতে যদিও খুব বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটাও খুব সহজসাধ্য হয়নি। বিশেষ ক'রে নিজামের অদ্ভুত চেহারা ও হাবভাব আমার আলোচনার উৎসাহ অনেকখানি এলোমেলো ক'রে দিয়েছিল। তবুও, এই এক ঘণ্টার মধ্যে নিজামের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এবং চিন্তার রীতিনীতি বোঝবার একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, এবং যেটুকু বুঝেছি সেটাও তথ্য হিসাবে কম মূল্যবান নয়। শরীরটা জীর্ণ-শীর্ণ হলেও, নিজামের মনটা বেশ পোক্ত। তাঁর মনের ভিতর যে ইচ্ছা রয়েছে, সেই ইচ্ছাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে রাখবার মতো মানসিক বলিষ্ঠতাও তাঁর আছে। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে দুর্বলতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নিজামের কাছ থেকে চলে যাবার আগে আমার মনে হলো, এক খামখেয়ালী বৃদ্ধ অধ্যাপক যেন এতক্ষণ ধরে আমাকে তাঁর বিশেষ প্রিয় কতগুলি তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিলেন। নিজাম যদিও আধুনিক কালের একজন নৃপতি, কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে তিনি নিতান্ত সে-কেলে, অনুদার এবং উদ্ধত স্বভাবের মানুষ। তবে, যেখানে তাঁর স্বার্থের ব্যাপার রয়েছে বলে মনে করেন, সেখান থেকে তাঁকে টলানো দুষ্কর। এক্ষেত্রে তিনি দুর্ধর্ষতার প্রমাণ দিতে সক্ষম। যতক্ষণ তিনি কথা বললেন, ততক্ষণ তাঁর চিন্তায় ও আচরণে

একটা প্রবল অদৃষ্টবাদেরই প্রমাণ পেলাম। নিজামের এই অদৃষ্টবাদে অবশ্য আত্ম-সমর্পণের ভাব আদৌ নেই। এটা হলো একরকমের জবরদস্ত অদৃষ্টবাদ।

নিজাম পরের হাতে বন্দীর মতো জীবন যাপন করছেন, এমন অবস্থার কোন প্রমাণ পেলাম না। নিজামের ভবনের প্রবেশপথে এবং পথের দু'পাশে বহুসংখ্যক পুলিশ অবশ্য সব সময় পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু এটা নিজামের বন্দিদশার লক্ষণ নয়, এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়! মনে রাখা উচিত যে, মাত্র কয়েক মাস আগে নিজামের প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, নিজামের বাসভবন এই কিং-কোঠি লোকচলাচলের সাধারণ সড়ক থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়। দিল্লীর সাধারণ অট্টালিকাগুলির মতোই নিজামের কিং-কোঠি সড়কের কাছাকাছি অবস্থিত। মীর লায়েক আলি নিজামের কাছেই রয়ে গেলেন। আমি একাই প্রস্থান করলাম।

এর পর যখন আবার প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলির ভবনে উপস্থিত হলাম, তখন মোইন নওয়াজ জঙ্গ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন।

মোইনের কথাবার্তা ও প্রশ্ন শুনে বুঝলাম যে, তিনি আমার কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চাইছেন। নিজামের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার মনে কি ধারণা হয়েছে, এই বিষয়। আমি বললাম, নিতান্ত মামুলী কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং সে আলোচনা থেকে উৎসাহিত হবার মতো কোন বস্তু আমি পাইনি।

গত মার্চ মাসে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ফল সম্বন্ধে দুই গভর্নমেণ্টের যুক্ত-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের যে চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন মোইন। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের সুরে বললেন, ভারতের এই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য ক'রে হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট বিস্মিত হয়েছেন এবং বুঝে উঠতেও পারছেন না যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারতের মনের আসল ইচ্ছাটা কি?

রাষ্ট্রভুক্তি, না সন্ধি? মোইনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হলো। মোইন বললেন যে, রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে সম্মত হতে একটা বাধা আছে। তিনি আশঙ্কা করছেন যে, রাষ্ট্রভুক্তিতে সম্মত হলে ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদের উপর মাত্র তিনটি অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে অবশ্য তিনটি অধিকার ইউনিয়ন কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবার কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কাজের বেলায় ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদের তেত্রিশটি ক্ষমতার বিষয় অধিকার ক'রে বসবেন। সমগ্র ভারতে যে ধরনের আইন প্রচলিত হয়েছে এবং হবে, হায়দরাবাদেও সেই একই ধরনের আইন প্রচলনের দাবী করবেন ভারত গভর্নমেণ্ট। ফলে, হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ অটোনমি বা আত্মকর্তৃত্বের অধিকার বিনষ্ট হবে। কিন্তু এ অধিকার ছেড়ে দিতে কখনই রাজি হবেন না নিজাম। মোইন আর একটি বিষয়েও আমাকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। হায়দরাবাদের ভিতর দিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে অবাধে যাতায়াত করবার অধিকার দিতে পারেন না হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট। এ প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য।

লায়েক আলির ভবন থেকে এইবার মুন্সীর ভবনে উপস্থিত হলাম। এখানেই আমার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

শাহ-মঞ্জিল থেকে মোটরকারে অতি দ্রুতগতিতে চলেও মুন্সীর বাসভবনে পৌঁছতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগল। সেকেন্দ্রাবাদের দূরপ্রান্তে বিমানময়দানের কাছে মুন্সীর বাসভবন অবস্থিত। শহরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুন্সী বস্তুত একাকী একটা নির্জন স্থানে রয়েছেন। একমাত্র যাঁদের প্রচুর সময়

আছে, পেট্রল আছে এবং রাজনৈতিক আগ্রহ আছে, তাঁরা ছাড়া আর কেউ মুন্সীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখানে আসেন না।

দেখলাম, মুন্সী যেন মনমরা হয়ে রয়েছেন, যেন সফলতার কোন আশা তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। মুন্সী বললেন যে, লায়েক আলিকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দেবার মতো একটা কাজ লায়েক আলি করেছেন। মুন্সীর সঙ্গে লায়েক আলির সাক্ষাৎ ও আলোচনার একটা সম্পূর্ণ ভুয়া বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন লায়েক আলি। মুন্সী আরও একটি তথ্য জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মোইন ও লায়েক আলির মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, যদিও ঠিক কি ব্যাপার নিয়ে এই বিরোধ ঘটেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। দু'জনের মধ্যে অবশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক (শ্যালক-ভগ্নীপতি) রয়েছে, কিন্তু আজকাল দু'জনে কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লায়েক আলিই এখন নিজামের প্রিয়পাত্র। মোইনের তুলনায় লায়েক আলিরই বেশি প্রভাব আছে নিজামের উপর।

মুন্সীর ধারণা, হায়দরাবাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউই সত্যি সত্যি দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অথবা রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আগ্রহের ধার ধারেন না। একটি বিষয়ে মুন্সী আমার সঙ্গে একমত হলেন। নিজামই যে এখনো হায়দরাবাদের সকল রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রধান নিয়ন্তা ও প্রভু, সে সম্বন্ধে মুন্সীরও কোন সন্দেহ নেই। নিজাম যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে এবং হচ্ছেও তাই। এ ব্যাপারে নিজাম এখনো পরাধীন হয়ে পড়েননি।

মুন্সীর মনের একটা সন্দেহ দূর ক'রে দিলাম। আমি বললাম যে, আমি এখানে মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে 'ব্যক্তিগতভাবে ঘরোয়া আলোচনা'র জন্য এসেছি এবং আসবার আগে নেহরু ও ভি পি মেননকে জানিয়ে তাঁদের সম্মতিও নিয়েছি।

শুনে খুশি হলেন মুন্সী। তিনি বললেন, আগামীকাল সকালেই তিনি বাঙ্গালোর রওনা হয়ে যাবেন। মুন্সীর স্ত্রী এ জায়গায় থাকতে মোটেই পছন্দ করেন না। মুন্সী বললেন, হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনি ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছে যে, হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগই এখন আর নেই।

হায়দরাবাদ, রবিবার, ১৬ই মে, ১৯৪৮ সাল : আজ সারা দিনটাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অনবরত লোক এসেছে, সবারই সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে এবং সবারই কথা শুনতেও হয়েছে। লায়েক আলিকে বললাম যে, আমি কাশিম রেজ্‌ভির সঙ্গে একবার ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চাই, যদি এই আলোচনার সংবাদটা অবশ্য গোপন রাখা সম্ভবপর হয়। আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং খুশি হলেন লায়েক আলি। তিনি বললেন, তাঁরও বিশেষ ইচ্ছা এই যে, রেজ্‌ভির সঙ্গে আমি একবার দেখা করি। লায়েক আলি জানালেন, আজই সকালে রেজ্‌ভির এখানে আসবার কথা আছে। লায়েক আলি আজ সফরে বের হবেন, তার আগেই রেজ্‌ভি তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য আসবেন। 'সুতরাং আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন'—লায়েক আলির উপদেশ অনুসারে আমিও বসে রইলাম।

রেজ্‌ভি এলেন। রেজ্‌ভির সঙ্গে কয়েক মিনিট সাধারণ দু'চারটা কথাবার্তা বলে লায়েক আলি চলে গেলেন। আমার কাছে শুধু রইলেন রেজ্‌ভি।

আমিই প্রথমে কথা বললাম। প্রসঙ্গের আরম্ভেই বললাম, ঘটনার গতি যেদিকে চলেছে তাতে বিষণ্ণ না হয়ে আমি পারছি না, আমি হতাশ হয়ে পড়ছি।

রেজভি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'আমি একটুও হতাশ হচ্ছি না, এবং কোন পরোয়াও করি না।'

রেজভি বললেন যে, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। তাঁর একমাত্র আনুগত্য হলো মুসলিম সমাজের প্রতি, অন্য কারও প্রতি নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কম্যুনিষ্ট দল রাজাকরদের সঙ্গে একযোগে সম্মিলিত-ভাবে কাজ করতে চাইছে, এই সংবাদের মূলে কোন সত্যতা আছে কি না?

রেজভি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন—আপনি রাজাকরদের কথা বলছেন, তার মানে আমার কথা বলছেন। তাহ'লে শুনে রাখুন যে, এখানে মুসলমানদের এখন এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে যে, তারা নিজের থেকেই অতি দ্রুত কম্যুনিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি 'তাদের' সাবধান ক'রে দিয়েছি যে, পরিণামে এই রকমেরই ব্যাপার হবে। এখানে 'তাদের' অর্থে কা'দের কথা রেজভি বলছেন, সেটা স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল না।

এর পর রেজভি স্পষ্ট ক'রেই বললেন যে, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে তিনি রাজি আছেন এবং এই দিক দিয়ে একটা প্রাথমিক চেষ্টা ও ব্যবস্থা তিনি এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছেন।

রেজভির এই অভিমত একেবারে নিঃসংশয়ে আরও ভাল ক'রে শুনে নেবার জন্য আমি একটা প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম—'কম্যুনিষ্টরা অবশ্যই নিজামের বিরোধী, কারণ তারা বলেছে যে, নিজামকে তারা কোন 'প্রশ্রয়'ই দেবে না। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আপনাকে নিশ্চয়ই কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হবে।'

রেজভি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলেন। তারপরেই বললেন, 'হ্যাঁ অসুবিধা কিছু কিছু আছে বটে'।

আমি আবার এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করলাম। এইবার রেজভি একেবারে মন খুলে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ক'রেই বলে দিলেন—'হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের কথাই বলুন বা নিজামের কথাই বলুন, এ'দের স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠা আমার কাছে তেমন কোন গুরুত্বের ব্যাপারই নয় মুসলিমের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায়। আমার কাছে আগে মুসলিমের স্বার্থ, তারপর আর কিছু। ধ্বংস হতে মুসলমানদের রক্ষা করার কাজে যদি আমি কম্যুনিষ্টদের একমাত্র সহযোগী হিসাবে পাই, তবে তাদের সহযোগিতা নিতে আমি কোন দ্বিধাই করব না।'

রেজভি আবেগের সঙ্গে বললেন—'ভারত যদি হায়দরাবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করেন এবং আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করবার জন্য দু' বছরেরও সুযোগ পাই, তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, এমন জিনিস আমি তৈরী করব যা দেখে ভারতের হিংসা হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম—"ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এখনই যদি একটা রাজনৈতিক মীমাংসা ভালভাবে না হয়ে যায়, তবে দু' বছর পরেও যে বর্তমানের মতোই একটা সঙ্কট আবার দেখা দেবে না, একথা কি আপনি বলতে পারেন?"

রেজভি বললেন—হ্যাঁ সঙ্কট দেখা দিতে পারতো যদি আমার আর একটা অনুমান ভুল হতো।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি আপনার অনুমান?

রেজভি বললেন—'ভারত রাষ্ট্রই থাকবে না। এ ভারত দু'বছরের বেশি টিকে থাকতে পারে না, সুতরাং দু' বছর পরে কোন সঙ্কটের প্রশ্নও ওঠে না।'

কাশিম রেজভির ধারণা, আর দু' বছর পরে ভারত নামে কোন রাষ্ট্র থাকবে না। সুতরাং যুক্তি ও মীমাংসার দাবী ক'রে হায়দরাবাদকে বিড়ম্বিত করবার কোন সুযোগও ভারত পাবে না। রেজভি বললেন, ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের বিরোধ এমনই এক সমস্যা হয়ে উঠেছে যার শান্তিপূর্ণ কোন সমাধান একেবারেই সম্ভবপর নয় এবং সমাধানের আশাও তিনি পোষণ করেন না।

হিন্দুদের কথা উঠতেই রেজভির মনের আর এক দিকের পরিচয় পেয়ে গেলাম। হিন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উগ্র জাতিবিদ্বেষে পরিপূর্ণ নানারকম মন্তব্য করলেন। রেজভি বললেন, হিন্দুরা যে কি চরিত্রের মানুষ সেটা গান্ধীর হত্যাতেই প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুরা চিরকাল তাদের দেবতাকে অতি-দেবতা ক'রে তুলবার জন্যই হত্যা করেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে হায়দরাবাদে যে কম্যুনিষ্ট দল কাজ করছে, তাদের অধিকাংশই কি হিন্দু নয়?

রেজভি বললেন,—হ্যাঁ, এ কথা সত্য। কিন্তু অন্যান্য দলের তুলনায় কম্যুনিষ্ট-দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাব কম।

জিজ্ঞাসা করলাম—একথা কি ঠিক যে, আপনিই হায়দরাবাদের প্রকৃত 'শক্তি-মান' ব্যক্তি? চারদিকে তো এই ধরনেরই অভিমত শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই।

রেজভি উত্তর দিলেন—ওসব কথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। আমার সম্বন্ধে চারদিকে এই নিন্দা প্রচার করা হয়েছে যে, আমিই হলাম হায়দরাবাদের আসল ব্যক্তি, আমারই হাতে সব ব্যাপারের চাবি-কাঠি রয়েছে এবং আমিই নাকি আড়ালে থেকে আমার ইচ্ছামতো হায়দরাবাদের গভর্নমেণ্ট ভাঙছি আর গড়ছি। এ সব প্রচারিত নিন্দাবাদ সম্পূর্ণ অমূলক, আমি এখানে একজন নগণ্য ব্যক্তি মাত্র। আমি শুধু একজন মুসলিমসেবক, মুসলিমের স্বার্থরক্ষাই আমার একমাত্র ব্রত এবং কারও সাধ্য নেই যে, আমাকে আমার এই ব্রত হতে নিবৃত্ত করতে পারে। হ্যাঁ, হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট অবশ্য মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও অকপটভাবে ও স্পষ্ট ক'রে আমার মতামত জানিয়ে দিই।

রেজভি বললেন, মুসলিমের প্রাণ এবং মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। তাঁর মতে, হায়দরাবাদে কংগ্রেসের যেসব নেতা ও প্রতিনিধি রয়েছে, তারা কতগুলি খড়ের তৈরী দুর্বল মানুষ মাত্র।

হেসে ফেললেন রেজভি। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম হাসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হিন্দুদের আমি একবার দেখে নিতে চাই।

বুঝলাম, রেজভি একজন সম্পূর্ণ ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি। তাঁর দু' চোখের দৃষ্টি যেন সূচীমুখের মতো তীক্ষ্ণ। যার দিকে তাকান তার দেহে যেন এই দৃষ্টি বিঁধতে থাকে। শত্রু-মিত্র উভয়কেই সন্ত্রস্ত ক'রে তোলার মতোই রেজভির চোখের দৃষ্টি, কিন্তু একটি কারণে রেজভির এই ত্রাসসঞ্চারকারী ব্যক্তিত্বের জোর তেমন ক'রে সফল হয়ে উঠতে পারে না। রেজভির কথাবার্তায় সহজেই এটা ধরা পড়ে যায় যে, লোকটির প্রকৃতিতে একটা উদ্ভট কিছু রয়েছে। মেজাজ চড়িয়ে যখনই কথা বলেন, তখনই বোঝা যায় যে, আজগুবি ও অবাস্তব কতগুলি ধারণায় এই লোকটির মন ভরে রয়েছে। তখন লোকটিকে নিতান্ত হুজুগবাজ বলে ধারণা না ক'রে পারা যায় না এবং তাঁর কথাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার মতো বস্তু বলেও

মনে হয় না। বরং মনে হয়, মানসিক ব্যাধির মতো একটা ক্ষমতাবোধের মোহ লোকটির মন আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে রেজভির ধারণা বাস্তবতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

চেহারা ছিপছিপে, আচরণে ছটফটে, চোয়াল ও চিবুক থেকে একগুচ্ছ দাড়ি ঝুলছে এবং মাথার উপর বেঁকিয়ে বসানো একটি ফেজ—এ হেন মূর্তিতে কাশিম রেজভি যখন দ্রুতপদে হেঁটে চলে গেলেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো যে, চার্লি চ্যাপলিনে ও ক্ষুদে পয়গম্বরে মিলিয়ে তৈরী একটি মূর্তি চলে যাচ্ছেন।

রেজভি-পর্ব শেষ হলো। এর পর দেখা হলো হায়দরাবাদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এল এদ্‌রুসের সঙ্গে। জাতিতে এল এদ্‌রুস হলেন হাশেমী আরব। দীর্ঘাকৃতি ও সুন্দর চেহারার এল এদ্‌রুস অফিসার হিসাবেও বেশ যোগ্য বলেই আমার ধারণা। মাউণ্টব্যাটেনের অধিনায়কতায় পরিচালিত বর্মাযুদ্ধে তিনি কাজ করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন সম্পর্কে এল এদ্‌রুস অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাও পোষণ করেন।

এল এদ্‌রুস বললেন যে, শোলাপুর অঞ্চলে (হায়দরাবাদ সীমানার বাইরে) কিছু কিছু হাঙ্গামা হয়েছে এবং ভারতীয় সৈন্য স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সীমানা পার হয়ে হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকতে সাহায্য করছে। এল এদ্‌রুস আর একটি অভিযোগ করলেন—ভারতীয় বিমান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে হায়দরাবাদের আকাশে অনেকবার চক্কর দিয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন যে, এ ঘটনার কথা তিনি বুশার ও এল্‌মৃহার্ষ্টের কাছে পত্র লিখে জানাবেন। অবশ্য সরকারীভাবে নয়, 'প্রাইভেট' পত্র দেবেন এল এদ্‌রুস। অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গেও কয়েকটি কথা তিনি বললেন।

"হিম্মতসিংজীকে (দেশীয় রাজ্যের ফৌজ সম্বন্ধে ভারতীয় বাহিনীর উপদেষ্টা) আমি পরিষ্কার সুযোগ দিয়েছি। তিনি এসে স্বচক্ষে সব ব্যাপার এখানে দেখে যেতে পারেন"—এল এদ্‌রুস মন্তব্য করলেন। তাঁর কাছ থেকেই আরও জানতে পেলাম যে, হিম্মতসিংজী এসেছিলেন এবং স্বচক্ষেই সব দেখে নিয়ে চলে গিয়েছেন। এল এদ্‌রুস বললেন, হিম্মতসিংজীর সন্দেহ মিটে গিয়েছে এবং তিনি খুশি হয়েছেন বলেই তাঁর ধারণা।

প্রসঙ্গক্রমে এল এদ্‌রুসের কাছ থেকে এই তথ্যটুকুও জানবার সুযোগ পেলাম যে, হিম্মতসিংজী এসে শুধু পরিদর্শন ক'রেই ফিরে গিয়েছেন, অনুসন্ধান করবার কোন সুযোগ তাঁকে অবশ্য দেওয়া হয়নি।

ভারত ও হায়দরাবাদ, উভয় পক্ষের মনে এখন যে তীব্র সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন সেনাপতি এল এদ্‌রুস। তিনি বললেন—'আমি এটা বুঝতে পারি না, ভারত গভর্নমেণ্ট কেন এ রকম কঠিন চাপ দিচ্ছেন?'

আমি বললাম—'একটা বিষয়ে আপনার বুঝে দেখা উচিত যে, দেশ খণ্ডিত হয়ে একটা অংশ পাকিস্থানে পরিণত হবার পর ভারত ইউনিয়নের শাসনকার্যের জন্য একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করার খুবই প্রয়োজন হয়েছে।'

এল এদ্‌রুস বললেন—তাঁরা (ভারত) কি ভুলে গিয়েছেন যে, পাকিস্থান তাঁদেরই নিজের হাতের সৃষ্টি? এটাও কি তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, চাপ দিতে গিয়ে তাঁরা এই হায়দরাবাদেও একটা সঙ্কট এবং মুসলিম ধর্মোন্মাদনা জাগিয়ে তুলছেন?

এল এদ্‌রুস আরও বললেন—'ভারত যদি মুন্সীকে এখানে পাঠিয়ে চাপ দেবার পন্থা গ্রহণ না করতেন, তবে আমার মতে, হায়দরাবাদ এতদিনে পাকা কুলের মতো ভারতের কোলে ঝরে পড়ত।'

এল এদ্‌রুস জানালেন, কিন্তু এখন অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলেছে। গেরিলা পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আয়োজন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি বললাম, কিছুক্ষণ আগেই রেজ্‌ভির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। রেজ্‌ভি সম্পর্কে একটি মন্তব্যও আমি করলাম—'রেজ্‌ভির নাম শুনে তাঁকে লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ বলেই আমার ধারণা হয়েছিল, কিন্তু দেখলাম যে, তিনি নিতান্ত ছোটখাট চেহারার মানুষ।'

অতিকায় এল এদ্‌রুস হেসে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন—'ছোটখাট চেহারার মানুষেরাই ভয়ানক হয়ে থাকে।'

জেনারেল এল এদ্‌রুসের সঙ্গে আলাপ সমাপ্ত হবার পর আমি আবার প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলির কাছে উপস্থিত হলাম। দুজনে এক টেবিলেই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম এবং দু ঘণ্টার উপর দুজনের মধ্যে আলোচনাও হলো।

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন গভর্নমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা করছেন। আপাতত তিনি অবশ্য বর্তমান আইনসভা বাতিল ক'রে দিতে পারবেন না, কিন্তু গণ-পরিষদ গঠন করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। বর্তমান আইনসভা থাকবে এবং নতুন গণ-পরিষদও গঠিত হবে, এই রকম কল্পনা তিনি করেছেন। তিনি বললেন, হায়দরাবাদের সকল দলের সঙ্গেই তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ণয়ের ভার তিনি রাজনৈতিক দলগুলির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলি যে পদ্ধতি পছন্দ করবেন, লায়েক আলিও সেই পদ্ধতি স্বীকার ক'রে নেবেন। বর্তমানে যে ভোটার তালিকা আছে, ইচ্ছা করলে রাজনৈতিক দলগুলি সেই তালিকাই রাখতে পারেন। অন্যথা, নতুন ক'রে ভোটার তালিকাও প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আমি জানি, বর্তমানে যে ভোটার তালিকা রয়েছে, সেটা বস্তুত মুসলিম সম্প্রদায়কেই অতিরিক্ত সংখ্যাপ্রাধান্য দিয়ে রচিত একটি তালিকা; যাই হোক, লায়েক আলির নতুন অভিমত শুনলাম। তিনি আরও বললেন, তাঁর মতে, নতুন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে এবং নির্বাচনের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত করতে দেড় বছরেরও কম সময় লাগবে।

প্রায় দু'বছর হলো হায়দরাবাদের আইনসভা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই আইনসভাকে বয়কট করেছে এবং এখনো সেই বয়কট চলছে। লায়েক আলি বললেন, কংগ্রেসের এই ধরনের অসহযোগিতা তাঁকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলেছে। জনসাধারণের সমর্থনে গভর্নমেণ্ট গঠন করতে হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে বনিয়াদ তৈরী করতে হবে, তাতে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করারই প্রয়োজন ছিল; কিন্তু কাজের দিক দিয়ে কংগ্রেস কোন সহযোগিতা করলেন না। প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট চাই, কংগ্রেস শুধু কথার জোরে এই দাবী করা ছাড়া আর কোনভাবে সাহায্য করছেন না। লায়েক আলি বললেন, অগত্যা কংগ্রেসের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নিজের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট গঠনের উপায় তাঁকে খুঁজতে হচ্ছে। হায়দরাবাদের কংগ্রেস সম্পর্কেও লায়েক আলি তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। হায়দরাবাদের কংগ্রেসই কি যথার্থ জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান? লায়েক আলি বললেন, ভারতের অন্যান্য স্থানের কংগ্রেস যেমন সাধারণের নির্বাচনের দ্বারা গঠিত, হায়দরাবাদের কংগ্রেস মোটেই সেরকম প্রতিষ্ঠান নয়। বয়কট নীতি গ্রহণের পূর্বে হায়দরাবাদের কংগ্রেসই সাধারণ সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব অর্জন ক'রে

যথার্থ জনপ্রতিষ্ঠানরূপে নিজেকে গঠিত করেনি। লায়েক আলি বললেন, তিনি সকল রাজনৈতিক দলের অভিমত জানবার ও বোঝবার অপেক্ষায় রয়েছেন এবং আশা করছেন যে, এই মাসের শেষ দিকেই এবিষয়ে সরকারী নীতি ঘোষণা করতে পারবেন।

হায়দরাবাদের রাষ্ট্রভুক্তির প্রসঙ্গে লায়েক আলি ঠিক মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই অভিমতের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। এ রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব ভারতকে মাত্র তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার প্রস্তাব বস্তুত নয়। লায়েক আলি বললেন—ভারতের সংবিধানে ঘোষিত নির্দেশগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, তিনটি ক্ষমতার নাম ক'রে ভারত গভর্নমেণ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিতে পুরোপুরি একানব্বইটি বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার চাইছেন। এর ফলে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ আত্মকর্তৃত্বের অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে।

লায়েক আলির ইচ্ছা, ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের একটা বিশেষ 'সন্ধি' হোক। হায়দরাবাদ এ ধরনের সন্ধি একমাত্র ভারতের সঙ্গেই করবেন, অন্য কোন দেশের সঙ্গে নয়। সন্ধিতে স্বীকৃত হবে যে, ভারত ও হায়দরাবাদ একই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে। তা ছাড়া, দেশরক্ষা সম্বন্ধেও একটা 'চুক্তি' এই সন্ধিরই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। হায়দরাবাদ পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী রাখবেন, এর মধ্যে দশ হাজার সৈন্য ভারত ইউনিয়নের পরিচালকাধীনে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর একটি বিষয় হলো, হায়দরাবাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভারত ইউনিয়নের অধিকার। লায়েক আলি বললেন, এবিষয়েও ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ভারত গভর্নমেণ্ট যেরকম ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন এবং ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্য যে চাপ দিচ্ছেন, তাতে হায়দরাবাদে মুসলিম সমাজের মন খুবই বিদ্বিষ্ট ও বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মুন্সীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেন লায়েক আলি। মুন্সী প্রকাশ্যভাবেই এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন যে, এই হায়দরাবাদ রাজ্য আজ যেখানে অবস্থিত, অতীতে সেখানে একটি হিন্দু রাজ্য অবস্থিত ছিল। মুন্সী এখানে শুধু কংগ্রেসী বন্ধুবর্গের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনায় আসন্ন এক 'মুক্তিদিবসের' কথা বলে থাকেন। মুক্তিদিবসের এক একটি তারিখও প্রায়ই ঘোষণা করেন মুন্সী। প্রথমে বলেছিলেন, ১০ই মার্চ তারিখে হায়দরাবাদের 'মুক্তি' হবে। তারপরে বললেন, মার্চ মাসেই 'মুক্তিদিবস' দেখা দেবে। এর পর ২৩শে এপ্রিল তারিখ নির্দিষ্ট করলেন। এইভাবে মুক্তিদিবসের নানা তারিখ প্রচার করতে করতে মুন্সী নিজেকেই এমন লঘু ক'রে ফেললেন যে, হিন্দুরাও তাঁর কথা আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। অগত্যা মুক্তিদিবসের তারিখ ঘোষণার অভ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মুন্সী।

আমি এইবার নিজামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। আমি বললাম, নিজাম যেভাবে অদৃষ্টের উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন, সেটা আমার খুবই খারাপ লেগেছে। সমস্যার সামাধান যদি করতে হয়, তবে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আরও কিছু তাঁকে করতে হবে।

লায়েক আলি বললেন—'একটা বিষয় আপনি বুঝে রাখুন যে, নিজাম বরং বুক এগিয়ে দিয়ে এবং গুলীর আঘাত বরণ ক'রে নিয়ে মৃত্যু স্বীকার করবেন, তবুও তিনি এমন কোন কাজ করতে রাজি হবেন না, যার ফলে তাঁর প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

অতিমান্য নিজামের নির্ভীকতা সম্বন্ধে আমি অবশ্য কোন প্রশ্ন উত্থাপন

করলাম না, কিন্তু একটি কথা আমি বিশেষ স্পষ্ট ক'রেই লায়েক আলিকে জানিয়ে দিলাম। সমস্যার সমাধান যদি না হয় এবং ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে যদি সংঘর্ষই দেখা দেয়, তবে সবচেয়ে বেশি দুঃখ ও দুর্ভোগের মধ্যে যাদের পড়তে হবে, তারা হলো নিজাম বাহাদুরেরই সাধারণ প্রজা, তথা হায়দরাবাদের জনসাধারণ।

কাশিম রেজভির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং আলোচনার কথাও লায়েক আলিকে বললাম। আলোচনার ফলে আমার কি ধারণা হয়েছে, সেবিষয়েও বললাম। প্রশ্ন করলাম, রেজভির এইসব মন্তব্যের অর্থ কি? এ সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা করছেন?

লায়েক আলি বললেন, রেজভি সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যদি নিজাম অথবা হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টের চাপে ভেঙে পড়েন, তবে শেষ উপায় হিসাবে তিনি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে ঐক্যবন্ধ হয়ে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

আমি উত্তর দিলাম—কিন্তু রেজভির কথা থেকে তাঁর এরকম কোন নীতি বা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না।

এইবার আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট ক'রেই লায়েক আলিকে শুনিয়ে দিলাম। রেজভিকে সামলাতে হবে। যদি আর বেশি দিন রেজভিকে এইভাবে অবাধে তাঁর ইচ্ছা-মতো আন্দোলন করবার সুযোগ দেওয়া চলতে থাকে, তবে নিজাম এবং তাঁর গভর্নমেণ্ট, উভয়েরই সেই অবস্থা লাভ করতে হবে, জাঁতির চাপে সুপুরির যে অবস্থা হয়।

লায়েক আলি পর্ব এখানে শেষ হলো। তাঁর সঙ্গে আমার এই আলোচনারও কোন ফল হয়েছে কিনা সন্দেহ। হায়দরাবাদে প্রতিনিধিত্বশীল গভর্নমেণ্ট স্থাপনের, অথবা রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে এর আগে লায়েক আলি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আজও হুবহু সেই অভিমত এবং সেই মনোভাব প্রতিধ্বনিত করলেন। আলোচনার ফলে আমরা কিছু বা বিশেষ কিছু 'অগ্রসর' হয়েছি বলে মনে করতে পারি না।

আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্বও সমাপ্ত হয়েছে। এর পর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে রওনা হলাম।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই কীর্তির সাক্ষ্য। এই কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন মোইন, বিশেষ প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মোসলেম এবং হিন্দু স্থাপত্যের রীতি এক সঙ্গে মিলিয়ে এই ভবন প্রতিষ্ঠায় সত্যি সত্যিই এক সাংস্কৃতিক দুঃসাহসের প্রমাণ দিয়েছেন মোইন। এখনো এ ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যেটুকু নির্মিত হয়েছে, তাতে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট-ভাবেই বোঝা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি প্রসারের এক বিরাট আশার নিদর্শন হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান ও ভবন গড়ে উঠছে।

নিজামের উত্তরাধিকারী হলেন প্রিন্স অব বেরার। বিকেল হতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। পিতা নিজাম যে ধরনের ভবনে বাস করেন, পুত্র থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশি জাঁকজমকে পরিপূর্ণ এক ভবনে। প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে জেনারেল এল এদ্রুসও রয়েছেন। আর আছেন, প্রিন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারি সফদার ইয়ার জঙ্গ। গলার স্বর কর্কশ এবং আচরণে সাধারণ ভৃত্যের মতো একটা বাধ্যতার ভাব, প্রাইভেট সেক্রেটারি সফদার হিজ হাইনেস দি প্রিন্স অব বেরারের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে কুর্ণিশ ক'রে যেন ভেঙে পড়ছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের অত্যুচ্চ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে প্রিন্সের সঙ্গে আমার আলোচনা হলো। এখানে একটা মজার ব্যাপারও হয়ে গেল। প্রিন্স অব বেরার,

সেনাপতি এল এদ্রুস এবং আমি—সকলেই অকুণ্ঠভাবে মাউণ্টব্যাটেনের প্রশংসা করছিলাম। সকলেরই অভিমত এই যে, মাউণ্টব্যাটেন নিঃসন্দেহেই অত্যুচ্চ কর্মোৎসাহ এবং দৃঢ় সংকল্পের মানুষ।

এই কথা শোনা মাত্র প্রাইভেট সেক্রেটারি সফদার ইয়ার জঙ্গ যেন প্রিন্সের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বললেন—ঠিক কথাই বলেছেন জাঁহাপনা। মাউণ্টব্যাটেনও ঠিক আপনারই গুণগুলি পেয়েছেন।

প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে নানারকম আলাপ ও গল্প হলো। বেশির ভাগই সাধারণ বিষয়। প্রিন্স বললেন—'এখনো চেষ্টা করলে মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে আসতে পারেন এবং আসবেন বলেই আমি আশা করি।' কুর্ণিশবিশারদ প্রাইভেট সেক্রেটারিও এই আশা প্রকাশ করলেন যে, 'ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কে উন্নতি হোক, এই ইচ্ছাই আমরা পোষণ করি।'

প্রিন্স অব বেরারকে দেখে মনে হলো না যে, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে আছে। শুধু একটি বিষয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হলো—তাঁর দাঁত আর গলা সম্বন্ধে। প্রিন্স বললেন, হয় তাঁর দাঁতের জন্য গলা কষ্ট পাচ্ছে, নয় গলার জন্য দাঁত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, দাঁত অথবা গলা, এই দুয়ের মধ্যে যে-কেউ দোষী হোক না কেন, আগামী জুন মাসের শেষে একবার লণ্ডনে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। প্রিন্স বললেন—'কিন্তু এখন লণ্ডনে যাবার অনুমতি পেতে আমাকে কতগুলি বাধা ও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে' (এর অর্থ সম্ভবত এই যে, নিজাম আপত্তি করেছেন)।

প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পেলাম, তাতে এটা বুঝতে পারলাম যে, হায়দরাবাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সাতে-পাঁচে এ ধরনের মানুষ থাকতে পারেন না এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এহেন ব্যক্তির কোন গুরুত্বও নেই। লায়েক আলি আমাকে একবার বলেছিলেন যে, হিজ হাইনেস শুধু সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়ে দিতে ভালবাসেন। লায়েক আলি হলেন প্রিন্সের ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং এটাও ধরে নিতে পারা যায় যে, প্রিন্স যখন হায়দরাবাদের গদিতে বসবেন, তখন লায়েক আলির প্রধান মন্ত্রিত্বেরও কোন ব্যতিক্রম হবে না। লায়েক আলির রাজনৈতিক গুরুত্ব ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই মনে হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় মিঃ ক্লড স্কটের সঙ্গে দেখা করলাম। স্কট এখানে গত পাঁচ মাস যাবৎ হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টের তথ্যবিভাগের অধ্যক্ষরূপে (ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন) কাজ করছেন। গত আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ে স্কটের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সহ-সম্পাদক ছিলেন। স্কটের মতো তুখোড় ও চতুর সাংবাদিককে পেয়ে হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট সংবাদ প্রচারের বিভাগীয় ব্যবস্থা যে বেশ পোক্ত ক'রে ফেলেছেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

স্কট বললেন, তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই যে, নিজামই এখনো হায়দরাবাদের সর্বেশ্বর। রেজভির এমন কোন শক্তি নেই যে, হায়দরাবাদের মুসলিম জনসাধারণকে নিজামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেন। নিজামের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য দুর্বল ক'রে দেওয়া রেজভির সাধ্য নয়। স্কট জানালেন, দক্ষিণ অঞ্চলে কম্যুনিষ্টদের উদ্যোগে পরিচালিত হাঙ্গামা এখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার রূপ গ্রহণ করেছে। কম্যুনিষ্ট হাঙ্গামাকারীর দল অনেক গ্রাম আক্রমণ করেছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, হিন্দুদের গ্রামগুলি তারা স্পর্শ করেনি।

সন্ধ্যার শেষ দিকে, সাড়ে সাতটার সময় আর একবার আলোচনার জন্য জেনারেল এল এদ্‌রুসের ভবনে গেলাম। নিজাম কেন দিল্লীতে যেতে রাজি হননি সে সম্বন্ধে এল এদ্‌রুসের মুখ থেকেই নতুন কতগুলি তথ্য জানবার ও শুনবার সুযোগ পেলাম। এল এদ্‌রুস বললেন, নিজামের দিল্লী না-যাওয়ার একটি কারণ এই যে, গেলে তিনি আর ফিরে আসতে পারতেন না। দিল্লীতে নিজামকে ধরে রাখা হবে, এই ভয় ছিল।

সামরিক ব্যাপারে হায়দরাবাদ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করলেন এল এদ্‌রুস। তিনি বললেন, এদিক দিয়ে হায়দরাবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং সুবিধাও আছে।—'হ্যাঁ, অস্ত্রবলে ও সৈন্যবলে হায়দরাবাদের বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর তুলনায় দুর্বল বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে যদি সামরিক সংঘর্ষ বাধে, তবে আমরা দক্ষিণ ভারতকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারি এবং ক'রে ফেলবো'। এই মন্তব্য করার পর এল এদ্‌রুস রাজনৈতিক বিষয়েও মন্তব্য করলেন। "যদি রাজনৈতিক নেতারা গোলমাল এবং আপত্তি না ক'রে ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদকে একটা সন্ধি স্থাপন করবার সুযোগ দিতে সম্মত হন, তবে বিরোধের অবসান হতে পারে। সন্ধিসূত্রের মধ্যেই এই চুক্তি সহজেই হতে পারে যে, হায়দরাবাদের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে।"

'এর বেশি আর কি আশা করেন ভারত?'—প্রশ্ন করলেন এল এদ্‌রুস। শেষ-পর্যন্ত এই কথাও জানিয়ে দিলেন সেনাপতি এল এদ্‌রুস—'যদি ভারত এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী করেন এবং তার জন্য চাপ দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তবে কোনই সন্দেহ নেই যে, আমরা ভাল ক'রেই বাধা দেব।'

এল এদ্‌রুস যা বললেন, স্কটও তাই বলেছেন। এ বিষয়ে উভয়েরই অভিমতে কোন পার্থক্য দেখলাম না।

ফিরে এলাম 'শাহ-মঞ্জিলে', লায়েক আলির বাসভবনে। আমাকে সম্বর্ধনা জানাবার উপলক্ষ্যে এখানে এক ভোজসভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রায় আশি জন অতিথি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অতিথিদের মধ্যে হায়দরাবাদের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিবর্গ আছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত বেশি সংখ্যক লোকের সঙ্গে আলাপ করার ফল যা হয়, তাই হয়েছে। লোকের কথাবার্তা থেকে অবস্থা সম্বন্ধে সমগ্রভাবে একটা ধারণা লাভ করতে পারছি না।

আলাপ হলো দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে। অল্পভাষী, পক্ককেশ ও ভারিক্কি চেহারার দীন ইয়ার জঙ্গ হলেন হায়দরাবাদ পুলিশের বড়কর্তা। অনেকের ধারণা, হায়দরাবাদের গদির পিছনে এই ব্যক্তিই হলেন আসল ক্ষমতার স্তম্ভ। স্কট আমাকে বলেছেন যে, গত ২৫শে অক্টোবরে যে ইত্তেহাদী জনতা হায়দরাবাদ ডেলিগেশনের তিন সদস্যের ভবন ঘিরে ধরেছিল, সেই জনতাকে পথ দিয়ে যেতে দেখেও অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন দীন ইয়ার জঙ্গ। তিনি অনায়াসে জনতাকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না ক'রে পাশ কাটিয়ে আড়ালে সরে গিয়েছিলেন।

দীন ইয়ার জঙ্গ প্রতিদিন একবার নিজামের সঙ্গে দেখা ক'রে থাকেন। দীন ইয়ার জঙ্গের মুখের ভাব ও কথাবার্তার রকম দেখে বুঝলাম যে, নিজাম তাঁকে আমার কাছ থেকে কিছু কথা বের করার জন্য বলে দিয়েছেন। নিজামের সঙ্গে

সাক্ষাৎ ও আলোচনা ক'রে আমি কি ধারণা করেছি, সম্ভবত এইটুকুই জানবার ইচ্ছা করছেন দীন ইয়ার জঙ্গ।

সামান্য কিছুক্ষণ দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। কিন্তু আমি এই সামান্য কিছুক্ষণের সুযোগেই আমার ধারণা দীন ইয়ার জঙ্গের কাছে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ ক'রে দিলাম। আমি বললাম—'অতিমান্য নিজাম যে পথ ধরেছেন, সেটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে অবিলম্বেই করতে হবে। নতুন অবস্থার সঙ্গে হায়দরাবাদকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যেসব সম্ভাব্য পন্থা আছে, সেই পন্থার কথাই চিন্তা করতে হবে, অন্য পন্থার কথা ছেড়ে দিয়ে।'

আর একটি বিষয়ও দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আলাপের মধ্যে উল্লেখ করলাম। নিজামের একবার দিল্লী যাওয়া উচিত ছিল। নিজাম দিল্লীতে গেলে কোন্ দিক দিয়ে এবং কি কি বিষয়ে নিজামেরই পক্ষে সুবিধাজনক হতো, সে সম্বন্ধে কতগুলি কথা দীন ইয়ার জঙ্গকে শুনিয়ে দিলাম।

শাহ-মঞ্জিলের এই ভোজসভার আসরে বসে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সামাজিক মেলামেশার একটি উৎসব এখানে হতে পারছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে সম্মিলিত হয়েছেন। যদিও এ উৎসবের পরিবেশের মধ্যেও একটা অস্ফূর্তির ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তবুও কারও চোখে-মুখে বা কথাবার্তায় এমন কোন ভাব দেখতে পাচ্ছি না, যাতে মনে হবে যে, ভয়ানক রকমের একটা সঙ্কট আসন্ন। হায়দরাবাদ রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রচারকার্যের দ্বন্দ্ব অবশ্যই চলছে, কিন্তু সেই মুখর বিরোধের কোন পরিচয় এই উদ্যানের আলো-ছায়া ও অভ্যাগতদের শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে পেলাম না। এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি, সম্মুখে হ্রদের জল শান্ত ও সুস্থির। দেখা যায়, গোলকুণ্ডার গিরিমালা এবং আরও দূরে গোলকুণ্ডার দুর্গ। সবই শান্ত। এই ভোজসভার আসরে যাঁদের দেখছি, তাঁদের জীবনে সমস্যা দেখা দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমস্যার জন্য এঁদের প্রাত্যহিক জীবনে তেমন কিছু উগ্রতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়নি। সমাজ ও মতবাদের দিক দিয়ে এঁরাও উত্তর ভারতের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এঁদেরই স্বসমাজী ও স্বমতবাদীর জীবন উত্তর ভারতে যে ভয়ানক হিংস্র ঘটনাবলীর অভিশাপে বিপর্যস্ত হচ্ছে, এখানে এখনো ঘটনার রূপ সেভাবে দেখা দেয়নি। এদিক দিয়ে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের তুলনায় বেশি ভাগ্যবান।

হায়দরাবাদ, সোমবার, ১৭ই মে, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আলি বলেছেন—'হায়দরাবাদে যখন এসেছেন তখন হায়দরাবাদের অন্যান্য অঞ্চলও একবার ঘুরে দেখে যাওয়া আপনার উচিত। আপনার ইচ্ছামতো যেকোন স্থান দেখে আসতে পারেন।'

আমি বললাম—'সবচেয়ে ভাল হয়, যদি হায়দরাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটি দেখবার সুযোগ পাই। শুনেছি, হায়দরাবাদের এই অঞ্চলটির উপরেই মাদ্রাজের দিক থেকে অনেকবার কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ হয়েছে।'

বিশেষ অনুগ্রহ করলেন জেনারেল এল এদ্রুস। আমার ভ্রমণের জন্য হায়দরাবাদ বাহিনীর একখানি এক্সপিডাইটার বিমান তিনি ছেড়ে দিলেন। প্রথমে যাব খামাম অঞ্চলে। আকাশপথে প্রায় চারশত মাইল যাতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এল এদ্রুস।

সকাল সাতটার সময় যাত্রা করলাম। খামামে পৌঁছতেই ব্রিগেডিয়ার হবিব আহমদ এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর বিভাগীয় অফিসারেরাও এলেন। এখান থেকে আবার মোটরযানে মোট

একশো আশি মাইল পথ ভ্রমণ করতে হলো। এখন এই অঞ্চলের গ্রীষ্ম দুঃসহ। সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে তাপমান ১১৮ ডিগ্রীরও উপরে উঠে গিয়েছে।

খামাম-মাদেইরা রোড ধরে অগ্রসর হলাম। মাদেইরা অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি হাঙ্গামা হয়েছে। প্রায় ষাটটি গ্রাম নিয়ে এই মাদেইরা মহল বস্তুত চারদিকে ভারতীয় অঞ্চলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শুধু একদিকে খুব সংকীর্ণ একটি ভূখণ্ডের দ্বারা হায়দরাবাদ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এই যোজক-পথটি কোনস্থানেই আধ মাইলের বেশি চওড়া নয়।

এই সংকীর্ণ যোজক-পথের কাছে এসেই আমাদের গাড়ি থেমে গেল, কারণ আরও অগ্রসর হবার পথে বাধা ছিল। এ বাধা গতকালও এখানে ছিল না। আজই সকালে ইঁট-পাথর জড়ো ক'রে রাস্তার উপর একটা বাধার প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার হবিব এই 'বাধা' সরিয়ে আরও অগ্রসর হতে চাইছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আরও ভিতরের দিকে ঢুকলেও কোন বিপদে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি আপত্তি করলাম, এবং এখান থেকেই ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরলাম। আমি বললাম যে, এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও আগ্রহেই এই অঞ্চলের অবস্থা দেখবার জন্য এসেছি। কিন্তু যদি এখানে কোন ঘটনা হঠাৎ হয়েই যায়, এবং আমাকে সে ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়, তাহ'লে মাউণ্টব্যাটেনকে এবং হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টকেও বিড়ম্বিত হতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদের সরকারী বিড়ম্বনা এবং মাউণ্টব্যাটেনেরও ব্যক্তিগত বিড়ম্বনার ব্যাপারে পরিণত হবে। এ রকম সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে আমি অগ্রসর হতে ইচ্ছা করি না। এখানকার কয়েকটা গ্রামের অবস্থা দেখবার লোভে আমি এত বড় ঝুঁকি নিতে পারি না।

ফিরে চললাম আমরা। এইবার খামাম-শিবরাওপেট রোড ধরে অন্য দিকে অগ্রসর হলাম। দু'পাশের গ্রামগুলির অবস্থাও চোখে পড়ল।

সত্যি সত্যি ধ্বংস ও ক্ষতির চিহ্ন খুব বেশি দেখলাম না। যেটুকু দেখলাম, সেটুকুও খুব বেশি ক্ষতির নিদর্শন নয়। কিন্তু আক্রমণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যটি সফল হয়েছে। এক একটা গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই ভিটে-মাটি ছেড়ে দিয়ে এবং সীমানা পার হয়ে চলে গিয়েছে।

'দেশীয় পদ্ধতি'তে পুল ধ্বংস করবার চেষ্টা কয়েকটি স্থানে হয়েছে, তার প্রমাণও দেখলাম। স্থানে স্থানে গাছের গুঁড়ি স্তূপীকৃত ক'রে রাস্তা রুদ্ধ করাও হয়েছে। এই ধরনের অশান্তির ব্যাপার দমনের জন্য হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং সামরিক দিক দিয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অবস্থা আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে গ্রামবাসীর মনে নিরাপত্তার ভাব আর নেই। গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত ও বিচলিত।

সড়কের ক্ষতি তেমন কিছুই নয়। যতগুলি সড়ক আমার চোখে পড়ল, সবই খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। যেটুকু ক্ষতি করা হয়েছিল, সেটুকু মেরামত ক'রে ফেলা হয়েছে।

শুল্ক অফিসগুলির উপরেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছে। শুনলাম, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যে এক-চল্লিশবার শুল্ক অফিসগুলির উপর আক্রমণ হয়েছে। ব্যাপকভাবে 'আবগারী গাছ', (তাড়ি তৈরীর জন্য সংরক্ষিত তাল গাছ) ধ্বংস করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের চিহ্ন দেখলাম শিবরাওপেট নামক গ্রামটির মধ্যেই। এই গ্রামটি মাদ্রাজ

প্রেসিডেন্সীর প্রায় গা ঘে'সে রয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে দু'-তিন হাজার গন্দ (স্থানীয় আদিবাসীগোষ্ঠী) এই গ্রামটি আক্রমণ করেছিল। সীমান্তের এপারে আর ওপারে, দু'দিকেই গন্দেরা বাস করে। শুনলাম, কম্যুনিষ্টদের পরিচালনায় এই গন্দের দল গ্রামটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়ে যায়। আক্রমণকারীরা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই ঘর লুণ্ঠন ও দগ্ধ করেছিল। স্থানীয় একজন অফিসার বললেন যে, প্রথম দিকে যেসব আক্রমণ হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে যে, আক্রমণকারীরা হিন্দু-মুসলমান বিচার করেনি। উভয় সমাজেরই ঘরবাড়ি লুঠ করেছে। কিন্তু শেষ দিকের আক্রমণগুলি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতেই চালিত হয়েছে এবং শুধু মুসলমানদের ঘর-বাড়ির উপরেই আক্রমণ হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার হবিব বললেন যে, এরই মধ্যে সামরিক ব্যবস্থার সাফল্য যেটুকু দেখা গিয়েছে, তাতে তিনি খুশিই আছেন। আক্রমণের ব্যাপারগুলি তেমন কিছু জবরদস্ত বা জোরদার ব্যাপার নয়। হঠাৎ এসে লুটপাট ক'রে পালিয়ে যাওয়া, সাধারণত এই হলো আক্রমণের পদ্ধতি।

জেনারেল এল এদরুসের প্রধান দপ্তরে সামরিক ব্যবস্থার মানচিত্রটি দেখে অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্যপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পেরেছি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হায়দরাবাদের শুধু এই দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার সংলগ্ন অঞ্চল নয়, পশ্চিম ও উত্তর সীমানাকেও বাইরের আক্রমণ সহ্য করতে হচ্ছে। বোম্বাই এবং মধ্য প্রদেশের দিক থেকেও আক্রমণ হচ্ছে। এর ফলে হায়দরাবাদ বাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্য সীমানার নানা দিকে ও নানা স্থানে ছড়িয়ে দিতে হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের মনে সাহস ও নিরাপত্তার ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হায়দরাবাদ বাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্যকে টহল দিয়ে ফিরতে হচ্ছে।

স্থানীয় পুলিশের প্রধান অফিসার সম্প্রতি সীমান্তের অন্য অঞ্চল (বোম্বাইয়ের দিক) থেকে ফিরেছেন। কথা প্রসঙ্গে এই পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'শান্তি রক্ষার কার্যে রাজাকর দলের কাছ থেকে আপনারা কিরকম সাহায্য পাচ্ছেন?'

পুলিশ অফিসার উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন—'সাহায্য করবার যোগ্যতাই বা কি আছে রাজাকরদের? ওরা শুধু জানে শহরের ভিতরে শোভাযাত্রা আর প্যারেড করতে এবং এ ছাড়া আর কোন যোগ্যতা ওদের নেই।'

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক জটিলতার একটা বিষয়ে বুঝতে পারলাম। যেমন হায়দরাবাদ রাজ্যের এক টুকরো জমি ভারতীয় অঞ্চলের ভিতর গিয়ে ঢুকে রয়েছে, তেমনি ভারতীয় অঞ্চলেরও একটি খণ্ড হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে রয়েছে। উভয় খণ্ডই মাত্র সংকীর্ণ এক একটি পথের দ্বারা নিজ নিজ রাজনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থাটাও অশান্তির সহায়ক এবং শাসনব্যবস্থার দিক দিয়ে উভয় গভর্নমেণ্টের পক্ষেই অসুবিধাকর। দুই গভর্নমেণ্টই যদি সীমানা একটু কাটছাঁট ক'রে ফেলতে রাজি হন, তবে কোন গ্রামকেই এভাবে 'বন্দীঅঞ্চল' হয়ে থাকতে হয় না এবং শাসনকার্যেরও সুবিধা হয়।

ফিরে এলাম খামামে এবং বিকাল হবার আগেই এক্সপিডাইটারের আরোহী হয়ে জ্বলন্ত আকাশপথে পাড়ি দিলাম। কী প্রচণ্ড গ্রীষ্ম! তাপমান কতদূর উঠেছে জানি না, কিন্তু বেশ অনুভব করতে পারলাম যে, আমার নিঃশ্বাস দিয়েই যেন আগুন বেরুচ্ছে। ধাবমান এক্সপিডাইটার যখন নীচের বায়ুস্তরে নেমে গোলকুণ্ডা গিরি-মালার শীর্ষের কাছাকাছি একটা চক্কর দিল, তখনই শুধু শীতল বাতাসে নিঃশ্বাস

নেবার সুযোগ পেলাম! মাটিতে পা দিয়েই বিস্মিত হলাম। দেখলাম একটি চা-এর আসর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই অভাবিত আয়োজনের মূলে রয়েছেন হায়দরাবাদের বৈদেশিক দপ্তরের উৎসাহী সেক্রেটারি জহির আহমদ। তিনি এরই মধ্যে চায়ের আসরে দশ-বার জন বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান নেতাকে এনে বসিয়ে রেখেছেন। মজলিসের নেতারা আছেন, রাজ্য কংগ্রেসের নেতারাও আছেন। এঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে একবার মুখ-দেখাদেখিও করেননি।

নতুন ও অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এই চায়ের আসরে। শাহ-মঞ্জিলের ভোজসভার সেই আলো-ছায়ার শান্ত পরিবেশ আর এই চায়ের আসরের পরিবেশে অনেক পার্থক্য। বুঝলাম, বড় বেশি উত্তাপ।

রাজ্য কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা মিঃ গার্নেরিওয়াল ও বিশিষ্ট মুসলিম সম্পাদক মিঃ রেইসের মধ্যে প্রথমেই গরম গরম কথার ও মন্তব্যের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়ে গেল। মিঃ রেইস আবার হায়দরাবাদ আইনসভার সদস্য। দু'জনেই নিজের নিজের অভিমত একেবারে চরমে তুলে নিয়ে তর্ক করলেন।

মিঃ রেইস বললেন যে, কংগ্রেসের কোন মুখপাত্রের কোন অভিমতকে তিনি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে রাজি নন, যতক্ষণ কংগ্রেসের রাজনৈতিক আনুগত্যের রূপ সুস্পষ্ট না হয়। এদিকে নিজাম আর ওদিকে ভারত, দু'দিকে দু'রকম আনুগত্য রাখার অভ্যাস কংগ্রেসকে ছাড়তে হবে।

মিঃ গার্নেরিওয়াল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে, তিনি হায়দরাবাদের কোন গভর্নমেণ্টের ধার ধারবেন না, যতদিন না জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিক্ষুব্ধ চায়ের আসরে বসে কংগ্রেসী ও মজলিসী নেতাদ্বয়ের বিতণ্ডা শুনলাম। মুসলিম নেতাদের মধ্যে অনেকেই হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বললেন যে, এ বিষয়েও হায়দরাবাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করা উচিত হবে না। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। মুসলিম নেতাদের অনেকেই শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, ভারত ইউনিয়ন হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতির স্বতন্ত্রতা লুপ্ত ক'রে দিতে ইচ্ছা করছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতিকেও এক ক'রে ফেলবার প্রস্তাবে এঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্ষুব্ধ হবার বিশেষ একটি কারণও আছে এবং সেটা এঁদেরই কথা থেকে বুঝতে পারলাম। পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত যদি বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেন, তবে হায়দরাবাদ কেমন ক'রে সেই নীতিকে অনুমোদন করবে? এ কি সম্ভবপর? এই প্রশ্নই হায়দরাবাদের মুসলিম নেতাদের চিন্তা অধিকার ক'রে রয়েছে।

দু পক্ষের নেতারাই অবশ্য একটি বিষয়ে একমত হলেন। হায়দরাবাদের সমস্যা হায়দরাবাদের 'ভিতর' থেকেই সমাধান করতে হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেটা হায়দরাবাদেরই ভিতর থেকে এবং হায়দরাবাদের নিজের চেষ্টাতেই করতে হবে। বাইরের হস্তক্ষেপে কোন সমাধান সম্ভবপর নয় এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কংগ্রেস পক্ষের নেতারাও বললেন যে, নিজামের প্রতি তাঁদের আনুগত্য আদৌ শিথিল হয়নি এবং সেরকম কোন সম্ভাবনাও নেই। মজলিসী নেতা মিঃ রেইস হঠাৎ বলে ফেললেন যে, হায়দরাবাদ হলো একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং প্রশ্ন হলো—এই মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকবে কাদের হাতে? মিঃ রেইস বললেন, হায়দরাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত

করার ব্যাপার নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সোজা কথায়, এই দ্বন্দ্বই হলো বর্তমান হায়দরাবাদের সমস্যা। আরও সোজা সত্য কথা এই যে, এই দ্বন্দ্বে হায়দরাবাদের মুসলমানেরা তাদের ক্ষমতা কোনমতেই ছেড়ে দিতে রাজি হবেন না।

চা-পানে পরিতৃপ্ত হতে পারছিলাম না। অন্য কিছু পানীয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সুতরাং গাত্রোত্থান করলাম।

আমি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের আসরও ভেঙ্গে গেল। সকলেই বিদায় নিলেন। সভাভঙ্গের পর বিদায়ের দৃশ্যটাও চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাত ধরে বললেন—আজ চলি, আবার দেখা হবে।

ভদ্রমণ্ডলীর কাছ থেকে আমিও নানারকম প্রশংসার উপহার লাভ করলাম। সকলেই একবাক্যে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা প্রকাশ করলেন যে, বয়সে অল্প হলেও আমার মোটামুটি ভাল রকমেরই বিচক্ষণতা আছে। চায়ের আসরে দুই বিপরীতের মিশ্রণ দেখে আমি আবার বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বাইরের ঘটনার দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় যে, চায়ের আসরের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মন রাজনৈতিক কারণে কিরূপ তিক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক তিক্ততা সত্ত্বেও সামাজিক আচরণে কি অদ্ভুত সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের ভাব!

সভাভঙ্গের পর এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি এসে সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম, তার মধ্যে স্পষ্ট ক'রে কোন মন্তব্যের ধার-কাছ দিয়েও গেলাম না। যা বললাম, সেটা বস্তুত কিছু না বলারই মতো। রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে, সেখানে সামান্য কোন মন্তব্য করলেই কোন-না-কোন পক্ষ থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় দেখা দেবে, এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আমার ধারণা, মন্তব্য না করলেও সমালোচনা হবে। কিন্তু এটা জানি যে, সেক্ষেত্রে সমালোচনার পরিমাণও তেমন বেশি কিছু হবে না। আমার বিশ্বাস, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপকভাবে আমার দৌত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের বা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্ভাবনা আমি সযত্নে পরিহার করতে পেরেছি।

রাত্রি আটটার সময় প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ আলাপও এবার শেষ হলো।

লায়েক আলিকে আমি বললাম—ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে এই আশঙ্কা ক'রেই নিজাম দিল্লী যেতে রাজি হননি, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

লায়েক আলি বললেন—নিজামের মনে হয়তো এ ধরনের একটা সন্দেহ ছিল; কিন্তু দিল্লীর আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধানত অন্য একটি কারণে এবং সেটাই হলো আসল কারণ। নিজামের ধারণা এই যে, তিনি দিল্লী গেলে হায়দরাবাদের ভিতরেই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতো এবং সেটা তাঁর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতো।

লায়েক আলিকে আমি আর একটি বিষয়ে আমার মনের কথা জানিয়ে দিলাম। ইংলণ্ডের বিরোধী দলের মুখ চেয়ে বসে থাকার কোন অর্থ নেই, চার্চিলের নেতৃত্বে চালিত বিরোধী দলের কাছ থেকে নিজাম সমর্থন লাভ করবেন, এই বিশ্বাস ও আশার উপর নির্ভর ক'রে থাকা নিতান্তই ভুল। আমি বললাম—নিজামকে ইংলণ্ডের বিরোধী দলের সমর্থনের আশা ক'রে বসে থাকতে দেখে আমি দুশ্চিন্তাই বোধ

করছি। এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, বিরোধী দলের সমর্থন আশা করা নিজামের পক্ষে বস্তুত একটা বিপজ্জনক কল্পনায় মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রিটেনের কমন্স সভায় বিভিন্ন দলের বিতর্কে ও মতভেদে হায়দরাবাদ সত্যি সত্যিই যদি একটা প্রশ্ন হয়েও ওঠে, তবুও তাতে হায়দরাবাদের তথা নিজামের কোন লাভ হবে না।

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি আমার প্রত্যেকটি যুক্তির সত্যতা স্বীকার করছেন। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কোন মতভেদ নেই। লায়েক আলি আরও বললেন যে, ব্যক্তিগতভাবে এটলির সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন। লায়েক আলিও চান না যে, হায়দরাবাদের প্রশ্ন নিয়ে ইংলণ্ডের বিভিন্ন দলের মধ্যে কোথাও মতভেদ ও তর্কের হানাহানি হোক।

আমি হায়দরাবাদে আসাতে খুবই প্রীত হয়েছেন লায়েক আলি—আলোচনার উপসংহারে তিনি এই কথা জানালেন। আরও বললেন, আমার হায়দরাবাদ আগমন সব দিক দিয়ে খুবই সহায়ক হয়েছে।

জইন নওয়াজ জঙ্গের পুত্রের ভবনে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। জইনের পুত্র ও সুন্দরী পুত্রবধূর সঙ্গে এক টেবিলে আহারের পর্ব সেরে নিলাম। তার পরেই জইনের কাছ থেকে আহ্বান এলো, আমার সঙ্গে একবার তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। আজই বিকালে দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে এসেছেন জইন।

জইনের ভবনে যখন পেঁাছলাম, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। জইন বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদে পেঁাছেই নিজামের সঙ্গে দেখা করেছেন। নিজাম আবার ভয়ানক রকমের চটেছেন।

জইন বললেন, কিন্তু সর্বদা চটে থাকাই তো তাঁর স্বভাব।

নিজামের সঙ্গে কি বিষয়ে জইনের আলাপ হয়েছে, তার বিবরণও শুনলাম। নিজের রাজ্যে নিজের ইচ্ছামতো আইন করবার ক্ষমতা হাতছাড়া করতে রাজি নন নিজাম। আইন প্রণয়নে নিজামের 'সার্বভৌম' ক্ষমতা এক বিন্দুও এদিক-ওদিক হতে দিতে তিনি চান না। এ বিষয়ে মনোভাব অত্যন্ত কঠিন ক'রে বসে আছেন নিজাম।

জইন নিজামকে বলেছেন যে, বর্তমানে যে গভর্নমেণ্ট রয়েছে, সে গভর্নমেণ্টকে দিয়ে আর কাজ চালান উচিত নয়। গভর্নমেণ্ট গঠনের ভিত্তি আরও প্রশস্ত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় এবং তার খুব প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল একটি নতুন গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে গঠন করা কর্তব্য।

জইনের কথা থেকে বুঝলাম যে, শেষপর্যন্ত নিজাম ও লায়েক আলি উভয়েই এই পরিবর্তনটুকু করতে রাজি হয়েছেন—বর্তমান গভর্নমেণ্টের বদলে একটি অধিকতর জনপ্রতিনিধিত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠন।

জইনের কাছে আমার কথাও উল্লেখ করেছেন নিজাম। নিজাম বলেছেন, 'আমি আমার মনের কোন কথা চেপে না রেখে ঐ লোকটিকে সব বলে দিয়েছি। কিন্তু মাউণ্ট-ব্যাটেন যে হায়দরাবাদে এখন আসবেন, এমন কোন আশাই আর দেখতে পাচ্ছি না।'

জইনের কাছেও প্রশ্ন করেছেন নিজাম—'আপনি কি মনে করেন? মাউণ্টব্যাটেন কি আসবেন?'

জইন উত্তর দিয়েছেন—মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এখান থেকে দিল্লীতে ফিরে গিয়ে তাঁকে যে ধরনের রিপোর্ট দেবেন, তারই উপর অনেকটা নির্ভর করছে মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে আসবেন কি না।

একথা শোনবার পর নিজাম আমার সম্বন্ধে জইনের কাছে প্রশ্ন করেছেন—সত্যি সত্যি ঐ লোকটা কে বলুন তো? কি করে লোকটা? ওর রাজনীতিই বা কি ধরনের?

আমার কাছে এইবার জইন তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। তাঁর ধারণা, সমস্যার সমাধান হতে পারে, যদি আইন প্রণয়নে নিজামের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা বিশেষ নীতি ভারত গভর্নমেণ্ট স্বীকার করতে রাজি হন। আইন প্রণয়নে নিজামের কিছুটা ব্যক্তিগত ক্ষমতা ভারত স্বীকার ক'রে নিলে গোলমাল অনেকখানি মিটে যায়। জইন বললেন, এদিক দিয়ে ভারত সরকার একটু উদার হলে 'রাষ্ট্রভুক্তি' কথাটার বিরুদ্ধে নিজামের আপত্তিকেও দূর করা সম্ভবপর হবে।

জইন বললেন যে, তিনি আগামী মঙ্গল ও বুধবার নিজামের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাবটিই উত্থাপন করবেন। আইন প্রণয়নে নিজামের কিছুটা ব্যক্তিগত ক্ষমতা যদি স্বীকৃত হয়, তবে রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবেও সম্মত হওয়া চলতে পারে, এই হলো জইনের প্রস্তাব। অবশ্য রাষ্ট্রভুক্তির অর্থ ভারতকে তিনটি মাত্র ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ব্যাপার বোঝাবে, আর কোন ক্ষমতা নয়। 'দেখি, নিজাম সম্মত হন কি না'—জইন বললেন।

জেনারেল এল এদরুসের সঙ্গেও আলোচনা করবেন জইন। জইন বললেন, 'দিল্লী এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে, এল এদরুস রাজাকর দলকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে অত্যন্ত উদ্বেগ ও তিক্ততা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এল এদরুসকে স্পষ্ট ক'রেই কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৮ই মে, ১৯৪৮ সাল : প্রাতঃরাশ সমাপনের পর মীর লায়েক আলির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ক্যাপ্টেন বেগ বিমান ময়দান পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। এইবার হায়দরাবাদের কাছ থেকেই বিদায় নিলাম।

হায়দরাবাদ এসে সকল পক্ষের নেতাদের কাছ থেকেই তাঁদের অভিমত জানবার সুযোগ পেয়েছি। এদিক দিয়ে আমাকে কোন বাধা পেতে হয়নি। সকলে মন খুলেই কথা বলেছেন। দীন ইয়ার জঙ্গ অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি কথা বলেছেন খুবই কম। কিন্তু নীরব দীন ইয়ার জঙ্গও আমার বক্তব্য বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনেছেন এবং তাঁর আচরণেও সৌজন্যের কোন অভাব হয়নি।

আরও একটা কথা ভাবছি। আমার হায়দরাবাদ আগমনে এবং হায়দরাবাদের এই সব বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলোচনায় কোন সুফল হলো কি না? আমার ধারণা, একটা সুফল হয়েছে। একটা কুছ-পরোয়া-নেই ধরনের মনোভাব এখানে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যেন একটা ইজ্জতের লড়াই আরম্ভ হয়েছে এবং হয় ইজ্জৎ নিয়ে বাঁচব না হয় মরব—এই রকম একটা মনোবৃত্তির প্রভাবেই এখানকার রাজনৈতিক সমস্যা কঠিন ও জটিল হয়ে ছিল। আমার ধারণা, আমি আসাতে এই মনোভাব অনেকটা নরম হয়েছে। আলোচনার পথে এখনো কাজ হতে পারে এবং আলোচনার পথ খোলাও আছে, এই ধারণা খুবই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি অন্তত এইটুকু করতে পেরেছি যে, আলোচনার পথেই মীমাংসার জন্য আর একবার চেষ্টা করার কথাটা অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

নিজামই হায়দরাবাদের প্রধান 'শক্তি'। নিজামের অনুমোদন, ইঙ্গিত অথবা পরামর্শ ছাড়া হায়দরাবাদের কোন নীতিই রচিত হয় না। ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের আচরণ ও মনোভাবের প্রত্যেকটি ব্যাপার নিজামেরই অনুমোদনে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটাও নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি যে, ভারতের সঙ্গে কোন

ব্যবস্থায় অথবা কোন চুক্তি পালনে যদি প্রতিশ্রুতি দান করেন নিজাম, তবে সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদাও তিনি রক্ষা করবেন। রক্ষা করবার শক্তিও তাঁর আছে। তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন পক্ষ যদি আপত্তি করে, অথবা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়, তবে নিজাম সেই আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ দমন করতেও পারবেন।

অদ্ভুত একপ্রকারের 'জবরদস্ত অদৃষ্টবাদে'র প্রকোপে অভিভূত হয়ে আছে নিজামের মন। ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আচরণে তিনি বস্তুত 'স্যামসন' পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছেন। এ কাজ করার মতো শক্তিও তাঁর আছে। যদি ভারত গভর্নমেণ্টের কোন নীতি, কাজ বা চাপের ফলে নিজামকে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার হারাতে হয়, তবে তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ রাজ্যের সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক আয়তনও যেন ভেঙ্গে পড়ে। যাতে ভেঙ্গে পড়ে, সেই ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন নিজাম। এ ছাড়া রয়েছেন কাশিম রেজভি। তিনি যে পন্থায় কাজ ক'রে যাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্যও বস্তুত নিজামের এই পরিকল্পনাকেই সাহায্য করা। হায়দরাবাদ রাজ্যকে যদি ভাঙ্গতেই হয়, তবে সে ভাঙ্গন একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে দিতে হবে, এই হলো রেজভি-নীতি। ভগ্ন হায়দরাবাদও ভারত গভর্ন-মেণ্টের কাছে একটা সমস্যা হয়েই থাকবে। হয়তো সামরিক শক্তির সাহায্যে হায়দরাবাদ জয় ক'রে নেবেন ভারত গভর্নমেণ্ট, কিন্তু জয় ক'রে নেবার পরেও হায়দরাবাদের সমস্যার যেন সমাধান না হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই রেজভি কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও নিজাম আবার আর একদিক দিয়ে এবং প্রচ্ছন্নভাবে একটা মীমাংসাই খুঁজছেন। তাঁর পক্ষে যাতে যথোচিত মর্যাদাসম্মত একটা মীমাংসা হয়, তারই জন্য আড়ালে আড়ালে এবং পাকে-প্রকারে একটা চেষ্টা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজাম। 'নিয়মতান্ত্রিক অধিপতি'র পদ গ্রহণের প্রস্তাব তিনি অমর্যাদাকর বলেই মনে করেন। এই 'ফাঁদে' তিনি আবদ্ধ হতে চান না। এবিষয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মনে যে ধরনের আপত্তি ছিল, নিজামের মনেও যেন সেই ধরনের আপত্তি ও প্রতিবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে রয়েছে।

আমার ধারণা, বাস্তব অবস্থা ও যুক্তির দিক দিয়ে নিজাম যতই কোণঠাসা হয়ে পড়বেন, তিনি ততই বেশি ক'রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভুত্বের 'বিশেষ অধিকার' নিয়ে জেদ আর বাড়াবাড়ি করতে থাকবেন। নিজাম যে স্বেচ্ছায় 'রাষ্ট্রভুক্তি' স্বীকার ক'রে নেবেন, এটা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। নিজেরই রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন ও কানুনের মাত্র একজন 'সরকারী' নিয়ন্তা হয়ে থাকতে হবে, এ অবস্থা মেনে নিতে কখনই রাজি হবেন না নিজাম।

অনেকেই অবশ্য এখনো এই ধারণা করছেন যে, একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা মীমাংসার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজাম এটা বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে নিজামের মনে যথেষ্ট সংশয় আছে।

আপাতত নিজামের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার মতো আর কিছু নেই। নিজামের সঙ্গে আলোচনা ক'রে মতভেদের অথবা বিরোধীয় বিষয়গুলির কোন মীমাংসা বা সামঞ্জস্য সাধনের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র ভরসা, ভি পি মেনন ও জইন ইয়ার জঙ্গ। এই দুই ব্যক্তি যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে মতভেদের বিপুলতা ও জটিলতা হ্রাস ক'রে ফেলতে এবং মীমাংসার কোন সূত্র নির্ণয় করতে পারেন, তবেই মাউণ্টব্যাটেনের 'শেষ চাপে' একটা সুফল হতে পারে।

দিল্লীতে এসেই আমি প্রথমে গিয়ে ভি পি'র সঙ্গে দেখা করলাম। ভি পি এখন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।

ভি পি বললেন যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রার ফল ভালই হবে বলে তিনি মনে করছেন। আমি হায়দরাবাদের সেই বিশেষ দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন প্রণয়নে নিজামের ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী। ভি পি এবিষয়টি আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন না এবং আলোচনা করবার কোন আগ্রহও ভি পি'র আচরণে দেখা গেল না। বুঝতে পারলাম হায়দরাবাদ সম্বন্ধে ভি পি'র মনোভাব আগের তুলনায় এখন আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে। আমি হায়দরাবাদে যাবার আগে ভি পি-কে হায়দরাবাদের প্রতি এতটা শক্ত হতে দেখিনি। এখন এসে দেখছি, এই ক'দিনের মধ্যেই তাঁর ধারণা অনেকখানি বদ্‌লে গিয়েছে।

জইন আর কয়েক দিনের মধ্যেই হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী এসে পেঁাছবেন। আমি ভি পি'কে অনুরোধ করলাম—জইন না আসা পর্যন্ত এবং তাঁর সঙ্গে আপনার একটা আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আপনি হায়দরাবাদ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ধারণা অবলম্বন করবেন না।

ভি পি বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদকে 'চূড়ান্ত প্রস্তাব' জানিয়ে দেবার কথাই চিন্তা করছেন। চূড়ান্ত প্রস্তাবের বক্তব্যগুলিও কিছু কিছু উল্লেখ করলেন ভি পি। কিন্তু আমারও শরীরের ও মনের ক্লান্তিও চূড়ান্ত অবস্থা লাভ করেছিল। ভি পি'র বক্তব্য ও বক্তব্যের যৌক্তিকতা বুঝতে আমারও অসুবিধা হলো। বুঝতেও পারলাম না।

দিল্লীর গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে লর্ড
ও লেডি মাউণ্টব্যাটেনের শেষ বিদায়

বিদায় পর্ব

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২০শে মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেন আছেন সিমলাতে। আমাকেও সিমলা যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে আমার হায়দরাবাদ-দৌত্যের একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েছি। পুরো একটা দিন রিপোর্ট লিখতেই কেটে গেল।

আজ বিকালে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও অভিমত মোটামুটি-ভাবে নেহরুর কাছে বর্ণনা করলাম।

নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের ইতিহাসটাই অগৌরবের ইতিহাস। যখনই বাইরের কোন শক্তি হায়দরাবাদের উপর চাপ দিয়েছে, তখনই হায়দরাবাদ আত্মসমর্পণ করেছে, কখনো প্রতিরোধ করেনি। মারাঠা শক্তির দাপটে হায়দরাবাদ কিভাবে ভেঙেগ পড়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করলেন নেহরু।

নেহরু বুঝেছেন যে, নিজাম তাঁর ধনরত্নের পুঁজি এবং ব্যক্তিগত 'বিশেষ অধিকার' রক্ষা করার জন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নেহরু বললেন, এ বিষয়ে তিনি নিজামকে আশ্বাস দিতে রাজি আছেন। হায়দরাবাদের উপরে ভারতীয় সংবিধান চাপিয়ে দেবার কোন উদ্দেশ্য নেহরু পোষণ করেন না। হায়দরাবাদ রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হলে হায়দরাবাদের উপর 'তিনটি' অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার লাভের কথা চিন্তা করেন না ভারত গভর্নমেণ্ট। যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তবে সে বিষয় নতুন ক'রে এবং ভিন্নভাবে আলোচনা করা হবে, তার জন্য স্বতন্ত্র চুক্তিরও প্রয়োজন হবে। নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের সৈন্যবাহিনীকেও গ্রাস ক'রে ফেলবার, অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করবার কোন পরিকল্পনা তিনি পোষণ করেন না।

নিজামের ধর্মবিশ্বাসের কথা এবং মহরম সম্বন্ধে নিজামের মন্তব্যও নেহরুর কাছে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম। নেহরু বললেন যে, মহরম সম্বন্ধে নিজামের আগ্রহপূর্ণ উক্তির একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই কেন্দ্র ক'রে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তার ফলে মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নি নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। হায়দরাবাদী মুসলমানেরা হলেন সুন্নি। অনেকেই সন্দেহ করেন যে, নিজাম হলেন প্রচ্ছন্ন শিয়া।

নিজামের মতিগতি বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য—মন্তব্য করলেন নেহরু। হয় জীবনে গৌরব ও ইজ্জৎ, নয় মৃত্যু—এরকম বীরত্বপূর্ণ ভাবনার দ্বারা নিজামের প্রকৃতি গঠিত কি না, সে বিষয়ে নেহরুর সন্দেহ আছে। নেহরু বললেন, নিজাম যে কোন-রকমের বীরোচিত ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ সে যোগ্যতা তাঁর একেবারেই নেই।

জইন দিল্লীতে এসেছেন, কিন্তু ভি পি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কি না, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু আজই রাত্রি ৯টার সময় ভি পি জইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য হায়দরাবাদ হাউসে উপস্থিত হলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম।

ভারত হতে মাউণ্টব্যাটেনের বিদায়ের অবধারিত দিনটি ক্রমেই নিকটতর হয়ে

আসছে। ওদিকে হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমানা-অঞ্চলের অবস্থাও উপদ্রবে ও উত্তেজনায় অস্থির। ভি পি এখন অত্যন্ত স্পষ্ট এবং কঠোরভাবেই বলতে আরম্ভ করছেন—এ অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না।

জইনের সঙ্গে আলোচনায়ও কোন ফল হলো না। পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য কয়েকটি কর্মসূচীর প্রস্তাব এই আলোচনার মধ্যে উত্থাপিত হলো ঠিকই, কিন্তু উত্থাপিত হলো মাত্র। দু'পক্ষই সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

মাত্র এই প্রস্তাব করা হলো যে, মীর লায়েক আলিকে আগামী ২২শে তারিখে দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে। নেহরু এবং ভি পি যাবেন মুসৌরীতে, প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য। আর, মাউণ্টব্যাটেনকে তৈরী থাকতে হবে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারে শেষবারের মতো কিছু করবার জন্য।

সিমলা, শনিবার, ২২শে মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেন এবং তাঁর স্টাফের সকলেই এখন সিমলাতে রয়েছেন। আমি হায়দরাবাদে যাত্রা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাউণ্টব্যাটেনও দিল্লী থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার এক সপ্তাহের ব্যস্ততা আজ শেষ অধ্যায়ে এসে পেঁছিল। ফে ও আমি দিল্লী থেকে রওনা হয়ে আজই সিমলাতে পেঁছেছি।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। আজকেই দু'বার আলোচনা হয়েছে। আমার রিপোর্ট আদ্যোপান্ত শুনলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, আমাকে আরও কিছুদিন আগে হায়দরাবাদে পাঠালেই ভাল হতো। আমার রিপোর্ট শুনে মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণাই হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, আমার প্রদত্ত হায়দরাবাদ রিপোর্টের বিশেষ মূল্য এই যে, এতে সমস্যার বাস্তব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা নয়, অন্য উপায়ে কিভাবে হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হতে পারে, তারই পরিচয় এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে নিস্পৃহ থাকতে পারেননি। তার একটা কারণ এই যে, নিজামের উপদেষ্টা মঙ্কটনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই আগ্রহও রয়েছে যে, ভারত থেকে চলে যাবার আগেই হায়দরাবাদ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান ক'রে দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং হায়দরাবাদের সমস্যাকে নিছক একটা সরকারী সমস্যা বলে ধারণা করা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও আগ্রহ নিয়েই তিনি এই সমস্যার মধ্যে নিজেকে মনে মনে জড়িয়ে ফেলেছেন। সেই জন্য সমাধানের পন্থা নির্ণয়েও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে তিনি নিজেকে একেবারে মুক্ত ক'রে রাখতে পারেননি।

এই প্রসঙ্গে আমি মাউণ্টব্যাটেনকে অকপটভাবেই আমার মনের কথা বলে দিলাম—'আমার ধারণা, নিজাম আপনার ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর নির্ভর করতে ইচ্ছা করেন না। নিজাম বরং পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল রাজগোপালাচারীর কাছ থেকেই বেশি কিছু আশা করেন। রাজগোপালাচারী স্বয়ং দক্ষিণ ভারতের লোক এবং দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের অধিপতি নিজাম সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয় তথা মাদ্রাজী গভর্নর-জেনারেলের সদিচ্ছার উপর বেশি নির্ভর ক'রে রয়েছেন।'

নিজামের নৈতিমূলক মনোভাব দেখে মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা করছেন না। তিনি খুশি হয়েছেন যে, হায়দরাবাদের শাসকগোষ্ঠীর মনে সঙ্কট সম্বন্ধে একটা সচেতনতার ভাব জাগ্রত করতে পারা গিয়েছে। রিপোর্ট থেকে তিনি

এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, আবার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য হায়দরাবাদের মনে আগ্রহের ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইটুকুই আমার হায়দরাবাদ-দৌত্যের সবচেয়ে বড় লাভ। ভারত ও হায়দরাবাদ, দু'পক্ষই সম্ভবত এবিষয়ে 'অচল' হয়ে পড়েছিলেন এবং চেষ্টার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, দু'পক্ষই নতুন ক'রে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হতে রাজি আছেন।

সিমলায় গভর্নর-জেনারেলের ভবনে আজ বৈকালে মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে পূর্ব পাঞ্জাবের যত সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সমাজের নরনারী এক প্রীতি-সম্মেলনে সমবেত হলেন। কিংখাবের পরিচ্ছদ আর রেশমী শাড়ির এক মনোহর প্রদর্শনী। তার উপর ব্যাণ্ডের বাজনা। লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন উদ্যানের আসরে ঘুরে ফিরে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৫শে মে, ১৯৪৮ সাল : ভের্নন ও আমি সিমলার শীতল আশ্রয় ছেড়ে গত রবিবারেই দিল্লীর উত্তপ্ত চুল্লীর মধ্যে ফিরে এসেছি। পাতিয়ালাতে একটি দিন কাটিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও আজ দিল্লীতে ফিরেছেন। মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী পৌঁছতেই তাঁকে আমরা খবর দিলাম—লায়েক আলি গত রবিবারেই দিল্লী এসে বসে রয়েছেন।

লায়েক আলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিচয়ও মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে লায়েক আলির সঙ্গে আমার আর একবার কথাবার্তা হয়েছিল। আর একবার উপলব্ধি করেছি যে, লায়েক আলি এবারও ভাল মন নিয়ে দিল্লীতে আসেননি। সমস্যা এড়িয়ে যাবার সেই পুরনো কৌশলটিই মনের ভিতর সযত্নে ধারণ ক'রে তিনি দিল্লীতে এসেছেন। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, সঙ্কট পার হওয়া গিয়েছে এবং আর চিন্তা করার কিছু নেই—এই ধরনের ভাব দেখাচ্ছেন লায়েক আলি। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনকে লায়েক আলির এই মনোভাব সম্বন্ধে আগে থেকেই সচেতন ক'রে দিলাম; কারণ, লায়েক আলির সঙ্গেই মাউণ্টব্যাটেনকে এখন শেষবারের মতো আলোচনার পর্ব শেষ ক'রে দিতে হবে।

আলোচনা হলো। শুনলাম, লায়েক আলির সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের আজ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে। ভারতে এসে কোন ঘটনায় অথবা কোন কাজের সূত্রে মাউণ্টব্যাটেনকে কখনো কারও সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় আলোচনার জন্য ব্যয় করতে হয়নি।

এখানে মাউণ্টব্যাটেন ও লায়েক আলির মধ্যে যখন আলোচনা চলছে তখন হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে ঘটনার পর ঘটনায় অশান্তিই বেড়ে চলেছে। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে সীমানা অঞ্চলে অনেক হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বাহিনীও সীমানা অঞ্চলের সন্নিকটে থেকে কাজ করছে। অশান্তি ও উপদ্রব আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে ভারতীয় সৈন্য। সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হলো গাঙ্গপুর ট্রেণ আক্রমণের ঘটনা। এই ঘটনায় দুজন হিন্দু নিহত হয়েছে, কিছু সংখ্যক হিন্দু আহত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক হিন্দুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনার সংবাদে ভারতের জনমতও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার হায়দরাবাদ যাত্রার দু'দিন আগেই এখানে দেশরক্ষা কমিটির এক বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, সীমানা অঞ্চলের অশান্তি দমনের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলতে থাকবে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী হঠাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ফেলবে না। অশান্তি দমনের জন্য ব্যবস্থা হিসাবে কোথাও সৈন্য চালনা করতে হলে সামরিক কর্তৃপক্ষ দশ দিন আগে নোটিশ

দিয়ে জানিয়ে দেবেন। মাউণ্টব্যাটেনও নেহর্র কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য আদায় ক'রে রেখেছিলেন যে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে কোথাও সৈন্য চালনা করা হবে না। ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যা অথবা এই ধরনের অতি গর্হিত অশান্তিকর ঘটনা যদি কোথাও হতে দেখা যায়, তবেই ভারতীয় সৈন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নেহর্। এ ছাড়া অন্য কোন কারণে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না ভারত গভর্নমেণ্ট। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভারত থেকে চলে যাবার আগে অথবা বর্ষা ঋতু দেখা দেবার আগে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যক্ষ-ভাবে হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হবে না।

সুতরাং, সময় এখনও আছে, কিন্তু খুবই কম সময়। এই অবস্থায় দু'পক্ষকে বুঝিয়ে শান্তিপূর্ণ কোন ব্যবস্থায় সম্মত করা কি সম্ভবপর হবে?

সম্ভবপর হবে, যদি এখনই শক্ত হাতে লায়েক আলিকে সায়েস্তা ক'রে ফেলা যায়। আসন্ন পরিণাম সম্বন্ধে লায়েক আলিকে রূঢ়ভাবেই সচেতন ক'রে দিতে হবে এবং স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে যে, লুকোচুরি খেলা আর চলবে না। হায়দরাবাদ রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে বেপরোয়াভাবে এত দিন ধরে যে জুয়া খেলছেন লায়েক আলি, সে খেলা ছাড়তে হবে। আর কোন দ্বিধা না ক'রে লায়েক আলিকে এখন জানিয়ে দিতে হবে যে, এ ধরনের রাজনৈতিক জুয়াবাজির দ্বারা তিনি নিজেরও ভাগ্য কণ্টকিত ক'রে তুলছেন।

সিমলাতেই মাউণ্টব্যাটেনকে আমি একথা না বলে পারিনি যে, লায়েক আলি যে মনোভাব অবলম্বন ক'রে রয়েছেন, তাতে লোকটিকে একটি বড় রকমের বুদ্ধিমান মূর্খ বলেই মনে করতে হয়। প্রত্যেকটি নিকৃষ্ট কাজের পক্ষে উৎকৃষ্ট যুক্তি, প্রত্যেকটি অন্যায়ের পক্ষে অজস্র ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ৎ দেবার এক অদ্ভুত অভ্যাস আছে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির।

মাউণ্টব্যাটেনও লায়েক আলিকে এইবার কঠোরভাবেই ধরেছেন। আলোচনার আরম্ভেই মাউণ্টব্যাটেন লায়েক আলিকে এই রূঢ় ও বাস্তব সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, পরিণাম সুবিধার হবে না। লায়েক আলিকে একবার কল্পনা ক'রে দেখতে বললেন মাউণ্টব্যাটেন—"কল্পনা করতে পারেন, কি দশা হবে আপনাদের, যদি হায়দরাবাদে একবার হিন্দুর রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়? আমি ভারত থেকে চলে যাবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যদি সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন ভারত গভর্নমেণ্ট, তবে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারেন? আপনার হায়দরাবাদের ফৌজ কি কিছু করতে পারবে?"

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদ ফৌজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন আছেন। হায়দরাবাদের সামরিক দুর্বলতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু উপায় কি? এত দিন ধরে অপর রাষ্ট্রের (ব্রিটেনের) অধিরাজক ক্ষমতার অধীন ছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু তা'ও ভাল ছিল। ভারতের সঙ্গে একরাষ্ট্রভুক্ত অবস্থা সেই অধিরাজক ক্ষমতার অধীন অবস্থার চেয়ে দশ গুণ বেশি খারাপ।

লায়েক আলি আরও কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রবর্তনেরই পক্ষে, কিন্তু এখন হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার তিনি বিরোধী। তিনি মনে করেন, এখন হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে, পরিণামে হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে একরাষ্ট্রভুক্ত হতেই হবে।

এই সময় আলোচনা-কক্ষে প্রবেশ করলেন ভি পি মেনন। সঙ্গে সঙ্গে লায়েক

আলি প্রস্তাব করলেন যে, ভারতের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করতে তিনি রাজি আছেন। পাঁচ বছর অথবা দশ বছরের জন্য এই চুক্তি কার্যকর হবে। এই পাঁচ অথবা দশ বছরের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের উপর ভারতের তিনটি ক্ষমতার বিষয় (যোগাযোগ, পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষা) কিভাবে এবং কতখানি প্রযোজ্য হবে, তারই সর্ত এই চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৬শে মে, ১৯৪৮ সাল : ভি পি মেনন ও লায়েক আলি, মাত্র এই দুজন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি আজকের আলোচনার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল। খসড়া ও ফরমুলা রচনার অদ্ভুত প্রতিভা আছে ভি পি'র এবং তার জন্য অফুরন্ত পরিশ্রম করবার শক্তিও তিনি রাখেন। মীমাংসাহীন জটিল হায়দরাবাদ-সমস্যার এই হতাশাকর অধ্যায়ে পেঁৗছেও ভি পি নতুন ক'রে এবং বিস্তারিতভাবে চুক্তির কতগুলি সূত্র রচনা ক'রে ফেললেন। চুক্তির সূত্রগুলি দুই অংশে বিভক্ত। সবশুদ্ধ এগারটি বিভিন্ন বিষয়ে ও ব্যবস্থায় দুই পক্ষের স্বীকারযোগ্য একটা চুক্তির খসড়া। প্রথম অংশে ভারত ও হায়দরাবাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের মূলবিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যবস্থা প্রতিপালিত হলে প্রথম অংশে বর্ণিত ভারত-হায়দরাবাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হবে।

চুক্তির এই নতুন সূত্রগুলিতে লায়েক আলিরও একটি অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। রাষ্ট্রভুক্তির কথা বাদ দেওয়াই হয়েছে এবং তার বদলে তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি ব্যবস্থার বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে—গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা।

মাউণ্টব্যাটেনও এই ধারণা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করেন যে, হায়দরাবাদে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাই সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা। চুক্তির এই নতুন সূত্রগুলিতে যেসব ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বিশেষ কিছু উৎসাহ বোধ করছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন। আবার দিনের পর দিন এবং দীর্ঘকাল ধরে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ হবে, আবার দর-কষাকষির একটা নতুন পর্যায় শুরু হবে, এই সম্ভাবনাই দেখছিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং তার জন্যই নৈরাশ্য বোধ করছিলেন। তাঁর মতে, এখন গণভোটের দ্বারাই এই সমস্যার হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলার চেষ্টা প্রয়োজন এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

লায়েক আলির ব্যক্তিগত অভিমতও গণভোট প্রস্তাবের পক্ষেই রয়েছে বলে মনে হলো। তিনি বললেন, গণভোটের ব্যবস্থা গৃহীত হলে দু'পক্ষেরই মুখরক্ষা করা হবে।

ভারতের সাধারণ জনমত এবং সরকারী অভিমতও গণভোটের পক্ষে। বিশেষ ক'রে প্যাটেল গণভোটের ব্যবস্থাই সমর্থন করছেন, যদিও এটা সকলেই উপলব্ধি করছেন যে, গণভোট গৃহীত হলেই হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে একরাষ্ট্রভুক্ত করবার অভিমতই জয়ী হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া গণভোট গৃহীত হবার পরেও ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের 'রাষ্ট্রভুক্তি'ও যে আপনাআপনি হয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনার আশাও সকলেই পোষণ করছেন না।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৯শে মে, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ এখন পরিণামের সবচেয়ে বেশি কঠিন এক সন্ধিক্ষণে এসে পেঁৗছেছে। মুসৌরীতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসেছেন ভি পি। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের অনুকূলেই প্যাটেল তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভাব ও ভাষা

যেমন স্পষ্ট, তেমনই শক্ত। গণভোটের ব্যবস্থার পক্ষেই মত দান করেছেন প্যাটেল। ভি পি-রচিত চুক্তির সূত্রগুলির প্রথম অংশ তিনি সমর্থন করেছেন। ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের যে প্রস্তাব এই সূত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, সেটা মেনে নিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই খসড়া-চুক্তির দ্বিতীয় অংশের সূত্রগুলিতে যেসব অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্যাটেল আর একটু শক্ত হবার নীতি পছন্দ করেন। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় তিনি এইটুকু স্পষ্ট ক'রে দেখতে চান যে, হায়দরাবাদের শাসনব্যাপারে প্রধানত অ-মুসলমান সমাজের হাতেই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেশি ক'রে এসে গিয়েছে। এ বিষয়ে প্যাটেল তাঁর বক্তব্য ও নির্দেশ নিজের হাতেই লিখে দিয়েছেন। প্যাটেলের নির্দেশের উপসংহারে এই অভিমতও স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি কাজের দিক দিয়ে সত্য সত্যই কোন ব্যবস্থা করবার আন্তরিক ইচ্ছা লায়েক আলির মনে থেকে থাকে, তবে তিনি যেন নিজামের কাছ থেকে মত দানের ও সম্মতি দানের ক্ষমতা নিয়ে আসেন। শুধু নিজামের বার্তাবাহক হয়ে আসলেই চলবে না। নিজামের কাছ থেকে লায়েক আলিকে এই ক্ষমতা নিয়ে দিল্লীতে আসতে হবে যে, আলোচনার দ্বারা নির্ণীত ব্যবস্থায় ইচ্ছানুযায়ী চূড়ান্ত সম্মতি তিনি নিজামের হয়েই দিতে পারবেন। প্যাটেল লিখেছেন—'এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, যিনি প্রত্যেক আলোচনার পর একবার ক'রে হায়দরাবাদে যাবেন উপদেশ আর পরামর্শ সংগ্রহের জন্য।

প্যাটেলের আর একটি নির্দেশ—নিজামের উদ্দেশে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হোক। এই টেলিগ্রামে স্পষ্ট ক'রে নিজামকে একটা সময়-সীমা জানিয়ে দেওয়া হবে। চব্বিশ ঘণ্টার সময়; তারই মধ্যে নিজামের কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিভূক্ষমতা গ্রহণ ক'রে লায়েক আলিকে দিল্লীতে আসতে হবে। যদি এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খসড়া-চুক্তিতে প্রস্তাবিত মৌলিক ব্যবস্থাগুলির সম্পর্কে সম্মতি ও স্বীকৃতি দান না করেন নিজাম, এবং লায়েক আলিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান ক'রে দিল্লীতে পাঠাতে না পারেন, তবে ভারত গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করবেন যে, হায়দরাবাদ আর আলোচনার পথে মীমাংসা করতে ইচ্ছা করেন না। এই অবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্ট ধারণা করতে বাধ্য হবেন যে, হায়দরাবাদ শুধু সময় কাটিয়ে দেবার খেলা খেলছেন। প্যাটেলের নির্দেশের শেষ কথা হলো—'এক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

নেহরুও লায়েক আলিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং একথা তিনি খোলা-খুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন।

লায়েক আলির ক্রিয়াকলাপের নানা তথ্য আমরাও গোপনভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ধূর্ত লায়েক আলি শুধু নানা কথার অজুহাতে সময় কাটিয়ে দেবার খেলা খেলছেন। কিন্তু এ-খেলা তো আর চলতে দেওয়া যায় না। লায়েক আলি অথবা নিজাম কাউকেই এখন আর দেরি করার অথবা দেরি করিয়ে দেবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। তাঁদের পক্ষ থেকে যা বলবার আছে, সেটা এখন স্পষ্ট ক'রে, চূড়ান্তভাবে এবং অবিলম্বে বলতে হবে।

অবস্থাটা নৈরাশ্যকর। এর মধ্যে কোন ভাল লক্ষণের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আশার লক্ষণ এই যে, মঙ্কটন আবার হায়দরাবাদে আসবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। সংবাদ শুনে খুশি হয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বলছেন যে, মঙ্কটন না আসা পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদ-সঙ্কটকে এই অবস্থাতেই থামিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এভাবে সমস্যাকে সামলে রাখা কতখানি সম্ভবপর হবে, সে বিষয়ে

মাউণ্টব্যাটেনের মনে সন্দেহও আছে। তার কারণ এই যে, হায়দরাবাদ সমস্যাকে একটা অবাঞ্ছিত পরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য নানা দিক থেকে চাপ পড়ছে এবং এই চাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মাউণ্টব্যাটেন ও মঙ্কটন, এই দুজনে সমস্যার যে সমাধান দেখতে ইচ্ছা করেন, সেভাবে সমাধান হবে কি না বলা যায় না।

কিন্তু আগামী ৩রা জুনের আগে মঙ্কটন ভারতে পৌঁছতে পারবেন না। এদিকে আমারও ভারত হতে বিদায়ের দিনটি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঐ ৩রা জুনেই আমি সপরিবারে বোম্বাই থেকে দেশের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ি দেব। সুতরাং এমন হতে পারে যে, ৩রা জুন তারিখের সকাল বেলায় বোম্বাইয়ে আগন্তুক মঙ্কটনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলে ভালই হবে, তখন আমি বে-সরকারীভাবে মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাব। সরকারী রীতিনীতির বন্ধন থেকে তখন আমি মুক্ত থাকব এবং তখন মঙ্কটনের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করলে আমার পক্ষে কোন 'বিশ্বাসভঙ্গের' কাজ করা হবে না। বোম্বাই থেকে বিমানযোগে সোজা হায়দরাবাদে চলে যাবেন মঙ্কটন। সুতরাং তার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে তিনি লাভবানই হবেন। আমার হায়দরাবাদ থেকে ফিরে আসার পর হায়দরাবাদ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য ঘটনা কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সে সম্বন্ধে মঙ্কটনের কিছুই জানা নেই। সুতরাং বোম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে কিছু নতুন তথ্য দিতে পারব। এই 'দৈব' সুযোগের সম্ভাবনা আছে দেখে মাউণ্টব্যাটেনও আশান্বিত হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে কোন কথা শুনবার সুযোগ না পেয়েও মঙ্কটন আমার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নিয়ে হায়দরাবাদে যাবেন এবং নিজামকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবেন। অনুমান করতে পারছি, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হায়দরাবাদ-সমস্যা আমাকে ছাড়ছে না।

বিদায়ের দিন প্রায় আগত। মাউণ্টব্যাটেনের আগেই আমি চলে যাব। আজ মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফ এক সম্মেলন আহ্বান ক'রে আমাকে ও ফে'কে বিদায় সম্বর্ধনাও জ্ঞাপন করলেন। মঙ্গলবার সকাল বেলার আগে অবশ্য আমরা দিল্লী ছাড়ছি না, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন-পরিবার আজকের এই সম্মেলনেই উপস্থিত হলেন আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। এর কারণ এই যে, আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য আজকের দিনটি ছাড়া আর কোন দিনে সুযোগ এবং সময়ও তাঁরা পাবেন না।

এ সম্মেলন পারিবারিক সম্মেলনের মতোই প্রীতিপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। আমার দুঃখ, যবনিকা পতনের পূর্বেই ভারতের এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। হায়দরাবাদ পর্বের উপসংহার পর্যন্ত আমার এখানে থাকবার খুবই ইচ্ছা ছিল। 'শেষ' পর্যন্ত এখানে থেকে এবং হায়দরাবাদ পর্বের সমাপ্তির পর মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গেই ভারত থেকে বিদায় নিয়ে যদি যেতে পারতাম, তবে বিদায় সম্বর্ধনার যে দৃশ্য দেখতাম, সেটা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ নেই। ভারত থেকে আমার অন্তর্ধানের পরিকল্পনা এবং দিনক্ষণ পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়।

বিদায় সম্মেলনে আমাকে নিয়ে স্টাফের সকলে বেশ একটা আমোদও ক'রে নিলেন। সম্মেলনের কক্ষে বিখ্যাত টিপু সুলতানের একটি প্রতিকৃতি দেয়ালের গায়ে ঝুলছিল। আমার চেহারার সঙ্গে টিপু সুলতানের চেহারার নাকি একটা সাদৃশ্য আছে; সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করলেন। টিপুর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, অতি বিষণ্ণ এবং উদাস এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি। টিপুর

ঐ বিষণ্ণ মুখের সঙ্গে যদি আমার মুখের সাদৃশ্য থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, সহকর্মীরা আমাকে আদৌ প্রশংসা করছেন না। আমার মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে এবং তারই ছাপ পড়েছে আমার মুখের উপর; একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই বিদায়ী ব্যক্তির মনকে উৎসাহিত করা নয়।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৩০শে মে, ১৯৪৮ সাল : গতকালের বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন আমাকে একটি সিগারেট-কেস উপহার দিয়েছেন। প্রীতি-পূর্ণ ভাষায় কয়েকটি কথা লেখা আছে এই উপহারের গায়ে। বিশ্বস্ততা, কর্মকুশলতা ও সৌহার্দ্যের যে পরিচয় মাউণ্টব্যাটেন পেয়েছেন, তারই স্মৃতির প্রতীক এই উপহার। উপহার পেয়ে খুশি হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এতদিন থাকবার সুযোগ পেয়ে সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার লাভ করেছি, সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ভারতে একটি মহৎ কর্তব্য পালনের জন্যই এসেছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য এই যে, এহেন ব্যক্তির কাজে সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়েছি। এই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

আজ দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে ভি পি মেনন এক বিরাট সম্বর্ধনা-সভা আহ্বান করেছিলেন। দিল্লীর প্রায় প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকেই বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এই প্রীতিসভা আহ্বান করা হয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহ পরেই মাউণ্টব্যাটেনকে আর ভারতভূমিতে দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন-বিদায়ের আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিদায় সম্বর্ধনার বহু অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে যে মেলা-মেশার পালা শেষ ক'রে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে চলে যেতে হবে, তারই সূচনা করেছেন ভি পি। বিদায়ের পালা আজ থেকেই আরম্ভ হলো।

হঠাৎ, এই সভাস্থলের মাঝপথ দিয়ে এবং গণ্যমান্যদের এই ঠাসাঠাসি ভিড় ঠেলে একজন বার্তাবাহক এগিয়ে এলেন এবং মাউণ্টব্যাটেনের হাতে তিনটি চিঠি দিয়ে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনজন। সভার প্রধান আহ্বায়ক, প্রধান অতিথি এবং প্রধান মন্ত্রী। দেখতে পেলাম—ভি পি, মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু, তিনজনেই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলি পড়ছেন।

ভারতীয় এবং বৈদেশিক সংবাদপত্রের যেসব প্রতিনিধি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই সবচেয়ে আগে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বার্তা-তত্ত্বে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এইসব সাংবাদিকদেরও বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে, এবং ব্যাপারটা ভাল নয়। মাউণ্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি পি, তিনজনেই সভার এক কোণে সরে গিয়ে এবং তাঁদের তিন মাথা প্রায় এক ক'রে নিয়ে চাপাস্বরে কথা বলছিলেন। চাপাস্বরের কথা শুনতে না পাওয়া গেলেও, তাঁদের আলোচনার ভঙ্গীতে একটা উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল। সুতরাং সাংবাদিকদের পক্ষে অনুমান ক'রে নেওয়া খুবই সহজ যে, একটা খারাপ খবরই এসেছে।

চিঠি এসেছে নিজামের কাছ থেকে। মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য পড়ে প্রথমেই ধারণা না হয়ে পারে না যে, মীমাংসার আর কোন ভরসা নেই। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু করবার সুযোগ আর নেই।

প্রথম চিঠিতে নিজাম ভি পি-রচিত খসড়াচুক্তিতে উল্লিখিত নতুন ব্যবস্থা ও মীমাংসার সূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন নিজাম, মঙ্কটন না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। দ্বিতীয় চিঠিতে রূঢ়ভাবে তাঁর 'না' জানিয়ে দিয়েছেন নিজাম। লায়েক আলির পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার যে প্রস্তাব ভি পি'র খসড়াচুক্তিতে করা হয়েছিল সে প্রস্তাব সমূহভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন নিজাম। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে যে, ভি পি'র সঙ্গে আলোচনার সময় স্বয়ং লায়েক আলিই এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। লায়েক আলির মনের ভিতরে কি ছিল জানি না, কতটা আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে শুভেচ্ছার ভাব জাগ্রত করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনি সানন্দে তাঁর নিজের পদত্যাগের প্রস্তাব সমর্থন ক'রেই নিজামকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করবেন।

তৃতীয় চিঠিতে নিজাম আবার মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু আমন্ত্রণের ভাষার মধ্যে কোন আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেন এবং কিসের জন্য নিজাম মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে আমন্ত্রণ করছেন, সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন উল্লেখ নেই। আমন্ত্রণের ভাষার মধ্যে সৌজন্যের অভাবও বেশ লক্ষ্য করা যায়।

মাউণ্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিজামের এই তিন চিঠির মধ্যে মাত্র প্রথমটির উত্তর তিনি দেবেন। আমার ধারণা, মাউণ্টব্যাটেন ঠিক সিদ্ধান্তই করেছেন। এখন আর অন্য কোন কথা নয়, শুধু এই কথাই মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে জানিয়ে দিতে চান যে, ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ করতে আবার দেরি হবে দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছেন। এই সঙ্গে আর একটি কথাও জানিয়ে দেবেন মাউণ্টব্যাটেন। এবার যখন লায়েক আলি দিল্লীতে আসবেন এবং যদি আসেন, তবে তিনি যেন নিজামের কাছ থেকে প্রকৃত প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়ে আসেন, যাতে মীমাংসার জন্য প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থায় অথবা সিদ্ধান্তে তিনি চূড়ান্ত সম্মতি দান করতে পারেন।

বিরোধিতাপ্রবণ মনোভাবেরই শোচনীয় পরিচয় নিজামের এই চিঠিগুলিতে ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে লায়েক আলিরও আর একটি আচরণের পরিচয় জানতে পেরে বিস্মিত হয়েছি। এমন একটি সিদ্ধান্তে সম্মতি দানের কথা নিজামের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন লায়েক আলি, যে সিদ্ধান্তে তিনি এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এবং অনেকের সম্মুখেই সম্মতি দান করেছিলেন। গত ২৬শে তারিখে লায়েক আলি মাউণ্টব্যাটেন, ভি পি ও নেহরুর সঙ্গে আলোচনাকালে সম্মত হয়েছিলেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরেই তিনটি বিষয়ে (যোগাযোগ, বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষা) হায়দরাবাদের প্রণীত কোন আইন বাতিল ক'রে দেবার ক্ষমতা ভারত গভর্নমেণ্টের থাকবে, এই তিনটি বিষয়ে ভারতের নীতি, আইন এবং ইচ্ছাই হবে চূড়ান্ত। লায়েক আলি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। আলোচনা-কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেকেরই এখনও মনে পড়ে যে, লায়েক আলি এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন। কিন্তু নিজামের চিঠিতে এখন উল্টো কথা শুনতে পাচ্ছি। নিজাম জানিয়েছেন যে, এই প্রস্তাবে লায়েক আলির সম্মতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন ভি পি, সেটা ভুল এবং লায়েক আলি বলছেন যে, ঐরকম কোন কথা তিনি বলেননি।

নিজামের এই চিঠিতে নেহর্র সেই সতর্কবাণীর সত্যতাই সমর্থিত হলো। নেহর্ বলেছিলেন, লায়েক আলিকে একেবারেই বিশ্বাস করা উচিত নয়, কথার কৌশলে শুধ্ সময় কাটিয়ে দেওয়া এবং মীমাংসার সব চেষ্টা দেরি করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এই লোকটির মনে।

আমি দেখছি, মঙ্কটনের হস্তক্ষেপই এখন একমাত্র ভরসা। মঙ্কটন না আসা পর্যন্ত অচল অবস্থার উপশম হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সঙ্কট ডেকে এনেছে হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে সারা ভারতের জনমতে উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠছে, এবং হায়দরাবাদের ভিতরেও ক্ষোভ ও উদ্বেগের অভাব নেই। কিন্তু এখানে হায়দরাবাদ হাউসে ক্ষোভ, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কোন চিহ্ন নেই। ডিনার পার্টির সমারোহে প্লকিত হায়দরাবাদ হাউসে জইন ইয়ার জঙ্গ এই রাজনৈতিক নৈরাশ্যের মধ্যেও ভরসা সঞ্চার ক'রে চলেছেন। হায়দরাবাদ হাউসের শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়, ভরসা আছে।

ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে আমি ও ফে হায়দরাবাদ হাউস থেকেই শেষ সম্বর্ধনার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বোম্বাই রওনা হলাম। আমন্ত্রণ করেছিলেন জইন ইয়ার জঙ্গ। জইন ও তাঁর স্টাফ এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে এক ভোজসভায় যোগদান করলাম। ভোজনের পর হায়দরাবাদ হাউসের বাগানে বসে কিছ্ক্ষণ জইন-পরিবারের সঙ্গে গল্পে ও আলাপে কেটে গেল। জনৈকা হায়দরাবাদী মহিলা কথা-প্রসঙ্গে এমন একটি মন্তব্য করলেন যাতে বোঝা গেল, স্থিতাবস্থা চুক্তি এবং রাষ্ট্রভুক্তি ইত্যাদি বর্তমানের এত গ্রুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগ্লির ম্ল্য এঁদের কাছে কতটুকু। এঁদের মন কোথায় রয়েছে এবং এঁরা সত্যি সত্যি কি ভাবেন, একটি কথায় তার পরিচয় পেয়ে গেলাম। হায়দরাবাদী মহিলা আক্ষেপ ক'রে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন—'এ দিল্লী সে দিল্লী নয়। সেই মোগল বাদশাহেরাই যখন আর নেই তখন এ দিল্লীর আর আছে কি?'

ক্যালেডোনিয়া জাহাজ, বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৯৪৮ সাল : ভারতভূমিকে পিছনে রেখে অনেকদূর চলে এসেছি। জাহাজের এক কক্ষে বসে আজ আমার দিনলিপি লিখছি।

বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসে আছি জাহাজের এই স্ন্দর কক্ষে। কক্ষটি হলো একটি 'স্টেট-র্ম'। জনৈক ভারতীয় মহারাজাও এই জাহাজে চলেছেন। খ্বই রাগ করেছেন তিনি। মহারাজার ধারণা, জাহাজের এই স্টেট-র্ম তাঁরই প্রাপ্য এবং তাঁর মতো একজন স্টেটাধিপতিকেই এই কক্ষটি দেওয়া উচিত ছিল।

অ্যাঙ্কর লাইনের বিশ হাজার টনী ক্যালেডোনিয়া ভারত থেকে এই প্রথম ইংলণ্ড-যাত্রার উদ্দেশ্যে সম্দ্রে পাড়ি দিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আট ঘটিকার সময় দিল্লীর গভর্নমেণ্ট হাউসের ছায়া পার হয়ে রেল-স্টেশনে এসে ট্রেণ ধরেছি। দিল্লী থেকে বোম্বাই, আটশত মাইল পথ এবং ট্রেণে আসতে ছাব্বিশ ঘণ্টা সময় লেগেছে। যদিও ট্রেণের একটি 'শীতল' কক্ষে স্থান পেয়েছিল্ম, তব্ও এই ছাব্বিশ ঘণ্টার ট্রেণ-যাত্রা ক্লান্তিহীন মারাথন দৌড়ের মতো ক্লেশকর মনে হয়েছে। এখন আমরা পাঁচজন দেশের মান্ষ দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমি, ফে ও আমার স্ত্রী এবং আমার দু'টি বাচ্চা-বয়সের ছেলে ও মেয়ে।

বোম্বাই ছেড়েছি আজই বিকালে। বোম্বাইয়ে এসে প্রথমে এক-গাদা টেলিগ্রাম

পাঠাবার দায়িত্বটি সেরে দিলাম। তার পরেই সান্তাক্রুজ বিমান-ময়দানে গিয়ে মঙ্কটনের সঙ্গে দেখা করলাম।

সস্ত্রীক মঙ্কটন লন্ডন থেকেই বিশেষ একটি চার্টার-করা বিমানে কিছুক্ষণ আগেই সান্তাক্রুজে এসে নেমেছেন। গিয়েই দেখলাম, সস্ত্রীক মঙ্কটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। ক্রোধের কারণ, পুলিশ ও শুল্ক-কর্মচারীর দল মঙ্কটনের জিনিসপত্র তল্লাসী করতে চাইছেন। মঙ্কটনের বক্তব্য এই যে, তিনি বিশেষ চার্টার-করা বিমানে ইংলন্ড থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছেন। বোম্বাইয়ে (সান্তাক্রুজে) তথা ভারতের কোন অংশেও তিনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন না। তাঁর বিমান শুধু সাময়িক বিশ্রামের জন্য সান্তাক্রুজ বিমান-ময়দানে নেমেছে। এই অবস্থায় তাঁর জিনিসপত্র তল্লাসী করার অধিকার বোম্বাইয়ের পুলিশ অথবা শুল্ক-কর্মচারীর নেই। মঙ্কটন আশা করেছিলেন যে, অন্যান্য দেশের নিয়মের মতো বোম্বাইয়েও শুধু তাঁর বিমানকে একবার পরীক্ষা ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম করছেন। মঙ্কটনের জিনিসপত্র তল্লাসী করবার অধিকার হলো লন্ডন ও হায়দরাবাদের কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ যেখান থেকে তিনি আসছেন ও যেখানে যাচ্ছেন। 'মাঝপথে' ব্যক্তিবিশেষের চার্টার-করা বিমানের জিনিসপত্র কোন দেশে সাধারণত তল্লাসী করা হয় না।

জানি না, কেন বোম্বাইয়ের পুলিশ ও শুল্ক-বিভাগ এই সাধারণ রীতিকে অগ্রাহ্য করার ভাবই দেখালেন। আমি জানি, এভাবে তল্লাসী করবার 'আইনগত' অধিকার তাঁদের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য দিকেও একটু চিন্তা ক'রে দেখা কর্তব্য ছিল। কে এই মঙ্কটন, কেন তিনি হায়দরাবাদে যাচ্ছেন, এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা বিবেচনার প্রমাণ পেলাম না সান্তাক্রুজের পুলিশের আচরণে। তাঁরা অনুমানই করতে পারছিলেন না, মঙ্কটনকে দেরি করিয়ে দিয়ে কত বড় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। যাই হোক, শেষপর্যন্ত আমি আমার পরিচয় ব্যক্ত করলাম, যেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে গোপনেই রেখেছিলাম। আমার পরিচয় জানবার পর পুলিশ ও শুল্ক-কর্মচারীদের মনোভাব অবশ্য বদলে গেল এবং আমার অনুরোধেও কাজ হলো।

ক্রুদ্ধ মঙ্কটন হায়দরাবাদ যাত্রা বন্ধ ক'রে দিয়ে এখান থেকেই লন্ডন ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তল্লাসীর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেলেন মঙ্কটন।

হায়দরাবাদ-সমস্যা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য ছিল, সবই মঙ্কটনকে জানালাম। মঙ্কটন হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে হায়দরাবাদ-সমস্যার সম্পর্ক কাজের দিক দিয়ে এতদিনে এবং এইখানে সমাপ্ত হলো। আমিও এইবার মুক্ত হলাম। আমার শেষ সরকারী কর্তব্যও এইখানে শেষ হলো।

একটি টেলিগ্রামে মাউন্টব্যাটেনকেও এই আলোচনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। মঙ্কটনের সঙ্গে প্রথম আলাপে বুঝলাম যে, তিনি সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করছেন না। তাঁর উৎসাহেরও অভাব লক্ষ্য করলাম। তাঁর হস্তক্ষেপে এখন সত্যি সত্যি কোন কাজ হতে পারে এবং তাঁর পরামর্শেই ঘটনার গতি এখন ভালর দিকে ঘুরে যেতে পারে, এটা তিনি অনুমান করতে পারছেন না। মঙ্কটনের ধারণা, নিজামকে কোন প্রস্তাবে ও ব্যবস্থায় সম্মত করার সুযোগ এখন বস্তুত শূন্যে হয়েই গিয়েছে। আমি মঙ্কটনকে জানিয়েছি, বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনা কি অবস্থায় পৌঁছেছে। এখন কালক্ষেপ করলেই সবচেয়ে বড় ভুল করা হবে, একথাও মঙ্কটনকে

স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। যাই হোক আলোচনার শেষে মঙ্কটন তাঁর নৈরাশ্য অনেকখানি বর্জন করেছেন। প্রথমে তাঁর মধ্যে উৎসাহের যতটা অভাব দেখেছিলাম, ততটা এখন বোধ হয় আর নেই। অনেকখানি আশার ভাব নিয়েই তিনি রওনা হয়ে গিয়েছেন।

মঙ্কটন অবশ্য বলেছেন যে, খুব তাড়াতাড়ি তিনি কিছু ক'রে উঠতে পারবেন না। নিজামকে বুঝিয়ে পথে আনতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ, একবার বললে কোন কথারই অর্থ বুঝতে পারেন না নিজাম এবং কোন পরামর্শকেই একবারের বলাতে আমল দিতে তিনি চান না। সুতরাং সময় চাই। মঙ্কটন বলেছেন, কোন একটা সিদ্ধান্তে নিজামের অভিমত স্পষ্ট ক'রে আদায় করতে পারলেই তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী চলে যাবেন।

গণভোটের কথাও মঙ্কটনকে জানিয়েছি। মাউণ্টব্যাটেন এবং প্যাটেল, উভয়েই গণভোটের ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথাও জানিয়েছি। এই প্রসঙ্গে মঙ্কটনের বক্তব্য জানবার সুযোগ পেয়ে আমার দুশ্চিন্তার ভারও অনেকখানি কমে গিয়েছে। মঙ্কটন বললেন, তিনিও লণ্ডনে থাকতেই সমস্যার সমাধানের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছেন যে, গণভোটের ব্যবস্থাই সমাধানের পথ। লায়েক আলির বদলে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার প্রস্তাবে নিজাম সুস্পষ্ট ও রূঢ় 'না' জানিয়ে দিয়েছেন, এই কথা শুনে মঙ্কটন বলেছেন যে, সম্ভবত প্রস্তাবের মধ্যে অথবা প্রস্তাব উত্থাপনের রীতির মধ্যেই কোন ত্রুটি হয়েছে। সম্ভবত যথোচিত শোভন ও সুষ্ঠুভাবে এ প্রস্তাব নিজামের কাছে উপস্থাপিত করা হয়নি।

মঙ্কটন বলে গেলেন যে, তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁর মতে, লায়েক আলির বদলে এখন জইন ইয়ার জঙ্গকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাতে পারলে কাজ হবে এবং জইন ছাড়া এ কাজে সাহায্য করার মতো দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তি আর নেই।

সান্তাক্রুজে শুল্ক-কর্মচারীদের আচরণে কিছুটা বিড়ম্বিত হলেও মঙ্কটনের সঙ্গে আমার আলোচনার দায়িত্ব ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের সার্থকতা আরও ভাল ক'রে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছি। ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারলে রাজনীতিক ঘটনার পরিণাম ঠিক দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়। মঙ্কটনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, লণ্ডন থেকে সোজা হায়দরাবাদে না গিয়ে প্রথমেই দিল্লীতে যাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হতো না। কিন্তু দিল্লীতে না-যাবার কারণে সমস্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও তাঁর অজ্ঞাত থাকায় তিনি যে অসুবিধায় পড়তেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে সে অসুবিধা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভারত সরকারের বক্তব্য যুক্তি ও মনোভাবের রিপোর্ট পেয়ে তিনি খুবই লাভবান হয়েছেন।

বোম্বাইয়ের বৈকালের আলোক ম্লান হবার আগেই জাহাজে উঠেছি। জাহাজে উঠেই বুঝলাম, মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা শূন্যতায় বেদনাতুর হয়ে উঠল সারা মন। প্রবল এক কর্মের জগৎ থেকে হঠাৎ যেন ছিন্ন হয়ে এক সুপ্রচুর আলস্যের জগতে এসে পড়েছি।

ক্যালেডোনিয়ার কোলে বসে স্বদেশভূমির উপকূলের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। এখনো ভারতভূমিকে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আরব সমুদ্রের জলে ক্যালেডোনিয়া মনের সুখে সাঁতার দিয়ে চলেছে। পিছনে দূর বোম্বাইয়ের সন্ধ্যায় দূরের তারকার মতো মিট মিট ক'রে জ্বলছে শত শত দীপ। বোম্বাইয়ের এই নিষ্প্রভ দীপের রেখা ক্রমেই আরও দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবই শান্ত।

কিন্তু জাহাজের কর্তৃপক্ষ সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন, এক প্রচণ্ড ঝঞ্চা এগিয়ে আসছে। জল ও আকাশের এই শান্ত ভাব দেখেও এখন ধারণা করতে হচ্ছে, আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

লণ্ডন, বুধবার, ২৩শে জুন, ১৯৪৮ সাল : বিশটি দিন সমুদ্রে কাটিয়ে দিয়ে গত কাল আমরা লিভারপুলে এসে পেঁছেছি। সমুদ্রপথে সত্যি সত্যিই ঝড় দেখা দিয়েছিল। বোম্বাই থেকে প্রায় দেড় শত মাইল দূরে প্রথম দেখা হলো এই ঝড়ের সঙ্গে। এডেন পর্যন্ত প্রায় সমস্তটা পথই আমাদের জাহাজ ঝড়ের কশাঘাত সহ্য ক'রে এসেছে।

ঠিক সময়মতো ইংলণ্ডে পেঁছেছি। ভারত থেকে সমুদ্রপথে আমাদের ইংলণ্ডে পেঁছতে লেগেছে বিশটি দিন, ওদিকে মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে এবং সদলে ভারত থেকে যাত্রা ক'রে আকাশপথে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডে পেঁছে গিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেনের বিমান নর্থহল্টে নামবার আগেই আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পেরেছি।

নর্থহল্টের বিমান-ময়দানে উপস্থিত ছিলেন ডিউক অব এডিনবরা এবং প্রধান মন্ত্রী এটলি। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন মাউণ্টব্যাটেন, জনৈক ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল ভারতে তাঁর কার্যকালের সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসেছেন। এই তো ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাকেই যে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার দ্বারা সম্মানিত করা হচ্ছে, তার অভিনবত্ব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। একথা আমি কখনো শুনিনি যে, একজন ভাইসরয় অথবা গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিনে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজন রাজকীয় ডিউক এবং এক প্রধান মন্ত্রী কোনদিন সশরীরে বিমান-ময়দানে অথবা জাহাজঘাটায় উপস্থিত হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া কোন গভর্নর-জেনারেলের এ সম্মান লাভের সৌভাগ্য হয়নি। নর্থহল্টের বিমান-ময়দানে অন্যান্য মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া, উচ্চপদের রাজকর্মচারীর দলও ছিলেন। বি বি সি-র, সংবাদপত্রের এবং সংবাদ-চিত্র প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ফটোগ্রাফারদের ভিড়ের কথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ক্রুজার 'দিল্লী' এখন পোর্টস্‌মাউথে বিশ্রাম করছে, কিন্তু 'দিল্লী'র এক শত জন নৌ-সৈনিক গার্ড-অব-অনার প্রদর্শনের জন্য যথাসময়ে নর্থহল্টে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এর মধ্যে এটলির উপস্থিতিই আমার সবচেয়ে বেশি শোভন বলে মনে হয়েছে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা এটলিরই এক অসাধারণ সুকীর্তি বলে মনে করা যেতে পারে। এ ঘটনা তাঁরই প্রধান মন্ত্রিত্বে পরিচালিত ইংলণ্ডের এক ঐতিহাসিক নীতি ও সিদ্ধান্তের ফল। এই নীতির উদ্ভাবনে, রচনায় ও সফলীকরণে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এটলিই বিশেষ দায়িত্বের ভার বহন করেছেন। কোনই সন্দেহ নেই যে, যেমন মর্লি ও মিণ্টোর নাম এবং মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ডের নাম ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, তেমনি এটলি ও মাউণ্টব্যাটেনের নাম ভবিষ্যতের ইতিহাসে একই কৃতিত্বের পরিচয়-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে।

নর্থহল্টের মাটিতে নেমে এল মাউণ্টব্যাটেনের বিমান। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনার পর মাউণ্টব্যাটেন বিমানক্ষেত্রের অফিসগৃহের এক কক্ষে চা-পানের জন্য প্রবেশ করলেন। আমরাও সকলেই এই চায়ের আসরে এসে ঠাঁই নিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, এটলির সঙ্গে হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। তার পরেই আমাকে কাছে ডাকলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং হায়দরাবাদ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে এটলিকে শুনিয়ে

দেবার জন্য আমাকে বললেন। হায়দরাবাদে গিয়ে এবং নিজামের সংগে সাক্ষাৎ ও আলোচনা ক'রে আমার কি ধারণা হয়েছে, সেই সম্বন্ধেই কিছু শুনতে চান এটলি।

সংক্ষেপেই বললাম এবং এটলিও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এর পর মন্তব্য করলেন এটলি—"আমার মনে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই যে, মানুষের পক্ষে যতটা করা সাধ্য, নিজামের সংগে একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তার সবই করা হয়েছে।"

এটলির মতে, এবিষয়ে আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটিও করিনি। সুতরাং হায়দরাবাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের পক্ষে মনের ভিতরে কোন আক্ষেপ পুষে রাখবার কারণ নেই। সংগতভাবে ও ন্যায়োচিত পন্থায় যা করা সম্ভবপর, তা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এখন গ্লানিমুক্ত মন নিয়েই যে যার ঘরে ফিরে যেতে পারি।

মাউণ্টব্যাটেন এসে জানিয়েছেন, হায়দরাবাদের সংগে মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কেন ব্যর্থ হলো এবং কিভাবে ব্যর্থ হলো, তার বিশদ বিবরণ এখনো আমি শুনিনি, জানিও না। ভারত থেকে আসবার পথে জাহাজের রেডিও থেকে মাঝে মাঝে এই সংবাদটুকু মাত্র শুনবার সুযোগ পেয়েছি যে, ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেনের গত পনর মাসের সর্বক্ষণের কাজের সংগী আমরা আজ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেব। মাউণ্টব্যাটেনের 'স্টাফ', তাঁর এই অন্তরঙ্গ কর্মসহচরের দল আজ শেষবারের মতো তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে চলে যাবেন, এটা ভাবতেও অদ্ভুত লাগছে। অতি বৃহৎ এক ঘটনার কেন্দ্রস্থল থেকে অস্বাভাবিক কর্মপ্রাবল্যের মধ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করার পর যদি হঠাৎ আবার স্বাভাবিক শান্ত কর্ম-ধারার মধ্যে ফিরে আসতে হয়, তবে এই স্বাভাবিকতাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে না হয়ে পারে না। এমন অবস্থার সংগে মনের অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করাও দুরূহ।

আজকের এই গ্রীষ্মের শান্তকোমল সন্ধ্যায় আমাদের প্রায় সকলেই 'ছুটি' নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ফিরে আসবার পরেও আমাদের এতদিনের অভ্যাসের দোষে একটা অসুবিধায় বিব্রত হতে হবে। মাত্রাছাড়া কাজের ভিড় থেকে সরে এসে এখন আবার রুটিনমাফিক প্রাত্যহিক কাজের রীতি গ্রহণ করতে হবে। অভ্যাসে বাধবে বৈকি। হয়তো সে রীতি নতুন ক'রেই শিখতে হবে।

লণ্ডন, সোমবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৮ সাল : লর্ডসের টেস্ট ম্যাচে ব্র্যাডম্যানের খেলার আকর্ষণে এবং জয়-পরাজয়ের দুশ্চিন্তায় এই ক'দিনের সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেলেও তার মধ্যে ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের শেষ তিন সপ্তাহের নাটকীয় ঘটনাবলীর কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করেছি। জাহাজের রেডিও থেকে সামান্যই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। হায়দরাবাদ সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এই ঘটনার যৎসামান্য বিবরণ রেডিওতে ঘোষিত হয়েছিল। ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের শেষ বেতার ভাষণের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও জাহাজের রেডিও থেকে পেয়েছিলাম। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় অনুষ্ঠানের কিছু বিবরণ শুনতে পেয়েছিলাম এবং তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেন-বিদায়ের দিনে ১৫ই আগস্টের মতোই শত শত ব্যাকুল হৃদয়ের এক বিরাট প্রীতির উৎসব দেখা দিয়েছিল। ১৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত দিল্লীর সেই আগ্রহ ও আন্তরিকতার উৎসবের তুলনায় মাউণ্টব্যাটেনের এই বিদায়-অনুষ্ঠানের দৃশ্য এক দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পনরই আগস্ট ছিল ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসব, আর এই অনুষ্ঠান হলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে মাউণ্টব্যাটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠান।

রোনি এবং ভের্ননের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা ক'রে শেষ তিন সপ্তাহের বিবরণ সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে দুবার সাক্ষাতে আলোচনা ক'রে আরও তথ্য জানবার সুযোগ পেয়েছি। এই ভাবে সংগৃহীত আমার তথ্যগুলিকে সাজিয়ে শেষ তিন সপ্তাহের ঘটনাবলীর একটা পূর্ণ পরিচয় দাঁড় করাতে পেরেছি। আমি ভারত থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পর সেখানে ঘটনার ধারা কিভাবে কোন্‌দিকে চলে গিয়েছে এবং কোন্ পর্যন্ত এসেছে, তার পরিচয় এখন আমি সংক্ষেপে দিতে পারি।

তিন দিন হায়দরাবাদে থেকে মঙ্কটন লায়েক আলিকে সঙ্গে ক'রে দিল্লীতে এলেন। কয়েকদিন ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে মঙ্কটনের আলোচনাও হলো। সমস্ত আলোচনার ব্যাপারটাই বাদ-প্রতিবাদে ও তর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং বোঝা গেল যে, এ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে মীমাংসাহীন অবস্থাতেই শেষ হয়ে যাবে। নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন লায়েক আলি, কিন্তু নেহরু এ প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলেন। লায়েক আলির সঙ্গে কথা বলতেই রাজি হলেন না নেহরু। মঙ্কটনও এই ভয় দেখালেন যে, এরকম ব্যাপার হলে তিনিও আর কোন আলোচনার ব্যাপারে থাকবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্যই প্রস্তুত হলেন মঙ্কটন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনই চেষ্টা ক'রে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন থেকে সেদিন রক্ষা করলেন। নেহরুকে টেলিফোন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তাঁর মনে এখনো যথেষ্ট আশা ও বিশ্বাস আছে যে, সন্তোষজনকভাবে একটা মীমাংসা এখনো হতে পারে। মাউণ্টব্যাটেন এইভাবে তাঁর একটা বিশ্বাস ও আশার কথা বললেন বটে, কিন্তু টেলিফোন করার সময়ও তিনি জানতেন না যে, কিভাবে অথবা কোথায় গিয়ে চেষ্টা করলে সন্তোষজনক মীমাংসার সূত্র পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক, নেহরুকে টেলিফোন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন অন্তত তখনকার মতো তরী ভাসিয়ে রাখলেন, তখনি ডুবে যেতে দিলেন না।

৮ই জুন তারিখে নেহরু এক বক্তৃতা দিলেন। হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন জনসাধারণের মন আন্দোলিত করছে, এই বক্তৃতায় সেই সব প্রশ্নের উল্লেখ করলেন নেহরু। প্রশ্নের উত্তরও তিনি এই বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন। ভারত সরকার কেন এখনো হায়দরাবাদে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছেন না, এই প্রশ্ন তুলে অনেকেই ভারত সরকারের আচরণের সমালোচনা করছেন। নেহরু তাঁর বক্তৃতায় বললেন, অস্ত্রবলে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যার সমাধান যতটা হয়, তার চেয়ে বেশি ক'রে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। নেহরুর এই বক্তৃতার ফল ভালই হলো। ঝড় শান্ত হলো। মঙ্কটনও শান্ত হলেন। আর একবার ভাল ক'রে চেষ্টা করার সুযোগ পেলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মঙ্কটন স্বীকার করলেন যে, ভবিষ্যতে হায়দরাবাদে গণভোট গৃহীত হবে, মাত্র এই প্রস্তাবের দ্বারা অবশ্যই বর্তমানের অশান্তিকর অবস্থা ও বিরোধের সমাপ্তি ঘটান সম্ভবপর হবে না। ঐ প্রস্তাব ছাড়া আরও কিছু করা দরকার। ওদিকে মুসৌরী থেকে রোগশয্যায় শায়িত প্যাটেল স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, হায়দরাবাদকে এখন দ্বিধাহীনভাবে এবং কোন সর্তের দাবী না ক'রে রাষ্ট্রভুক্তি স্বীকার ক'রে নিতে হবে। এ ছাড়া সমাধানের অন্য কোন পথ আর নেই।

মুসৌরী থেকে প্যাটেল জানিয়েছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট আর কোন ফরমূলা বা নিষ্পত্তির সূত্র উদ্ভাবন করতে পারবেন না। ভারতের পক্ষ থেকে নতুন ক'রে আর

কোন প্রস্তাব উত্থাপন করাও এখন আর সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে ভারতের যা করবার ছিল তার সবই করা হয়ে গিয়েছে। হায়দরাবাদের মনে যদি নিষ্পত্তি করবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখন হায়দরাবাদকেই বলতে হবে—কিভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে। এখন নতুন ফরমূলা তথা নিষ্পত্তির সূত্র উদ্ভাবন ও উত্থাপন করার দায়িত্ব হলো হায়দরাবাদের, ভারতের নয়।

প্যাটেলের এই অভিমত সমর্থন করলেন মঙ্কটন। তিনি স্বীকার করলেন, এখন হায়দরাবাদের কাছ থেকেই নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে ফরমূলা ও প্রস্তাব আসা উচিত।

স্বয়ং মঙ্কটনই নিষ্পত্তির সূত্র রচনা করলেন। সবশুদ্ধ দু'টি দলিল তৈরি করলেন মঙ্কটন। একটি হলো, নিজামের এক ফারমানের খসড়া। এই ফারমানে নিজাম ঘোষণা করবেন যে, তিনি হায়দরাবাদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট স্থাপন করবেন, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকেই গণপরিষদ গঠন ক'রে ফেলবেন, এবং অবিলম্বে বর্তমান গভর্নমেণ্টকে পুনর্গঠিত করবেন।

দ্বিতীয় দলিলটা সত্যি সত্যি নতুন ক'রে রচিত কোন দলিল নয়। ভি পি মেননের রচিত নতুন খসড়া-চুক্তির প্রথম অংশটা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন মঙ্কটন, যার মধ্যে প্রস্তাবিত ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের মূল বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্কটন তো দলিল রচনা করলেন। হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে এইভাবে নিষ্পত্তির একটা সূত্র উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু লায়েক আলি যা বললেন, তাতে বোঝা গেল যে তিনি আবার নতুন ক'রে কালক্ষেপ করার খেলা খেলতে চাইছেন। লায়েক আলি বললেন, তাঁকে অবশ্যই একবার হায়দরাবাদে গিয়ে নিজামের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

৯ই জুন তারিখে দিল্লীতে এই সংবাদ রটে গেল যে, পাকিস্থানের এক প্রতিনিধি হায়দরাবাদে এসেছেন। লায়েক আলি শপথ ক'রে বললেন যে, এ সংবাদের মূলে কোন সত্যতা নেই। যাই হোক, মনে বহু সন্দেহ ও উদ্বেগ সত্ত্বেও দিল্লী এবারও লায়েক আলিকে কোন বাধা দিল না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সম্মত হলেন, এবং ঠিক হলো যে লায়েক আলি এ বিষয়ে নিজামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ফিরে আসবেন। মঙ্কটন রইলেন দিল্লীতে, এবং লায়েক আলি চলে গেলেন হায়দরাবাদে।

১২ই জুন তারিখে নিজামের উপদেষ্টা মঙ্কটন জানালেন যে, তাঁর রচিত নতুন খসড়া-প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল বিষয়ই নিজাম এবং নিজামের কাউন্সিল অনুমোদন করেছেন, মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া। হায়দরাবাদ রাজ্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত গণপরিষদে সদস্যদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত সম্বন্ধে মঙ্কটনের প্রস্তাবে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি নিজাম এবং তাঁর কাউন্সিল। এই দুই বিষয়ে প্রস্তাবের বক্তব্যে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন নিজাম।

নিজামের এই আপত্তির সংবাদ পাওয়া মাত্র মাউণ্টব্যাটেন, মঙ্কটন ও নেহরু এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করলেন। আর একটি আলোচনার বৈঠক হয়ে গেল মুসৌরীতে। মাউণ্টব্যাটেন এবং মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য মুসৌরীতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

প্রস্তাবে যে পরিবর্তন করেছেন নিজাম, সেটা মেনে নেবারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু দুই বৈঠকেই সকলে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, নিজামকেও তাঁর বক্তব্যের একটি বিষয় সংশোধন করতে হবে। গণপরিষদে দুই সম্প্রদায়ের সমান-

সংখ্যক সদস্য থাকবে, এভাবে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ এই প্রস্তাবে রাখতে পারবেন না নিজাম। এই উল্লেখ বাদ দিতে হবে, এবং তার পরিবর্তে ফারমানে এই ক'টি কথা যোগ ক'রে দিতে হবে যে, হায়দরাবাদের 'সকল বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে' গণপরিষদ গঠন করা হবে।

১৩ই জুন তারিখে মঙ্কটন খুব জোর দিয়ে এই অনুরোধ জানিয়ে লায়েক আলিকে পত্র দিলেন যে, এইবার নিজামের কাছ থেকে যথার্থ প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়েই তিনি যেন দিল্লীতে আসেন, যাতে দিল্লীতে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্তে বা প্রস্তাবে তিনি নিজামের হয়েই চূড়ান্ত হাঁ বা না জানাতে পারেন।

দিল্লীতে ফিরে এলেন লায়েক আলি। কিন্তু নিজামের কাছ থেকে প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়ে তিনি আসেননি। স্বয়ং নিজাম এবং নিজামের কাউন্সিল, উভয়েই লায়েক আলিকে এরকম পূর্ণ ক্ষমতা দিতে রাজি হননি। যেমন বরাবর দেখা গিয়েছে, তেমনি এবারও লায়েক আলি হায়দরাবাদের মাত্র একজন আলোচনাকারী প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। কোন প্রস্তাবে মাত্র সমর্থন বা আপত্তি জানাবার মনোভাব প্রকাশের জন্য মামুলী ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নিয়ে তিনি আসেননি।

১৪ই জুন তারিখে লায়েক আলিই হঠাৎ চুক্তির খসড়া-প্রস্তাবের চারটি নতুন সংশোধন দাবী ক'রে বসলেন। প্রথম, ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টকে রাজ্যের অভ্যন্তরে সেই ধরনেরই আইন প্রবর্তনে মাত্র 'অনুরোধ' করতে পারবেন, যে ধরনের আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত করা হয়েছে বা করা হবে। বিশেষভাবে এবং একমাত্র হায়দরাবাদের জন্যই কোন আইন প্রবর্তনে হায়দরাবাদকে অনুরোধ করতে পারবেন না ভারত গভর্নমেণ্ট। দ্বিতীয়, হায়দরাবাদ আট সহস্র অ-রেগুলার সৈন্য রাখতে পারবে, যার উপর ভারতীয় সমর বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকবে না। তৃতীয়, রাজাকর দলকে হঠাৎ এবং একেবারেই ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হবে না। ক্রমে ক্রমে এবং দফায় দফায় রাজাকর দলকে ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। চতুর্থ, যে 'জরুরী অবস্থায়' ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্য রাখতে পারবেন, সেই 'জরুরী অবস্থা' বলতে কি অবস্থা বোঝায়? এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিশদ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারত শাসন আইনের নীতি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই 'জরুরী অবস্থা'র সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে।

আশা ছেড়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলির প্রস্তাবিত এই চারটি নতুন ও অতিরিক্ত দাবী ভারত গভর্নমেণ্ট কখনই স্বীকার করতে রাজি হবেন না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং খুশিও হলেন, লায়েক আলির প্রস্তাবিত এই অতিরিক্ত চারটি দাবীও মেনে নিতে আপত্তি করলেন না নেহরু। নেহরু বললেন যে, তিনি এই দাবীও মেনে নিতে রাজি হতে পারেন।

১৫ই জুন তারিখে হায়দরাবাদ ডেলিগেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং অভাবিত সফলতার কথা জ্ঞাপন করলেন। লায়েক আলি তৎক্ষণাৎ দুটি নতুন দাবী উত্থাপন করলেন। লায়েক আলি বললেন, প্রস্তাবে আরও দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ চাই। রাজ্যের অর্থনীতি এবং রাজস্বের আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল নীতি সম্বন্ধে হায়দরাবাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আবার রাজি হলেন ভারত গভর্নমেণ্ট, লায়েক আলির এই দুইটি দাবীও মেনে নিতে আপত্তি করলেন না। ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে শুধু এই প্রস্তাব করা

হলো যে, চুক্তি-প্রস্তাবে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ বা ঘোষণার উল্লেখ না রেখে, আনুষঙ্গিক এক সম্মতিপত্রে হায়দরাবাদের এই দাবীর স্বীকৃতি উল্লিখিত হতে পারে।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে এ তথ্যও জানতে পেরেছি যে, নেহরু আরও উদার প্রতিশ্রুতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু এ পর্যন্ত বলেছিলেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত সকল উদ্যোগে হায়দরাবাদকে সুবিধার অধিকার দিতে রাজি আছেন ভারত গভর্নমেণ্ট, এবং সেই সব 'সুবিধা'র কথা এই আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লেখও করা হবে।

লায়েক আলি বোধ হয় নেহরুর এই প্রতিশ্রুতির অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেন না। লায়েক আলি সত্য সত্যই প্রস্তাব করলেন যে, এ সব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ বাদ দেওয়াই ভাল এবং বাদ দিতে হবে।

প্রতিবাদ করলেন মঙ্কটন। লায়েক আলির প্রস্তাবে আপত্তি ক'রে মঙ্কটন বললেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করলে হায়দরাবাদের পক্ষে চরম বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, নেহরুর এই প্রস্তাব বস্তুত হায়দরাবাদের প্রতি বিশেষ উদারতা ও সৌহার্দ্যের প্রস্তাব। ভারত গভর্নমেণ্ট এই ধরনের প্রতিশ্রুতি মাত্র সেই সব দেশীয় রাজ্যকেই দিয়েছেন যারা রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো 'রাষ্ট্রভুক্ত' না হয়েও হায়দরাবাদ রাজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সহযোগিতা লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাচ্ছেন। নেহরুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে লাভবান হবে না হায়দরাবাদ।

মঙ্কটন এবং মাউণ্টব্যাটেন, উভয়েই এইভাবে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার পর লায়েক আলি মত পরিবর্তন করলেন। আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে ভারত গভর্নমেণ্টের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ না করবার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন, এইবার সে অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, এ ঘটনা নতুন কোন বিরোধের সূত্রপাত না ক'রে তখনই একরকম মিটে গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বাস্তব সত্যটিও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, লায়েক আলি তখনো কতখানি একরোখা মনোভাব নিয়ে সর্বপ্রকার আপোষের পথ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। এত আলোচনার পর এবং বিশেষ বিশেষ সংশোধনের পর খসড়া-প্রস্তাব শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াল, তাই নিয়ে হায়দরাবাদ রওনা হয়ে গেলেন লায়েক আলি। মঙ্কটনও লায়েক আলিকে এই বিশেষ অনুরোধ করতে ভুললেন না যে, এইবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গে নিয়েই তিনি যেন ফিরে আসেন। আবার নতুন ক'রে কোন সংশোধন বা রদবদলের দাবী যেন না উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব হয় সম্পূর্ণভাবে স্বীকার, নয় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মাঝামাঝি অবস্থায় আর ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।

লায়েক আলি রওনা হয়ে যাবার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু কোন উত্তর এল না। রাত্রি ন'টা চল্লিশ মিনিটের সময় নিজামের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল, তিনি এখনো চূড়ান্তভাবে কিছু বলতে পারছেন না। নিজাম জানালেন, কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত চূড়ান্ত বক্তব্য জ্ঞাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নিজাম তাঁর কাউন্সিল তথা শাসনপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উত্তর দিতে নিজামের আর একটা দিন সময় লাগবে এবং ততক্ষণ

দিল্লীকে শুধু প্রতীক্ষায় চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে। যাই হোক, এই প্রতীক্ষা এবং বিলম্বও সহ্য করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দিল্লী।

১৬ই জুন তারিখের বৈকালে মাউণ্টব্যাটেন এবং মঙ্কটন উভয়কেই হায়দরাবাদ থেকে জানানো হলো যে, নিজামের কাউন্সিল এই খসড়া-প্রস্তাব অনুমোদন করেননি এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যই কাউন্সিল নিজামকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রত্যাখ্যানের চারটি নতুন যুক্তি দেখিয়েছেন কাউন্সিল।

শুধু মাউণ্টব্যাটেন নয়, মঙ্কটনও এই চারটি নতুন যুক্তির স্বরূপ দেখে বিস্মিত হলেন। অত্যন্ত অসঙ্গত এবং বস্তুত হাস্যকর চারটি যুক্তি। মাউণ্টব্যাটেন এত বিচলিত হলেন যে, তিনি মঙ্কটনকে তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রিতেই হায়দরাবাদ চলে যাবার অনুরোধ করলেন। হায়দরাবাদে গিয়ে একেবারে নিজামের কাছে উপস্থিত হয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সব বক্তব্য মঙ্কটনই বলবেন। নিজাম কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলে মঙ্কটনই মাউণ্টব্যাটেনের হয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কারণ মাউণ্টব্যাটেনের উত্তর কি হতে পারে, সেটা মঙ্কটন ভালভাবেই বুঝে নিতে পেরেছেন।

গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজাম তাঁর ফারমানের মধ্যে কয়েকটা কথা এর আগে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। "ভবিষ্যতে আমি ভেবে দেখব, কোন্ ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হতে পারে, এবং সেই ভিত্তি নির্ধারণের পর"—এই উল্লেখের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। নিজামের ডেলিগেশনের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল এবং ডেলিগেশন এই কথাগুলি বাদ দিতে তখনি রাজি হয়েছিলেন। ডেলিগেশনের মতেও, এই কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই যার জন্য কথাগুলিকে ফারমানের বক্তব্যের মধ্যে রাখতেই হবে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়াতেই কথাগুলি বাদ দিতে রাজি হয়েছিলেন ডেলিগেশন এবং সংশোধিত খসড়া-প্রস্তাবে কথাগুলি বাদ দেওয়াও হয়েছিল। এখন নিজাম ঘোর আপত্তি তুলেছেন, ঐ কথাগুলিরই বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে। কথাগুলির যে কি গুরুত্ব আছে, সেটা মানুষের কল্পনাও মাথা খুঁড়ে বের করতে পারবে না। তবু নিজাম আপত্তি তুলেছেন এবং অতি তীব্র আপত্তি। আর একটি আপত্তি হলো 'অর্থনৈতিক চুক্তির' বিরুদ্ধে। কোন্ প্রস্তাবকে অর্থনৈতিক চুক্তির প্রস্তাব বলছেন নিজাম? ভারত নিজের থেকেই এবং নিজের আগ্রহে শুধু এই প্রস্তাব করেছেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত হায়দরাবাদকে সুবিধা ও সাহায্য দান করবেন। এই প্রতিশ্রুতি আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লিখিত থাকবে। নিজামের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন পাল্টা কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি দাবী করা হয়নি এবং কোন সর্তও আরোপ করা হয়নি। সুতরাং, 'অর্থনৈতিক চুক্তি'র কথা এর মধ্যে কেমন ক'রে আসে? তবু নিজাম আপত্তি তুলে বলেছেন যে, আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লেখ ক'রে নয়, আসল রাজনৈতিক চুক্তিপত্রের মধ্যেই এই অর্থনৈতিক চুক্তির বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

১৭ই জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে হায়দরাবাদ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে টেলিফোন করলেন মঙ্কটন, এবং একটি মাত্র কথা উচ্চারণ ক'রে তাঁর বক্তব্য শেষ ক'রে দিলেন। মঙ্কটন বললেন—'ব্যর্থ'।

সন্ধ্যা হতেই নিজামের কাছ থেকে তাঁর এমন আর একটি সম্পূর্ণ নতুন আপত্তির সংবাদ দিল্লীতে এসে পেঁাছলো, যে আপত্তি তিনি এর আগে কোন প্রসঙ্গে কখনও উত্থাপন করেননি। নিজাম জানিয়েছেন, জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে হায়দরাবাদে

ভারতীয় সৈন্য সন্নিবেশ করার অধিকার ভারত গভর্নমেণ্টের থাকতে পারে না। এই আপত্তি ছাড়া আর একটি ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন নিজাম—আরও আলোচনা চলতে থাকুক, আলোচনা বন্ধ করতে চাই না।

হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে এবং চলছে, এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট একটা পরিণতির মধ্যে এসে সমাপ্তি লাভ করতে পারেনি। মাউণ্টব্যাটেনের কার্যকালের শেষ দুটি সপ্তাহ ফুরিয়ে যাবার আগেই হায়দরাবাদ-প্রসঙ্গ এবং আলোচনা চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। এর ফল এই হলো যে, কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধের একটা মীমাংসা করিয়ে দেবার যে শেষ চেষ্টা মাউণ্টব্যাটেন করতে পারতেন সেটা নিতান্তই অসম্ভবপর হয়ে উঠল। গত মার্চ মাসেই তিনি দুই প্রধান মন্ত্রীকে রাজি করাতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা মাসে অন্তত একবার ক'রে পরস্পরের সাক্ষাতে এসে আলোচনা করবেন। কিন্তু তারপর দু'টি মাস পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে কোন দেখা-সাক্ষাৎ আর হয়নি।

মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে অনুরোধ করলেন, দুই প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাতের প্রস্তাব ক'রে লিয়াকৎকে চিঠি দেবার জন্য। মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছা, এবারের সাক্ষাতের স্থান ও ব্যবস্থা দিল্লীতে হলেই ভাল হয়। লিয়াকৎ দিল্লীতে এলে মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায়-বাণী জানিয়ে দিয়ে চলে যাবার সুযোগ পাবেন, কারণ ভারত থেকে মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় নেবার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থা হয়ে উঠল না। প্রথম কারণ হলো, হায়দরাবাদের ব্যাপার। দ্বিতীয়, লিয়াকৎও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সমস্যা সমাধানের নানাপ্রকার উপায় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার পূর্বে যা যা করণীয় ছিল, তা সবই করা হয়ে গিয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট এ খবর অবশ্য জানতে পেরে গিয়েছেন যে, পাকিস্থানের রেগুলার সৈন্যবাহিনীর বহুসংখ্যক দল কাশ্মীর অভিযানে নিযুক্ত হয়েছে এবং আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংবাদে ভারত মন্ত্রিসভার মন যদিও অত্যন্ত তিক্ত হয়ে রয়েছে, তবুও তাঁরা এখনো শান্তভাবেই ঘটনা ও সমস্যাকে বিবেচনার চেষ্টা করছেন। আলোচনার দ্বারা একটা নিষ্পত্তি করবার আগ্রহ এখনো তাঁদের মনে রয়েছে, অন্তত পাকিস্থানের তুলনায় বেশি ক'রেই আছে।

পাকিস্থানের রেগুলার সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণে নিযুক্ত হবার সংবাদ পাওয়ার পর সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য ও প্রমাণসহ যে রিপোর্ট নেহরু পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন, লিয়াকৎ তার উত্তর দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, লিয়াকৎ নেহরুর অভিযোগের প্রতিবাদ করেননি। পাকিস্থানী ফৌজ কাশ্মীর আক্রমণে যোগদান করেছে, এই অভিযোগ সোজাসুজি অস্বীকার করেননি লিয়াকৎ। পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবার কি আশঙ্কা, কিভাবে দেখা দিয়েছে এবং সে আশঙ্কা কতখানি বাস্তবসম্মত, তারই এক বর্ণনা পাঠিয়েছেন লিয়াকৎ। লিয়াকৎ বলেছেন—"কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্য পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে যেভাবে এগিয়ে আসছে, তাতে উপজাতীয়েরা বিপন্ন বোধ করছে। উপজাতীয়দের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, তাদের অঞ্চল ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবে।"

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, ঠিক এই সময়েই দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ হবার খুবই প্রয়োজন ছিল। তবুও দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধান যে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়েও পরস্পরের সাক্ষাতে আসতে পারলেন না, সেটা রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিক দিয়ে এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনোভাবের সম্পর্কের দিক দিয়েও খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো।

নেহরু এবং ভি পি মেনন মঙ্কটনের অপেক্ষা করছিলেন এবং মঙ্কটন দিল্লী

এসে পেঁাছতেই এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন নেহর়ু। ভারত-হায়দরাবাদ চুক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেসব নীতি, বিষয় ও ব্যবস্থার কথা নিজামের কাছে শেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তাবরূপে উত্থাপন করা হয়েছিল, এই সাংবাদিক সম্মেলনে সেসব প্রকাশ ক'রে দিলেন নেহর়ু।

এ সত্ত্বেও এবং এখনও নেহর়ু ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শেষ চেষ্টা ও সুযোগের পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে চাইছিলেন না। নেহর়ু এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হায়দরাবাদের কাছে ভারতের এই শেষ প্রস্তাব ভারত প্রত্যাহার করছে না। হায়দরাবাদের সম্মুখেই এই প্রস্তাব রইল। ইচ্ছা করলে হায়দরাবাদ এখনও এ প্রস্তাব গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারেন। নেহর়ু বললেন যে, ভারত সরকার এখনও সময় বেঁধে দিয়ে হায়দরাবাদকে এমন চাপ দিতে চান না যে, অমুক তারিখের মধ্যে এ প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করতেই হবে।

হায়দরাবাদ থেকে দিল্লীতে এসে মঙ্কটন মাউণ্টব্যাটেনের কাছে তাঁর হতাশার বিশেষ হেতু সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। লায়েক আলিরই একটি রহস্যপূর্ণ আচরণের কথা। মঙ্কটন বললেন যে, দিল্লী থেকে খসড়াচুক্তির দলিল-পত্র সঙ্গে নিয়ে হায়দরাবাদে পেঁাছেই লায়েক আলি সবার আগে দেখা করেছেন কাশিম রেজভির সঙ্গে। নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পূর্বেই লায়েক আলি রেজভির সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপার দেখেই মঙ্কটন সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্কটনও হায়দরাবাদ-সমস্যার বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হায়দরাবাদের 'অর্থনৈতিক অবরোধ' সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন। মঙ্কটন বলেছেন, তথাকথিত এই অবরোধ ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নির্দেশে প্রয়োগ করা হয়নি। এমন নির্দেশই দেননি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট। সম্ভবত কোন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টও (মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ অথবা বোম্বাই) হায়দরাবাদকে 'অবরোধ' করবার কোন নির্দেশ দান করেননি। মঙ্কটন বলেছেন—প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অধস্তন কর্মচারীরাই তাঁদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই কাজটি করেছেন।

আলোচনার ব্যাপার থেকে এইবার এবং এতদিনে 'সরকারীভাবে' নিজেকে সরিয়ে নিলেন মাউণ্টব্যাটেন। এ ব্যাপারের মধ্যে আর তিনি আসতে পারেন না, আসতে পারবেন না এবং সুযোগও নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শেষবারের মতো একটা চেষ্টা করলেন। এক দীর্ঘ টেলিগ্রামে নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর 'শেষ অনুরোধ' জানিয়ে দিলেন। এই সঙ্গে মঙ্কটনও তাঁর একটি অনুরোধের বার্তা নিজামকে জানালেন। উভয়েই নিজামকে জানিয়েছেন—'আপনি আপনার নিজের ধারণা, বিবেচনা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য সাহসের সঙ্গে দাঁড়াবেন, এই আশা করি। অনুরোধ করি, আপনি আপনার নিজের এবং রাজ্যের কল্যাণ ইত্তেহাদী অভিসন্ধির কাছে কখনই বিকিয়ে দিতে ও বিলিয়ে দিতে রাজি হবেন না।'

ইত্তেহাদীগোষ্ঠীর আচরণে এটা সুস্পষ্টই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা ভারতের সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থার মধ্যেই হায়দরাবাদকে আসতে দিতে রাজি নয়, যে ব্যবস্থায় হায়দরাবাদের উপর ইত্তেহাদী দলের প্রভুত্ব বিন্দুমাত্রও লঘু হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইত্তেহাদের ক্ষমতা নিজামেরই প্রভুত্ব-ক্ষমতাকে চেপে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে চাইছে। এই সঙ্কট এক দিক দিয়ে নিজামেরই প্রভুত্বের সঙ্কট। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ব্যক্তিগতভাবে নিজামকে যতটা বলিষ্ঠ মনোভাবের মানুষ মনে

করা গিয়েছিল, সঙ্কটকালে তাঁর আচরণে সে চারিত্রিক দৃঢ়তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল যে, নিজাম আজ ইত্তেহাদীগোষ্ঠীর চাপে অসহায়ের মতোই আত্মসমর্পণ করছেন। ইত্তেহাদী ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাশক্তির কোনই প্রমাণ তিনি দিতে পারলেন না।

বিগত এগার মাস ধরে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এই আলোচনার পালা চলেছে, তবু ব্যর্থ হলো সব আলোচনা। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে, হায়দরাবাদের প্রধান ব্যক্তি এবং ভারত সরকারের পক্ষের প্রধান ব্যক্তি কোনদিনই পরস্পরের সাক্ষাতে এসে এবং সান্নিধ্যে বসে আলোচনা করতে পারলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের মনে এখনও এই বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি নিজাম একবার দিল্লী আসতেন এবং স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন একবার মধ্যস্থ হিসাবে চেষ্টা করবার সুযোগ পেতেন, তবে এই বিরোধের মীমাংসা সহজেই হয়ে যেত। ব্যর্থতার আর একটি কারণ, হায়দরাবাদ ডেলিগেশনই মঙ্কটনকে ততটা বিশ্বাস করেনি, যতটা করা উচিত ছিল। আলোচনার ব্যাপারে মঙ্কটনের অসাধারণ দক্ষতা এবং নিজামের প্রতি ব্যক্তিগত-ভাবে মঙ্কটনের অকুণ্ঠ আনুগত্য, এই দুই বিষয়েও ডেলিগেশনের মনে পূর্ণ আস্থার অভাব ছিল। তা ছাড়া, আলোচনার ব্যাপারে ডেলিগেশনের ক্ষমতাও আর একটু বেশি থাকা উচিত ছিল। ডেলিগেশনের আচরণে, মনোভাবে ও ক্ষমতায় এই কয়টি ত্রুটি না থাকলে এত দিনের চেষ্টার ফল ভালই হতো বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে হায়দরাবাদ অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত। 'ব্যর্থতা'ই এই অধ্যায়ের শেষ কথা। ওদিকে কাশ্মীরের ঘটনাবলীও যে সঙ্কটের সূত্রপাত করেছে, তার সমাধানের চেষ্টাও মাউণ্টব্যাটেনকে এখানেই সমাপ্ত ক'রে দিতে হলো। মাউণ্টব্যাটেন আশা করেছিলেন যে, পাক প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে তিনি আর একবার দিল্লীতে দেখতে পাবেন এবং নেহরু ও লিয়াকৎ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আর একবার আলোচনায় বসবেন। কিন্তু লিয়াকৎ আলিকে দিল্লীতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবার জন্য নেহরুকে আর অনুরোধ করতে পারলেন না মাউণ্টব্যাটেন। ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যর্থতা এবং লিয়াকতের অসুস্থতা, এই দুই কারণেই মাউণ্টব্যাটেন আর কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে ভারত-পাকিস্থান আলোচনার জন্য চেষ্টা ও ব্যবস্থা করতে উৎসাহবোধ করলেন না।

কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের কাছ থেকে শেষপর্যন্ত ব্যর্থতাই উপহার পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু তিনি ভারত থেকে যাবার আগে এমন আর একটি উপহার লাভ ক'রে গেলেন, যার মূল্য ও আনন্দ ঐ দুই ব্যর্থতার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। ভারত-বাসীর সৌহার্দ্যের উপহার লাভ করেছেন, ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ভারতবাসী এবং ভারত সরকার তাঁদের জাতীয় মুক্তির এবং জাতির বন্ধু হিসাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে সহস্র শুভেচ্ছার দ্বারা অভিনন্দিত ক'রে বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের দিনে ভারত থেকে যে সম্বর্ধনা পেয়ে চলে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন সেটা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

প্রথমে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি। নয়াদিল্লী ও পুরাতন দিল্লীর রাজপথে হাজার হাজার ভারতীয়ের ভিড় ও জয়ধ্বনির ভিতর দিয়ে এবং চাঁদনী চক পার হয়ে সম্বর্ধনাসভায় উপস্থিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন। এই সেই চাঁদনী চক ও সেই সড়ক, ১৯১১ সালের হার্ডিঞ্জ-হত্যা প্রয়াসের সেই ঘটনার পর যে পথ দিয়ে আর কোন ভাইসরয়কে কখনো যেতে দেখা যায়নি। গান্ধী-ময়দানে

প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশে চঞ্চল ও ব্যাকুল এক সম্বর্ধনাসভায় উপস্থিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন। সারা পথে জনতার কাছ থেকে জয়ধ্বনি ও পুষ্পমাল্যের উপহার পেয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধী-ময়দানের জনসভায় আরও আড়াই লক্ষ লোকের ভিড় প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু সভায় আর জায়গা ছিল না।

সন্ধ্যায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আহূত ভোজসভায় মাউণ্টব্যাটেন-পরিবারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। বক্তৃতা করলেন নেহরু।

মাউণ্টব্যাটেনকে লক্ষ্য ক'রে নেহরু বললেন—'মহাশয়, আপনি আপনার অসীম খ্যাতি ও প্রতিভা নিয়ে এই ভারতভূমিতে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এ ভারতভূমিতে আপনার পূর্বে আগত বহু ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেলের খ্যাতি ও প্রতিভা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। আপনি ভারতের এক অতি কঠিন রাজনৈতিক দুর্যোগ এবং সংকটের কালে এসেছিলেন এবং অতি দুরূহ অবস্থার মধ্যেই আপনাকে এখানে থাকতে ও কাজ করতে হয়েছে। তবুও, ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন, আপনি আপনার প্রতিভা ও খ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেই আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র আপনিই এই কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করতে পেরেছেন।'

লেডি মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে নেহরু বললেন—'সেবিকার মমতা দিয়ে আপনি স্পর্শ করেছেন ভারতের হৃদয়। আপনি ভারতের দুঃখাক্রান্ত মানুষের কাছে যেখানেই যখন গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, সান্ত্বনা ও আশার উপহার নিয়ে গিয়েছেন। তাই আজ আর বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, ভারতবাসী আপনাকে বিদায় দেবার সময় এক আপনজনকে বিদায় দেবার দুঃখ অনুভব করছে।'

প্যামেলার কথাও ভুলতে পারলেন না নেহরু। 'শান্তশীলা বালিকা প্যামেলা, ইংলণ্ডের স্কুল-জীবন থেকে যাকে এখানে এসে বহু অশান্তি ও ঘটনায় ক্ষুব্ধ ভারতের এক সংকটকালে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির মতোই বহু দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়েছে', তার উদ্দেশেও বিদায়বাণী জানালেন নেহরু।

সেদিনই বিকালে, মাত্র চার ঘণ্টা আগে, দিল্লীর রাজপথে জনতার কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন যে প্রীতি ও অভিনন্দনের বিস্ময়কর উপহার লাভ করেছেন, সে ঘটনারও উল্লেখ ক'রে নেহরু বললেন—'আমি জানি না, ভারতীয় জনতার কাছ থেকে এই বিরাট প্রীতির পরিচয় পেয়ে লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন কি ভাবছেন। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি, ভারতে এসে এত অল্পকালের মধ্যে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ও এক ইংরেজ মহিলা কেমন ক'রে এত বড় আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করতে পারলেন? এই অল্পকালের অধ্যায়টি ভারত-জীবনের এক সাফল্য অর্জনের অধ্যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, এই অধ্যায়টি বহু দুঃখ এবং বিপর্যয়েরও অধ্যায়। তাই মনে হয়, দুঃখ এবং বিপর্যয়ের স্মৃতি সরিয়ে রেখে ভারতবাসী আজ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দু'জনের প্রতি তাদের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিচয় দান করেছে। আপনারা প্রীতি ও শ্রদ্ধার আরও অনেক উপহার-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ভারতীয় জনতার এই প্রীতির চেয়ে বেশি সত্য ও মূল্যবান কোন উপহার অবশ্যই নিয়ে যাচ্ছেন না।'

বক্তৃতার উপসংহারে নেহরু বলেন—'স্যার ও মাদাম মাউণ্টব্যাটেন, আপনারা আজ অবশ্যই অনুভব করতে পেরেছেন, মানুষের প্রীতি ও সৌহার্দ্য কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।'

মাউণ্টব্যাটেন ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন, উভয়েরই মন এ বিদায়-অনুষ্ঠানের অজস্র

প্রীতির স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। উভয়েই বক্তৃতা দিলেন, সে বক্তৃতাকে হৃদয়ের ভাষা দিয়ে রচিত বক্তৃতা বলা যায়।

শেষবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার বিনিময়ের পালাও শেষ হলো। ভারত সরকার মাউণ্টব্যাটেনকে একটি ট্রে উপহার দিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের সকল মন্ত্রী এবং সকল প্রাদেশিক গভর্নরের স্বাক্ষরচিহ্নের দ্বারা খচিত একটি ট্রে।

মাউণ্টব্যাটেন ভারত সরকারকে উপহার দিলেন একটি স্বর্ণনির্মিত প্লেট। এই প্লেট রাজা পঞ্চম জর্জকে উপহার দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত 'গোল্ডস্মিথ এণ্ড সিলভারস্মিথ' প্রতিষ্ঠান। রাজা ষষ্ঠ জর্জের ইচ্ছা অনুসারেই এই স্বর্ণপাত্রটি ভারত সরকারকে উপহার দেওয়া হলো। রাজা ষষ্ঠ জর্জ জানিয়েছেন—'ভারতের জনসাধারণের প্রতি সকল ইংরাজ নরনারীর, তথা যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক নরনারীর সৌহার্দ্যের প্রতীকরূপে' এই বস্তুটি ভারতকে উপহার দেওয়া হলো।

বিদায়-অনুষ্ঠানের এই ভোজ-সভায় কম ক'রেও ছয় হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে লেডি মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর সেবাব্রতের শেষ অনুষ্ঠান সেরে নিলেন। কুরুক্ষেত্র এবং পাণিপথের শরণার্থীদের শিবিরে উপস্থিত হলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। এই দুই শিবিরে তখনো তিন লক্ষ শরণার্থী ছিল। হাজারে হাজারে শরণার্থী নরনারী লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে ঘিরে দাঁড়াল। জলভরা চোখে বিদায় সম্ভাষণ জানাল শরণার্থী নরনারী। শরণার্থীরা যে সব সামগ্রী লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে উপহার দিল, সেই সামগ্রী এক ব্যক্তি দিল্লীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে, তারই জন্য রেলভাড়া সংগ্রহ করল শরণার্থীরা, নিজেদের মধ্যেই এক-পয়সা ও এক-আনা ক'রে চাঁদা তুলে।

আর একটি সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দিল্লীর সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে আহূত সম্বর্ধনার সভা। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বর্তমানে চীনা রাষ্ট্রদূতই হলেন দিল্লীতে অবস্থিত বৈদেশিক দূতগোষ্ঠীর আচার্য। তিনি সুধী ও কৃতবিদ্য, মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেদন নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করবার শক্তি তাঁর আছে। মাউণ্টব্যাটেনের এই ঐতিহাসিক বিদায়-পর্বের অনুষ্ঠান সকলের মনের গভীরে হর্ষ ও বেদনায় মিশ্রিত যে ভবানার আবেগ জাগি তুলেছে, তার পরিচয় ও রূপ তিনিই প্রায় ঠিক-ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এক বিখ্যাত চীনা কবির রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন চীনা রাষ্ট্রদূত :

"পুষ্পিত পীচতরুর ছায়ায়
শীতল ঝরণার জল খুবই গভীর।
তার চেয়েও বেশি গভীর
হৃদয়ের প্রীতি আবেগ ও বেদনা,
সুহৃদ্ যখন বিদায় নিয়ে যায়।"